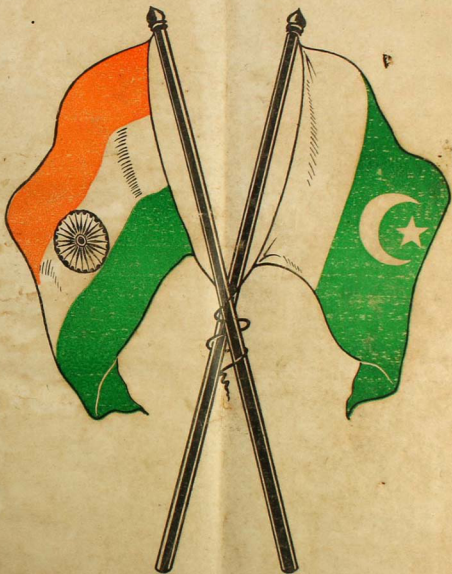




“এস হে হিন্দু, এস মুসলীম, ধরো তাত সবাকার”

# বঙ্গজ্ঞা

স্বাধিদানন্দ ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত



পঞ্চদশ বর্ষ

আশ্বিন-১৩৪৪

{ ১ম বঙ-৪র্থ সংখ্যা

## ভারতের বনিজসম্পদ ও কয়লাশিল্প

শ্রীমতীপ্রবোদন বন্দ্যোপাধ্যায়

কদি-প্রধান ভারতের ভূমিও সম্পদের জায় ধনিও সম্পদও প্রচুর। তার সর্বপ্রকার বনিজ পদার্থই তাৎক্ষণিক নানার বিপুল বিদ্যুত বস্তুপত্রভাষ্যে পাওয়া যায়। —বাতু (Metal) বাতুজ আকবিক বাতু-মিশ্র (Ore) বনিজ পদার্থ (Mineral substances) এবং বনিজ তৈল (Mineral oil)। এ পর্যন্ত আমরা পঞ্চাশটি বাতু আবিষ্কার করিয়া তাহার ব্যবহারে রতী আছি। নূতন নূতন আবিষ্কার প্রায়ই চলিতেছে এবং আধুনিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের উন্নতির সহিত আমরা কালক্রমে আরও বহু নূতন বনিজ পদার্থের সন্ধান পাইব। ভারতের ভূগর্ভের জায় ভূগর্ভেও অগ্ন্য রহ নিহিত আছে। বর্ধনানে আবিষ্কৃত পঞ্চাশ প্রকার বনিজ পদার্থের ব্যবহারিক উদ্ভবের বেট হুয়া, প্রায় পঞ্চাশ কোটি টাকা। ভারতের বিভিন্ন ধনি ও আকবের প্রায় পাঁচ লক্ষ লোক কর্ম করে। উচ্চ বাতু ব্যবহারিক পরিমাণ ও হুয়া এবং অধিক বংখ্য হইতে আমরা ভারতের বনিজ-শিল্পের বিপুল বিভার ও বৈতনের একটা নির্ভরযোগ্য ধারণা করিতে পারি। তাহত যদি স্বাধীন হইত এবং ভারতের ধনসম্পদ যদি ভারতবাসীর

প্রেরা সাধনে নিয়োজিত হইতে পারিত, তাহা হইলে আমরা এতদিনে আরও অধিক আবিষ্কারে সমর্থ হইতাম। আমাদের ধন-সম্পদ ও সুখ-স্বাধি রহল পরিমাণে বৃদ্ধি করিতে পারিতাম।

ভূতপূর্ব আনন্দ-তাহির পদক্ষেপের লক্ষ্য ছিল বৃষ্টিপ আর্ষের পরিপূষ্টির দিকে। স্মরণ্য ভারতের জাতীয় স্বার্থ প্রায় প্রতিক্ষেত্রেই বিশেষরূপে ব্যাহত হইয়াছে। বাবা হউক, কাল-চক্র ও ভাগ্য-চক্রের আবর্তনে বিবর্তনে সম্রাতি ভারতে জাতীয় শাসন তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ঘটিয়াছে। বিধা বিতর্ক হইলেও ভারতের সর্বক্ষেত্রীয় সৌকর্য্য বৃদ্ধি উদ্বেগ হইবে জাতীয় উন্নতি বিধান ও জাতীয় স্বার্থের পরিপূষ্টি। পদাঙ্ক, সাহিত্য, স্বাস্থ্য, সম্পদ, ক্রীড়া, বৃত্তি, স্বাধীনতা ও স্বাধীনতা সর্বক্ষেত্রেই উত্তরোত্তর শ্রীকৃতি লাভিত হইবে। বিরোধ-বিবাদের সম্পূর্ণ অবসান না ঘটিলে পাবে, কখন কোন বেনেই নিরস্তর নিরস্ত্র শান্তি সম্ভবপর নহে।

বাহি জীবনের জায় সম্রাতি জীবনেও দায়িত্ব সংলগ্ন স্বাধীনতা। মানব প্রকৃতির ইহাই রীতি। তাহাণি জাতীয়



স্বাধীনতাশাসনের সুখ-শান্তি ও সুযোগ-সুবিধা ও সম্পদ সমৃদ্ধি অসম্ভাব্য। তাই, জাতীয় শাসন-তন্ত্র প্রবর্তনের প্রয়োজ্যে বনি-সচিব যোগেশ কলিতাছেন যে, তাঁহাদের জরুরী কার্যের মধ্যে দেশবাসীখনিজ সম্পদের উন্নতি-বিধান-প্রচেষ্টা অন্তর্ভুক্ত। বানবাদের খনিজ বিভাগের হাজিরের সংস্থাপন করিয়া তিনি খনিজ, বিশেষতঃ খাত্ত-পরিষ্করণ-বিজ্ঞান তাত্ত্বিক (Theoretical) এবং ব্যবহারিক (Practical) উভয়বিধ শিক্ষার দ্রুত উৎকর্ষ এবং বিস্তারিত প্রতি শিক্ষক ও ছাত্র এবং শিল্পী ও বণিক সকলেই গতি মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন। বনি ও ভূতত্ত্ব এবং খাত্ত পরিষ্করণ প্রতিষ্ঠানের (mining Geological and metallurgical Institute of India) গত বাৎসরিক অধিবেশনে তিনি যোগেশ করিয়াছেন যে, বর্তমান জাতীয় শাসনতন্ত্র খনি ও খাত্ত-পরিষ্করণ-উন্নতিতে প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন এবং এই বিভাগের ব্যবহারিক প্রয়োজনের উৎকর্ষ সাধনার্থ সর্বশ্রেণীর শিল্পী, কারিগর ও বিশেষজ্ঞ কক্টর অভ্যন্তর গুরুতর প্রতিবন্ধকের সম্মুখীন এবং যথাসম্ভব নিরাকরণে আগ্রহ প্রকাশিত করিয়াছেন।

পণ্ডিত গুরুদাস বসুজগৎ সত্যেন্দ্রের গত ভাষণে ভারী মনে মনোনিবেশিত ভারতীয় বিজ্ঞান-সংসদ (Indian Service Congress) এর যে অধিবেশন হয়, তাহাতে বক্তার পর বক্তা দৃঢ়ভাবে উল্লেখ করিয়াছিলেন যে, ভারতের যুদ্ধান্তর সমুদয় সংগঠনের সর্বপ্রধান অন্তর্য্য আবশ্যকীয় অর্থ, বিদ্যা দান-মণ্ডলার অভাব নাই, পরন্তু উপযুক্ত সংখ্যক কর্মকর্তা শিল্পী, কারিগর ও বিশেষজ্ঞ বিশেষজ্ঞ কক্টর অভাব। বস্তুতঃ, কয়েক বৎসর পূর্বে পঞ্চাশ আশ্রয় আশ্রয়ের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে যে সকল বৈজ্ঞানিক বিষয়ে শিক্ষাদান করিয়াছি, তাহাও মধ্যে খনি-বিজ্ঞান, ভূতত্ত্ব ও খাত্ত-পরিষ্করণ কোন স্থান পায় নাই। যে সকল ছাত্রেরা ব্যক্তিগতভাবে তাহাদের কটিকর বসিয়া এই তিনটি বিষয়ে শিক্ষালাভ করিয়া পরীক্ষা দিত ও রত্নবিদ্য হইত, তাহাদের সংখ্যা দৃষ্টিমগ্ন ছিল। তাহাদিগকেও অদিত বিভাগের প্রয়োজন-ক্ষেত্রে আহত করিতে বিলম্ব যোগ্য পাইতে হইত এবং তাহাদের পাঠ্যক্রমিক ও পুস্তকাদি ছিল অতি অধিকতর। ভারতের জাতীয়-শিল্পের প্রতি

আত্মতাত্ত্বিক শাসনতন্ত্রের অবস্থা এবং খনিজ-শিল্পের উন্নতির প্রতি অবহেলার দিনে, এইরূপ দুঃখবহা ছিল স্বাভাবিক ও অসম্ভাব্য। কিন্তু সময়ের এবং শাসন-নীতির পরিবর্তনে, খনিজ বিভাগ শিক্ষা ও তাহার উন্নতির প্রয়োজনের প্রয়োজনের তাগিদে, গুরুতর পরিবর্তন ঘটাইয়াছে। আর ছুই বৎসর পূর্বে, ভূতত্ত্ব-বিভাগের অসাধারণ লক্ষ্য, ভূতত্ত্ববিদ্যার কৰ্মক্ষেত্রেও অসাধারণ হইত। ভূতত্ত্ব বিষয়ে উচ্চাঙ্গের শিক্ষা দিবার ব্যয়ভাও কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্তর্ভুক্ত হয়। ভূতত্ত্ব, খনিজ-বিজ্ঞান এবং খাত্ত-পরিষ্করণ বিষয়ে উন্নতিশীল দেশ হইতে ভারতীয় ছাত্রগণকে শিক্ষিত করিয়া আনিবারও সুব্যবস্থা হইয়াছে। বিভিন্ন বনি শিল্পে, বিশেষতঃ খাত্ত-পরিষ্করণ-শিল্পে নিযুক্ত খনিজ ও বণিক-বিভাগের কলকারখানার ভারতীয় ছাত্রদিগকে ব্যবহারিক শিক্ষা দিবারও ব্যয়ভাও হইয়াছে। মেথারী ছাত্রগণকে সরকারী বৃত্তির সাহায্যে শিক্ষা দিবার রীতি প্রবর্তিত হইয়াছে। বানবাদের খনিজ বিভাগেরও বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছে। বিভিন্ন খনি-শিল্প-কারখানার রত্নবিদ্য ছাত্রদের গবেষণা-পরিচালন ও কর্মসংস্থান-ব্যবস্থাও বিস্তৃত হইয়াছে। দলভঃ, শিল্প, ব্যবসায় ও সরকার—এই তিনের সদবেত প্রচেষ্টা ও সহযোগিতার ভিত্তিতে ভারতের অন্তর খনিজ সম্পদের সমুদয়ন, সম্ভাব্যতা এবং সমাধানের দ্বারা জাতীয় জীবনের উন্নতিবিধান-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে। অনুরূপে এই উন্নতিসাধন ক্ষেত্রে ভারতের বিজ্ঞান-সংসদ সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব করিয়াছেন যে, দেশীয় রাজ্যগুলির সহিত বিভিন্ন ভারতের খনিজ সম্পদকে রাষ্ট্রের অধিকার-ভুক্ত করিতে হইবে, এবং কোন ক্রমেই তাহাদের পরিচালন, পরিবর্তন এবং ব্যবহারযোগ্যতা পরিবর্তন-শিল্পের কর্তৃত্ব বিদেশী হস্তে অর্পিত হইবে না। ভারতীয় বিজ্ঞান-সংসদ বিশেষভাবে বিজ্ঞাপন করিয়াছেন যে, ইউরেনিয়াম ও থোরিয়াম সংগঠিত খনিজ পদার্থকে (Uranium and Thorium bearing minerals), সুবহু জাতীয় প্রয়োজনের নিমিত্ত, নিত্যপরিমাণে সর্ব-প্রকারে এবং সর্বপ্রকারে রক্ষা (conserve) করিতে হইবে। অতিমাত্রায়ই সুবিধিত আছেন যে,

আগবিক শক্তি সম্পর্কে ইহাদের আভ্যন্তরীণ প্রয়োজন বহু-  
তরফে ব্যক্তিগত হইয়াছে। প্রচলিত জলসম্পদ আগবিক  
শক্তিতে সর্জনসম্পদ-বিস্তারিত নীতি ও পদ্ধতি-শক্তিতে পরিণত  
করিবার নিমিত্ত প্রতি বৎসরেই বিজ্ঞান-বিশারদগণের সম্মেলন,  
সমিতি ও সম্মেলনের দ্বারা হইয়াছে। ভারতের সমস্ত  
আগবিক ভাষার নৈকট্যে একটি সমিতি গঠিত হইয়াছে।

নিম্নলিখিত ভারতের সমগ্র বনিয়াদপত্র আলোচনা  
একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্বলিত নহে। এই নিম্নলিখিত ভারতের  
মূল ও মূল শিল্পের সর্জনসম্পদ লৌহ এবং অক্সিজেন সর্জনসম্পদ  
বনিয়াদ শিল্পের সর্জনসম্পদ অপরিহার্য। ইকন-উপায়  
পাণ্ডিত্য করণের বর্তমান পরিস্থিতির আলোচনাই এই  
প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য। গৃহস্থের বর্তমানকারী চুক্তি হইতে  
সর্জনসম্পদ শিল্প-প্রতিষ্ঠানের অধিকৃত হইবার একক  
একাধিকতা। বিদ্যুৎ বিদ্যুৎ বহানুষ্ঠানের সময়ে, এবং  
ভাষার অর্থানের দীর্ঘ সময় পক্ষে, আত্ম পর্যাট আত্ম  
প্রতিদিন শক্তিতে ইহার তীব্র অর্থায়ন অনুভব করিতেছি।  
একাধিক অর্থ প্রয়োজনীয় এবং নিত্য-প্রয়োজনীয় উৎপাদন  
অর্থায়ন বে কিস্তি ক্রেতাদের, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তি  
যাত্রেরই সম্যক বোধগম্য। এই অর্থায়ন-অনুভবের প্রমাণ-  
কারণ দুইটি। প্রথম, প্রসিক-বিস্টার্ট, এবং দ্বিতীয়  
পরিবহনোপযোগী মালগাড়ীর অর্থায়ন-অনুভব।  
কয়েক বৎসরে কল্যাণ-শিল্পে নিম্নলিখিত প্রসিক-বিস্টার্টের সম-  
সাময়িক এবং বাহ্য-সম্পদ বৃদ্ধির নিমিত্ত, কেন্দ্রীয় সম-  
বাসম্পদ এবং স্বাধীনগামী বিবি-বাসম্পদ প্রেরণ  
করিয়াছেন। তথাপি বর্তমানে লালিয়াই আছে। কল্যাণ-  
ক্ষেত্রের প্রসিক-বিস্টার্ট নিম্নলিখিত বাহ্য-সম্পদ বাসম্পদ নিম্ন-  
এবং তাহাদের মূল-সম্পদ বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত, বর্তমান  
বর্ষের কেন্দ্রীয় বাজেটে অর্থের ব্যবস্থা হইয়াছে।

বাজেট অধিবেশনে প্রচলিত আইনের উত্তর সংশোধন  
হইয়াছে। এই বিধানের বলে, প্রতি টন কলার উপর  
চারি আনার কম এবং আট আনার অধিক নহে, উৎপাদন-  
কর নির্ধারিত হইয়াছে। ইহার ফলে, সর্জনসম্পদ কলার  
মূল্য প্রতি টনে পাঁচ তিন টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ক্রেতা  
ও ভোক্তার পক্ষে এই বৃদ্ধি আদৌ অস্বীকার্য নহে। ৬৪  
আনা বর্ষের পোড়া কলার (Coke) দ্রবের কয়েক

বৎসরে একটাকা ছয় আনার উন্নতি হইয়াছিল। সমস্ত  
ও দ্রবিত গৃহস্থের পক্ষে ইহা কিঞ্চিৎ নীতিগত ভাষা  
বলা নিম্নলিখিত, তারপ, এই বৃদ্ধি কেবল পাণ্ডিত্য  
কলার নিমিত্ত নহে। গৃহস্থের নিত্য-প্রয়োজনীয় সর্জনসম্পদ  
প্রায়ের মূল্য বহুতর বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৪৪ বৃত্তান্তের  
কল্যাণ-প্রসিক-কল্যাণ-আইনের এই ১৯৪৭ বৃত্তান্তের  
সংশোধন গত দুই বৎসরে বহুতর বৃদ্ধিতে কার্যকরী  
হইয়াছে। পাঠকগণের সমগ্র ব্যক্তিতে পারে যে, গত  
অষ্টোত্তর বৎসরে কল্যাণ-শিল্পের প্রসিক-বিস্টার্ট বহুতর  
পক্ষায় ও বৃদ্ধি করা হইয়াছিল। এখন উৎপাদন-কর  
প্রতি টনে ছয় আনা পরিমাণে বৃদ্ধি করা হইল। অধিক  
সম্প্রসারণ (Slowing)-প্রকার উত্তোলন-প্রক্রিয়া দ্বারা  
কলার অপচয় নিবাণে যেহেতু কল্যাণ-ক্ষেত্র-সমিতির  
(Indian Coal Fields Committee) সুপারিশ অনুযায়ী  
কেন্দ্রীয় সরকার টন প্রতি দুই আনা সম্প্রসারণ (Slowing  
Coke) চারি আনার উন্নতি করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন।  
কল্যাণ-ক্ষেত্র-সমিতি প্রস্তাব করিয়াছেন যে, প্রতিটন  
উত্তোলিত কলার দুই টাকা হিসাবে সম্প্রসারণ-বাহ্যের  
মতকরা ৭৫ শতাংশ বাধ্যতামূলকভাবে বহন করিতে হইবে।  
এই নিম্নলিখিত প্রতি টন কাঁচা কলার উপর আট আনা এবং  
প্রতি টন পরপোড়া (Hard Coke) কলার উপর বার  
আনা হইতে প্রতি টন কাঁচা কলার উপর দেড় টাকা  
এবং প্রতি টন পরপোড়া কলার উপর এক টাকা মূল্য  
আনা পর্যন্ত কর আগামী পাঁচ বৎসরের জন্য নির্ধারিত  
হইবে। সম্প্রসারণ আইন (Slowing Act) এবং সম্প্র-  
সারণ-বর্তনীর (Slowing Board) পরিচালনভার বনি-  
বিকাশ হইতে শিল্প-বিত্তাগে হস্তান্তরিত করিবার প্রস্তাব  
হইয়াছে। ইতিমধ্যে আগামী মূল্য বৎসরের নিমিত্ত,  
বালু সন্ধ্যা (Sand Slowing) ব্যবস্থার নিমিত্ত কেন্দ্রীয়  
শিল্প ও সরবরাহ (Industries and Supplies)  
পুর্ক, বনি ও শক্তি (Works, mines and Power) এবং  
পরিবহন (Transport)-বিত্তাগের প্রতিনিমি লইয়া  
একটি সমিতি গঠিত হইবে। সম্প্রসারণ, উত্তোলন  
একই বিত্তাগের পরিচালনামূলক করিবার নিমিত্ত এই  
উত্তোগে এই সমিতি বালুসন্ধ্যা এবং তাহার আর্থনামিক



করলা-বনি হইতে উত্তোলিত এইরূপ নিরুপেক্ষ করলা তাহারা ব্যবহার করিতে বিমুখ্যে বিধা যোগ করে না।—অতঃ, তাহাদের উত্তোলন-ব্যয় তাহাদের দ্বিতীয় শ্রেণীর করলা-বনির তুলনায় অধিক ব্যতীত, অল্প নহে। ভারতীয় দ্বিতীয় শ্রেণীর বনি-বানিজ্যে তাহাদের বনিজ্যেত করলা স্বল্প মূল্যে বিলেত রেল-কর্তৃপক্ষ তাহা গ্রহণ করেন না। পরাধীন ভারতেই এইরূপ বিমুখ্য ব্যবহার সম্ভব। ভারতের অর্ধে ভারতের এই মূল ও মূল key শিল্পের অন্তি বিস্তারিত। এখন এই শ্রেণীর করলার প্রয়োজন ছিল, তখন ইহার প্রচুর উৎপাদনে সরকার অসীম উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। বেশ-বিদেশে এই শ্রেণীর করলা এখন অস্বীকৃত ও অব্যাহত ভাবে প্রেরিত হইয়াছিল। কিন্তু দুইবিধির সঙ্গে সঙ্গে এই ব্যবস্থা রহিত হইয়াছে। নিরুপেক্ষ করলা ভারতের সম্পদ; এবং এই সম্পদের যোগ্যত্ব সম্বন্ধে এবং সংরক্ষণ হাটের অবস্থা কর্তব্য। অনেকের মত—না যে, রেল-কর্তৃপক্ষ তাহাদের নিজস্ব বনি হইতে উত্তোলিত নিরুপেক্ষ করলা ব্যবহারের ক্ষমতা, নতুন একাধারের এক্সিম-মার্জী প্রস্তুত করিয়াছেন। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে করলা-বনি-সমিতিতে সাক্ষাৎ প্রদান করলে, এই ইতিহাস রেলপথের তদনীন্তন কর্তৃকর্তা মিঃ জে. এ. বেন্সন এই সভা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি আরও বলিয়াছিলেন যে, কোন কোন ক্ষেত্রে রেলগাড়ী পরিচালনে নিরুপেক্ষ করলাই অধিকতর উপযোগী। ইষ্ট ইন্ডিয়া রেলপথে যদি এইরূপ করলায় সম্যক ব্যবহার হইতে পারে, তাহা হইলে, অত্যন্ত রেলপথ ব্যতীত, কোন কোন শিল্প তাহাদের বয়সান্তরে ক্রিয়াকর্মী পরিবর্তন করিয়া নিরুপেক্ষ করলা অব্যাহত ব্যবহার করিতে পারে।

এই প্রকার নিরুপেক্ষ করলায় বিবিধভাবে অসংখ্য আর্থিক ব্যবহার যেশের ও জাতির বৃদ্ধির কার্যের একাধার অস্বীকৃত। অসামান্য যেশের উত্তর শ্রেণীর করলায় পরিমাণ অসীম নহে। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের করলা-বনি-সমিতি দ্বারা করিয়াছিলেন যে, বর্তমান ব্যয়ের বিবিধে ভারতের উত্তর শ্রেণীর করলা-সম্পদ এক মত বৎসরের অধিক কাশ হারাই হইবে না, এবং রক্ত-শালায় নিমিত্ত উত্তর করলা

পূর্ণাঙ্গ বৎসরেই নিঃশেষ হইয়া যাইবে। অপর বিচারণ করিতে পারিলে, এই সম্পদের আরও কিছু দীর্ঘকালী করা হইতে পারে। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে সাক্ষাৎ প্রদান মিলিয়ন টন রক্ত-শালায় করলায় বৎস, মাত্র আড়াই মিলিয়ন টন রক্ত-শালায়-কার্যে (Metallurgy) ব্যবহৃত হইয়াছিল, এবং অবশিষ্ট মাত্র মিলিয়ন টন অপর্যাপ্ত হইয়াছিল। মিলিয়ন ভারত জাতীয় পরিবর্তন সমিতির দলত এবং সোভিয়েত রাশিয়ার স্ক্রুপার ইচ্ছা-বিশেষজ্ঞ উপদেষ্টা ডাঃ এ. জে. সাহার দৃঢ় অভিমত এই যে, মিলিয়ন ভারতের সমগ্র ব্যবহারযোগ্য করলা-সম্পদ মাত্র পাঁচ মত বৎসর হারাই হইতে পারে। করলা-সম্পদে বিশিষ্ট-বনী রক্ত-শালায় সম্পদ ছয় হাজার বৎসর হারা হইতে পারে। তাহাপি স্ক্রুপার সর্বপ্রথম ভারত এই বিপুল-করলা-সম্পদে মনোযোগপূর্ণক আরও দীর্ঘকাল দ্বারা করবার নিমিত্ত, সর্বপ্রথম উপায় অবলম্বন করিয়াছে। স্ক্রুপার আলা ভারতীয় শ্রমিক তত্ত্বের, ভারতের সর্বপ্রথম জাতীয় কার্যের প্রতি চির-উৎসাহিত বৎসর ভারতের এই প্রকট সম্পদের সংরক্ষণ হেতু, প্রত্যেক কোন দৃঢ় প্রত্যয়ী হইতে পারে। ডাঃ সাহার বলেন, বৈজ্ঞানিক এবং বৃত্তিসম্পদ উপায় অবলম্বন করিলে, ভারতের করলা-ব্যবহার-ব্যয়ের মতকরা ২০ হইতে ২৫ অংশ হ্রাস করিতে পারা যায়। এই সং উদ্দেশ্যে, উৎপাদন এবং ব্যবহার, উত্তর ক্ষেত্রেই অপর্যাপ্ত বিকল্পে অভিব্যক্তি জালাইতে হইবে। করলা অপর্যাপ্ত করলা-সম্পদের সমাধান জুগুপসারহিত অ-বৈজ্ঞানিক এবং অর্থোক্তিক অব্যাহতের দ্বারা বিচার্য্যের নিমিত্ত, করলায় উৎপাদন অবস্থা বৃদ্ধি করিলে, জাতীয় সম্পদের অপর্যাপ্ত করা হইবে। ডাঃ সাহার সিদ্ধান্ত এই যে, ভারতের উপদেষ্টা উপায় অবলম্বন করিলে, ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র ৩২ মিলিয়ন টন করলায় ভারতের প্রয়োজন প্রসিদ্ধ হইবে। সম্ভ্রুতি, ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে করলায় উৎপাদন, স্বল্প এবং বর্ধন সম্বন্ধে সরকারী বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা তাহা হইতে দেখিতে পাই যে, ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের উৎপাদন, ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের উৎপাদনের তুলনায়, ২৮,৭৭,০০০ টন হইতে ২৯,২৭,৫০০ টন উন্নীত হইয়াছিল। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে করলায় উৎপাদন

অধোগতি লাভ করিয়া, ২৫, ১৮৮, ৮৭২ টনে নামিয়াছিল।  
 স্তম্ভসমূহ ঐ কৃতাক্ষের তুলনায়, গড় বঙ্গের উৎপাদন  
 ৮,১০৮, ১১৮ টন অধিক হইয়াছিল। কিন্তু, উৎপাদনের  
 আদিক অল্পবায়ী, মালগাড়ীতে করলা বোঝাই, কঁচা  
 করলা-কোঠা হইতে করলার চালান, ভিনভি কারণে অধিক  
 হার নাই; প্রথম,--করলা-কোঠা মালগাড়ীর বরফ  
 দ্বিতীয়, ভ্রমণ উপস্থাপন এবং তৃতীয়, সাম্প্রদায়িক গোপ-  
 যোগ। এই ত্রিবিধ অসুবিধা সত্ত্বেও পূর্বে বঙ্গের  
 ২৪,৪৪২,৪৪২ টনের তুলনায় বনি হইতে করলার চালান  
 ২৪,৬০৮,৪৪২ টনে উন্নীত হইয়াছিল। ইহার মাসিক  
 গড়—প্রত্যেকের নির্ধারিত অংশের মতকরা। ১৮৮৬ অংশ  
 হইয়াছিল। ১৯৪৬ কৃতাক্ষের উৎপাদনের ১,৪৭২,৮০০  
 টন জাহাজে ব্যবহৃত, এবং বর্ষা ও অশান্ত দেশে রপ্তানী  
 হইয়াছিল। উৎপন্ন করলার অবশ্য অধিকাংশ অর্থাৎ  
 ১০,২২৮,৪৪২ টন রেলপথগুলি পোতাঁহিয়াছিল। প্রতি  
 মাসে বিভিন্ন শিল্পে ব্যবহার গড় ছিল এইরূপ—কাপড়ের  
 কল, ১৬২,০০২ টন, তুলার বীজ বাড়া ও পাইট বাগা,  
 কল, ১০,৪০০ টন; পাটের কল, ৪২,৪৪২ টন; বিলাতি  
 মাটির কারখানা, ৬৮,২০৭ টন; চীনার বাসনের কারখানা,  
 ১০,২৪৬ টন, কাগজের কল, ৩৬,২১০ টন; কাঁচের  
 কারখানা, ১১,৮১১ টন; রাসায়নিক কারখানা, ১১,০১২  
 টন; ইট খোঁচা, ৪০,৪৪২ টন; চা-বাগান, ১০,২৪৪ টন;  
 সবজী-বট ও বেগুন কল, ১৪,৪৪২ টন; বাজ প্রদর্শন  
 প্রতিষ্ঠা, ১৪,৪৭৮ টন, ইঞ্জিনিয়ারী ও চালাই কল-  
 কারখানা, ১৮,৪৪২ টন; পোতাঁহ করলা প্রতিষ্ঠা, ১০,০১২  
 টন, এবং সৌদ ও ইম্পাল্ড কারখানা, ২৪৮,০১০ টন।

এই বটনের কিয়দংশ নিম্নশ্রেণীর করলার দ্বারা সম্পন্ন  
 করা অতীব প্রয়োজন। কারণ, আমাদের উচ্চ শ্রেণীর  
 করলা সংস্থান সুপ্রচুর নহে। সমস্ত প্রয়োজনে, মিত-  
 ব্যতির্যক অল্পদ্রব্যেও উচ্চশ্রেণীর করলা ব্যবহার করা  
 অসম্ভব নীতি হইবে। যেসব বৃহত্তর দ্রব্যের নিমিত্ত  
 অর্থাৎ আমাদের দেশের মূল ও মূল শিল্পগুলির হ্রাস  
 পরিচালনার নিমিত্ত, উচ্চশ্রেণীর হুআপ করলার বিশেষ  
 প্রয়োজন। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, ইতিমধ্যে  
 রেলকর্তৃপক্ষ হুআপিত্য পরিচর বিধা, উচ্চশ্রেণীর হুআপ

পরিচরপ এবং সৌদ ও ইম্পাল্ড শিল্পে ব্যবহার্য করলায়  
 ব্যবহার্য করলার পুষ্টিমূল্য প্রচেষ্টার ব্যাপ্ত  
 আছেন। সমস্তি আমরা পরিবহন-মন্ত্রী এইটি ঘোষণা  
 হইতে আশিতে পারিলাম যে, দুইটি সরকারী রেলপথ  
 হুআপ-শিল্পে ব্যবহার্যযোগ্য করলায় ব্যবহার বন্ধ  
 করিয়াছেন; এবং আরও তিনটি রেলপথ কঠোরভাবে  
 উচ্চশ্রেণীর করলায় ব্যবহার হ্রাস করিয়াছেন। শুধু ও  
 বৃহৎ শিল্প সমূহের ও সাম্প্রদায়িক সমস্তে এবং রেলপথ-  
 গুলির তবিত্য উন্নতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, রেল-কর্তৃপক্ষ  
 পুষ্টিমূল্যে উচ্চশ্রেণীর করলা সংস্থানের দীর্ঘ দ্বিবিধের  
 নিমিত্ত এই বিতবার-মূল্য সংরক্ষণ-নীতি অবলম্বন  
 করিয়াছেন। যদি উচ্চশ্রেণীর শিল্পে ব্যবহার্যযোগ্য  
 তাহে অসম্ভব মতকরা বস হইতে পারে অল্প নিম্নশ্রেণীর  
 করলা ব্যবহার করা হয়, তাহা হইলেও উচ্চশ্রেণীর করলায়  
 ব্যয় অনেক পরিমাণে হ্রাস করিতে পারা যাইবে।  
 কোন কোন রেলপথে নিম্নশ্রেণীর করলায় সহিত কিয়ৎ-  
 পরিমাণ উচ্চশ্রেণীর করলা মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার সুবিধা-  
 জনক হইয়াছে কিন্তু তুল্য করিয়া রাখিবার দানাত্যের  
 অসুবিধা এই নিম্ন ব্যাপারে প্রতিবন্ধকতা ঘটাইছে।  
 পূর্বে রেলের করলা-চালাতে (Loosbeds) আট মণটি  
 বনি হইতে করলা আনিয়া বিভিন্ন জুপে পৃথক করিয়া  
 রাখা হইত। কিন্তু এখন যদি কোন বিশেষ করলা-চালায়  
 সর্বপ্রকারের করলা পাঠান হয়, তাহা হইলে পাঁচটি  
 অধিক তুল্য প্রয়োজন হয় না। আসল কথা হইতেছে,  
 করলা-চালায় কবিশগ বিভিন্ন রকমের করলা-বিভ্রণের ক্রেপ  
 বীকার করিতে প্রস্তুত নহে। রেল-কর্তৃপক্ষ যদি এই  
 নিম্নশ্রেণীর করলাকে ব্যবহার্যযোগ্য করিয়া মিশ্রিত  
 করিতে হুদ্র আদেশ প্রদান করেন, তাহা হইলে সম্বন্ধেই  
 এই কার্য সম্পন্ন হইতে পারে। আর একটি কথা,—  
 আমরা প্রার্থী ভূমিতে পাই যে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বণির সংখ্যা  
 অনেক এবং তাহাদের উৎপাদন এবং আয়তনও বর।  
 একমাত্র ভারতেই যে এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বণির অস্তিত্ব,  
 তাহা নহে। যুক্তরাষ্ট্রেও প্রায় ৩০০টি করলা-বণি আছে,  
 বাহ্যের উৎপাদন বার্ষিক বস হাজার টনেরও কম  
 ভারতে এইরূপ বণির সংখ্যা ইহা অপেক্ষা অনেক কম।

বৃত্তাকারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বনিভাগে এখন উৎপাদন পতন করা যাচ্ছে না; কিন্তু ভারতে এই সকল খনির উৎপাদন, পুত্তরায় ১১৩৪ অংশ। বৃত্তাকারে এখন ক্ষুদ্র বনি আছে, যেখানে বনি-পল্লবের মাত্র চরজন প্রমিত কর্তৃক করে। ভারতে এরূপ খনির অস্তিত্ব নাই। বৃত্তাকার খনি, এরূপ খনির প্রতি অবশেষে কিংবা অসম্ভব না দেখাইয়া, তাহাদের সমস্ত উৎপাদন ব্যবহার করে, তখন ভারতের পক্ষে উত্তরণ করা একান্ত প্রয়োজন। কয়লা-খনিতে সমস্ত কয়লার পরিমাণ নীচ নীচ উপস্থাপিত এবং সমস্ত কয়লা-উৎপাদন সমিতিতে (Coal Advisory Committee) কলিকাতা অবস্থিত। এই সমিতিতে বৈঠক হয়। কয়লা আধীন (Coal Commissioner) যদি নিয়মিতভাবে কোন বনি-বিশেষের কয়লা ব্যবহার করিবার প্রণতি হইতে ক্ষেত্রকে নির্দেশ করেন; এবং কেবল মাত্র নির্দেশ সূত্রী স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, কয়লা-শিল্পের বৃদ্ধির স্বার্থের অধিকারে প্রাপ্ত কয়লা মাত্রই ব্যবহারের নির্দেশ দেন, তাহা হইলে এই উদ্দেশ্য সহজেই সিদ্ধ হয়।

কেন্দ্রীয় সরকার সমস্ত বাহালা ও বিহার সরকারের প্রতি নির্দেশের সহিত ভারতের কয়লা-শিল্পের সর্বসম্প্রদায় উন্নতিপ্রচেষ্টা হেতু আশাপ-আলোচনা করিয়া একটি আত্মীয় সন্যাসী সমিতি নিযুক্ত করিয়াছেন। কয়লা আধীন বিঃ জে, আর, হারিসন্ ইহার সভাপতি এবং বৈজ্ঞানিক-আধীন বিঃ এইচ, জে, ব্যাণ্ডিউক, হেলগেয়েগোর্ডে সন্যাসীর মিঃ জি, এ, হেলগারসন্ ও বিঃ এইচ, জে, নিবসন এবং শিল্প ও সন্যাসীর-বিভাগের মিঃ পি, আর, ম্যাক ইহার সন্যাসী। এই সমিতি কয়লা উৎপাদন এবং পরিবহনের দৌরব্যয় একটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করিবেন। তিন মাসের মধ্যে তাহাদের প্রাথমিক প্রতিবেদন কেন্দ্রীয় সরকারে দাখিল করিতে হইবে। অল্পমধ্যে কয়লা-চলান করিবার একটি কর্মসূচী (Programme) নির্দ্ধারিত করিয়া, সমিতি হেলগেগোর্ড ও ক্যাম্ব্রিজ, এই উভয়ের সহযোগে কয়লা-পরিবহনের একটি সমিতিতে সহযোগিতা-মূলক প্রণা প্রবর্তনের নির্দেশ দিবেন। কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিগণ আবেদনিক প্রতিনিধিগণের সহিত কয়লা-শিল্প সম্বন্ধে যেরূপ উচ্চতর সন্যাসীর আলোচনা করিয়াছিলেন। কয়লা-ক্ষেত্র সমিতি স্থাপন করিয়াছিলেন যে, কয়লা-শিল্পের উন্নতি

পরিকল্পনার ক্ষেত্র ও ভোক্তাদিগের প্রয়োজনীয় প্রয়োজন (Quality wise requirements), পরিবহনের দিতব্যতার এবং হেলগেগোর্ড কয়লা চলানের উপযুক্ত স্থান-স্থিতির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। বিশেষ-বিশেষ ক্ষেত্রে বর্ধিত উৎপাদনের সহিত পরিবহন-পরিকল্পনার সামঞ্জস্য সংস্থাপিত করিতে হইবে। এই সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় সরকার আত্মক্রিয় (Preliminary) অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়াছিলেন; কিন্তু সমস্ত নতুন কয়লা-ক্ষেত্র (Virgin Coal-bearing areas) সম্বন্ধে পরিকল্পনা প্রণয়ন করিবার পূর্বে, কয়লা-উৎপাদন প্রদেশ-গুলির সহিত পরামর্শ প্রয়োজন হইয়াছিল।

কয়লা-ক্ষেত্র-সমিতি তাহাদের বিবৃতিতে কয়লা-ক্ষেত্র-গুলির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বণ্টন বিভাগকরণ নিম্নলিখিত মত হইতে উপায় অবলম্বনের এবং কয়লা-ক্ষেত্র ভোক্তা-সমিতির পাঠ্য ও বস্তুগত বিধি নিয়ন্ত্রণের নির্দিষ্ট নির্দেশ দিয়াছেন। কয়লা-ক্ষেত্রে প্রতি উচ্চ-হারে সন্যাসী লইবার প্রণা অবশ্য চলিতেছে; এবং তাহার ফলে, কয়লার মূল্য বৃদ্ধি অবশ্যস্বীকার্য। এই নিমিত্ত কেন্দ্রীয় সরকার এই প্রণার উল্লেখ সাধন করিতে কৃত-সম্মত এবং বৈজ্ঞানিক আবেদনিক সরকার-সমিতি সন্যাসীর আইন-সম্বন্ধ উপযুক্ত ক্ষমতা গ্রহণ করিতে বসিয়াছেন। আইন-প্রণয়ন করিবার পূর্বে, বর্তমান অবস্থা ও ব্যবস্থার সম্যক পরিকল্পনা বিবরণী সংগ্রহের নিমিত্ত, বাহালা ও বিহারের কয়লা-ক্ষেত্র পরিদর্শন, সরকারী ও বেসরকারী তত্ত্ব-বিশেষজ্ঞ কয়েকজন লক্ষ্য লইয়া এক কিংবা একাধিক তত্ত্ব-সমিতি গঠিত হইবে। কয়লা-ক্ষেত্র-সমিতির সর্বপ্রথম সভা ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে পূর্বে ভারতে কয়লা উৎপাদন ১১,০০,০০০ টনে উন্নীত করিতে হইবে। কেন্দ্রীয় সরকার ইহা সর্বাঙ্গ-বরণে গ্রহণ করিয়াছেন। নির্ভর এবং দুইটি স্থাপন,— একটি নতুন ইন্ধন ও শক্তি (Fuel and Power) বিভাগ; এবং একটি ভারতীয় কয়লা-তত্ত্ব-সমিতি স্থাপন। বর্তমান চলিলা সাময়িক সন্যাসীর সন্যাসীর নির্দেশে নিশ্চয় হইলে, ভারতীয় শাসন-তত্ত্ব এই সর্বাঙ্গ-বরণের দ্বিতীয় অর্থনৈতিক অনুষ্ঠানের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য কয়লা-শিল্পের সন্যাসীর উন্নতির নির্দেশ এবং বন্যোৎসাহ প্রদান করিবেন। নতনের আদিকার এবং পুস্তক-বরণের প্রণার দ্বারা অত্যন্ত বহুবিধ বনিজ পদার্থের দ্বারা সর্বাঙ্গ-শিল্পের উন্নয়ন-প্রচেষ্টার ফলে জন-সাধারণের জীবনযাত্রা সুকর হইবে।

## রামশাল ঐনতিলাল দাস

বয়ে নবীনা বধু—প্রাণে বাসের বধু বর্ষণ। কদম  
কেতকী চোপে পড়ে না, তবে রজনীগন্ধার গন্ধ আনি  
ঐতিহ্য পবিত্রতার অঙ্গ। গৃহের মায়া ছাড়িয়া বাহির  
হইব, একথা বন্ধুতা তাহিতে পারেন না। তাই কাছাকাছি  
সঙ্গী জোটে না—‘একা বাব বর্ধমান করিয়া বসন।’

অবশ্য তাগত্যের আনি। এ সংসারে আনি একান্ত  
একক। পাই না সঙ্গী, পাই না সান্নিধ্য—একাই চলি পৃথিবীর  
মূলি ধূসর পথে। এবারও চলিলাম।

চাকার প্রাচীন ঐতিহ্যের রামশালকে না দেখিয়া  
চাক। হইতে চলিয়া যাওয়া ঠিক নয়। বন্ধুত্বের বীর থাকেন  
মুখোপদে, তাঁহাকে লিখিলেন। তিনি দাবর নিয়ন্ত্রণ  
করিলেন।

শনিবার দিন সকাল সকাল বর্ণভার শেষ হইল।  
বাড়ী আসিতেই পুণ্যতন ভূতা স্বর্গদর্শন বলিলেন—‘যাবেন  
তো সকাল সকাল যান, বধী বাবলের দিন—’

তার কথা তিনি মূগ্ধ হইল। কারণ, তৈলেন বিখ্য  
দশিতে না বসিতে আসিল অশ্রুজ্ঞান বর্ষণ—বাড়ীতে  
আরক্ত হইলে নিশ্চয়ই বাধা করিতেন। বাহাজ্জাযাযেব  
গাফী আসিতে যেদী হয়, প্রাথমিক ব্যক্তিগত আসিয়াছেন,  
যেদের অপরাধবোধে নিচায় হইবে।

পালনে আনাদের তৈল লক্ষ্য নাই তাহানে জাচে।  
প্রত্যেকের বস বস্ত্রী লইব, ঠিকিট বিব না। গাড়ীকে  
অন্যভাবে অপরিকল্পিত রাখিব—এই যে পত পত অপরায়  
রেল-কোম্পানী করিতেছে তাদের নিচায় করে কে?  
লোকে যেন যে, কোম্পানীর হাত হইতে গাড়ী বসন  
সদাশর দরকারের হইয়াছে, তখন হইতে তাহার সর্বস্বত্ব  
অবশ্যি হইয়াছে। অসত্য নচে। যেনওয়ে যে তাহা  
পরিচালিত হয় তাহা রাষ্ট্রের কলম বটে।

নাহাজলগেজ টীবার মিলিল না। টীবারও যেন চলে  
দৃশ্য হইয়া, কিন্তু আনাদের তাগত্যে বাধ্যমান আর  
জলবান একান্ত অসহযোগ করিয়া চলে। বাহাজ্জা এইদম  
বাবুতা করেন, তাহারা যে অসদাচারের প্রতি কতবানি

উদ্বোধন, তাহা এইদম উচ্ছ্বল নিয়মবিরহীন স্নেহ তালিকা  
হইতে মুক্তি পায়।

নাহাজলগেজের দুই একজন বন্ধুর সহিত আলাপ  
করিতে বাহির হইলাম। কালীঘাট বিক্রমপুর স্রমের  
নিয়ন্ত্রণ করিলেন। তার পর পুনঃপুনঃ তৈলবর্ণনী টীবারও  
উট্টরা পড়িলাম। বর্ষার নীতলক্ষ্যা এবং বসন্তের নয়না-  
ভিরা—যেখানে চোখ পড়ে সেখানে চলেই চিত্রণ  
বদল রূপ। আকাশে নীলাভ মেঘ, আর দিগন্তে বায়ুবেগ  
কল-কারবানা, বহুবাড়ী ছাপাইয়া প্রাণ বনানীর উল্লেস  
প্রাণিনা।

পূর্ণ বায়ুগার এই নবীমাতৃক সৌন্দর্য, অস্ত্রস্থলত  
নয়। চোখছড়ায়, মনভুলায়। মূল্যগেজের সার্কেল ইন্-  
স্পেক্টার যীনেপ অক্ষ মহাপ্রভুর সঙ্গে আলাপ হইল। তিনি  
তাঁহার নৌকায় স্নেহ পথায় বাইবেন বলিলেন। কবির  
কথা যেন আগে, কত অজানারে জানাইলে বধু, কত ঘরে  
দিলে ঠাই।

মূল্যগেজ স্নেহের নয়, নগরনির্মাণে কোনও পরি-  
কল্পনা নাই—অস্বস্তিনিষ্ঠিত স্নেহের না আছে চাকতা, না  
আছে স্নেহীয় বাধ্যতা, তবে এখানে প্রাচীন ইজ্ঞাকপূর স্বর্গ  
আছে। স্নেহের আক্রমণ যোগ করিবার অঙ্গ বীরভূষণ।  
এই স্বর্গ নির্মাণ করেন। এখন তাহাচ উপর বহুমান  
হাকিমের বাসো নির্মিত হইয়াছে।

রাত্রি ও সকাল দুই আনকে কাটিল। সকালে নিবে-  
শিতা গভী বৃষ চক্রেয় পান গাফিল। পুঙ্খের অনেক দিন  
পরে সাতার বিলাস। আহারাদি শেষে বৈজ্ঞান্য বন্ধুত্ব  
বীর এবং পবিত্রত্বকর দিগন্তে ব্যক্তি ও ব্রহ্মবানকে লইয়া  
আমরা আল সেনের মূল্যবোধ বর্ণন বাহির হইলাম।

জোট ছোট বাল দিয়া গানের স্কেনের মাঝে মাঝে  
বিলের উপর দিয়া নৌকা চলিল। বৈজ্ঞান্য বলিলেন,  
‘বিক্রমপুরের এত যে নাম, তার কোনও মূল্য নেই।’

তারার কথা এক দিক ঠিক, অত বিক দিয়া নহে।  
বিক্রমপুরের যারা বীর-সন্ধান, যারা কবী, ভূশলী,

তাহারা নিম্ন বসন্তুনি ত্যাগ করিয়া গ্রন্থালী। আচার্য।  
অপলীপ্যতঃ বহু বে বসিয়াছিলেন—'বিক্রমপুর বিক্রমণালী  
সত্যের কল্পতরু, বহুতরুণী হৃৎকলের নয়।' তাহা  
অনেকাংশে সত্য। তবে বাহ্যিক পিছনে গ্রামে পড়িয়া  
বহিরাগত, তাহারা চরিত্রে, দীর্ঘে বা আচরণে সেই  
বিক্রমণালী বহুতরুণীর তুলনার অতিরিক্ত হীন, একথা  
স্বীকার না করিলে সত্যের অপমান হইবে।

হু হইতে চাড়া ও বিক্রমপুরের বাহ্যের উপর  
আমার নিয়তিস্বরূপ ছিল। কিন্তু নিকট পরিচয়ে সে  
প্রকা বাহিতে পারি নাই, ইহা অত্যন্ত দুঃখের। কাকেই  
তাহার সঠিক গুরু করিয়া বিক্রমপুরের পৌর, সুবাইলেও  
হুনে মনে গুহ্যের বর্জননের বিচারকে স্বীকার করিয়া  
সইলাম। তাহা বলিলেন, "এত কষ্ট করে কি বেথতে  
হ'লেছেন, দেখবার কিছুই সেখানে নেই।" গুরু করিলাম—  
'তা ঠিক নয়, আত্মবিশ্বস্ত ভাবের পক্ষে এই মনোভাব ঠিক  
নয়। বর্জনন চলেবে তবিশ্বস্তের আশায়, কিন্তু সেই  
তবিশ্বস্ত পুতে নির্মাণ সম্ভব নয়, তার পতি থাকে  
অস্বীকৃত।' তখন বলিতে পারি নাই, কিন্তু আত্ম নিশ্চিন্তে  
বসিয়া যেটার শিখরে The Power of the Dead নামক  
হুম্বর নাটকটির কথা মনে পড়িতেছে। আমাদের দিগা  
ও উপনিষদের পূর্ণ পিতৃ-পিতামহের ভাবধারা বহিতেছে।  
সেই ভাবধারাকে অতিক্রম করা আমাদের পক্ষে সম্ভব  
নয়।

প্রাচীন সত্যতে নব পূরী নির্মাণ করিয়া রাজ্য  
বিক্রম সেন বিক্রমপুর স্থাপন করেন। সেন-বংশের  
লীলাভূমি বিক্রমপুর এবং রামপাল প্রতি বাঙ্গালীর তীর্থ-  
স্থান বলিয়া গণ্য হইবার স্পর্ধা রাখে। আজ অবধি  
বেবিবার মত কিছু নাই আছে যোজন-বিস্তৃত দীর্ঘিক,  
আর প্রাচুর্য্যবহু। বহুকাল সব ধ্বংস করে, কিন্তু বৃত্তি  
ও ভ্রুতিকে ধ্বংস করে না। তাই তাম্রকে প্রাচীন  
ইতিহাসের লীলা-বিক্রমণালী রামপালকে প্রচার চক্ষে  
বেবিবার অল্পোৎসব তানাইলাম।

আমাদের বৌদ্ধ রামপালের দীর্ঘের প্রান্তে পৌছিল।  
আমরা নামিয়া দীর্ঘের পাশে অবস্থিত গঙ্গারি বৃক বেধিতে  
চলিলাম। গঙ্গারি বৃক বাঁচিয়া নাই, ওকাইরা পাড়াইয়া

আছে। আমাদের পথপ্রদর্শক বারিক ও মহান বলিল,  
মৃত বৃকের নিকট হইতে একটা নতুন চাড়া উল্লসিত হইয়া-  
ছিল, কিন্তু লোকেরের অনাচারে তাহা বহিরা গিয়াছে।

দীর্ঘের পাশে পাড়াইয়া পৈখালদল-পরিপূর্ণ দীর্ঘের  
দিকে চাষিয়া মনে হইল বাহ্যের বিলাসবৈভব এতই  
মহা। একদিন সেখানে ছিল সখাগোহ ও কলকোলাহল,  
আত্ম সেখানে স্থান। মনে দুঃখ ও বিহার ভাগে।  
দীর্ঘের নাম রামপালের দীর্ঘ। কেহ কেহ বলেন, ইহা  
পালবংশীয় রামপালের কীর্তি। তবে স্থানীয় কিংবদন্তী  
অসম্ভব। আমাদের গঙ্গী দুইজন পিওনই দুশশমান  
কিছু তাহারা এইসব পক্ষ বেশ জানে, কিরিবার পক্ষে  
তাহারের নিকট সেই পক্ষ চলিলাম।

বজ্রালের রাজবাড়ীর হুবি ছিল রামপাল। বজ্রালের  
অবধি দীর্ঘিক। তাহার বাজীর নিকট গিয়া পৌঁছে।  
তাহার তাম্রকমে লোকে দীর্ঘিকে রামপালের দীর্ঘি  
বলিতে থাকে। তাগের বেলা আশ্চর্য।

সেখান হইতে আমরা দীর্ঘের অপর পাশ দিয়া অস্ত  
একটা দীর্ঘি দেখিতে বাজা করিলাম। এই দীর্ঘিকাতে  
অন্য বেশী নাই,—বাসে ভরা। কিন্তু দাবী পৃথিবীর মিন  
দামের উপর এক হাত অল উঠে। অনেক ইহা বিশ্বাস  
করেন না, কিন্তু বাহ্যের সচক্ষে দেখিয়াছে, তাহাদের  
কথার অধিষ্ঠান কিরিবার কারণ নাই। ইহার বৈজ্ঞানিক  
যেহু কি তাহা বলা হুছিল, কিন্তু বাহা আপাততঃ অসম্ভব  
মনে হয়, তাহা সব সময় অসম্ভব হইবে—ইহা ঠিক নয়।  
কিন্তু এই দীর্ঘি বেধা আমাদের হইল না, বানিক হু  
হুগুটিতে হইবে বলিয়া তাহারা কিরিলেন। কাকেই  
আমাকেও কিরিতে হইল।

সেখান হইতে আমরা কোমাল-খোওয়া দীর্ঘিতে  
ফেলিলাম। কোমাল-খোওয়া দীর্ঘির পাশে আদিয়া একটা  
গ্রামা বাজা বাহিয়া আমরা চলিলাম। ইহারই ভানদিকে  
বজ্রালসেনের বাজী—বাজীর কিছু নাই—তাহার  
আমাদের ক্ষণাংশের উপর রামপালের বিশ্রান্ত  
কমলী-বাগান পড়িয়া উঠিয়াছে। বেবিবার মত কিছু নাই,  
কেবল ইট আছে ওনিয়া কেহই কষ্ট স্বীকার করিয়া সেই  
ক্ষণাংশের পরিদ্রব করিতে চাহিলেন না।



আমরা সেখান হইতে বাবা আদমের দসজিৎ ও সদাধি বেবিলাহ। দসজিৎ বেবিলা নিঃসন্দেহ হইলান যে, ইহা পুরাতন কোনও হিন্দু-বন্ধিরের জ্ঞানের উপর নির্ভিত—প্রাচীরের একটা কাচকাঁচাময় ভক্ত তাহার অতীত কাহিনীর সাক্ষ্য দিতেছে। সেখান চট্টে আমরা কিরিয়াম। চারিদিকে ব্রহ্মর কুবি আয়োজন—কণির চারা লাগাইয়াছে। রামশালং এই স্থানটি নানাপ্রকার সজী চাপের জন্য ব্যস্ত। উচ্চের ক্ষেত বেগনের ক্ষেত প্রকৃতিতে এখনকার চাষীদের কৃষ্ণ-সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা পাইগান।

কিরিতে কিরিতে মনে পড়িল, সত্যাকর মন্দির বাম-চরিত্রের কথা। কবি অতিশয় আত্মবিশ্বাসী ছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন :—

অবদানঃ রত্নপরিচয়-মৌড়াধিপরাগমবয়োদেহতৎ।

কলিঙ্গগরামার-নিহ কবিরসি কলিকালবাসীকিঃ।

তির দুর্ভাগ্য, কলিকালের বাস্তবিক অতি দন পাঠকই জানেন। তাঁহার রামশাল-চরিত ব্যঙ্গ-ইতিহাসের এক দৃশ ও বিস্তৃত অধারে আনোকপাত করে। রামশাল বাঙ্গলার প্রজা-বিত্রোহ দমন করিয়া রানাবতী নামে নগর নির্মাণ করেন। সেই রানাবতী আর রামশাল এক কিনা তাহা লইয়া বিশেষ দ্বন্দ্বের আছে। প্রত্নতত্ত্বি দারালারাস বাল্যোপাখ্যায় মহাশয় কিন্তু ঢাকার রামশালকে রানাবতী বলিতে চান না। বজাংজাবিহাজ, পরমভট্টায়ক, পরমেশ্বর, পরমসৌম্য রামশালমের দেনপতী স্থাপন করেন, তাহার বর্ণনা রাম-চরিতে এইরূপ :—

অগাভিতো গঙ্গাকরভোদানবর্ণপ্রবাহপুণ্ডরবাদ।

অশুনভবান্নবনবতীর্বাণিকসুখল্যাবয়ঃ।

গঙ্গা ও করভোদার স্বাধীনতা এই রানাবতী করণই ঢাকার রামশাল নহে।

নৌকার কিরিয়া বারিক ও রহবানের গল্প তুলিতে তুলিতে চলিলাম। আদমের ইতিহাস নাই। বাহুরের স্বপ্নায় ও তাকনাকে উইকি বিষয়ে নিবন্ধ না করিয়া পরলোকের দিকে তাহার দৃষ্টি-কিরাইতে আমরা একান্ত উৎসুক। তাই এইসম প্রাচীন লুপ্তাবশেষের সত্যাকার ইতিহাস কোনও দিনই উদ্ধার হইবে না।

কিংবদন্তী কবি-কল্পনার সঙ্গে জড়িত হইয়া নগর ও জনপদবাসীকে মুগ্ধ করে। একটি গল্প পারাবতের পলায়ন-কাহিনী। বাবা আদমের প্রথমে রাজসভায় খুব আদর ছিল, কিন্তু একদিন শত্ৰুণ একটি গঙ্গর হাড় প্রাণাঘাতের নিম্না ষাওতার কলহ ও বিবাহ বাধিল। বাবা মুগ্ধ চলিলেন—তিনি বাবা আদমের সৈন্তদের পরাজিত করিয়া একটা বীথিকায় জলপান করিতে নাহিলেন—এমন সময় তাহার যার্তাবাহী পারাবত উড়িয়া গেল। কথা ছিল, পারাবত কিংবদন্তিঃ আদমের রাজপুত্রীর সকলে অনলে আত্ম-বিসর্জন করিবে। রাজা পারাবত উড়িতে দেখিয়া তখনই খোঁড়া ছুটাইয়া বাজী করিলেন, কিন্তু তাহার পুকেই রাজপুত্রী অশানে পরিণত হইয়াছে, তিনিও শোকে ও হুঃখে আত্মবিসর্জন বিলেন।

বাবা আদমের বাজী হইতে বলালের রাজবাড়ী অতি সন্নিকট—এই গল্পটি যে সত্য নহে, এই নৈকট্যই তাহার প্রমাণ। তবে এই ধরণের গল্প নানাবিধে প্রচলিত—কত উষ্মার পিণ্ডি বুঝার খাড়ে চাপিরাছে যে তার নির্ধ করিবে। তবে অধিকৃত নামে একটি পুরু এই কাহিনী সম্বল করে।

যে শুক গজারিগাহ বেবিলাহ তাহার সম্বন্ধে কতিপয় গল্প আছে—আদিনির বংশ পুত্রের-বজা করিবার ভক্ত কাঠকুস্ত হইতে পাঁচজন ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন, তখন তাহার ত্রী তৃত্য সহগোদানে আরোহণ করিয়া চর্যপাহক্য পড়িয়া তাবল চর্যণ করিতে করিতে তাহার প্রাণাদে উপস্থিত তুলিয়া তিনি তাহাদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া বলেন, বিলয়ে দেখা করিব। রাজপ্রাণাঘাতের দ্বায়ে হাতী ধাবিবার ভক্ত একটি শুক কাঠকুস্ত ছিল। রাজার কথা তুলিয়া ব্রাহ্মণগণ সমস্ত বৃত্তিতে পড়িয়া আশীর্ষকের ভক্ত সংস্কারিত অর্থানার ও পুশ্যাদি তাহার উপর নিক্ষেপ করিলেন তাহাতেই বরকাঠ সজীবিত হইয়া উঠিল। ব্রাহ্মণ-গণের যোগবল আনিয়া রাজা তাহাবিপের বধোচিত সন্মান করিলেন। আদিত্রের বন্যা লক্ষ্মীদেবীর গর্ভে বাল-সেনের জন্ম। তিনিই বাংলায় কোনোনা প্রথা বিস্তার করেন।

রামশালের অন্ত-সাগর, দুঃসাগর, অতীতের প্রভৃতি

কলার বত নুশৰ কলা তাত্তবৰ্বে আর নাই। সুদৃগত  
হইতে আশায়া গছে কলা লইয়া আসিয়াছিল। তাহাই  
তখন করিতে করিতে গর ওনিতে লাগিল।

বল্লভ জোব আভায়া একটা কীলোককে বিবাহ করেন,  
কলে তাহার পুত্র লক্ষ্য সেন বিয়ত হইয়া দুৰে প্রবাসে  
চলিয়া যান। পুত্রও বিবাহ-বাখাৰ হুনিতে হইয়া এই  
কবিতাটি অখিৰ-পাত্রে লেখেন।

পততাবিহন্তঃ বারি নৃত্যন্তি শিশিনো মুখা।

অত কাশ্যঃ কৃত্যন্তো বা হুংবশান্তিঃ কথোতু মে।

পুত্রবধূ ননোবাখাৰ বাখা পাইয়া বল্লভ কৈবৰ্ত্তবিগতঃ  
পুত্ৰকে আনিতে পাঠান। কৈবৰ্ত্তৰা দুই দিনের মধ্যে  
লক্ষ্য সেনকে আনিয়া তাহার স্ত্রী বিবহবাখাৰ উপল-  
ক্ষে। রাধা বল্লভ দস্ত হইয়া হালিক কৈবৰ্ত্ত নিপে-  
জলাভেবীৰ করেন।

বাতিক গর বলিতে পারে। যে দীঘিতে বাখী পূৰ্বিয়ার  
জল ওঠে, তাহাকে বোব হয় সে হরিপালের দীঘি বিদ্যা-  
ছিল। হরিপালের বিকল জল ছিল, সে একদিন ব্রাহ্ম-  
গণের সমুখে ঠাড়াইয়া তাহার বিকল অমৃত অমৃত ভা-  
কিতেছিল। ব্রাহ্মণেরা মনে করিলেন সে উপহাস  
করিতেছে। তাহাতে তাহারা ক্ষুব্ধ হইয়া অভিলাপ  
কিতে আগ্রস হইলেন। কিন্তু যখন আনিলেন যে লতা  
সত্যই কুঁচো, তখন তাহারা প্ৰসন্ন হইয়া তাহাকে  
বিত্তে বলিলেন। হরিপাল চতুৰ ছিল, সে আৰ্থনা করিল,  
“আমি বেন গোনার খালে ভাত বাইয়া নতপুত্ৰের  
জননী—স্ত্ৰীঘের বাবা সেবিত হইয়া পালকে সোকা হইয়া  
ভইতে পারি।” আশীৰ্বাদেব কল ফিল। হরিপাল  
নিরাশ হইয়া ঘন ও সৌভাগ্য লাভ করিয়া গুৰে কাল  
যাপন করিতে লাগিল।

আমাদের নৌকা বীৰে বীৰে কলার খেতের পাৰ  
দিয়া চাখীঘের ছোট ছোট বাড়ী ছুঁইয়া ক্ৰমে বীৰকানিন  
কলমাঘাটে আসিয়া পৌছিল। তাহারা বলিলেন—  
“এখানেই নায়াৰগপ্তের সীমার আখণ্ডীয়া মধ্যে পাইবা।”  
কিন্তু সীমার-বাটে গিয়া আনিলান—যে, সীমারের তখনও  
অনেক সেতী আছে। কি করিব ভাবিয়া পাই না।  
কিরিভেছি, এমন সময় সেখানৰ একটা বাজীবাচী নৌকা

নায়াৰগপ্ত বাইতেছে। আমাকে বিত্তে বলিলাব,  
কিছুতেই নিল না। তখন বিজ্ঞেই একটা বড় নৌকা  
করিয়া বড়না হইলাব। বাখিরা পাল ছুটিয়া দিয়া  
হলেবদী পাড়ি দিল।

ব্রাহ্মণের কুলে কুলে তারা নদী নৌকা তাহার পথে  
নাচিয়া নাচিয়া চলে। পালের জোরে বাকে বাকে  
নৌকা কাত হয়, বাখিরা বলে, ‘বাধু, ভর নেই’—আমার  
অবস্ত ভর হয় না, তথাপি তাহাঘের সাবদানে চলিতে  
বলি। তাহারা দুইজন বুবা ও বলিষ্ট, তাহারা আমার  
কথার মনে মনে হাসে।

শীতলক্ষ্যার ত্ৰিমোচনার শুধানে উদ্ধাৰ অলমোত।  
নায়াৰগপ্তের বাড়ী-ঘর চোখে পড়ে আমাৰ শীতলক্ষ্যার  
চুকিয়া পড়ি। নায়াৰগপ্তের বিত্তে বাইল যানেক  
আসিয়ার পর সমুখে একটি বড় পশ্চিমা নৌকা দেখিয়া  
বাখিঘের বলিলাব—‘সাধবান’। বাখিরা স্বৰ্ণপাত করিল  
না। হঠাৎ সেই বড় নৌকার লতা মাগিয়া নৌকা কাত  
হইয়া গেল। হ হ করিয়া জল উঠিতে লাগিল। আমার  
হাতের হাতা নৌকার ভিতর চলিয়া গেল, প্রথমে তাহা  
আনিতে সেলাম। কিন্তু জল বেশী উঠিতেছে দেখিয়া সে  
ঠোঁতাগ করিয়া ওইঘের বাখিৰে আসিলাব। তখনই  
অঙ্গে অগ্নিৰা নৌকা ভুবিয়া গেল। নৌকা তলাইল না—  
উপুড় হইয়া তালিতে লাগিল। আমি সেই উপুড় নৌকার  
উপর সোজা হইয়া ঠাড়াইয়া বহিলাব। বাখি দুইজন  
জলে কাঁপাইয়া পড়িয়া কুলের বিত্তে সাঁতার দিল। যে  
নৌকাটির অস্ত আমাদের এই বিশব, তাহাঘের বাখিরা  
আমাদের সাহায্যের অস্ত আগ্রস হইল না। চাখিবি-  
কত পত নৌকা চলিতেছে, কেহই আমাদের উদ্ধাৰে  
আগ্রস হইল না। একবার মনে করিলাব, জলে কাঁপাইবা  
পড়িবা সাঁতার দিয়া কুলে বড়না হই। এমন সময়  
পাশের একটি পাটগুৰাম হইতে একটি নৌকা আমাদের  
সাহায্যে আসিতেছে দেখিয়া তাহা আর করিলাব না।

নৌকার একদিক জোবে, আর একদিক তালে—তাহার  
সহিত ভাল দিয়া সেই বালোতা শীতলক্ষ্যার জলে দুজুর  
সমুখে ঠাড়াইয়া এই যে অভিজ্ঞতা, তাহা স্মৃতিয়া নয়।  
তখন ভর পাইয়াছিলাব, তাহা নহে। মনে লাহন ছিল,

যদি কেহ না আসে, তথাপি কাপড় বুসিয়া ফেলিয়া  
সাঁতার দিয়া কুলে নিশ্চয়ই উঠিতে পারিব।

পাঠকবাহের নৌকা আসিয়া হাবিসের আগে তুলিল,  
তাহার পর আমাদের নৌকার কাছে আসিয়া আমাকে  
তুলিল। বিপদের সময় আমার পকেটের কমান্ডিট অল  
তালিয়া সিরাহিল। ছাতির মায়াটি ত্যাগ করিয়া বৃষ্টি-  
মানের কাঁজ করিয়াছিল। কুলে বধন আসিলাম, তখন  
উদ্ধারকারী নৌকার হাবিসের দিব মনে করিয়া কমান্ড  
তুলিতে গিয়া দেখি যে, পকেটে একটি অটো আসি আছে,  
কমানে বাঁধা টাকা তালিয়া চলিয়া গিয়াছে।

পাঠকবাহের ডব্রলোক আমাকে অবতর টাকা দিতে  
চাহিয়াছিলেন, তাহা না নিয়া একটি রিক্সার চড়িয়া  
শ্রেনে বসনা হইলাম। পবিত্র্যে রাসেলারার বাস  
হইতে আমার পরার তত একখানা কাপড় চাহিয়া নিয়া

শ্রেনে আসিয়া পাড়িতে উঠিলাম। রিক্সাডালার বিপদ  
আমার নিকট হইতে চারি আনা নিয়া দ্রুত হইল। আমি  
পাড়িতে উঠিয়া অবসর হইয়া পড়িলাম। একটি বুক  
আমাকে টিকিট কিনিয়া আসিয়া দিলেন।

সন্ধ্যার অন্ধকারে বাড়িতে পৌঁছিলাম। বা শুনিয়া  
চূপ করিয়া বহিলেন, তিরস্কার করিলেন না—আমি বর্ষায়  
কিছুমাত্র ভ্রমণ করিবার একটা আয়োজন করিয়াছিলাম।  
কেবল তাহার উল্লেখ করিয়া বহিলেন—“আর কোথাও  
যেতে হবে না।”

হার অন্ধ জননী, পথ বাক্যে ভাকে, সূঁচের মায়া  
ভাটাকে বাঁধে না। বাক্যে অবতর সে-বর্ষন বুঝাইতে বসি  
নাই। কীমনে অনেক গুরিমাছি, কিন্তু অতি সহজ এই  
অবশ্যে বাহা পাইমাছি, তাহা তুলিবার নয়।

## দিন

এ, কে, এল, দুই মোহাম্মদ

যেহা বয়স দিন এবার কুরান :  
বিক্রমে কোম্পানি অরোহা-আতান দেখা যায়।  
বিশ্ব-ভাষা তেঁদে হয় আশ নব হর্বোদয়  
কুরান-বাটির বুকে প্রথম বিশ্ব  
অনবের নতুন উদ্বোধন  
যেহা রক্ত রাঙে তাই বরুণের পুতান বতাস। ...  
কেউ তোলে কেউ তোলে নবরের সজীব নদিল  
শহীদেব গুলে রাঙা দিন আসে—রূপ ভিলুদিল।  
হলের পানীর কাক উড়ে উড়ে যায় :  
কেসেছে হবির কোথ আদি আকসিক  
কলোরা-গিলোরা নাই...আসিয়াছে লুকা-আপসিক  
নত পথ্যকর আশ আভিরাছে বত লাজ তর...

চিনিয়াছে নিশ্চয় স্বপ্ন  
পাড়াবীর ব্যক্তির ইতিবে না আর তাহা চূপ।  
এরাই নতুন হ'বে পানীর বতন কাক কাক  
জিহবার শেষ হ'বে : ইহাদের ভাকে  
একবা দেখিবে নব বাহা-কুর হ'রে গেছে শেষ,  
অপব চাহিছে অনিবে  
ইহাদের প্রতি—  
নীল ইশাভের হতো হরে গেছে ইহাদের গতি। ...  
এরাই নতুন হ'বে, শোনা যায় অবেশ দিব্য  
এবের অপতে হ'বে নব হর্বো, নব তায়-কাক—  
এবার লয়েছে এরা নতুন হর্বো আশির্বাদ...  
নতুন বক্তা আসে নিটাইতে তাহাদের বাহ।

# টাকাপ্রকাশ ও বাঙ্গলার প্রাচীন কথা

ক্রিয়োগেন্দ্রনাথ স্তব

[ পত সংখ্যার পর ]

টাকাপ্রকাশ ১২৮৮, ইংরেজী ১২ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮১

নীলদর্পণ

গোলপ্রকাশ সম্পাদক লেখেন, "মাস-রান সাহেব নীল দর্পণের বিষয়ে লিখিয়াছেন "বসিও ইতার ( নীলদর্পণের ) অস্থাবর যোব আছে, কিন্তু ইহা যেখান পুস্তক লেখকঃ যোগ্যতার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। ইহার বিপক্ষে বাহ্য বলা হইয়াছে, আমরা তাহার কোন উপযুক্ত কারণ দেখিতেছি না। শত সাহেব আপনার ভূমিকার নিমিত্ত দায়ী হইলেন, কিন্তু তদুপরে কিছু অজ্ঞান করা হয় নাই।" এতদ্বারা নীলদর্পণের বিষয়ে ইংলণ্ডের লোকের যেহেতু অভিপ্রায় তাহা জানা যাইতেছে।

উক্ত সম্পাদক লিখেন :—

টাইমস অব ইণ্ডিয়া সম্পাদক বলেন, বোম্বাইর সমাচার-দর্পণসম্পাদক তথায় নীলদর্পণ অভিনয়ের সমুদয় উদ্যোগ করিয়াছেন। তদন্ত উক্ত টাইমস অব ইণ্ডিয়া সম্পাদকও অত্র নীলদর্পণের ইংরাজী অস্থাবর আভ্যোপাত্ত প্রচার করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। উক্তন সত্য।

সম্মতবরজন পাঠে অবশিষ্ট হইল, বোম্বাইর সমাচার-দর্পণ সম্পাদক নীলদর্পণ নাটক গুলুয়াড়ি ভাষায় অস্থাবর করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। বোম্বাইতে ত কোনও গোপ-বাদের ভয় নাই।

ইংরাজ বিজ্ঞানগণ

টাকাপ্রকাশ

তার ১২৭৭

—আমরা অভিযায় সত্ত্বেও সত্যকারে প্রকাশ করিতেছি যে, মহানাজ পণ্ডিত ইংরাজ বিজ্ঞানগণ মহাশয় তাঁহার পুত্র বাবু-করায়নজ্ঞ অধ্যাপ্যায়িক-জ্ঞানকোশাধিপায়ী একজন প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণের ১০ বৎসরবয়স্ক বিবাহ করায় সত্যিকার বিবাহ দিয়াছেন। ১১ই আগষ্ট তারিখে এই বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। যতদূরকার্য্য করা হইয়াছে সত্যিকার বিবাহবিবাহ-হওয়া উচিত বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে।

টাকাপ্রকাশ, ১৮ই আশ্বিন সহস্রাব্দিবার, ১২৮৮ সাল

সমাধিসংসার—বিবাহ-বিবাহ

বিবাহ-বিবাহ যে উচিত এবং শাস্ত্রমত তাহা অবি-কাশ মহোদয়েরাই স্বীকার করেন। কিন্তু সমাজচ্যুত হইয়া একাকী থাকার ভয়ে কেহই এই হিতকর ব্যাপারে আগ্রহ হইতে সাহসিক হইতেছেন না। বোধ করি, যদি অধিকাংশ লোক ঐক্যতা অবলম্বন করিয়া এতদ্বিষয়ে উদ্যোগী হইতেন, তবে আর সে ভয়ের কোন কারণ থাকে না। অতএব নিম্নলিখিত প্রতিজ্ঞাপত্রে আমরা সকলে স্বাক্ষর করিলাম। এইজন্য জানা আবশ্যক যে, বক্তৃতা ইচ্ছাতে স্বাক্ষর করিতে সাহসিক আছেন, বাহারা সম্মত ও সাহসিক আছেন, তাঁহারা য য নাম টাকাপ্রকাশে প্রচার করিয়া যথিত করিবেন।

প্রতিজ্ঞাপত্র

আমরা বঙ্গদেশীয় হিন্দু বিবাহ বিধিানুগত বিবাহ প্রদানার্থে সকলে হিতপ্রীতি এবং ঐক্যতাবলম্বন পুঙ্কল স্বীকার করিতেছি যে, আমরা সাধারণস্বার্থে এতদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হইবার পক্ষে যথোচিত ব্যয় পাইব। তদন্ত সাধারণিক লোকেরা আবাদিগণকে সমাজচ্যুত ও অধ্যবসিত করিলেও আমরা সকলে একত্র হইয়া পরস্পর সাহায্য ও ব্যবহার করিব। সমাজচ্যুত হইবার ভয়ে কোন প্রতিজ্ঞা-চ্যুত হইব না—ইতি।

শ্রীমা বান হার

|                             |      |           |           |
|-----------------------------|------|-----------|-----------|
| শ্রীমত বাবু রামচন্দ্র গুপ্ত | টাকা | হাজাখাড়া | হিতমুদ্র  |
| " গুরুচরণ মহলানবিশ          | "    | "         | পঞ্চাঙ্গ  |
| " পদবিহোহন সেন              | "    | "         | সোণারক    |
| তবানীশঙ্কর সেন              | "    | "         | বান্ধী    |
| শ্রীনাথ সেন                 | "    | শ্রীমদ    | মহাপাত্র  |
| " জগদ্রাম সেন               | "    | "         | কাটাঘিয়া |
| " গোবিন্দচন্দ্র বসু         | "    | "         | মালবানন্দ |
| " হরিশ্চন্দ্র বসু           | "    | "         | বীহতারা   |
| " আনন্দবাহন সেন             | "    | হাজাখাড়া | সোণারক    |

|                                                     |         |          |
|-----------------------------------------------------|---------|----------|
| মূল্যের শিকক                                        |         |          |
| কাম্বিজ লেন                                         | শ্রীনগর | বেতগ্রাম |
| ভগবানচন্দ্র বসু (করিদ-<br>পুরের ডেপুটি মেজিষ্ট্রেট) |         | হাড়ীপাল |
| বিজয়কৃষ্ণ পোস্তালী নবীয়া,                         |         | পারিপুর  |
| নবকুমার গুহ                                         | ঢাকা    | শ্রীনগর  |
| শ্রীনাথ ঘোষ                                         |         | কুমারভোগ |
| হারকানাথ ঘোষ                                        |         | গোলাপতর  |
| প্রদ্যোত গুহ মুখার্জী                               |         | হাটহাট   |
| ঢাকাপ্রকাশ ৩০শে কার্তিক, ১২৬৮                       |         |          |

### নাটক ও অভিনয়

১৬ই কার্তিক ১২৬৮। ইং ১ নবেম্বর ১৮৬১ ইংরেজী।  
১ ভাগ, ১৮ সংখ্যা। বার্ষিক মূল্য ডাকলাভল পত্র ৫

এখানে নাটকভিনয়ের সজাবনা না কি ?

প্রায় বর্ষব্যস্ত হইল, এ প্রবেশবাসীরা যাত্রা-  
গানের আমোদ-প্রমোদে উদ্ভ্রান্তপ্রায় হইয়াছে। নগরের  
প্রত্যেক পরীতেই এক একটি সন্দের যাত্রার দল দেখা  
যাইতেছে। আবার: প্রেষণাবিহী এই লোক যাত্রাভি-  
নয়ের প্রেম প্রবণ করিয়া আসিতেছি কিং কখন  
এতদ্বিধা প্রেমভর প্রকাশ করি নাই। বস্ত্র: যাত্রা,  
কবি, শ্রীতি বৎসারাত্র ঘটনা সন্নিহিত উৎস  
করিয়া ঢাকাপ্রকাশের দ্বারের সতীর্ণতা করিতে আমাদের  
অসুখ্য নাই। এখানে পাঠকগণ: বনে করিতে  
পারিছেন, যে-বিধের প্রস্তাব করিতে আমাদের অভিশাপ  
হইতে নাই, অথ কি নিবৃত্ত আশা সেই বিধে লেখনী  
ধরন করিয়া এক্ষণ হৃদিকা নিবিয়া যাইতেছি। ইহার  
কারণ এই, অথ "নাটকভিনয়" স্বাক্ষরিত কইনক পত্রপ্রেক্ষ  
এতদ্বিধা একখান পত্র লিখিয়া আমাদের নিকট প্রেরণ  
করিয়াছেন। পত্রপ্রেক্ষক—আমাদের সম্বন্ধে এক্ষণ সুশ্রুত  
ব্যাপার নির্দোষিত হইয়া যাইতেছে, আমরা শুৎপ্রতি  
বাহনিস্তি না করিয়া বোন হইয়াছি, ইহা সম্প্রদায়  
বৃদ্ধের বিবৃতি—বলিয়া বিস্তর অগ্রবোধ করিয়াছেন এবং  
বাহ্যতে এক্ষেত্রের উত্তমোত্তম নাটকভিনয় করিতে  
বলুন হইবে তদ্বিধা সবিধে উপদেশ প্রদান করিতে  
আমরা বিব্রত করিয়াছেন। আমরা কি নিবৃত্ত

এতদিন প্রস্তাবিত বিধা বাপুবিভাগ করিতে উপেক্ষা  
করিয়াছি, এক্ষেত্রের দ্বারা নাটকভিনয় হইবার কত  
সজাবনা, অথ এতদ্বিধা বিবৃতি করিয়া পত্রপ্রেক্ষকে  
প্রবোধ প্রদান করা কর্তব্য বিবেচনা অথবা ঢাকা-  
প্রকাশে যাত্রা-প্রদর্শন উপাদান কহিবার। আমাদের  
পাঠকগণ কহা করিবেন।

এখানকার যাত্রার বহাদর বিলোকন করিয়া  
আমাদের মনে অনেক সময় নাটক অভিনয়ের প্রস্তাব  
উদিত হইয়া থাকে। কিন্তু বন আমরা বর্তমান যাত্রার  
প্রণালী এবং যাত্রাকবিদের কলতার বিধা চিত্রা করিয়া  
দেখি, তখন আর সে আশা মনোমধ্যে স্থান প্রাপ্ত  
হইয়া না। সুশ্রুত যাত্রাবি আমোদ-প্রমোদ অপেক্ষা  
বিস্তৃত নাটক অভিনয় দ্বারা সাধারণের প্রবোধকৃত্য  
কৃতি সাধন করা অনেক অংশে প্রেরণের সম্ভব  
কি? যাত্রা কবির পরিবর্তে এখানে চিত্রকর  
নাট্যনোদের প্রথা প্রবর্তিত হয়—ইহা আমাদের  
কেন, সম্ভব যাত্রাভিনয়ের বাহনীর।

এখানে যে সকল যাত্রার দল বৃহৎ হইয়া থাকে, প্রায়ই  
তত্ত্ববৎ ইতর আমোদ-প্রদর্শন অনিশ্চিত ব্যক্তিগণ  
পরিপূর্ণ। দলের মধ্যে যে ছুই একজন সম্পন্ন ব্যক্তি  
আছেন, তাঁহাদের চিত্র কলার ও অজ্ঞানতার পার্শ্ববি-  
মুক্ত নহে। ইদৃশ সত্যবস্তু লোকবিদের উপদেশ  
দেওয়া এবং চেতনহীন অজ্ঞ লোককে উপদেশ দেওয়া  
প্রায় ভুল। ফলশ্রুতির সজাবনা। কলার অমার্জিত-  
বুদ্ধি ব্যক্তিবৃন্দের দ্বারা নাটকভিনয় দর্শনের আশা করা,  
আর বাস্তুসংস্থ বস্তুভূমিতে কৃত্রিম লতা দর্শনের আশা  
করা, উভয়ের পরিণাম একপ্রকার বলিতে হইবে। নাটক  
প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে বস্ত্র মৎ তত্ত্ববৎ আভিনয়  
দর্শনের হইবে বা আশ্রয়ক। যাত্রাগানে তান হাড়ী  
গান করিতে পারিলেই কৃত্যবর্তা লাভের সজাবনা।  
নাটকের তত্ত্ব নহে। নাটক এক্ষণে অভিনয় হওয়া  
আবশ্যক যে, তদ্বিধা দর্শকগণের সৌভাগ্য অঙ্গভবনের  
অবশিষ্ট না থাকে। নাটকের নটগণ বন বে-লগ্ন্যক  
বক্তৃতা করিবে, তখন তাহাতে সেই দলের শ্রুতি হওয়া  
আবশ্যক। যে নট বক্তৃতা দ্বারা আশ্রয় মনোমগ্নতা

দর্শকগণের দ্বারে প্রতিবিম্বিত করিয়া দিতে সক্ষম, তিনিই নাটক অভিনয়ে ব্যতিত হইতে পারেন। এখানকার ব্যক্তিকর্মগণের দলবধৌঃ এতদপ লোক কখন আছেন ? অধিক কি, বর্তমান ব্যক্তিকর্ম দলের মধ্যে নাটক যে কাঙ্ক্ষিত বলে, বোধ হয় তাহাই অনেকের কণ্ঠগত না হইয়া থাকিবে। বাজার নাটক অভিনয় কখনো প্রত্যক্ষ করে নাই, বাজার নাটক অভিনয় প্রণালীর অণুনাথ অবগত নহে, বস্ত্রি আনয়্য তাহাদের দ্বারে ও উৎসাহে নাটক অভিনয় দর্শনের আকাঙ্ক্ষা করি, তবে আনয়্যের দুলা দুলাকাঙ্ক্ষা আর কে আছে ?

বখন অজ্ঞতা আচাৰ্য্যগণীয় অস্তঃকরণ দুগত হইবে, বখন এ-দেশীয়দের মানস-বন্দিত্ব অজ্ঞানভিবিজ্ঞান বিজ্ঞার বিবলা জ্যোতিতে অস্তিত্ব হইয়া যাইবে, বখন এখানকার আপামর সাধারণ বিজ্ঞানস-আনয়্যের সর্ব হইবে, আনয়্য তখন এ দেশে নাট্যভিনয় দর্শনের আশা করিব। যেসময়ের অত না হইলে বস্তুকালের বসনীধ সাধুঃ অলোকিত হয় না। একপে এদেশীয়দের কর্তৃক নাট্যভিনয়ের সম্ভাবনা কি ?

### প্রতিপত্ত

চাক্ষুশ, ২১শে নবেম্বর, ৭ই অক্টোবর ১৯৬৮, ১৯৬৯।  
মহাশয়ঃ প্রিয় চাক্ষুশ প্রকাশ সম্পাদক মহাশয়  
সমীপে।

সবিনয় নিবেদনমিঃ। সম্পাদক মহাশয়, ১৬ই কাঙ্ক্ষিত বাগদীয় চাক্ষুশ প্রকাশ নাটকপ্রিয় পত্রপ্রেক্ষক এখানকার ব্যক্তিকর্মের ইতিহাস প্রতীতি উল্লেখ করিয়া নাট্যভিনয়প্রণা প্রবর্তনার আপনাকে বস্ত্র পাইতে অজ্ঞোদ্য করেন। আপনি এখানকার লোকগণের অনভিজ্ঞতা ও অসংজ্ঞতদ্বারা প্রতি উল্লেখ করিয়া এককালে এখানে নাটক অভিনয়ের সম্ভাবনা নাই বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এবং নাটককে বিতর্ক আনয়্য বলিয়া তৎপণগণে লেখনী ছাড়িয়া দিয়াছেন। ভাল মহাশয়, বাজারগান নিকট এবং নাটক অভিনয় কি প্রণ উৎকৃষ্ট হইল, আনয়্যে বুঝাইয়া যেউন যেবি।

নাটক সঙ্গত্বিতে অভিনীত হইয়া থাকে, ব্যক্তা যবা তথা হইতে পারে, এবং হইয়াও থাকে। নাটক বাজারিক উক্তিঃ পূঃ মধ্যে মধ্যে ছুই চারিটি সঙ্গতিও

সঙ্গতি থাকে। ব্যক্তাঃ আচাৰ্য্যগণ সঙ্গতিপূঃ। কেবল নাহে নাহে কথা আছে। নাটকও যেমন আদি, কতদ বসাদি এখান হুবিয়া বস্ত্রিত হয়, ব্যক্তাও তদ্রূপ। কেবল অভিনয়প্রণাঃ কণ্ঠিক বিস্তারতা নাহে। যে দ্বারা এই নামাত্র প্রভেদ, সে দ্বারা নাটক অভিনয় বিস্তৃত আনয়্য, এবং বাজারগান ইত্য আনয়্য পদে কি নিমিত্ত ব্যক্তা হইল ?

এখানে “বস বিলাস,” “কৃতান্তিলাস” মুক্তা-লভাবনী” প্রবৃত্তি যে সকল সখের ব্যক্তা হইয়া থাকে, তাহা হইতে ইতিহাসের তুর্গত নির্গত হইয়া থাকে না কি ? দর্শকঃ প্রেই সকল ব্যক্তাভিনয় দর্শন করিয়া ব্যক্তিকর্মগণকে কি তিরস্কার করিয়া থাকেন, না প্রশংসা করিয়া থাকেন ?

সম্পাদক মহাশয় ! আপনি যেন স্মরণে না যে, এখানে বস্ত্র করিলে নাটক অভিনয় প্রদর্শিত হইতে পারে না। এখানকার ব্যক্তিকর্ম দলের মধ্যে এমন এক একজন গনী পুত্র আছে যেন, তাহারা যেন করিলে একতঃ সাত নাটকের অভিনয় করিতে পারেন।

ব্যক্তাঃ—যে সকল বসনাপত্রঃ করিয়াছেন ততঃ-বস্ত্রের উত্তর প্রেঃ কতঃ নাটকপ্রিয় পত্রপ্রেক্ষক কর্তব্য।

### নাট্যভিনয়—বিবিশাল

৪ বৈশাখ ১৯৭৭

আনয়্যের নবাগত কাল্পটের ম্যাজিষ্ট্রেট প্রিয় চাক্ষুশ বিঃ বেজারিঃ দ্বারাঃ ব্যক্তা লিখিত পত্রিতে উৎসাহ আছে। ইমি সকলের স্টিতিঃ তত্র ব্যবহার করিয়া থাকেন।

বাই-বেনটীর পরিবর্তে নাট্যভিনয়

“এতদেশীয় কোন ভবিষ্যৎ নাট্যভিনয় ব্যক্তিঃ ব্যক্তিঃ হইয়াছেন। সহস্রাব্দী অনেক বিবোঃসারীঃ ব্যক্তিঃ কয়েক দিল ( ১৮৭০ চই এঃপ্রল, বসিশাল ) হইল তিনি সম্ভার স্টিতিঃ বসিশাল আদিত্য ক্রমে রানিঃভিঃ ও তানকী নাটক—এই দুইব্যক্তির অভিনয়কাঃ সম্পন্ন করিয়াছেন। আনয়্য প্রেঃক অভিনয়ঃপ্রেই উপস্থিত হইয়া যেখাতি। অভিনয়কাঃপ্রের অণ্যাপি অনেক অস্তঃ আছে, একতঃ উঃ আংশিক অভিনয়ঃ বলা বাইতে পারে।……ইহার সূত্রঃ উপকরণ সঙ্গীতঃ হইয়া

সর্বাবস্থায়ই হইলে অতি উত্তম হইবে সন্দেহ নাই। অভিনেতাগণের মধ্যে অনেক গুণজ্ঞ। ইংরাজ অভিনয়-কাণ্ডে প্রাণশক্তি হইবার জন্য অনেক ব্যয় ও পরিশ্রম করিয়াছেন। এ অবস্থায় এই ক্ষণ বজ্রবৎ প্রচলন করা বৈদ্য কৃতবিদ্যা ব্যক্তিমাত্রেরই কর্তব্য।

১৫ই প্রাবণ ১২৭৭

ঢাকাপ্রকাশ।

কালীপ্রসন্ন সিংহ।

অম্বা আশ্রয়। একটি শুভবাস্তব প্রদান লোকের চক্ষু-সংসার লইয়া পাঠকবর্গের সমীপে উপস্থিত হইতেছি। বিস্ময় ২০শে জুলাই অপরাজিত ভাষায় বাহু কালী-প্রসন্ন সিংহ বান্দবীলা সংগ্রহ করিয়াছেন। ইনি এসেন্সিয়ালিগের নিকট অপরিসীম নন। কয়েকটি প্রদান কাণ্ড দ্বারা লোকসমূহের চিত্ত তিনি আশ্রয় দিলে অনেক আকর্ষণ করিয়াছিলেন। ইংরাজ জীবনব্যয় লোককে সংস্কারে প্রবৃত্তি ও অসংস্কারে নিবৃত্তি এতদ্বারা বিধারই উপদেশ প্রদান করিতেছে।

ইনি অতি অল্প বয়সেই নানাপ্রকার রোগে জীর্ণ-নীলা শয্যে করিয়াছেন। ইংরাজ বয়স্ক ২০ বৎসর নাত্র হইয়াছিল। ইংরাজ পিতা নন্দলাল সিংহ ইংরাজে বালাবস্থায় অতুল সম্পত্তির জোড়ে রাখিয়া পরলোক গমন করেন। কালীপ্রসন্নবাহু তাঁহার পিতার একমাত্র উত্তরাধিকারী ছিলেন। নন্দলাল সিংহের দুইজন পুত্র দ্বারা হস্তান্তর যোগে তাঁহার ও তাঁহার সম্পত্তির হস্তান্তর-কর্তার গ্রহণ করেন। দ্বারা হস্তান্তর যোগে তাঁহার পুত্র নিম্নলিখিত প্রাপ্তিলাভ করিয়াছিলেন। অন্যজন বাহু কালীপ্রসন্ন সিংহ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে অল্প সম্ভার সম্পত্তির হস্তান্তর-কর্তার গ্রহণ করেন। তিনি হিন্দু ফলে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। কিন্তু ইংরাজী প্রাপ্তি তাঁহার বিশেষ অধ্যয়ন ছিল না। কেবল সাধারণ ভাষা তাঁহার

চিত্তকে অধিক আকর্ষণ করিত। মুক্তগায় সাহেবের তাঁহার বিশেষ অধিকারও ভবিষ্যৎ ছিল। যদিও সত্যতঃ ভাষায় তাঁহার অধিক অধ্যয়ন ছিল, তথাপি তিনি সর্বপ্রকার ভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রের বিশেষ সম্ভার করিতেন। তিনি বঙ্গ-ভাষার পুরনু দ্বৈতবী বাহন ছিলেন। এ-সময় বহুতর অর্থ-ব্যয় ও পরিশ্রম স্বীকার করিতে ক্রটি করেন নাই। ইনি মহাত্মার ন্যায় অধ্যয়ন বাসনা-ভাষার প্রকাশ করেন। ইংরাজ বাসনা নির্বিকার বিশেষ ক্ষমতা ছিল। তদা ব্যয়, উক্ত বাসনা মহাত্মার ন্যায় অনেক উৎকর্ষ প্রাপ্তি তিনি বয়ঃ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তিনি মহাত্মার ভাষাও কোম কোম সত্যতঃ পুঙ্খবৎ বাসনা অধ্যয়ন প্রকাশ করেন। কালীপ্রসন্ন বাহুই প্রথমে বাসনা নাটকের অভিনয় প্রথা প্রচলিত করেন। বাসনা লাইব্রেরীর উন্নতির জন্য তিনি অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া দিয়াছেন। কালীপ্রসন্ন বাহু সম্প্রতি একখানি কবিতা গল্প-পুস্তক রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা বহুতর করিয়া বাইতে বাল্য তাঁহারে অবসর ছিল না। সাধারণজাতির প্রতিও তাঁহার সর্বিশেষ অধ্যয়ন ছিল। তিনি বয়ঃ একখানি বাসনা সাধারণতঃ প্রচার করেন, কিন্তু নানা প্রকার শৈথিল্যে লীলাই তাহার বিশেষ হয়। পেট্রিটও একসময় তাঁহার অধ্যয়ন লাভ করিয়া জীবিত ছিল। সম্প্রতি বৃদ্ধ হইয়া বাহু যৌবনভরকালে নীড়িত ছিলেন, তখন তিনি পেট্রিটের অধ্যয়ন প্রাপ্ত করেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তিনি উহার অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তিনি উর্দু-ভাষায়ও দ্ব্যবসায় নানক এক সাধারণতঃ প্রচার করিয়াছিলেন। চিত্রবিদ্যার অধ্যয়ন লাভও তিনি বঞ্চিত ছিলেন না।

তাঁহার জীবনের বহু ঘটনা আশ্রয়ের নরনগোষ্ঠ হইতেছে, তদ্বারা একটি ঘটনা জীবন উদ্ভাস ও চিত্র-স্বপ্নের। যখন নীলদর্পণ প্রকাশ্যে গোলযোগে বহুতর লাভ সাহেবের কাগজবান ও একসময় টাকা অর্থ-ব্যয় হইয়াছিল, তখন তিনি তাঁহার অনেক সম্ভারতা করেন। তাঁহার অধ্যয়নার সম্ভার টাকা তিনি দিয়াছিলেন, অত্যন্ত বিধেয়তা তাহার দাননীলতা যথ ছিল না। তিনি বিধবা স্নানার্থে একজন প্রদান উৎসাহী ও উপদেশদাতা

শ্রী. Bencidage সাহেব একজন বিখ্যাত নির্বাসিত ছিলেন। The District of Bakarganj নামক বিখ্যাত প্রদেশে প্রেরিত এবং আবুলফজল কৃত আকর্ষণাধ্যয়ন অধ্যয়ন করিয়া এপ্রতি লাভ করিয়াছিলেন।

হিলেন। রাজকীয় কার্যের সহিত তাঁহার চিন্তা অপরিচিত ছিল না। তিনি অধুনাতনিক ব্যাকট্রিট এবং মিউনিশিয়ান কবিশনার হইয়াছিলেন।

এতকণ্ণ আত্মা কেবল তাঁহার অপেক্ষাই বর্ণনা করিয়া আসিয়াছে। 'কতকগুলি সঙ্গণ যেমন তাঁহাকে অধিকার করিয়াছিল, তেমন কতকগুলি প্রধান বোধও তাঁহাকে হস্তগত করিয়াছিল। তিনি অত্যন্ত অমিতব্যয়ী ছিলেন। তাঁহার উপর পানবোধ প্রভৃতির ভক্তির আধিপত্য ছিল।' এতদ্বিবন্ধন অধিরে তাঁহার জীবন নান শু সম্পত্তি

নাশ উত্তর প্রকাশ অনিষ্টই সংকট হইবে। পানবোধ প্রভৃতি অত্যন্তই বোধ হই তাঁহার অকালমৃত্যুর প্রধান হেতু। এইরূপ নানা প্রকার বোঝান। নিবন্ধন তাঁহার জ্ঞানোন্নতিরও বিঘন ব্যাঘাত হইয়াছিল। বস্তুতঃ ইহার নান্দিক নক্তি প্রভৃতি যেতদপ সত্তর ছিল, যদি এত বোধের রূপ নিবর না হইতেন, তবে তিনি একজন মহান ব্যক্তি হইতেন সন্দেহ নাই। যুগক্ষেণে দেখিতে পেল, তিনি অকল্পন অতীত কল্যাণশালী ও পরম হিতৈষী লোক ছিলেন।

## রূপসী

### ঐদীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়

তোষার আমি বেবেছিস্যাম যেমন। নদীর বাঁকে।

গাঙের শালিখ কাঁকে কাঁকে

উড়িয়া পড়ে পায়,

গাঙারে ছিলে জলের কিনারায়।

হুঁহু ভ'রে সবুজ মাঠে ঘনারে আসে বড়,

ফুলিয়া ওঠে উত্তম নদী-জল,

বানের জলে ডুবিয়া মরে আবুল বাসুচর

ভালাজ-বাটার জলের কলকল।

বেবেছিস্যাম নৌকো চড়ে' চলেছ বগুবেণে—

নাহের পাশে বাতাস লাগে দিঠা।

শঙা-তারায় আলোক জলে কালোবরণ কেনে,

জলের বুকে পড়েছে তার ছিটা।

ওবেছিস্যাম ভালের বনে, শিল্প তরা মাঠে,

ধানের ক্ষেতে, পল্লী মাঠে,

বিহু বটের ছায়,

তোষার ছায়া রূপসী কাঁখে যায়।

পেরেছিস্যাম হুঁহু হ'তে তোষার নিবহণ—

মৌমাছিরে গুজরণ

বিজল ফুলে ফুলে

গেদন-বাঁধা পত্র বিল ফুলে।

কল্পবনের 'হুঁহু হ'তে ডাকিলে অম্বরাসে,

কুবর হুয়ে হুঁহু'হু: কুবরি' গেলে বনে

কাপারে শাখা ছুটিয়া এলে ধবিন বাহুর আগে,

শীতল শুট-শুকর ফুলে বসিলে ভূগঙ্গনে।

নধুবতীর ছকুল ছুড়ে' বসিয়া ছিলে তুনি,

বকুলুড় হুঁসিছে ফুলহার।

নিখিল শাড়ি জামাকলে ঢেকেছে বনফুনি,

চাহিয়া ফুৎ শিহরে নদীপার।

তোষার আমি বেবেছিস্যাম শাপলা তরা বিলে,

পদ্মবনে পাতার নীলে,

কোবল ঘাসে ঘাসে,

নাহ না জানা-প্রানের পাশে পাশে।

বেবেছিস্যাম বানের ফুলে বিজন বাসুঙের,

একলা পথে ভিহিৎ খরে।

নিখিল বেশপাশ—

দিনের পেথে এবার অবতাপ।

কাঁজল চোখে নেনেতে ছায়া, ঢেকেছে ইন্ডিকণ,

এনেছ মাঠা, পেগেছে বাহু প্রাবল জনপদে,

বপন লেগে বুঁজিয়া আছে সকল চরাচর

গোছুরী নামে নীরব বন-পথে।

হুজুপালা, বীড়ের পানে ভিহিৎ চলা: পাতী

ঝাঝারে পাখা সহসা ক্ষণকাল,

তোষারে যেহি হরুঙের উঠিল গবে ডাকি'

রুচিল গানে ছুরের মায়ামাল।

সহসা যেহি দিনের আসো বিজেছে নদীকূলে,

আঁধার ভ'রে উঠছে ফুলে

সোনার স্তারা ফুল

ঘুঘর হুয়ে নদী ও নদীকূল।



# ধাতো গাধা কি সিংগ হয় ?

ঐগণাগলদান চৌধুরী

এক

সে বছর বর্ষায় প্রকৃতিক বেন শানবে পেরেছিল। মেঘের  
সে কি আভাস, আর কি গর্জন। বর্ষণও হলো এতটাই প্রচুর যে,  
সামোনের উইকেও তার ছান হলো না—উইকেট উপরে যে  
ছড়িয়ে গিল বিপুল জলধাণি শতদিকে। দুর্ভাগ্যে গিল বেশপণ,  
সেদুর্ভাগ্য; জাঙ্গিরে গিল বাড়ীঘর, জীবজন্তু, এসে তরে গিল চাচার  
কেতী কলস; আগের করে গিল নদী, খাল আর পুকুরং হল।

বাব ভেঙে বেঁচিরে আসা সামোনের একটা চিরকলে বন  
অভ্যাস; কিন্তু সাগরের ত সে বড়ার নয়; নিভেই সীতা' লম্বের  
করে না বলে বং একটা চানাই আছে তার, আর সেও আত-  
খর্বাল তুলে তারের সহস্র কথা তুলে ক'পিঁরে পড়লো বাসার  
কুক। হুতাপা নিশেখ আসে না বলে একটা জনকতি আছে।  
বাসার দুর্ভাগ্যের দিনে টোরা খোল জানা বকম প্রদান পাঠায়  
গেলো। বর্ষের সঙ্গে প্রাচীন, প্রাচ্যের সঙ্গে আকাশ আর  
বোকার উপর শাক ঝাঁট মত আকাশের সঙ্গে আসিয়া নাশাল  
কবিল দ্বিতীয় বিধবুকের সেধা অবদান—বোম্বিন:। ব:ত-  
বালুবে চলেই অদম প্রভিপ্রোদিত। দুদুর্ভাগ্যে বন কবে  
গিল পরাধরের লক্ষ্য—বিজয়ের বহনাল) শান কবিল নিদ্রা  
বহ।

বোম-আনা বকম বনকে ছুদিলেও পেটা হোবেরট হয়ে। হুদেয়  
অচিৎ বলে বেনের পুতরা হোটেট পাচ্ছিল, বদ্যাহুতর পুঁচিগতিয়া  
তালেরও কবিল গো-প্রাণে উত্থব। বোমনিংয়ের স্তব-সস্ত্র  
বান-চাউল, আটা-ঘর, চিনি-মিষ্টি এমন কি পাখুয়ে-কলস  
পথ্যে হাতাবাতি উপাও হলো বাসার খেতে, অচিৎ এ-সব  
জিনিষট চারকপ সনে অজলজ মিলিত—দিশের বাসার।

দুই

বালোর এই দুর্ভাগ্যে একটা লক্ষ্য-করক খটনাই আর বনছি  
এখানে। দুটিব দিন; আশাবের সঙ্গে সমতা থাকতে গিরে  
বিশা-নিজটাও হয়েছিল একটু মাত্রাতিরিক্ত। দুই বন ডালো,  
তখন চাচটে খেতে গেল। দুই কিলির চেয়ে দেখান  
বিধাপ্রদীত অভ্যাস মত আর আর দুহলা তার স্রাট পেটে  
কিছুবে বেরনি বিছানায়। একটা আচাষ কেবাবার এলিগে  
পকে কিছুছিল, আর তার দাসিকা ডজায়ে 'ব্রড কাট' করে  
জানিয়ে ছিল—সে তখন 'কজার ব্যাডা বিলাসে থিতোব।

বিধাতার অনুরূপ নৃতী এই দুহলা। সারা দিন ঘোঁরাছি  
মত দুইকরেও যেমন সিঁচত, তেমনি দুহলাছি মত জনকন  
কমতেও সিঁচত। দুহলাশীর কামোয় মধ্য সন্ধ্যার পাট  
সেবে নিজেব টাউক, পেজিক, আখাষ পাট-পাতারী, কি-চাকরে  
পেজিক-কাজিক তৈরী করে নিয়েও "বহায়েত লুন্সিয়ার আ-  
বিধাব অভ্যাসট কাল্যায় হাংবায় প্রোপ-প্রবিণ, সে যে কি করে  
পাথ তা' আমি ত আমি, বেবতাযও জানেন না।

উপহাট হাততালি বাটুনি খেটে পুপুর বেলা যে একটু নিখাস  
কেনাবে সে সন্তুকে পথিক কোথীর কোঁঠে দেখেনি। শু  
এই ধবিবাবে দিনটাই হু' বণ নিমিটেব মত একটু আভাবোডা  
ভাগবায় জ্বলন্ত পাথ সে। আর তারও ব্যতিক্রম দেখে আশ্চর্য  
হলো—'পূর্জতা বহুমান দুহলা'। তাই তার তরু না জাবিবে,  
পাত-দুখ দুই এসে একটা সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে হাতলহীন  
কোমারটার বসে পড়ল। চোখ দুটো দুটে পেগো হুগুবে  
বাড়ীর আলিঙ্গন-বাহা কুসেব টবগুলির উপর—বোমানে হু' পাঁচটা  
তপাতট ঘোঁরাছি বুপাই উড়ে বোড়াছিল মূগু লজনে। বকিকা-  
গুজন গুজতে গুজতে চট্টাং টেব পেগাব দাসিকা-গুজন খেবে  
গেল। সভবে চেয়ে বেধি, অতি বাস্তব ভাবেই দুহলা সমাণ।  
সমবচ: সিগারেটের ঘোঁরাই এই অকালবোমানে জড় দাতী।  
চাব চোখের মিলন চ'তেই বোণ করে চোখ দুটোকে হুহাতে  
বগতে নিয়ে দুহলা তার বলাব-অশিৎ নীচু পর্দায় ভিজালো  
কলস—দুই ভাগলো ? কখন থেকে ঠার বলে আজি।

মেজালটা বো-বোম নয় বেবে একটু জালিচাই বালিলায়—  
দুটিব দিন, আশাবের মত দুহলাও বহি একটু বেশীট হয়ে থাকে  
ভাতে এমন কি লোখের হয়েও ?

মেঘের কথা হচ্ছে না; বহকারী কথা সমবচন কমতে না  
পারলে মন নির্ভরত যাব কি না তুদিত হলো না ?

দুহলাব কথার গবে অভিব্যক্তন'লভান পেয়ে একটু সাংবদন  
হয়েই জিজ্ঞাসা কালস—দুহলাও নি যে আজ ?

সুপ্তব পেগাব কৈ ?

কেন, ধবিবাবে আবার কুপ্তের অভাব কি ?

বা পোক বাহুব বটে !

কি বকম ?

কি বকম আবার কি ? বহ-সলায়ে কোন বহবট। এখানে ?

ভিক্ষা বেধাব মন্ত মাদ-মধ্যার টাকটা ফেলে দিয়েই ত বাগান তুলি। আমি টেনে সংবাহ বেলায় এই বৃদ্ধলাই।

বৃদ্ধলায় মীন-অভিমান, বাগ-বিধাণের চড়াই-উৎসাহ লগ্নি আঘাত নগ্নপূর্ণ। আভ্যন্তর অভিমানে বৈশিষ্ট্য অস্ত্র কিনে চেয়ে বৃদ্ধের মধ্যে বৃদ্ধ হাঙ্গির পতিতই বলমান—ভাগ্যিণী তুমি ছিলে, তাই। নষ্টলে এই বৈ-ওসিধার নাবাসকে। নৌকা করে বাসচাল হয়ে পড়তো।

অকৃত্যত চাষির গোচাটাকে তৎকালে স্বপ্নানে খণ্ডন করে বিস্তৃপ্ত মধ্যও একই ক্রীতির হাঙ্গির দিয়ে বৃদ্ধলা হাঙ্গির পতিতই বলল—কী আঘাত কীর্ষিমান পুঙ্খ পে। এই ঘেঁষালীপনাব আঘাত হেগোত জুগ মস্তই হচ্ছে যার।

—আহা, ওটা আর কতো না। পেবে কি আঘাতে টানতে হবে আমি ?

—খায়ে; অমন মিনমিন করবে তো সত্যি কিছু জুগে মরবে। তোমার জগৎ কি কম কবাতা স্নাতক হয় ? পাড়ার কীটী মাইগ ত হিংসের চৌচির। আমি নাকি সোহাগিক পাখা ঘানিয়েছি। আমিও বড় গলাইই যদি—খানিয়েছি ত বেশ করেছি, তোমার কি না ? পাখি ত যেহেতু না লাভ পী বুঝে অমন আর একটী।

বৃদ্ধলায় দ্বাখী-দৌরবের বহুত বেধে চেয়ে বলমান—কোকা-মি-মেরও বহিবার বেশপতি বায় দুটি আছে—ঘেঁষেবেহ ডিংগা বস্তপলও দুটি নাই।

—আচাঃ। আর তোমাদের আছে। পাড়ার মুখপোড়ালে জুগেও কি কম বিহ ? বলে কিনা—আমি নাকি ক'নে-বো বেকের ডবল জোহাঙ্গান পেয়ে বাস্তাব্যিক পিতী হয়ে বসেছি। আকুলক ভাণে মিন্বেবেহ, পথের মতের কথা নিয়ে কি বহুত অমন সংগা বের !

অজ্ঞের লম্বোতারণ শ্রীমদ্বৃদ্ধদের নাম ভগ্ন করে' জুগে ছোট একটি হাঙ্গির দিকা বিলিক হুড়াইগা বলিলাম—যা হটে তা কি একেবারে বোলখানা মিথ্যে হয় ? যে দিন পলিগপ্রাণী পেমির সলাল-সাপের তরী তালালায়, সে দিন জুড়িই ত সুখিন-আগান হয়ে হাসে বসেছিল। সে দিন থেকে জুড়ি সাংঘোব প্রকৃতি, আমি পুঙ্খ ; জুড়ি কর্ণবাক, আর আমি বুনি আলস্যের জাল !

আহাঃ, কি আঘাত পাখা তাঁতি রে ! তবু যদি—কবাতা আর বেধে কবলা না, কিছু করে এক কলক চেলে দুটো দুটো হুঁ হুঁ হুঁ দিয়ে বিলে বহবা।

বৃদ্ধলা ছিল ঠিক সেই ধানের মধ্যে, দ্বাখা নিজের মদ-পুঙ্খদ্বাখী অধিকার-সীমার অগ্নি অস্ত্রের তিলমাত্র আশ্রিত্যও বহলাত কহতে পারে না। একটা কালী বহান বলছে, 'এক কালে বহলাত বহবেদ থাকতে পারে, কিন্তু এক রাত্তি চাই বাস্তাব্য জাণা ওয় না।' কবাতা এখানে বাসিকটা আশ্রিত্য হলেও বৃদ্ধলায় মনো-তাওটা বৃদ্ধবার পক্ষে সার্থকতা আছে। তার পুঙ্খদ্বাখী মদ-পাটে সেই সন্ধানী, পৌৰজ্ঞনগ্ন প্রাণগণের মতই উৎসাহকীয়। দ্বাখী যা বাতস্তি যে-ই গোঁক টুকিটাকি কিছু বলতে খেলও 'চক্রেবেশ : বৃদ্ধপ্রবেশ : আশ্রিত্য ক'রে বৃদ্ধলায় বৈবাহ্যিক হটে। নিজের মদ-বাগ, তাই-বোন ছেড়ে সে যে পুঙ্খ দ্বাখী এসেছে, সে কি বৈবাহ্যিকীয় জগৎ ? না,—সে এসেছে যারের দ্বাখী হ'তে—খোল আনা, পুঙ্খগন্ধর। বৃদ্ধলায় বাতস্তি তার মানে আঘাত পূর্ববাসিনী, কানীবাসিনী ; আর আমি ত বৃদ্ধলায় বিনি পদলায় দ্বাখা, কীবেলায়। ফলে বৃদ্ধলাই পুঙ্খের বৈবাহ্যিকের এককটী সন্ধানী। ম'মানে হ'মানে যদি কখনো বহবেদে টাকের পণ্ড না কুলায়, তখনই তবু সে এসে প্রচার মত দ্বাখী গবে পাড়তো। আঘাত করে এক বিধি কৈকিফে, গান্ধে, চট্টলায় গলাগ পু-বলায় কবিগা প্রাণেরদীর্ঘ টাকার আঘাত কবিগা বিজয়িনী পলিত পরি-বিলাসে স্বপ্নানে, কি না তাঁড়ায় বা হৈলে চলে যেতো। তাই বৃদ্ধলায় এই হাঙ্গির ও কলভার টাকা আঘাতেই পূর্বজালায় লম্বই করে দিত বৃদ্ধই প্রাণ কলভার—এখন বলতো, এ মানে আর কত টাকা চাই তোমার ?

বৃদ্ধলা লম্বিকের বোজ কবিল—টাকা চাই কে বললে ?

—না, কেউ বলে নি, তাবলায়, যা মাসি-পণ্ডার মিন—বৃদ্ধলায় সঙ্গে চোখো-চোখি হটেই জিন্সা গুজ হয়ে গেল। বৈবাহ্যিক পুঙ্খদ্বাখী দ্বাখাপাটে টাকের মতই তার দ্বাখানি কলিত—উবিতও। আকুলক মতের এই বৃদ্ধলা। পলকম মতোই নিজেকে সামলাইগা লটল এবং স্ত্রীমালীক মদ-পাটভার দ্বাখার মত জুগ একটী মানে হাঙ্গির আঘাতনী কবিগা কবিল—ই ত তোমার বোয় ; কাছে যেখানেই মনে কব টাকার মতলবে এসেছি। না পে না, সে ভর নই ; আমি এসেছি পোড়ামুখোবে। আঘাত।

—ভাঙ্গা, কবাতা ?

—ই তোমার কটে-দে-পোকানী।

—জাখা আঘাত কি কহলে ?

—কি না কহছে ? চলে গিনি পেবে না, কলভা পেবে না—

এখন বহুত বাহুবলগা না খেয়ে। কহে ত পাবে মনে পোড়ামি, তা বহুত জাণে মিন্বেবেহ ?

—তাতে তোমার বাপ কেন? তোমার বাপ চালা-  
চিনির অত্যাচার নেই? বিচার ছুটিবের মত তুমিও খাচ্ছ আর অর্ধ-  
স্বস্ত পাশ-কথা লুপাহু চা চা "কাপ" করে নিশিঠি পাচ্ছ।

—কাল থেকে ছুটিবের মত ভাঙে থাকেনা, চাচের গোড়াল  
পায়ে না—সকাল চালা আর সোবান চিনি। ছুটি বাড়ুক। কপ্তোলে-  
চালাপাশের চাকের আগরাক পেয়েই তিন মাসের দুখনি চালা-  
চিনি বের রেখেছিলাম। এখানেই তাতেই চললো।

—এখন থেকে কপ্তোলের চালা-চিনিতে চালাও।

—তুমি ক হুজুর করেই খালাস! কপ্তোলের চালা ত চালা নই,  
এক একটা লানা খেন কাশীর কুল! আর উড়া উড়া ইট পাখের  
তর্কি। পাখের গিলতে?

—তাই ত!

—পাখির না বদি, বেড়ির পড় এখুনি চালের খোদাতে।  
মইলে কিছু হুংবলাই অতি বজায় হবে। চা-খাওয়ার এনে শিল্পি,  
খোচেই চট করে বেড়ির পড়।

দুহা বলে কি? পাড়ার ডাকলাইটে আসলে আমি, আমি  
কবো চালায় খোপাত? সতেরে নম্রতম হবে বললাম,—ভালোকে  
আর তাহা আর কতজো কেন? ঠাকুর-ডাককে বলা গে।

—কবেই হাজরে! ঠাকুর-ডাক কবে চালের খোপাত?

তাজব পতিতই বললাম—না, তাহা কেন করবে? আমি  
বোঁ। ছুটি কাবুল-কালাপায়ে খালা-খাওয়ার মতে বাসমতির  
খোপাতে।

—কী বুঝিল! তোমাকে বোঝানো গিবে অসারি। খালা-  
খাওয়া আর ছাট কেনতে ডাঙ্গা ফুলা এই দুটো দুখার  
কপ্তোলের চালাই খাচ্ছে। বাসমতি চাই সাধারণ পুখুরির  
কড়ে। বুঝলে?

আমি দুখা চুলকাত চুলকাত ক্যাল-ক্যাল চোখে বললাম  
—ক্যাল-ক্যাল? কিছু বোঝাও বোঝাও কবি?

—কেন, খোশেন মন-ম্যাজিষ্ট্রেট, উকিল-বোকার, উকিল-  
কম্বারার করবে?

খ্যা! তাইত? দুখা যে পর্বতীয়—গেটট বে-আলম খুলে  
বিলে। উকিলের সচিবই বললাম—ওকিল বলেছে; এত বড় সহজ  
কথাটা এতকণ ঢোকেনি আমিও বোঝা। বাও লম্বাটি, চট,  
করে চাট। নিয়ে এল জো। খোঁচই বেড়িরে পড়ি।

চা-পূর্ণ শেষ হতেই বন চাকার পাঁচখানা মোট এনে হাতে  
তুলে নিয়ে দুখা দুখ মত বিট পলায় দিলি—খ্যা! বদি চিনিও  
কিছুটা এনে। জালা-কাপক বদলিয়ে, মোটকলি কোঁড়ে

তলে তরং কোণ থেকে লাগিগাছটা তুলে নিয়েই  
পতলায় বাছায়।

তিন

বাকীর চব্বায়েট টামেব লাটন—উত্তর-দক্ষিণে। শীতের  
অপহৃত্যু লাভ-করাই বোকাই সাতীভলি চলছে উজ্জ্বল—বহু  
ভাবে। আর লক্ষণেরচলি চলছে খোশ-খোশেরা কী ঘটিকায়েব  
ফুৎ তুলে নিয়ে—কেজাবা সিনেমা আর খেলার মাঠের দিকে।  
সবগুলিতেই আসনফেরে চোরে "পুখুরি" সংখ্যাই বেশি। তা  
হলেও সংখ্যাসিঁইরাই চলছেই পাড়ার মনবে গির্জার—পুখুরি  
বজায় কঃ টাল সাহলতে সাহলতে, আর লম্বাটা চলছেন  
আগিরের বঃ সাংহেবের মত তলুপুঁ হয়ে বনে। আর একল  
খাটী ধোঁকেকে "আকাপুহ" বলা থেকে পায়ে, তীলা চলছেন  
অনেকটা বাহুয়েই মত কুলতে কুলতে পাড়ার আগে, পাশে,  
পেছনে। পুখুরি ছোঁচের মত ত মাথিকেল-কাঁদার মত খাটী-  
মজারি ঠাকুরদিকে যেনে তপকবার ডান্সি, আর শোনার  
পালক-আলা বাহুবিলেব কথা মনে করে হেনেই ছুটিট।

ভিড়ে ভড় করেটা টাম বেড়ে বিরে কঃ ভিড়ের একটার  
উঠে পতলাম। ঝিঁ কি বিজাটেই পতা গেল। প্রথমেই  
একজনের হাতের বাঁটে কেনে পাখারী পকেটটা খেলে গেলো,  
চলমটি মালিকচুত হতে হতে বকা পেতে গেলো। "হুতর" বলে  
নামে পতলাম। সফুখই মার্কেট, তাক্যাম একটাখার বেগেই  
গাই না ছুঁব। সড়ক পায় হুত বাজাবে চুকতেই বেরলাম  
শোভানে খোকানে ডাল, তেল, দুদ, মসলা সবই আছে কুঁঠাব—  
মাই কেবল চালা আর চিনি। একজন বুড়ো খোকানীকে  
জিজ্ঞাসা করলাম—কতটা, বলতে পাব নত চালা কোথায় পাবে?  
খোকানী হাঁসিয়ার লোক। নির্জিকার ভাবে জবাব দিলে—  
চালা কোথায় যে পাবেন? সড়ক আর মোটা, এক লানও কাছো  
খোকানে নেই।

—তা ত থেকেই পাছি। কোথায় গেলে পাবো বলতে  
পারো?  
—না বাঁবু, জব বড়খাটাব, বেলেবাটা "মফলে" খোঁচ করে  
বেগতে পাবেন।

বড়খাটাব, বেলেবাটা চালায় বঃ হেজত বেগতে মার্কেট  
থেকে বেড়িয়ে এসে ছুটি-পায়ে গিঁড়ালাম। খোকানের প্রবর্ণন-  
বাক্যানে মত পড়তেই চালায় বঃ ছুটে গেলো। খোকানে  
খোকানে বজাবিলারের কী বিপদা আয়োজন। খোপা-তপায়  
অবির পাতি, খ্যাকট, টাউল, মপের খোজার চোখ খেন ফুলে

কিছু। এই আকাশের দিনে, হৃদয় বাজাবেও বিলাসোপকরণের  
কি অলঙ্কার চাখি। বোকারে বোকারে ডীপুলা জেতার  
কি ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডি, ঠোণ্ডা-ঠাণ্ডি! দুখ অত গিয়েছে। সনাত-  
শান্তির হালকা আলো ছড়িয়ে পড়েছে—আজার বুক, এখানে-  
সেখানে। বিজ্ঞানালোকের স্রবণের দিনে এই সন্ধ্যাবাগিতি  
কি মধুর, তাহা ভাবার আঁকড়ার নয়—তুই অলঙ্কারীত।

বেলেঘাটা বাঘা মনে করে ট্রামের আশায় গ্রেব মার্শালার  
অনুপে এসে গাড়ীলাম। হেবলার কন হলেও বেড় উঠল মোক  
গাড়ির কাছে ট্রামের গ্রেডীকার; হ' চাখল সাজ হয়ে সূতপাতের  
উপরই উঠু হয়ে বলে পড়েছে। অথচ এত লোকের বাড়ি তুই  
তুলত বানটির লীপালোকের ইলাঘটি পর্যন্ত বসে নিচ্ছে না  
বুড়ি মাদারী পুটিগেবে। গাড়ির গাড়ির আবারও বিকি  
বুড়িল, এমন সময় গুঁহাটোলার উকিল বড়ুটির কথা মনে পড়ে  
গেলো। বড়ুটি যেমন চৌখোল, পলাতক জমিদারের ভ্রমণ।  
বন বড়ুও হয়নি প্রাকৃষ্টি কয়েকজন, এনি মধ্যে নিজেও বাড়ি  
গাড়ী করেছেন। বড়ুদের আকাঙ্ক্ষা আর পত্রের আশা। আর  
বনু বড়ুদের মধ্যেই জমিদারের হস্তে বসছেন। ভাগ্যভাগ  
বাড়ীতেই পেলো। মাগুনী হুঁচক কথা বলেই হিজলার  
বসলার—তোমরা চাল পাচ্ছে। কোথায় বলতে পার?

একটুও ইতস্ততঃ না করে বড়ুদের লগ্নাতে উত্তর করিলেন—  
কেন, নিজের ঘরে?

—নাও, এও একটা কথা হলো?

—নর কিসে? বাজারে চাল নেই; কনট্রোলার চাল  
আমার ব্যান্সেলিয়ার—“বাঁকি”ও বুঝে তোলে না। অথচ খালি  
চাকা আছে, তাহা সকলেই ছুঁবেলা ভরাপেট থাকে। যত চাল  
না থাকলে বেঁচে আছে কি করে?

—এ তোমার মন খুঁজি নর। এখন প্রশ্নবিপদ্য উকিল  
কৌলিনীরাই দাঁতে পারে।

—সহজ উত্তরই দিয়েছি, তুমি বিখাল না করলে কি কংগো  
কলো?

—ভীকিল সিক্তর তুলে ধাওয়া;  
হবির্গটা দিয়ে হাও।

—কী বুঝিল। সত্যি বলছি, ঘরে চালই থাকি। তোমার  
বাড়ী পাখা ম্যানেজার! আবেদী ভেবে ছায়াসের হুঁপ চাল,  
চিনি, কলস—সবই যোগাড় করে দেবহিসেন।

তারি ত বললে। সে ত তোমার বাড়ীরও দেবহিসেন—  
জিন্দা সালের হুঁপসি, ছড়িয়ে গেলো যে।

—তুমিও খেতে দিয়েই তুল বংগে।

—বড় হজ্জি, সত্যি নাই—কুখানি না ত কি?

—বড় ত আমায়েবও হচ্ছে, বিকি কুখানি না।

—তোমার ভাঁড়োটি তা বলে একটি কুখ-খিলে—নিম্নের  
বর্জ-কথা জল বাতায়িতই আবার আমদানি হয়।

বড়ুটি হাসিয়া বলিলেন—বজায় ইউ খরি! ঠিক ঠাওর  
করছে।

—উকিল হলেও তা বলে মজুতগার তুমি?

—হ'লেও কই কংগো। নই—নহাতই চুনো-পুটি।

—বেরত, আমি না হয় তুতো চিড়িই হলো। সন্ধানটি  
বখিলে হাও।

বড়ুটি সত্যে খুঁজাটো একটা ঘরের দিকে চেয়ে—“আজ-  
কালি অম্বর অলস। কানের কাছে বড়ুটি এর অপেক্ষাকৃত মন  
পলায় বলিলেন—ভালক স্যামিচরণের এক বড়ু বেরানি-পণের  
মালিক। এবার ত তুলে ব্যাপারখানি কি?

—বুড়াম, কিং বড়ু কৌতো। সে ডক্টর এসেই, কিং  
বাঁকিয়ার সঙ্গে। শালি নাই, তা আনির তার বড়ু।

—যা হোক কিসে, একটা খোপাত কলো না? সংবর্ধিত  
সহোদরের অন্তরে একটা ভিগেলিট না হয় বুঁতে নাও। ইলিন  
মাছের অন্তরে তার গুহেই বালা-খালা ভাত উঠে যায়!  
পালার অন্তরে পালার সত্ত্বও বাঁচ গায়ে আছে তাকে সেলেও  
বৈধিবে ব্যাপার কেনম হ'লর কলসাল হয়ে যায়।

—তা' হলে চললাম ভাই?

—তা হাও; আমার বাপ-দাদার প্রাইই একটা অসার  
উকিল কর্তব্য। সেটা হচ্ছে—অসারি বনু মদ্যের সারো  
বস্ত্রসন্ধান; তোমার বাড়ীর বাড়ী না থাকলে আদিত মাকটা  
আওড়াই। পাব ত এই মহাজন-বাখাটি বুঝ করে দেখো।

ভাই থাকবে।

বুড়ু বাড়ী থেকে বেহিরে হাফিলন বোড এসে গাড়ীলাম,  
বেখানে ঠায় থাকে। সন্ধ্যা উত্তরে পড়ে; আজ আর বেলেঘাটা  
দিয়ে কোন কাজ হবে না। তার চেয়ে বঙ্গ বড় বাছারে মিন্টার  
বড়ুটির সঙ্গে বেধা করে বাই, চাই কি চালের একটা দুধায়া হবেও  
হুঁতে পারে। শিলালার বিক থেকে ঠায় আসতে উঠে পড়লাম  
এক কল্যাবাসান বকি হুঁজির একটা স্কলার বোড়ে নেমে  
পড়লাম। বড়ু বাড়ীর দ্বায়ে গিয়াই থিরা উপস্থিত হইল  
জিভের বাই কি, না যাই। এক সঙ্গে আই, এ পথার পতি;  
আর এই বিজাইকুর মৌলকেই বড়ু এখন বাসলারের উল্লী।

এক সময়ের লম্বা-পাণী হলেও আবার দূত ছা-পোষা লোকের পক্ষে তাঁর সঙ্গে লাক্ষ্যাতের ইচ্ছাটী নেই। তাই হঠাৎ সে—‘ওহ ভাখনা ছুঁড়ে কেনে চুকে শুল্লাব বাড়ীতে। বেগা হোলে। তবে সে যেন অনেকটা নীচের প্রতি উত্তরে অগ্রসর হই মত। চিন্তিতও পাবলেন, একটু হেসেও অস্থূলীত করলেন; কিন্তু সে হাসিতে আশ্রয় কি আতিথেয়তার আশ্রয় ছিল না—‘ছিন্ন বস্ত্র, সপথ, আর সন্দেশ।’ হাসির সঙ্গে অনেক একটা অগম্য ভাব করে—‘বৈষ্ণবের ভাষার “জিতম” হয়ে ফলাফল আনা চলে।’

—কি রে চাইছো, এ্যান্টনি পরে কি মনে করে ?  
বহুর বরণ-বাসনে আমি তা তেতেই উঠছিলাম। ভাবগান বেশ হৃৎকণ্ঠে তুমিই নিয়ে বেগ হয়ে ঘাই মন মন করে। কিন্তু পরকণ্ঠেই হবিবাবাদীর বতই আলোরঙটা হস্ত করে বললাম—  
হ্যাঁ! ভাই, অনেক দিন পরেই এলাম—বহুত ধারের পড়ে।

একটা অস্বস্তি বিকৃত মুখে স্ত্রী মহাশয় বলিলেন—‘তাইত আসছে সকলে; কিন্তু সে কথা স্বীকার করে না। যেন আমারই অগ্রহের সঙ্গে এসেছে এমন একটা ভাব দেখে, এ কথা সে কখনো পরই পাড়ে আসল কথাটি—‘দালা কি হেলের চাকরী বা টিকাদারীর উদ্দেশ্যে।’

—আমিও সন্দেশ তাকে আনিমি। আমি এসেছি তোমার কাছে—‘বাক্য জিজ্ঞাসে এসেই হোটেট পেরে খুঁজতে পড়লো নতুন মুখে ভাবান্তর দেখে। শান্তিমুখি না হলেও বেশ বুদ্ধিত পারলো, আবার বয়োভাষা বসিত্তার তাঁর লক্ষ্যের ও সামাজিক লক্ষ্যবাহীর সৌম্য সুরক্ষিত না হওয়ায় তিনি বহুতরুই অগ্রহ হতেছেন। একটু অনুগ্রহ দলার জিজ্ঞাসা করলেন—‘তবে তুমি এসেছ কিসের জন্যে ?’

—চালিয়ে গতে।  
চালিয়ে গতে ? আমার কাছে ?  
স্ত্রী বোটার চোখ-মুখের ভাব-ভাষা দেখে ভর হলো, বুদ্ধি বা বিস্ময়, বিস্ময়কে টুকুবা টুকুবা হয়ে ভেঙ্গে পড়ে লজা-শতক, পাভা দুইতলে।

একটু দলব কথার মতলবেই বললাম—‘হ্যাঁ! ভাই, চালিয়ে গতে, আর তোমারই কাছে। যত চাল বাড়িত; বাজারের অবস্থা। ভগ্ন-কথার আমলে চাকার বহুতরুই দিলত; কিন্তু তোমাদের উদ্ভবী আমলে চাকার চালও দিলে না।

স্বামীমহাশয় ঈর্ষাক্ষ হয়ে বললেন—‘কেন কিম্বদ না ? বেশান-কার্ড দানের আছে তোমারই নিষ্কর।

—তা ত বিলম্ব; কিন্তু চালের মাঝে যে-বস্তা বিলম্ব, সেটা খাতি কি না সে খবর রাখো ?

—তা কেনম করে রাখাখো ?

—‘তা’ ধর মাই পারবে, তবে অত ঠাট-ঠাটক করে অমন একটা বে-খাড়া আইন বাড়ি। কহলে কেন ?

—সময়ের আর সময়ের চাপে।

একটু বিস্মিতও লসেই বললাম—‘তা যেন বুঝলাম; কিন্তু লক্ষ্যের চাপে বলে কি কিছুই নেই মগত ?’ কণ্ঠ্যের চাল আনোয়ারেবও অস্বস্তি।

—তা হতে পারে; কিন্তু বেশান-কার্ড আনোয়ারের নামে ‘ইদ্র’ হুজুরি, হযেছে আনোয়ারই নামে। তাঁরা নিজেদেরও বলেছেনও; নইলে লক্ষ্যের বৈমিত্তিক দুহা-তালিকা হবিবাবের ঐক্যবাহিনেও ফলাফল না।

না; লোকটার জ্বর বলে কোন জিনিষই মাই—‘তবু হাত আর থাকেছে জুপ। কথার গুয়ে একটু বিস্মিতও খাব মিলিয়ে বললাম—

—‘তবাবা’ তা নিজেদের; কিন্তু তুমি নিজে, তুমি খাচ্ছা ?

—নিচি হই কি ? ‘তা’ নইলে কতাল-বসীয়েক ইচ্ছাটী বিচি কি করে ? হ্যাঁ, তবে বাড়ি না।

—তবে কি চাল খাচ্ছো ?

—‘বাবানি, কালজীরে, কালজীরে !

—কোথার পাভো ?

মুখে হাসির হাওয়া ওজারীয়া স্বামীমহাশয় বলিলেন—‘দে আমি লগ্ন করে বলতে পারছো না। ও আমার ভিপার্টমেন্ট নয়—বিলেপ হইবে। চালিয়েছেনও তিনি বেশ তোলাই।

—‘তার মানে তোমারও মন্তব্য ?

—‘ঐবানেই তোমার জুল। বহুতলার ভাবাই, বাবা লজা-দরে দাল হ’য়ে উঠে বহু হাড়ে।

—বেশ ত আতিথি করে নিয়েছ কথার কারণে—‘কোনল ?

—‘না নিয়ে কি কহি ? আমি ত আর তোমাদের বহুতলার স্বামী হ’তে চাইনে, আমা। বুদ্ধি কয়েম-মোকররী স্বীখে। কয়েই কথার পাক-পোভ না হ’লে চালবে কেন—? কথি খুঁয়ে চাক-বড়িটার নম্বর বুলিয়ে নিয়ে—কি রে, বসতে চাও নাকি ?

একজন ঈর্ষাক্ষ ঈর্ষাক্ষে আলোপের পর “বসতে চাও না কি ?” যানেই—‘নিকালে।’ ইতিক-ইলাবা নয়, ‘পাট’ আসেন। ট্রে শেতে আমিও বললাম—‘না, বলে আর কি করছো ? ঈর্ষাক্ষ ঈর্ষাক্ষই ত বেশ চালো একজন। আচ্ছা, তা হলে চললাম।

চাঁদ-খড়িটার আর একখান ট্যাঙ্কটা তাই চোখে নিয়ে—তা' এসে। আনবেও এখনি ছুটতে হবে লাটের বাড়ী—ভিনায়ে।

এক বন্ধু ছুটেই ছাফিগান ঘোড়ে এসে নিখোশ ছেড়ে পুরানীন লাভ' করিয়ায়। চতুর্থী কি পঞ্চমী হবে; আকাশের পশ্চিম প্রান্তে একখালি চাঁদের আনন্ড হাসিতে বহুতর ঘুরি চলে গেছে বেগলায় ঠাঁয় আনন্ডের কোন লক্ষণই নেই। বুধা ঠাঁয়ে আনন্ডের সুখ নই না ক'রে হেটেই চলিয়ায় কলকাতার দিক। বানিকীট একতর না একতরই বেগলায় বাই হাতে একটা পশু ঘোড়ে ছুটপাখ বেঁধে একটা মোটর ঝাড়িয়ে আছে। পাকীটকে পেছনে বেলে পাকটাক এদিকে থেকেই গুলিয়ায়—নীলবাসের বাবু, ক-সফার, কলকাতা ? কলকাতার ঠিকই—আনন্ডের পাকীর চাক ডাকেরেব দলা। কিবে এসে, মোটরেরেব প্রদূষ ঝাড়িয়ে জিজ্ঞাসা করিয়ায়—ডাকার যে। হ্যাংবুয়ে 'কন' পাও। বাঃ বেগ ত কনিয়েও প্র্যাঙ্কটপ ? মোটর কনিয়ে বেগবি ! এগলায় খুঁচি হয়ে সাড়ীর দরজাটা খুলে হবে বললে—সাড়ী যাচ্ছেন তো ? উঠে পড়ুন—আমিও বাড়ী ফিরছি।

শীতের রাতে নিশ্চলপিতার আনন্ড অন্ধকারে ছোটো ছোটো খেতে খেতে পথ চলতে গিয়ে ডাকারের আনন্ডটা অনেকটা বের-প্রেক্ষিত মনে করে বেই উঠতে থাকি, অমনি ডাকার—'সাবধান, বেগে উঠুন' বলেই উঠটা জেলে ধরলো। বেগলায় সাড়ীর খোলে তিনটে বজা পড়ে আছে। প্রেরে বাবা বহুতরকে খোলায় কলকাতা বাজিয়ায়, কিছু চাক ডাকার 'হুশ কলন' বলেই হাত গিয়ে সুখ প্রেরে ধরলেন। এই সময় 'সোফার' আর দরোয়ান-গোছের একটা দরোয়ান লোক আর একটা বজা ধরাধরি করে এনে পাকীতে ফুল ফিলে। দুহুর্ভে মাথো একটা বাজিক ব্যাণ্ডার খটে গেলো। দরোয়ান সা' ঢাকা দিয়েছে, লোকের তার আনন্ডে, আর মোটর চলছে হ হ করে ছুটে কলকাতা ঠিক বুঝে। এখান ডাকার সুখ ফুলে, বললে—একটু হলেই একটা কাণ্ড বাজিয়ে-ছিলো পাখ কি ?

—কাণ্ড বাজিয়েছিলো কি বন্ধু ?

বাণিকীসেনে না ? পশু আনন্ডের কি চোখাই কারবারেব আশেচেনা চলে ? অন্ধকারে সা-ঢাকা গিয়ে সোফা-পুলিগ সোফার ওঁত পেতে আছে, তার কি কিছু ঠিক আছে ?

—ডাকারী কলো তাই জানি, চোখাই কাণ্ডেরেব কব জানলে কি আর সাধা বাজার ফুল বধি, না ছুটোছুটি করি উঠার-ওদকাবেব বাড়ী।

—আনন্ডের কি বন্ধুয় তনি ?

—বন্ধুয় ত বত কিছুই। আনন্ডের: কিছু সখ চলে আর মোবরা চিনি হ'লেই চলবে।

—বেগ ত, মিন না ; চলে চিনি ছই-ই আনন্ডের সুখের পড়ে ধরেছে।

—বলো কি ? একলো চলে-চিনি বজা ?

—হ্যা, কতটা চাই ?

—পুলিগান ত কিছু বলে বেননি গিলী, তবু বস ডাকার পাচখানা মোটর নিয়েছেন। হ্যা, হবে চলো বেগ সখ হওয়া চাই।

—তা হ'লে কেনা নবই বিকি এক বজা খাট কাপ্তারি চলে। আর এক বজা চিনি।

—বীচালে ডাকার। নাও এই পকাশ টাকা। কনে জায়ে। ডাকার টর্কেব আলোর মোটরলি বেগ করে বেগে পকেটে রেখে দিল। পাচ খিনিটের মধ্যেই মোটর এসে আনন্ডের বাড়ীর বেগে ধারলো। ঠাকুর-চাকর ডাকতে থাকি—ডাকার ডাকতে দিলে না। নিজে আর মোটরকে ধরাধরি করে ছুটো বজা নামিয়ে বিকিটে মোটর কিবে তেজীটে চুকে পড়লো। মোটরেরেব পথ পেতেই দুহুলা দরবে গলিয়া। তার আনন্ডে ঠাকুর-চাকর চলে-চিনি বজা নিয়ে উপরে চলে বেগলো।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে লোক উদ্যম আনন্ড দুহুলায়। তবু কি আনন্ডই ? পশুয় বেন খেটে পড়তে। পড়পালন উদ্যম করে বললে—এখন জায না এসে, সাধা বাজিয়েছি কি সিংগি বাজিয়েছি। বত সব হিংস্রটের বল।

চলে-চিনিও অমন নাহু-দুহুলা বজাগুলি বেগে দুহুলায় আ। তার সইল না—বজা খুঁজে কল গেলো। একটার দূর খুঁজেই আনন্ডে চাকার করে উঠিল—বাঃ। কি দূষের বন্ধুয় চিনি। তবে সোফার নর, আ হোক সে। বা পেতেই প্রেরে কাক চলে যাবে।

খিজীর বজাটাও খোলা হলো, খুলেই দুহুলা চাকার করে উঠলো—ও বা। একি এনেছ ? চলে ঠেক ? এবেই।

আমিও আঁখক উঠে বলিয়ায়—সই ?

কোন উত্তর না গ'লে, এক তিমুটি চিনি ঘুবে বিকিই সুখ বিকৃত করে বলল—সোডা। বা খটে, কিছুত বটে। হাতে পাখা কি সিংগি হয় ?

# প্রবাসে ভগবান

ঐতর্য্যগোত্রের সোম

( ৩ )

[পূর্ববর্তী প্রবন্ধে আমরা আলোচনা করিছিলাম যে, ভগবানই সৌরী প্রত্যাপাত্তা ( জীব ) হ'য়ে আত্ম-চেতন লাভ বা পৃথক-আত্মিকতা (individuality) লাভেন, অপর কথায় বিধর ভ্রমাবধ মত আত্ম-চািনিত হ'য়েই এই লগ্নাধে বৈজ্ঞান-পূর্বক অবতরণ করেন,— যাহ পূর্ণ পবিত্রিত কলে তিনি সৎ, চিত্ত ও আনন্দের পূর্ণ অবিকারী হ'য়ে তিনি তাঁর স্বভাবে প্রতিগমন করেন। আমরা সেই আলোচনার বৈবেছিলাম যে, বিধর প্রথম উৎপাদে সগায়ে বিচরণের মত এই পার্বত্যমিক অধ্যাত্তের বিভিন্ন জুড়ির উপযোগী প্রত্যাপাত্তার বিভিন্ন বৈধ—ঐশ্বর্য্যবিধের পবিত্রাধার কোণ হ'লনী অবিকৃত। তিনি চিত্তশে ঐ কোণগুলি ঘটনা হ'য়ে এই লগ্নাধে অবতরণ করেন, এখন তাহাি আলোচনা করিমা:—

প্রত্যাপাত্তা সৌরী ভগ্ন অমুপারক সোকে "জ" ও "ঐ" (১) অর্থাৎ ভগ্নবানের মতোই জ্ঞানী ও নৃত্তিশালী; কিন্তু তাঁর প্রকৃতি একম পৃথক, তিনি ঐ সোকেই নিজে অবতরণ করতে পড়েন না। অপর তাঁর প্রাপ্তক অবতরণ করা প্রয়োজন। এই প্রয়োজন সিদ্ধি মত তিনি প্রাক্কর অধ্যাত্তক, মনসৌক ও মনসৌকর উচ্চতম প্রাধে বিহবের উপযোগী বিহবর কোণ, আনন্দবর কোণ ও বিভ্রামর কোণ ঘটনাও মত ঐ ঐ সোকেই এক একটা অবিনবর পদাধু নিবাতন করেন। এই তিনি কোণের সংকৃত মার বৈজ্ঞানিক পবিত্রাধার "কাল-পরীত"। বৈজ্ঞানিক সত্যাত্তার এই কাল-পরীত বর্তিত মলে প্রত্যাপাত্তা সৌরী ভগ্ন অমু ও পরীতের মগে তার সৎ, চিত্ত ও আনন্দ-ভারতক সগায়েও একম ও হ'ত বিকীর্ণ করেন(২)। এইভাবে:

(ক) 'জ্ঞানী যৌ টপানীশৌ'—যেত ১০২

(খ) আমরা জ্ঞান-বিজ্ঞান থেকে জানি, সূর্যের চৌদ্দটিকে ইধর-সমুত বিভ্রাম। নৃত্তিশালী সূর্যের প্রথম স্পন্দনের কলে ঐ ইধর-সমুত যে স্পন্দন উৎপন্ন হয়, তাকে আমরা বলি বর্তি, বা, তাপ-তড়িৎ আর্চ নৃত্ত প্রকাশ করে। সেইসম ইধরের মতোই নৃত্তিশালী ঐ প্রত্যাপাত্তা তার চতুর্দশাবর্তী অধ্যাত্তক, মনসৌক ও অমুতপ মনসৌকর উপাদান মগে প্রথম স্পন্দন উৎপন্ন করেন। ঐ স্পন্দনের কলে তার সন্দর্ভী অর্থাৎ সৎ, চিত্ত, আনন্দ-ভারতক একটা হার উৎপন্ন হয়। তখন উচ্চমণীর বৈধম, বীরা ভগ্নবানের সূরী-ব্যপারে সাহায্য করছেন, তারা প্রত্যাপাত্তার আনন্দ-ভার থেকে নিঃসৃত স্পন্দনভর তৎসমীক সংকৃত করেন প্রাক্কলোভে ঐ অবিনবর পদাধু স্রম বা আনন্দভাবে স্পন্দিত হ'য়ে প্রাপ্তক সগািপনিত্তক প্রকাশ; চিত্তভাবে থেকে নিঃসৃত স্পন্দনভর তৎসমীক সংকৃত করেন মনসৌকর ঐ অবিনবর

পরীত-উপচিত প্রত্যাপাত্তা, অপর কথায়, কাল-পরীতের বিকীর্ণ প্রত্যাপাত্তা ঐ বর্তীত বিলুপ্তর জীবাত্তা, চিত্তাত্তা, পার্বত্যক মর্মে, উর্ধ্ব, দিগদী মর্মে ভ্রমর, সূরীমর্মে সোম ও ইন্দ্রাধ মর্মে দিলু নামে অভিহিত। ইনিই পার্বত্যতা পার্বত্যিকের ইন্দ্রো (ঐত) ও আনন্দের পক্ষে মানব। ইনিই এই নিম্নতর ভিন অমুত বিধর প্রথম বামা আত্ম-চেতনলাভ বা পৃথক আত্মিকতা সিদ্ধ করেন অর্থাৎ নিম্নক ভগ্নবান ও অত জীব থেকে পৃথক মনে করে এই লগ্নাধাত্তক পবিত্ররণ করেন (৩) হ'য়ে লগ্ন্য করেই ইধরি বারহাধর মনসৌকর, "যেমন জ্যোতির্ধর সূর্যের বিধ বন্ধ পার্ধা পনিত হ'য়ে প্রতিবিম্বক প্রভা বিকীর্ণ করেন, সেইসম প্রত্যাপাত্তা ওয়াহিত সূর্যক প্রতিবিম্বিত হন, সেই প্রতিবিম্বই জীবাত্তা" (৪)। প্রতিবিম্ব বিধর নৃত্তিকলি বিভ্রাম থাকে। সূর্যের বিধ আত্ম পাপ্রর পনিত হলে, তাকে যদি বারকের তুলে

পায়াধুর সূকে বা চিত্তভাবে স্পন্দিত হ'য়ে জ্ঞানী নৃত্তিকলে প্রকাশ পায় এবং সৎ তার থেকে নিঃসৃত স্পন্দনভর তৎসমীক সংকৃত করেন অ-তপ মনসৌকর ঐ অবিনবর পদাধু স্রম, বা সত্যভাবে স্পন্দিত হ'য়ে সূরীত নৃত্তিকলে প্রকাশ পায়। তাবপর জীব ঐ ত্রিবিধ ভাবাত্তক বর্তিকলিও একত্র সংকৃত করেন। তখন ঐ বর্তীত ঐ ঐ তিনি নৃত্তিকত নৃত্তিশালী হয়। এইমলে প্রেকাতীত অমুতের সৎ, চিত্ত ও আনন্দ-ভারতক প্রত্যাপাত্তা প্রাক্কর অ-তপ-মনসৌকর সূরীত সৎ চিত্ত ও জ্ঞানী নৃত্তিশালী জীবাত্তাধরে আত্মসংকাশ করেন।

(গ) বৈজ্ঞানিক ১০৬

(ঘ) 'বারাস এং চ'—অমুত ২০৬০ পূর্বধর অতএব উপধা সূর্যকবিধং হু: স্র: ওয়াং সূরীত সাতটীপও মনেন, 'The Ego-man is the image and likeness of perfect Mind, Spirit, Divine Principle.

নিবেশন কর: যাহ, তা' হ'লে সে অতি উৎসাহিত হবে। এই অতি উৎসাহিতা নক্তি তার ছিল না। এই যে অতি উৎসাহিতা নক্তি এই নক্তি সূর্য্যোদয় প্রতিবিম্বিত নক্তি। সূর্য্যোদয় আসে সূর্য্য প্রতিবিম্বিত হ'লে সেই প্রতিবিম্বিত সঙ্গে সূর্য্যোদয় বিবেশ কোন সম্বন্ধ জানা যায় না বটে, কিন্তু এই সঙ্গে সূর্য্যোদয় তাপ গ্রহণ করে বলেই উত্তপ্ত হয়। বর্ণণে শুধু সূর্য্য প্রতিবিম্বিত হয় না—সেই সূর্য্যোদয় জ্যোতিও কতকটা প্রতিবিম্বিত হয়। প্রত্যয়: দেখা যাবে, প্রতিবিম্বিত বিবেশ নক্তি সংক্রামিত হয়। সেই ভর প্রত্যয়স্বারা প্রতিবিম্বিত যে জীবাত্ম, সেই জীবাত্মার মধ্যে প্রত্যয়-গাঢ়তা সহ, ভিন্ন ও মানবতায় বা প্রাপ্তে সন্ধীনী, ক্রান্তিনী ও সন্ধিত নক্তিও প্রকাশ পায়, সেই তিন নক্তি অবতরভাষী রূপে বিদ্যমান, তবে স্বীকৃতভাবে। কারণ উপাধি, যাহা বর্ণা গিরে নক্তিও প্রকাশ হয় (৩) সেই উপাধি নক্তিও পূর্ণ প্রকাশে যাহা হবে। সর্বত্রই এই নিয়ম যে যে-উপাধি নক্তি প্রকাশের সাহায্য করে সেই উপাধিই আবার নক্তিপ্রকাশের অন্তরায়—উপাধি যেন সেই নক্তিও কতকটা সোপান করে। বর্ণণে একক ও সূর্য্য-বর্ণিত পতিত হ'লে সূর্য্যোদয় প্রতিবিম্বিত দেখা যায়, কিন্তু বর্ণণে পতিত সমস্ত সূর্য্যবিম্বিত বর্ণণে প্রতিফলিত হয় না। বর্ণি তা' হ'ত তা' হ'লে সূর্য্য ও প্রতিবিম্বিত নক্তিও ভেদ থাকত না। বর্ণি প্রতিফলিত হওয়ার সময় বর্ণণ কতকটা রক্তি যেন গ্রাস করে। এই ভক্ত বৈশ্বকামো উপাধির বর্ণা বিবেশ নক্তিও প্রকাশ হয়, তা' তার সীমাবদ্ধ প্রকাশ-পূর্ণ প্রকাশ নয়। এই ভক্তই প্রত্যয়স্বারা ঐ তিন নক্তি বা ত্রিবিধকোণ আন্তরিককোণে বিস্তারনের কোণের সাহায্যে জীবাত্মার মধ্যে প্রকাশ পায়, সেই তিন নক্তি জীবাত্মার মধ্যে সীমাবদ্ধ প্রকাশ, পূর্ণ প্রকাশ নয়। তাপনি জীবাত্মা প্রত্যয়-গাঢ়তা সহনক্ষমশালী। এবেশ মধ্যে উপস্থিত ভেদ ত্রি-বাক্যভেদে নাই। যেমন বর্ণণে সূর্য্যের প্রতিবিম্বিত দেখা যায়, সেই প্রতিবিম্বিত সূর্য্য থেকে ভিন্ন নয়, সেইজন্য জীবাত্মা প্রত্যয়স্বারা থেকে ভিন্ন নয়। ইনি প্রেক্ষাকর্তীভাষ্যভেদে প্রত্যয়স্বারা। পাছে জীবাত্মাকে নক্তিহীন ও প্রত্যয়স্বারা থেকে ভিন্ন বলে ভয়

হয়, সেজন্য কঠিন-উপনিষদের যদি তাৎপর্য্য বলেছেন, “এই কর্তৃকসত্তোক্তা প্রাণাধির বিবাহক জীবাত্মাকে বিনি আশ্রয়: থেকে নক্তিও কালভেদে ইচ্ছা: প্রাপ্ত, তিনি সেই প্রাপ্তের তৎসম অন্তর প্রাপ্ত হয়—ইনিই সেই তৎসম” (৩)।

প্রত্যয়স্বারা প্রাপ্তক অবতরণ এখনো লাগু রহি। তিনি জীবাত্মারূপে আত্মসংকাশ ক'রে কেবল আত্মসংকাশ পূর্ণাঙ্গ অবতরণ করেছেন। এখনো তাঁকে তপ বসন্তিক ও তুলসীকৈর বর্ণা গিরে অবতরণ করতে হবে এই তুলসীকৈর, কারণ যাহা চেতনার পূর্ণাঙ্গ হয় এখান থেকেই। “যেমন উচ্চ চেতন নিয়ো” এই অবতরণ উপলক্ষে জীবাত্মা তপ বসন্তিক ও তুলসীকৈর বিবাহের উপযোগী মানসবৈশিষ্ট্য, কামবৈশিষ্ট্য ও তুলসীকৈর—মনোবৈশিষ্ট্য, প্রাণবৈশিষ্ট্য ও অহরবৈশিষ্ট্য কোণে চেতনা ভক্ত ঐ ঐ কোণের অর্ধাঙ্গ রূপে অস্তিত্বের একটী, অস্পষ্টত্বের একটী ও ভিত্তিত্বের একটী অধিনায়ক পূর্ণাঙ্গ—পূর্ণাঙ্গাচার্য্যের পতিতাবস্থা “ভূতবৃত্ত”-নির্ভর্য্যন করেন। তাৎপর্য্যে যেমন-নক্তি সাহায্যে ঐ কোণ তিনটী গঠিত হ'লে, জীবাত্মা ঐ কোণ তিনটীর মধ্যে তাঁর অবস্থানিত সন্ধীনী, সন্ধিত ও ক্রান্তিনী নক্তিও সন্ধিতের বর্ণে একক ও বিকীর্ণ করেন। ঐ তিন কোণে বিকীর্ণ জীবাত্মার রক্তিই বিম্বিত হ'লে জীবাত্মা (৩) ইঙ্গলমধ্যেই নকল্, বিদ্যে বর্ণে জেবেল, বৌদ্ধবর্ণে অনাবা নামে অভিহিত। ইনিই শান্তাত্মা বার্মিনিকের Personality। এই তুল ভগতে “মানব” বলেই আমরা যা ভূক্ত ইনি তাই। জীবাত্মা যদি চিত্তভাগ হয়, এই জীবাত্মা তাৎপরে চিত্ত-ভাগ্য (৩)। জীবাত্মার অন্তর্নিহিত সন্ধীনী, সন্ধিত ও ক্রান্তিনী নক্তি, যা উত্তরত: তিনিসোকে বিম্বিত অতি হিন কোণের বর্ণা গিরে প্রকাশ পায়, সেই তিন নক্তিই এই নিমিত্ত তিন সোকে মনোবৈশিষ্ট্য, প্রাণবৈশিষ্ট্য ও অহরবৈশিষ্ট্য (মানসবৈশিষ্ট্য, কামবৈশিষ্ট্য ও তুলসীকৈর) বর্ণা গিরে বর্ণা (ইঙ্গা) নক্তি, ক্রান্তিনী ও ক্রান্তিনীভেদে প্রকাশ পায়। এই তিন নক্তি জীবাত্মার বাস্তবিকী (৩)।

যেটী কথা, ভগবানের আশ্রয়ণী সন্ধিত-মানবাত্মিক প্রত্যয়স্বারা

(৩) বিনা উপাধিতে নক্তিও প্রকাশ হয় না। যাহাও বর্ণণনক্তি, প্রাণনক্তি ও বাক্যনক্তি আদি বিবিধ নক্তি আছে। কিন্তু যদি শুধু উপাধিভিত্তিক, বর্ণণনক্তি ও কঠিনাভি ভেদন করা হয়, তা' হ'লে ঐ নক্তি তার বিদ্যমান থাকলেও প্রকাশের উপাধি অভাবে তাবৎ প্রকাশ হয় না—সে অন্ধ, বহির ও দূর থাকে। প্রত্যয়স্বারা অন্তর্নিহিত পতিতগির প্রকাশের ভক্ত তাঁর উপাধি (সেই) গ্রহণের আব একটা সার্থকতা—

(১) য ইন্দ্র কলং বেক আদ্য: জীবনভিকায়।  
উপাধি: ভূতভ্যন্তর ন ততো বিজ্ঞানসত্তা:। এতং বৈ  
তৎ। কঠিনাভি  
(২) অথ বা বা নরীন্দ্ৰ ইজ্ঞাত: স জ্ঞাতাহ ইজ্ঞাতন্—  
যৈহ ৩২  
(৩) যৈবো পূর্ণবৈ জ্ঞাত: এতন্ আত্মতন্—প্র ৩০  
(৪) যাতাবিকী জ্ঞানবপক্তি ৩—







বিধাতাঙ্গের নির্দেশ অনুসারে অত্র সমবেশে শিতাব লবী  
 প্রেরিত চম (৪) এবং তাঁদের অন্তর্ভুক্ত বাংলা প্রদত্ত ও মাতার  
 কৃত্রিম স্থাপিত অগ্রসর কোণের টাইট্রার হার্ড ম্যাগে নির্ধিক হয়  
 সেখানে এই ক্রিয়ারের 'কৃত্রিম' ও অর্ধ ও অংশের  
 'কৃত্রিম' ম্যাগে ফিরা করে, তার কলে তাঁর বিস্তারিত কীভাবে  
 চৌম্বক অগ্রসর চৌম্বক উৎসর্গ করতে পারে, এমন সব  
 উৎসর্গ অর্থাৎ চম এই 'কৃত্রিম' উৎসর্গ করে অগ্রসর কোণ  
 গঠন করে। তখন কীভাবে চম-এর এই অগ্রসর কোণ বাংলা  
 মিডকে আবৃত করে বসানো যাক তাঁর থেকে কৃত্রিমভাবে  
 প্রিজম হয়ে। তাহলে বাংলা বাংলা আবৃত পৃথিবীরে বাংলা  
 করে কর্ম-বিষয়। তর্কত্ব বিশিষ্ট সমস্ত কৃত্রিম প্রদত্ত চম  
 অগ্রসর কোণ প্রদত্ত করেন এবং পূর্বের কামলাক ও বাংলাক  
 কামলাক অগ্রসর করে অগ্রসর করে অগ্রসর করেন। সেখানে  
 কিছুকাল অগ্রসর পূর্ব বাংলা বসন পৃথিবীরে আগমনের হার্ড  
 বাংলা তাঁর চিত্র উৎস হয়, তখন পূর্বের 'কৃত্রিম' বিমলী বাংলা  
 সমবেশিত হয়ে ও পূর্বের অগ্রসর কোণ বিমলী বাংলা মিডকে  
 আবৃত করে এই কৃত্রিমকে আগমন করেন। এইভাবে চমি ক্র,  
 ক্রম ও বাংলাক পূর্বের পত্রায়িত করেন। (৪) প্রেরিত বাংলা  
 সমবেশিত করে প্রদত্ত।

ইহেৎপ চৌক-কৌ প্রত্যাপাত',—বিমি গুণধামের জল, অ-  
প্রাপকর অবিসারী ও বিসেত্রী,—চিমি বেজ্ঞা-প্রোমিত্তি চ'ত  
প্রাপক অবহঃণ ক'ংহাও তত্ত স'ংগেচী তম এবং কীয়াতা ও  
ভুক্তাতা জ্ঞে পুতকু'চিৎ প্রাপক বিগাহেও তত্ত সিংহত, জ্ঞানসহ,  
বিজ্ঞানসহ এবং মানসহ, প্রাণসহ ও অহরহ কোপগ্রণ উপাধিও, ক  
প্রণ কয়ে। কিন্তু এই উপাধি সঙ্গার্গের কলে তিনি অস-  
বিস্তৃত চ'তের সংগেও তত্তে অবহিত করেন।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

আত্মীয়-বন্ধনহীন নিঃশিক্ষিত বৃদ্ধকে আমিই  
তাড়ানুহঁৎ গৃহ হ'তে। যাগুতী ঠাকুর ও আমার বানী  
—তাকে অপমান করলেও এরকম করে—তাকে গৃহ  
হতে তাড়াবার কথা হয়তো ভাবাও তাহেন নি।

যত্ন সহায়তা ও অত্যন্ত যত্ন করতেন, আমার  
মনে হয়, তাঁর প্রিয় হঠাৎ মৃত্যু না হ'লে তাঁর কত কোন  
কথা হত।

নিজের পুত্র তাঁর কোন আশা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেনি।  
তিনি স্বয়ং অত্যন্ত জ্ঞানী ও বিদ্যাহুগামী ছিলেন। কিন্তু  
তাঁর পুত্র কোনরূপে আদর্শ, এটা পাশ করলেও যি, এ-র  
আর আর কোন রকমেই অতিক্রম করতে পারেন নি।  
সুতরাং যত্ন সহায়তা বতীন ঠাকুরগোত্র বিদ্যাহরণে  
অত্যন্ত তৃপ্তি লাভ করেছিলেন। তিনি স্বয়ং অগাধ  
শক্তিধর আদিকারী হলেও কখনও বিলাসিতা, অসিত্যাস  
নয় করতেন পারতেন না। এ বিষয়েও তাঁর পুত্র তাঁকে  
নিরাশ করেছিলেন। সুতরাং বতীন ঠাকুরগোত্র পরলতা,  
শিষ্টাচার, বিদ্যাহরণ ও অত্যন্ত শৃঙ্খলিত তাঁর প্রতি আকৃষ্ট  
হয়ে পড়েছিলেন। তিনি তাঁকে নিজের মনের মত করে  
গড়ে তুলেছিলেন। আমার স্বর্গতে যত্ন সহায়তার এই  
অভিযোজনা পাত্রকে আজ তাঁরই গৃহ হতে তাড়ানু  
আমিই।

বতীন ঠাকুরগোত্র অকৃত্রিম প্রীতি ও প্রভাৱ প্রতিপাদন  
আমি নিম্নে এখনই ক'রে।

তিনি চলে যাবার পয়ের বিন আমার যাগুতী এবং  
বানী নানা প্রকারে আমাকে উত্থাপন করে তুলতে লাগলেন।  
অবশেষে আমি তাঁদের বলতে বাধ্য হনু—“আপনার  
তাকে যে-রকম অপমান করছিলেন, আমার আর মত  
হল না। আমিই তাঁকে এই গৃহ ত্যাগ করতে সমর্থ  
দিয়েছি।”

যাগুতী ওমে বজ্রোক্তি করলেন। “যার চোখে  
বেদনী—তারে বলে ভাইনী।”

বানী তাঁর বক্তব্য তুলে রাখলেন যাত্রের ভিত্ত—বেশ

বুদ্ধিমূখ। আমিও মনে মনে প্রসন্ন হ'য়ে বসেছি। তাঁর সঙ্গে  
যাগুতীকে যোগ দেবার ভিত্ত। কিন্তু সে যাত্রা তাঁর পানের  
মাত্রা অধিক হওয়ার বাইরের বাড়ীতেই হাত কাটলেন।

আমি মতীন ঠাকুরগোত্র কথা কিছুতেই তুলতে  
পারিনি না। মতল বুঝতে পারি কোথায় আছে, কি  
করেছে, কিছুই জানি না। কোন বিদ্যেই তাঁর কিছু  
কেন্দ্রীয় থাকত না। আপন-তোপা লোকটি পত্রের মাঝে  
একবার নিজেকে হাতিয়ে ফেলেন তাঁর আর মনের জ্ঞান  
থাকত না। কতবারই তাঁকে এ সম্বন্ধে সচেতন ক'রে  
দিতে হয়েছে।

ইহাণী: লক্ষ্য করেছি, কত সময় তিনি বিম্ব হয়ে গভীর  
চিন্তায় মগ্ন হয়ে আছেন। তাঁর সেই ধ্যানমগ্ন দিবানুভূতি  
আমাকে বড়ই উত্তম: করে তুলত। সেদিন তাঁকে  
ভিজ্ঞান করেছিলাম—“ঠাকুরগোত্র, এত কি তাৎ হুনি  
পাতঙ্গিন পতীর হয়ে?” উত্তর দিবার পূর্বে কাতর মন  
অনেকক্ষণ ছিলেন আমার পানে চেয়ে, তারপর দীর্ঘকাল  
হাস্য করে বলেছিলেন, “আমার পাণের প্রায়শ্চিত্ত কি  
ক'রে করব তাইই লব পুঞ্জি, নানাবাহুকে আমিই বলে-  
ছিলাম তোমাকে এ-গৃহে আনতে। তোমার দৃষ্টিতে মত  
হুম্বর জীবন, আমিই তিনু স্বর্গ ক'রে, এ যুগ কি আমার  
মহলেও বাবে বোধি? কিন্তু বিশ্বাস কর আমার—  
শরৎকালে তানুতন লক্ষ্যিত ও বিলাসী বলেই, সে যে  
এত মত হতে পারে, তা আমি যে স্বপ্নেও ভাবিনি—পার  
ত আমার কথা বজ্রো।” চোখের জল লুকাবার ভিত্ত  
তিনি ক্রত সে স্থান ত্যাগ ক'রে চলে গেলেন।

আমি শুভ হ'য়ে দেখানই এইলুম দাঁড়িয়ে, এত সম-  
বেদনা, ধর্ম বতীন ঠাকুরগোত্র প্রাণে আমার ভিত্ত। তাঁর  
কল্যাণের মত মতের পরিচয় তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতার  
মাত্রা আমার মনর ভিত্তে উঠল।

করদিন পর বতীন ঠাকুরগোত্র স্বয়ং পেশুদ। ৬৬-  
৬৭য়ের হাতে একটা চিঠি দিয়ে গেছেন, আনিয়েছেন  
তিনি চাকরীটি পেয়েছেন এবং আর একটা বেশ  
আপাতত: আছেন। পয়ের মানে আর একটা চিঠি  
পেলুম। আর তাঁর সঙ্গে আমার বেগুয়া ঠাকুর কণ্ঠি,

ডিঙি ছাড়িয়া মাত্ৰ—“তাহার ভণ্ড শোভা করলুম; দুঃখিত হয় না, তোমার ঘোষের ভণ্ড এ জীবনে শোভা করতে পারবে না।”

যতীন ঠাকুরপো আবার স্বামীও গোঁবের মন্থন হ'তে ঘুরে ঘুরে গেলেন তাঁর অন্ধর হ'তে সন্মোহ, ঈর্ষাঃ হুং হলে না। আবার নির্জিগৎ উপেক্ষা যখন তিনি যাব সহ করতে পারতেন না, তখনই যতীন ঠাকুরপোর সহকে বক্তোক্তি ক'রে আবার উদ্ভ্রাজ্জ করে তুল'তেন।

ইতিমধ্যে বাবর অগ্রগতির সংবাদ পেয়ে তাঁর কাছে গেলেন শুভম ক'রবার জন্য। ছ'মাস পিড়ালয়ে লাগিয়ে আস করলুম। এ দিকে আবার সন্ধান জু'মি হ'বার দিনও আগন্তপ্রায়। অম্বু'পিতা, বাড়ীতে স্বিত্তির বদিসা না থাকায় আমাকে বহুরখাতী পাঠিয়ে দিলেন। সংসল শিশি কিছুদিন পূর্বে তাঁর'ে বার হয়েছেন, পাড়ার কচুটি বন্ধার সঙ্গে। ভারতবর্ষ ছুটে গিয়ে এলুম স্বতঃস্ফূর্তে।

জিহবে এসে স্বামী ঠাকুরপো তাঁর পুত্রের কিছু পতিন-বর্জন লক্ষ্য করলুম। আবার প্রতি রের প্রকাশ ক'রবার জন্য সিদ্ধ: আমার পিড়ালয়ের প্রতি ঘোষারোপ করবার জন্য যিক বুঝলুম না, স্বাক্ষরী বললেন,—কি ছোঁয়া হয়েচে বোনা, এই অংগার কি অত বাড়ু'নী সহ, বাচা—

আমি বলছিলাম—“কিছুই বাড়ু'নী তো আমার চর নি—শুধু বাবার কাছটে বসে থাক'র তাজে ঐন্দ পবর. যাওয়াচলুম”—

তাই কি কন কতি বাচা, চল বা চল, উপরে চল। আবার স্বামীও ঈষৎ অজ্ঞবোধ করা কর্কে বললেন, “আসতে পারলে এতদিনে!”

আমি শুধু কর্কেই ভাবা গিয়েছিলুম, তোমাদের সংসার যদি অচল হয়েছিল তা হলে আগে আনতে গেলেই পারতে।”

তিনি বলছেন সূচনা আশঙ্কা ক'রে ভাড়াভাতি বল-লেন, “অমনি রাগ হ'ল. একটা কথাও বল'বার বো নেই।” আমি নীরব রইলুম।

কিছুদিন পর আবার একটা কন্যা সন্তান লাভ হ'ল। স্বাক্ষরী ঠাকুরপো বংশধরের যুগ বর্ধনের দোডেটে আবার

প্রতি সদয় চরচ্ছিলেন, পৌজের পরিবর্তে গৌরীর অম্ম-সংবাদে তিনি কিছু ভুল্ল হ'লেন বই কি।

স্বামীও একদিন ঠাট্টাচ্লে বলেছিলেন, “তোমার বেয়ে, তবে তো এ ‘পাদিন্ত্রী ঠাকুরপ দি সেকেন্ড’ হবে।” আমি যনে যনে বললুম—তপস্বিনের চরণে সন্তান সন্তান, আবার গর্ভে পুত্র-সন্তান ভক্তগত করিনি, কি আমি, যদিই সে পিতার আদর্শে তাঁরই স্বিত্তির সংস্কার হ'তো।

কিছুদিন লংগত শিতটিকে কেন্দ্র করে আবারে জীবনযাত্রা নির্দিষ্টবারে অভিযান্ত্রিক হ'তে লাগল, আবার শিতাও অবনত। মূহ হ'য়ে উঠেছিলেন, তিনি একদিন এসে ঘোঁষিীর যুগ দেখে নাম দিয়ে গেলেন ‘সতী’—

আরও কিছুদিন কেটে গেল। দাদা বিবেশ হ'তে রক্তকাঁধ হয়ে গিয়েছেন।

তাঁর বিবাহ উপলক্ষে আবার করেকদিন পিড়ালয়ে কাটালুম। দাদার বিবাহে যতীন-ঠাকুরপোকে একদান: নিমন্ত্রণ-পত্র পাঠিয়েছিলুম। যোগ্যতের দিন যতীন ঠাকুরপো সকাল সকাল উপস্থিত হ'লেন, সেদিন রবিবার জু'মিয়েই ছিল। সন্ধ্যা বেলায় আমি যখন মৃত্তন বসুকে লাক্ষাতে ব্যত ছিলুম, যতীন ঠাকুরপো সতীকে নিয়ে বেড়া-জিলেন। আবার স্বামী নিমন্ত্রণ লক্ষ্য কর'তে এসে যতীন ঠাকুরপোর কোলে সতীকে লেপে অলে উঠ'লেন। কিছুকণ পরে আমাকে নিরিবিলি পেয়ে বল'লেন, “এইবার বুকেছি বাণের বাড়ীর উপর এত টান কিসের? এটা যে তোমা-দের অভিসার ক্ষেত্র তা বুঝি নি।

তাঁর এই কর্ণা কটুক্তিতে আবার মাথা বেন ঘুরে গেল। “মাগো! এ কি কর্ণা সন্মোহ?” বললুম, “তোমার কি মাথা খারাপ হয়েচে, কি খল'জো কাকে বল'ছো একটু মাজাজান থাকে না?”

তিনি “থাক থাক, চের হয়েচে, আর লেকচার বাড়'তে হবে না”—বলেই বাহির বাটী অভিমুখে চলে গেলেন। পরের দিনই আমি গিয়ে এলুম, বৌদি ডেলোমাত্র, নিমন্ত্রি-ভদ্রা কর্কে কতবার অম্বুরোপ ভাষালে, “আর দুটি দিন থেকে যাও ঠাকুরপি,” কিন্তু স্বামীও দূর্বাক্যে আমি তখন বুঝি প্রততিব ছিলুম না। নৌদিও অম্বুরোপ, দাদা: এং

যাবার আদেশ উপেক্ষা করে এসে এলুম, “বাঁকবার উপায় নাই” খাতীত অল্প কোন মুক্তি দেখাতে পারলুম না। কিন্তু এগে অবধি আমিওকে যতদূর সম্ভব এড়িয়ে চল্লাম, তার সঙ্গে কথা বলবার প্রবৃত্তি আর ছিল না।

কোনরূপে দিন কেটে যায়, দড়ীকে নিঃশেষে দিন কাটান সম্ভবপর হয়ে উঠল, নতুবা কি যে করতুম তা ভেবে ক্লমকিনারা পাই না।

সংসার, আচার-বিধির শাসন দন আর মানতে চায় না। জ্বর হয়ে ওঠে বিরোধী।

আমার মহাব্যবের দাবী এতদিন করে দুটিয়ে বেবে গুলায়—আমার স্বাধীন নত ব্যক্তি, যার আছে গুণ নারীত প্রতি কার্য লিপাসার তত্ত্বতা, নাই তাতে দরদী প্রাণের “অধুত” ও তাবের আদান-প্রদানের সজীব সরসতা। বিধাতার বিধান মানি না আমি, মানি না অদৃষ্টের লিখন! মানুষই গড়ে তুলবে নিঃস্বের অদৃষ্ট, অদৃষ্টের বন্দীত্বের কেন হইব বনন-শীল মানব? বিরোধী অস্তরের ভীত বহন আমার সম্ভাবন-বৎসল বেধেণীল জ্বরবেগে বৃষ্টি বা করে তোলে নীরস, নির্জীব্য, অস্তরের নিত্য-বন্দ, আমার দন হরে উঠেছে আশাহীন, অস্বকারবহ।

এই সদয় শিতার মুকূটে অস্তরের এ অস্বকার আরও বন্দীত্ব হয়ে উঠল, আঘাতের পর আঘাত পেয়ে আদার অস্তর হয়ে উঠেছে সাহায্যের স্তায় নীরস, শুক।

এ অতিপশু ব্যর্থ জীবনে সতীই একমাত্র বন্ধন, তার মুখের বা ভাক দিল্প করে তোলে আমার চন্দ্র, বাধুর্ষ্য এনে দেয় ভিত্ত প্রাণে, অধীর চকল জ্বরে যোগ্য বৈধা, শক্তি।

আমার ব্যর্থ জীবনের অতিশাশের ভাগ বৃষ্টি বা নাগে সতীর নবীন কোমল জীবনে—এই ছিল আমার একমাত্র আতঙ্ক।

আমার সব আশা-অপেক্ষার অবসান হয়েছিল, এখন আমায় ঐকান্তিক কামনা আমার সম্ভাবনকে এই অমাহাদিক প্যারপার্থিক আবেষ্টনের মাঝে বাহুব্ব করে” তোলা।

সতীর অরগ্রাশন—বাওড়ী-ঠাকুরপ ইজ্ঞা এককণ করলেন—মুইই ঘট করে সম্পন্ন করবেন। আমার যোর আপত্তিতে তিনি কর্পণাত করলেন না—দিন-রক্ষ দেবে

দিন স্থির করলেন—এবং বহু লোক নিরক্ষণ করলেন এতদিনে তাঁর বতীন ঠাকুরপোকেও বনে পড়লো—এখন তো আর তিনি তাঁর দাপারে অরসদেকারী দন!

দাদা-বৌদিও এদেডিলেন। দাদা সতীর অল্প হুঁগাছি কবি এনে লেন, আর বতীন ঠাকুরপো দক একপাতি চেন—ত তোলাল ছোট্ট একটা বকেট, তার বখো মুক্তার ন করে লেখা—“শ”—

সাধাধিন কাছের ভীতে ও হৈ চৈ-এর মাঝে নিঃস্বেকে রাখলুম ডুবিয়ে—রাঙে পদীর ও দন অবসারে গেল অবে,—প্রায় বেহ এনিরে নিম্নমু পল্লার সতীর পাশে। সতীও স্নাত হয়ে পড়েছে গুলিয়ে, তার সাক্ষস্কা বলভারের থোকা গুলে, হাতে বেখেছি দাদার বেগুলা দক কপীলোডা ও গলায় বেখেছি বতীন ঠাকুরপোর বেগুলা হারহড়া। সতীর শুভ ছোট্ট বুকের উপর মুক্তার অক্ষরটি অল্প অল্প করছে।

আম লোকের ভীড়ে বাবী বোথ হয় “পানের” অবকাশ পানি। তিনিও কিছু পরে এলেন শয়ন-কক্ষে। সতীর গলায় চেন্দ্ৰা নজরে পড়তেই তিনি বেব জলে উঠলেন। বললেন, “আমার বার বেগুলা অস্তায়ার হারবানির চেয়ে বেশী ম্যাবান্ তোমার কাছে বতীনের বেগুলা দক চেন-প্রডা! বায় বেগুলা হারবানা তাইই গুলে বেবে দক চেনগাছি জুলিয়ে রাখা হয়েছে বেবের গলায় সোহাগ করে!”

কি অলহা অজ্ঞতা! কটি বাস্তার গলায় ভারী নেবুলেশ বে কতখানি কঠোরক এটুফুও বাকবায় কনতা নাই? না, এ-গুণু ইচ্ছাকৃত বকোক্তি!

আমি নীরব হইলুম, তাতে কিছু তাঁর কোথের উপশন হল না বহু হুঁচিই হ’ল।

তিনি বললেন, “বতীনকে চুপি চুপি নেদস্তর করা হয়েছিল? আমায় জানান হযনি কেন?”

আমি এবার উত্তর করলুম, “আমি কউকেই নেদস্তর করিনি, কারণ উৎসবের আনন্দের উপযোগী আমার বনের অবস্থা নয়। আমার আপত্তি সন্তেও তোমার না এই উৎসবের আয়োজন করেছেন এবং নিরক্ষণ-পত্রও তিনিই পাঠিয়েছেন, স্ততমাং তাঁর কাছেই কৈফিয়ত চাও, কেন বতীন-ঠাকুরপোকে নিরক্ষণ করা হয়েছিল!”

আমি মনে করেছিলাম এতে তাঁর স্নেহের উপশম হবে, কিং হুগ পিক বিশপীত। অতিশয় কষ্ট হয়ে তিনি চিৎকার করে বলে উঠলেন, “আর নিজের সন্তানি কি করতে হবে না! আমি আমি, তোমার সঙ্গে যতীনকে কি করব।” সন্তীকে উপলক্ষ্য করে তোমাকেই প্রাণধারণের দিবে দেখে সে। ঐ ‘স’ অক্ষরই তার প্রমাণ তুমি আমাকে কোনদিনই ভালবাসনি, সত্য করতে পারিনি, কারণ, তুমি ভালবেসেছিলে সন্তীকে প্রথম থেকেই।”

বৈয়ের সহ-শক্তিই বীর গেল একেবারে টুট, আমি বললাম “তুমি বিনাই বলছ—তোমাকে আমি কোনদিনই ভালবাসিনি, কারণ, তোমার মত লোককে আমার পক্ষে ভালবাসা সম্ভব নয়। তুমিও ‘আমাকে’ কোনদিন ভালবাসনি, কামনা করেছিলে শুধু এ নারী-বেহতাকে।

তুমি ভালবাসার কথা তুললে, ভালবাসার অর্থ কি তুমি বোঝে আমি জানি। তোমার ভালবাসা নিজেদেরই ভালবাসার হ্রাসপ্রবৃত্তি, কারণ তুমি চাও আত্ম-হত। এ কানজ ভালবাসার কোনই বুঝা নাই আমার কাছে।

আমি ভালবাসি বই কি বতীন-ঠাকুরপোকে, সে ভালবাসার কানবীর নাম-গড়ও নাই, যাতে শুধু বহরী অন্তরের সংস্কৃতি, আছে সব-কিছোরের সব-আত্মবোধের মুক্ত চিত্তাধারার আশ্রয় এখানে বসে পুষ্টি।

তোমার আভ্যন্তর এই ঘোরস্তর অগম্যনোর পর আমার পক্ষে আর তোমার গৃহে বাস করা সম্ভবপর নয়।”

তিনি তোমাকে অন্ধ হয়ে সন্তীকে গলার চেনটা টেনে ছিঁড়ে দিলেন, সন্তী চোঁচিয়ে কেঁদে উঠল, তিনি চলে গেলেন বহু ছেড়ে। আদিত্য সন্ন্যাসী বন্ধ করে গুণে পড়লুম সন্তীকে বুকে জড়িয়ে—আত্মবোধের এক মুক্তির আনন্দে বন গেল গুণে।

আজ আমি অসত্য, অশুভ ও অস্বস্তির পাশ ছিন্ন করে পা বাড়ানুম সত্য, মুক্তনয় ও দিব্যের পাশে। এ অজানা ব্যাপারের বা কিছুই থাক না কেন আমার অশ্রুতে ভাতে থাকবে না আর এ বিখ্যা-অভিমনের সন্তী

লক্ষ্য। আজ হুঁতে লোকচোর, লম্বা, সন্তোষের মুখল ছিন্ন করে বান্ধবে শুধুই বিবেকের বিচার। আমার বার্ষিকী আবার সার্বিক করে তুলব সন্তীকে জীবনের মাঝে। আমার প্রাণের গান, হৃৎকের হাসি, অন্তরের সাধনা—যা কিছুই মুক্তগলে বিনাশ করেছে বারী, সমাধি ও সন্তোষ, সে সবই আবার হুট করে তুলবে সন্তীকে মাঝে। আমার কর্তব্য কষ্ট সন্তীকে আবার কষ্ট হতে সন্তীকে কষ্টে, আমার গঠের বিলীন হাত-বোঁহা কুটে উঠবে সন্তীকে গঠে। আমার অন্তরের হৃৎ হৃৎগুলি পূর্ণ বিকাশ পাবে সন্তীকে অস্তরে। আমি—এই কবিত্তপ্রায় আমি আবার বেঁচে উঠবে সন্তীকে জীবনে। সন্তীকে জীবনে হবে সাবিত্রীর পুনর্জন্ম।

পরদিন সকালেই গুরুচরণের হাতে দাবার নিকট পত্র পাঠালুম অস্তরের জানিয়ে—যেন তিনি পত্র পাবামাত্র আসেন।

আবার দাবার নিকট কিছুই বলবার লক্ষ্য তোপ করুতে হল না। তিনি এসেই সময়ে বসলেন—“লল, লাবী আমার কাছে চল, এতদিন অনেক কিছুই লক্ষ্য করেছি, অস্থান করেছি, আজ তোমার পত্র আমার সব স্পষ্ট হুঁচিরে দিয়েছে, আমার কর্তব্য সবচেয়ে আমি নিঃসন্দেহ হয়েছি।

একবারে সন্তীকে কোলে নিয়ে বাতুলীর নিকট বিবাহ নিয়ে চলে এলুম দাবার সঙ্গে—বাতুলীর অস্থায়ী, তির্যকার কিছুই প্রাণ না করে।

সাবীর গৃহ ত্যাগ করবার সময় ত্যাগ করে এসেছি সিঁদুর, কোঁটা, নোয়া ও শাঁখ।

সাবীর কন্যাপের চিকণলি বাগের বিখ্যা-অভিমনের বন সাতা দিল না।

দিনের পর দিন কেটে যায়, দুই অস্তরে আমি নিরীকশ করি সন্তীকে ক্রম বিকাশ—তার হাসির, আনন্দের কলকলিত প্রতিধ্বনি এসে লাগে আমার গৃহে—

শিও সন্তী ক্রমে দাবার কোল ছেড়ে প্রবেশ করল তার বেলাঘরের অগতে—তার প্রতিটি বেলায় যেন বহু পিছনে ফেরে আসা আমারই শৈশবের বেলায় পুনর-

স্নিগ্ধ। মুঠ নয়নে আমি যেন বর্ষণ করতুম আমারেই  
শৈশবের ছায়াচিত্র।

তার পর খেলাঘর ছেড়ে, সতী বদল করে' নিল  
নিজের স্থান তার ছোট অগতে। তার নিজাছায়া, সন্তা-  
নিষ্ঠা, ভায়পরায়ণতা, করুণা, মায়া-মনতা সবের মাঝে বেঁধে  
গেই বিগত দিনের ছোট সান্নিধ্যই চিত্তবিকাশ।

বছরের পর বছর কেটে যায়, আমার তপসার প্রত্যেক  
ফল পাই সতীর মাঝে।

যে দিন তার আই, এ, পাশ করার সংবাদ পাই, সে  
দিনের সে আনন্দ অবর্ণনীয়—সেদিন সার্থকতা লাভ  
করল আমার প্রথম বার্ষিকীয়াস। আমার সব মৃত্যু সব  
বিফলতা হার মানল আজ; আজ হতে শুরু হল আমার  
সাক্ষ্যের অধ্যাক্ষা।

আমার জীবনের দিনগুলি নইনে: নইনে: আসছে  
ফুরিয়ে, এ কথা কেউ না জানতে পারলেও আমি যেন  
বুঝতে পেরেছি। পাছে সতীর প্রাণে আঘাত লাগে তাই  
আমি বলি না কাহ্নও কাহ্নে।

বুকের বেনদা দিন দিন চলছে বৃদ্ধি পেয়ে, যেকোন  
দিন হঠাৎ হয় ত বিহার নিতে হবে এই আলোছায়া-বংশা  
পৃথিবী' হ'তে।

বুড়া আমার কাছে বিতীন্দিকান্দী নয়, পত্রম বদনীত।  
আজ সতীকেও ছেড়ে যেতে আমি প্রসঙ্গ, তাপ মাঝে  
যেবেছি আমার বার্ষ জীবনের বার্ষিক্য অবদান, সাক্ষ্যের  
বিকাশ।

আমার এখন একমাত্র কর্তব্য বাকী—সতীর  
চাক্ষুসণো।

সতীর ঠিকুরপোর জীবন আমি বার্ষ করে নিরেছি।  
তার মূক অন্তরের নীরব ভাষা আর আমার অজানান নয়,  
আমার প্রতি তার দয়ী প্রকণাকাত প্রীতি যে তার  
হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করেছে, আমি নিঃশব্দেই জানি।

তার এই একনিষ্ঠা, গভীর প্রীতির প্রতিদান আমি  
যেবে—আমার সতীকে তার হাতে কুলে দিবে।  
সান্নিধ্যই যে সতীর মাঝে পেরেছে পূর্ণবিকাশ, তাঁকে  
যেবে জানিয়ে—তার পর মেবে বিদায় পূর্ণ শান্তিতে  
তাঁয়ের হাথ হ'তে।

এই বিগত সান্নিধ্যর ছায়া চিরন্তনের সরিয়ে দেব পুন-  
র্জাত সান্নিধ্যর নবীন জীবনের হার হ'তে, মনকাত  
সান্নিধ্য-গভীরের মিলনের অন্তরায় হ'তে যেবে না এই  
বার্ষ অভিশপ্ত সান্নিধ্যকে। [ সমাপ্ত

## উন্মেষ

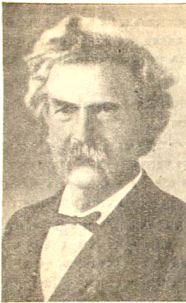
শানমুদীন

তোমার স্বপন আজ সূঁচ হ'ল অনন্তর ভিড়ে  
ফুল হ'ল আজি এই অশ্রুধন জীবির ভাষায়,  
হ'ল মুগ্ধ নিশ্চেষ্ট দলিত যে পথের ফুলার  
আর রঙা যেমনার মাঝার হতাশার ভীয়ে।

দুখাল যে উন্নীলিত আশিত্যায় মেলি দূর তট  
পদাশ্রিত করি যত বাহুবীর আকাঙ্ক্ষার দর,  
কুহিত আশ্রয় লাগি বিদ্বাইয়া বাধা বাহুবীর  
হৃক্তির নিঃশব্দ ফেলি আঁকে তবু ভবিষ্যের পটে।

ওরাও ত' বাহুবীর নহে—নহে জীব দরবীর পরে :  
অকস্মাৎ ভেসে আস: তৃণ-খণ্ড সাগরের কূলে,  
অসিট বক্তের ধারা ক'র মৃত্যু আলোক লতার ;  
তবু ওরা বাঁচিবার স্বার্থ বহু আলোকের ভয়ে  
মেলিয়া আগায় কমল প্রকটিত আশার মুহূলে  
গতিতে নতুন ভয় চাছে সব আলোকের প্রত্যায়।





মার্ক টোয়েন

জীবনে যারা বড় হয়ে ওঠেন—এমন একটা অশাধারণ কিছু খটে তাঁদের জীবনে, যার প্রভাবেই হরত তারো অশাধারণের পর্যায়ভূত হন!

যার কথা আজ বলব, তিনি তাঁদেরই একজন।

১৮৩৫ সালের এক শিশু বয়ে সারা আকাশ আলো হ'রে উঠল কোন অনাপত্ত জ্যোতিষের আভাস। ধ্রুবকেতু পুঞ্জের আলোর ভ'রে গেল সারা আকাশ, সারা দেশের লোক ব্যাকুল হ'রে চেয়ে র'য়েছে আকাশের দিকে, এমন এক রাতে অন্ধ নিল সুসৌরী নদীর তীরে স্কোরিডার এক শিশু!

বেড়ে চলল দিনের পর দিন—অতাবের সংসার, বাবা বাবা হ'রে চলে এলেন পরিবারবর্গ নিয়ে আর এক ঠাই—ভীমকা অর্জনের চেষ্টায়! তার পর বছরই তিনি চলে গেলেন পৃথিবীর মারা কাটিয়ে...আমুয়েল ত্রিভঙ্গ তখন ছুঁত শিশু! বাবার অবর্তমানে দুইনি তার বেড়েই চলল!

সারাদিন কাটে নদীর বুকে তেলার চ'ড়ে। দুলী ভুল নিগ্রোধের একটা ছেলে, পাড়ার ছ' একটা বখাটে

## মার্ক টোয়েন

ঐশক্তিপদ রামেশ্বর

বন্ধ আর নিমেষ কালো কুহুট! সুসৌরী নদীর বুকে ফেলী ইদারংগো বাতায়ত করে। পাশা দিয়ে আক্রমণ করে সেই ইদারকে শিশু অলপস্থায় বল—সেই তেলার চ'ড়ে কাঠের তলোয়ার হাতে। নদীর অল ইদারের গতিবেগ স্থলে উঠেছে, ছোট তেলটা জোতের আশংক পড়তেই ভেমেচুবে হুত্থান হ'য়ে যার; আক্রমণকারী বীর পুত্বেদ বল স'তায় কেটেই পাড়ে এসে ওঠে।

সন্ধ্যার অন্ধকারে আমুয়েল পাঠাল ডিসিয়ে জানালা দিয়ে তিলে পোষাকেই যথেষ্ট চুকে পড়ে! যাইরে যারের পাতের দল পেয়েই মাত ডাক্তে হুক করে—কিন্তু মাথার হাত দিয়ে না ছেলের চামাকা হ'রে ফেলেন। অতিবানে—ছাখে না ঝেঁপেই ফেলেন! সে-বি—কোন বিনাই বাগব হবে না! সংসারের অতাব—যারের চোখের জল—আজ সত্যই কিশোর আমুয়েলকে বিচলিত ক'রে তোলে!

সে বার হ'ল চাকরী করতে! কি চাকরী আর করবে! জাতি সম্পর্কে দামার ছাপাখানা ছিল, সেই-খানদেই সংবাদপত্রে কম্পোজিটারী করতে শুরু ক'ল। “সুসৌরী কোরিয়ার” এ চাকরী শুরু ক'ল আমুয়েল। কিন্তু কোর না পোনে বয়স-কাহিনী!

দুইনি বাবে কোবার। কি একটা কারণে সেখানের মধ্যে প্রতিপত্তিশালী একজন লোক আমুয়েলকে বেশ ধানিকটা নাজানানু ক'রে, এ পর্যায় চেপেই ছিল আকোশটা সে। সুযোগের অপেক্ষা ছিল প্রতিশোধ নেবার!

একদিন সন্ধ্যায় আমুয়েল কাজ করছে এসে, সম্পাদক শ'ণারের কাছে ততালোক ব'স এসেছেন যার বৃত্তি হ'য়ে—হাতে সেদিনকার ‘Missouri Courier’। তাঁর সযত্নে এমন সব আপত্তিকর অপরাধজনক ব'বর প্রকাশ হ'য়েছে, তিনি কোর্টে নালিশই ক'বেন; সম্পাদক শ'ণায় ত অবাক। বসন্ত তাবেন নি এ-সব! কোবার থেকে কি হ'ল!—হঠাৎ ওত্রলোকের মনে প'ড়ে যার

সামনেই ক্রান্তরেলকে বেবে—দক্ষীরতাবে সে কাক  
কবুড়ে—পাশে ব'সে বিখণ্ড সেই কালো কুহুইটা! প'ড়ে  
ওঠেন তিনি; সম্পাদক ন'শায় ন'র নৃতি হ'য়ে এগিরে  
আদেশ;—গতিক গোলমাল বেগে—ক্রান্তরেল সামনের  
জানলা দিয়েই দিল লাফ—পিছু পিছু কুহুইটাও! প'ড়ে  
থইল প্রেস আর সম্পাদক ন'শায়; ক্রান্তরেলের চাকরী  
সেইদিনই 'ইতি' হ'ল।

কিন্তু মাহুণ তাকে হ'তেই হ'বে, যেমন ক'রেই হোক!  
সকাল বেলায় বা দেখতে পেলেন বেওরালে লিখে থেবে  
গেছে ক্রান্তরেল—

—মাহুণ সে হবেই, বা যেন তাবনা না কতে—  
যা দবাণ হ'য়ে বার হুইল ছেলের কাণ্ড দেখে।

হঠাৎ একদিন দেখা গেল তাকে বেশ জাঁকালো  
পোষাকে মিসি দাঁপ নদীর বুকে! যে সব জীমারের সঙ্গে  
পার্সা দিয়ে শিঙ নাবিক কাঠের ভেলা নিয়ে হুই  
ঘোষণা করত, সেমনি এক Steamer-এর Pilot চবার  
অবগণ সে পেরেছে। বড় Steering wheel ব'রে  
চালাবার জাবি সব। বুড়ো পাইলটটার কাছ থেকে  
অনেক বলে কয়ে—হুইলটার হাত দেবার অযোগ্য নয়।  
কিন্তু কখনও করেনি এই কাজ—অগষ্ট হাতে প্রথম  
জোতের বেগে জীমার জ্যান্ডার বহুকের বত পূর্ণবেগে ছুটে  
চলে; চাকটা বেগে বুঝে চলেছে, প্রাণপণে বাঘাবার  
জোতা করে ক্রান্তরেল, কিন্তু তাকেই নিয়ে বড় চাকটা  
পাক দিতে থাকে। ও-দিকে রাস্তার অন্ধকারে গিয়ে  
এক ভড়ার লাগে আর শি। বুড়ো পাইলটটা রেগে য়ে  
তার হাত হ'তে Steeringটা ছেড়ে নিয়ে অকস্মা তাবার  
গালাগালি দিতে থাকে! তার Steamer-এর বাজীরে  
থাকে হৈ চৈ প'ড়ে গেছে। আর্জানাম হুক হ'য়ে গেছে।  
কোন রকমে সে বাজী রক্ষা পায়। বুড়োর বুকে আবার  
হালি ফিরে আসে। অহা ছেলোমাহুণ! বীরে বীরে  
ক্রান্তরেলের পিঠে হাত বোলাতে থাকে—সত্যিই তাকে  
বা-তা বলা অভায় হ'য়েছে! চমৎকার ছেলে; উন্নতি  
করবে জীবনে; নিজে থেকে বুড়ো এবার Steeringটা  
ক্রান্তরেলের হাতে দিয়ে বেনিচে দিতে থাকে! Steamer  
ও চলল টিকমত; রাজার অন্ধকারে চ'লেছে Steamer

কোন গোলমালই হবে না। ক্রান্তরেলের মনেও আনন্দ  
আজ হবে না! খালানীরা নদীর অল মাগছে সামাজিক  
ভাবার চীৎকার ক'রে—"নার্ক টোয়েন—। নার্ক  
টোয়েন—।

তারের হু' বোলা চীৎকার অন্ধকার কুয়াসার নির্জন  
নদীকে স্নানি-প্রতিস্নানি তোলে।

...বিন, মাল, বছর কেটে গেল ক্রান্তরেলের চক-  
গতিতে, মিসিসিপি নদীর সব কিছু তার পরিচিত। তার  
প্রতি দিনের সঙ্গে এদের যোগাযোগ! বিশেষ  
ক্রান্তরেল—আজ পৌঁছনে পা দিয়েছে।

একদিন এক খবর সন্ধান বাচ্ছিল, সেই Steamers;  
তার সঙ্গে আলাপ জমে যায় ক্রান্তরেলের, তার কেবিনে  
বসে বসে গর কবুতে কবুতে ক্রান্তরেল হঠাৎ তার  
টোবলে একটি বেয়ের বড়ো বেগে লোভ সামলাতে  
পারে না অগিরে। তাকে চাইতেও পারা যায় না;  
অগত্যা বোলাব গাপই ক'রে দিল ক্রান্তরেল ছবি-  
খানাকে।

পাইলটের চাকরী পুরোনো হয়ে গেছে। ভাল লাগে  
না। হঠাৎ একদিন কোথা থেকে মন্ডান পেল বহু  
পথেই দুর্গম সকলে পোন; পাওয়া যাচ্ছে। বহু  
বিনকার ইচ্ছা এবার কার্যকরী হবে। Steamer-এর  
চাকরী ছেড়ে দিয়ে বার হয়ে পড়ল ক্রান্তরেল পোনার  
বনির সন্ধান; সঙ্গে এক ভাবেই বত ভাগ্যান্ বহু আর  
বিখণ্ড এক ভাগ্যবাহী বজর। চলেছে তিনজন  
ভাগ্যাহনকানে।

এমন পথ—বজরও সেখানে চলতে চায় না। মাঝে  
মাঝে পাহাড়ের পথে ব'লেই পড়ে। পাহার ভাক  
ভেঙেও জোনাগেল সে না তাকে। অগত্যা পিঠে ক'রে  
মালপত্র নিয়ে হাঁটা দেয়—বজর চলল তারের সঙ্গী হ'য়ে!  
এমনি ক'রে এসে পৌঁছল একটা ভাগ্যবাহী। চালা বর  
তুলে তারের মালত্র ভাগ্যবাহী তার দুই বন্ধ লাগল  
mairat-এর কাজে। ...বিনহাত হুঁবে চলে যদি পোনা  
বয়'হয়। একদিন সব মুখে যেত ক্রান্তরেলের—মাটির  
একটা ক্ষয় ছেড়ে প'ড়েছিল আর কি—! কোন রকমে  
নিজে বেঁচে বার হ'য়ে আসে। বিতৃষ্ণার ত'বে ওঠে

সারা মন। কোথার সোনা—কোথার আকাশের ঢাল।  
'মুত্তোর' বলে সোনার সন্ধান ছেড়ে আবার মাছধে  
অগন্তে রওনা হ'ল হু'জনে।

এইবার মুক্ত হ'ল উদ্ভারের ভক্ত সংগ্রাম! বাচতে  
হবে! সামান্ত একটা কাম্বোজের হিপোটার্কের চাকরী  
কোন রকমে ছুটিয়ে নিয়ে বিন কাটাতে লাগল। মাথার  
অনেক আপাই উঁকি দাড়ে—কিন্তু কানে হ'য়ে ভঠে না।

ও অকলের মধ্যে ব্যাঙের লাকের পান্না নিয়ে  
অনেকেই বাজী ধরে। সেই হস্তাগ্রাণ: বহুতীর কোন  
কাম নাই। দিনকতক আগে পর্যন্ত নিভিল গুয়ারের  
সৌন্দর্যে পেট পুরেছে—ভাবিয়েলও গিয়েছিল বুকে। দিন-  
কতক বেশ বাতির-সন্ধান পেয়েছিল—তারপর বধাপূর্ত্ত  
তথ্য গয়! অগন্ত্য বাল-বিল-কোপে বড় ব্যাঙের  
সন্ধান ক'রে বুকে বেড়াই বহুতীর। অনেক কঠে—তল-  
কা। ভরনের মধ্যে—খুঁজে পেতে পার্শ্বভাগ ক'রে অনেক  
বহুতীর বিশাল এক ব্যাঙ!

ও অকলের দেহা নেতার ব্যাঙের লাক-এর উপর  
হ'য়েছে অনেককেই। বিখ্যাত ব্যাঙ—অনেকবার  
বাড়ী বিতেছে। স্তরাং—তার উপরেই লোকে অনেক  
টাকা রাখছে। যে হারাতে পারবে সেই পাবে!...  
আনুয়েলের বহুতীর নৃতন ব্যাঙ—সুতরাং, তার উপর কেহই  
বাড়ী ধরেনি।

বহুতীর ইতিবৃত্তে প্রতিবন্ধী ব্যাঙের বালিকের সঙ্গে  
বেশ আলাপ জনিয়ে নিয়ে, তার ব্যাঙটা অনেকক্ষণ হ'রে  
নাড়াচাড়া ক'রে দেখেছে। সবত লোক ঠিক ক'রে  
দাঁড়ায়। বাজী মুক্ত হ'ল! আনুয়েলের বহুতীর নৃতন  
ব্যাঙ তিনবার লাফ নেবে নে-বাৎ কম দূর যায় নি। এইবার  
পালা সেই পুরোণো ব্যাঙ বাবাভীর। সকলেই অবাক হয়ে  
বায়, বায়। বাজী হ'য়েছিল তার উপর—তার। মাথা  
চাপড়তে থাকে; ব্যাঙটা এক ইঞ্চিও লাফ নাহতে পারে  
না। লাফ নাহবার জেটা করে কিন্তু সেইখানেই প'ড়ে  
যায়। ঝিতে গেল বহুতীর নৃতন ব্যাঙ। উত্তেজিত জনতা  
পুরোণো ব্যাঙকে রাগের জোটে পায়ে চেপেই ফেরে ফেলে  
—বালিক তখন 'পগার পাথ'।

হঠাৎ আনুয়েল আবিষ্কার ক'রে—এটা বহুতীর

কায়দা! বেখার অছিলা ক'রে বহুতীর প্রতিবন্ধী ব্যাঙ-  
এই পেটে পুরে দিয়েছে এক গান। ছোট পাখর—গান্ধারে  
কোথা থেকে!

এই বিভিন্ন অভিজ্ঞতা হ'তে কোথার যেন একটা  
বুজ আবিষ্কার ক'রে ফেলে আনুয়েল! লিখতে ব'লে  
যায়। গল্পটা লিখ: শেষ হ'লে ভাবে পাঠাবে কিনা  
ইত্তজত: করতে থাকে—! শেষ পর্যন্ত পাঠিয়েই দেয়—  
কিন্তু নিজের নামে নয়! মিসিসিপি নদীর বুকের কথা  
লে ভোলে নি। বালাদীরের জুয়েলা ডাক 'Morb  
Tain' মনে প'ড়ে যায়। হঠাৎ লেখা পাঠান—'মার্ক  
টোয়েন'। চ'লে গেল প্রথম গল্প।

সহসা একদিন দেখে—বলে বলে লোক চ'লেছে সেই  
দুর্ঘম পর্বত-রাঙা—সেখানে নাকি সোনার খনির সন্ধান  
সত্যই পাওয়া গেছে। গাড়ী-খোড়া পথচারীর ভিড়ে  
মাজা চলা অসম্ভব! মাজা করে নতুন আশায় বুক  
বঁধে আনুয়েল আর সেই ভণ্ডবুকে বহুতীর।

ক্রান্ত ঘর্ষাক্ত কলেবরে সেখানে পৌঁছেই অবাক  
হ'য়ে যায়। সেই ভাদে: আরগাতেই যেখানে তারা  
প্রথম বার্ষ পরিত্রম ক'রে ফিরে গিয়েছিল—সেখানে  
উঠেছে নোতুন পিট! পুরোণো দিনরাজি কাছ চলেছে।  
গিরে তখনকার বালিককে বলতেই তিনি হাঁকিয়ে যেন—  
অবজ্ঞার হাসি হেসে!—কোন দাবীই আর ভাবের নেই  
এখানে! এত বড় সম্পদ—পৃথিবীর মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ  
করতে পারত—সেই সম্পদই ছেড়ে বার হ'তে হ'ল তা'  
খিকে আবার সেই পথে!—মিরমাণ হ'বে ফিরে আসছে  
আবার সেই আত্মনার হু'জনে!

খোড়া হ'তে কেনে জিহবে আনাপোবাকেই অকসেসে  
চুকল আনুয়েল।

সেইদিন হঠাৎ তার আর এক অগন্ত হ'তে ডাক  
এগেছিল। প্রথম গল্প যে-দিন নিউইয়র্কে প্রকাশিত  
হয়েছিল, সকলেই মুগ্ধ হ'য়ে গিয়েছিল তার অমৌকিক  
প্রতিভায়। ব্যক্ত-সমস্ত হয়ে এক পত্রিকার সম্পাদক ছুটে  
এগেছেন মার্ক টোয়েনের সঙ্গে দেখা করতে। তার তার  
ক'রে পুঁথোও তিনি মার্ক টোয়েন বলে কোন লোককেই  
পান না; রেগে বলেন, "The world should know

Mark Twin, খেচর একপাশে স্তিমভাণ হয়ে বসে  
ভাবছেন! স্পন্দনর ভীষণেই জিজ্ঞাসা করেন মার্ক  
টোয়েনের সম্বন্ধে। বিস্মিত-ভরা কণ্ঠে তখন সেও ভাবছেন  
—“তিনি না তাকে?”

চেষ্টা করে উঠেন সম্প্রদায়ক—“It's a shame, every  
body should know Mark Twin.”

তার ভবিষ্যৎ বাণী শব্দল হয়েছিল!

ক্রমশঃ লেখা বার হ’তে গাঙ্গল মার্ক টোয়েনের। সাগর  
বেগের শোক উল্লীষ হয়ে চোরে থাকে—কবে পায়ে  
ভাঙা মার্কের লেখা পড়তে! প্রতিভার সম্প্রদায়কদের  
বহুবেশে একটা ভাড়াভাড়ি পড়ে বার—কে তাঁর  
লেখা দিতে পারে পাঠকদিগকে! বিজ্ঞপ্তি-পত্র ভরা দৃষ্টিতে  
বর্তমান সমগ্র-সত্যতার রূপকে সবল স্পষ্ট ব্যঙ্গ করতে  
প্রথম যে সাহসী হ’ল সে মার্ক টোয়েন।

এসমি বিনে West Coast এ টোয়েন পরিচিত হল Bret  
Harte এর সঙ্গে। কথার কথার তিনিই বার করলেন,  
বার লেখে তিনি কথা কইছেন তিনিই মার্ক টোয়েন।  
এতদিন পর্যন্ত বুঝ কব লোকেরই আগলে কে যে মার্ক  
টোয়েন—জানতই না। তাঁরই এচোরে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে  
প্রথম গল্প নিয়ে বই বার হ’ল।

“The Celebrated Jumping Frog of Calaveras  
Country” ইতিমধ্যে নিউইয়র্কে প্রত্যেক বিখ্যাত কাগজের  
পাঠকেই মার্ককে ভালবেসে ফেলেছে। তাঁর অদ্ভুত  
প্লটবন্দী—মায়ুষকে যা হুড় করে, তারই অজ্ঞান বসে  
ফেলেন। Sacramento Union বহুপত্র দিয়ে তাঁকে  
হাতঘাট ধীপে পাঠালেন—“তিনি লেখান হ’তে তাদের  
অজ্ঞত ব্রহ্ম-কাহিনী বা লেখা পাঠাচ্ছেন এই সঙ্গে। ক্রমশঃ  
এরই মার্ককে ভূমধ্যসাগর, প্যালেস্টাইন বাবার বহু  
দিলেন।

প্রতিভার বিকাশ ছয় বেশবিদেশে ভ্রমণের অভিজ্ঞতার  
লেখানকার বনীবী বা শিল্পী প্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ  
যোগাযোগে। টোয়েন তাঁর ভ্রমণ সেবে এসে রচনা করলেন  
তাঁর বিখ্যাত ভ্রমণ-কাহিনী—“Innocence Abroad”।  
এই প্রবন্ধেই কইরে তিনি আমেরিকার সাহিত্যক্ষেত্রে  
বিশিষ্ট স্থান অধিকার করলেন, নানা ঠাই হতে আসতে

গাঙ্গল তাঁর আয়তন। ও-স্তা বস্তার পর বস্তা তাঁর মনে  
দাঁড়িয়ে বস্তুতঃ মনে আচ্ছাদিত হয়ে থাকত। হঠাৎ  
এক সত্যের মার্ক সেখা পান সেই টিনারের দিন কয়েকের  
পরিচিত সেই বড়লোকের হোস্টে; সঙ্গে তার বোনকে  
নিরে মার্ক টোয়েনের সংসর্গ-সত্যতা এসেছে। যেহেতু  
মার্কের চেনা, এরই তব মার্ক ছুরি করেছিল সত্যের কথা  
কথিবার সম্বন্ধ। আবার একদল পর তাঁর সঙ্গে বেনা।

পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হয়ে ওঠে ক্রমশঃ, যাতায়াতে করেন  
মার্ক; কিন্তু নিঃ এলমিরা একজন বড় ধনী, তিনি পঞ্চ  
করছেন না একজন ভগ্নের সাহিত্যিক তাঁর কথার যোগা  
হবে। ফলে একদিন তাঁকে একজন ভ্রমণ করেই  
বাড়ি থেকে উঠিয়ে দেওয়া হ’ল।

গাড়িতে ইঠে বার হয়ে আসলেন তাঁদের বাড়ী হতে,  
সকলের অলঙ্কার—কখন ঢাকার আটকান আসাটা বুঝে  
নিরেছেন মার্ক, কেউ তাকে না, গাড়ী নিঃ এলমিরা বাকী  
বাহিরে আসবার আগেই ঢাকার বার হয়ে পড়ে গেল—  
আর মার্কও লম্বা মাটিতে পড়ে একেবারে অজ্ঞান।  
নেহাত চক্ষুস্বাধার ব্যস্তিরই তাঁকে বাড়ীতে উঠিয়ে নিয়ে  
দাওয়া হ’ল।

কি আর হবে, নিঃ এলমিরা সেপকালে টোয়েনের  
উত্তরের কাছে পরাশ্রিত হয়েই বিদে দিলেন তাঁর সেই  
মেয়ের সঙ্গে। —Olivia Langdon-ই সেপকালে তাঁর  
স্ত্রী হলেন, সে তখন ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ!

এর পরই মার্ক হ’ল অ-ব্রহ্মের পরিবর্তন, বিবাহ ছয় স্ত্রী  
অগ্রভাই হয়েছিল তাঁদের কাছে। হ্যাটফোর্ডের বাড়ীতে  
এসে মার্ক বসলেন পুরোনো সাহিত্যিক হ’লে; বাবার  
সব সম্বন্ধই তাঁর অদ্ভুত কমন, তাঁর এতদিনের সঞ্চিত অর্থ  
এক আশ্চর্য্যের ধরণে টাইপসেটিং মেসিনের গির্হনে খরচ  
ক’রে লোকদান হয়ে গেল। আশঃ করেছিলেন, এরকম  
মেসিনের পেটেন্ট নিতে পারলে বেশ ছ’পয়সা করতে  
পারবেন কিন্তু ত আর হ’ল না, সব কিছু খুইয়েই বসলেন।

প্রাণপণে আবার ভাগ্যের সঙ্গে সংগ্রাম। L. Webster  
ও, তাঁর (Frank) Innocence বই ছাপিয়ে বেশ ছ’পয়সা  
করল, তিনিও গেলেন কিন্তু, কিন্তু সে আর কতদিন,  
মেথতে মেথতে সে কোম্পানীও ফেল দিল।

আজ মার্চের কাছে নয় দ্বিভাষা যেন ভীষণ হয়ে বোঝা দেয়। নানাবিধে পাণ্ডনাথের ভাগিবি, পাণ্ডু নিমি হাতে করে মার্চ প্রকাশকদের দরকার ঘুরে বেড়ান, কিন্তু ভুলও কোথাও অপমানজনক সঠিক বই দিতে রাজী হ'লেন না। হোক দ্বিভাষা, ভুল উল্লেখ না তিনি। ইতিমধ্যে কয়েকজন সাহিত্যিকের সম্মুখে এবং সমাজের বিচ্ছিন্ন কঠোর হওয়া করার ভক্ত প্রকাশক-মহলে তাঁর এই অবস্থা; ভুলও তাঁর সত্যিকার প্রত্যাহার করতে রাজী হ'লেন।

এই অসহন-অভিযোগের দিকে একমাত্র সাধন পেয়েছিলেন তাঁর ভ্রাতৃ কাছ হ'তে, নিজের ছোট ছোট ছেলেরা-বোনের নিয়ে মার্চ গল্প বলতেন—সে গল্প নয়, বিখ্যাত হাক্সারদিক মার্চ টোয়েনের পদাঙ্করের লক্ষ্যনাথ প্রথমজন জীবনী—প্রোতা তিনটি শিখ।

এই কঠিন সময়ে সমাধান বার করলেন তাঁর ভ্রাতৃ; যা কিছু বাকী ছিল সেই বিক্রী করে অল্পস্বল্প হ'য়ে বানোকে পাঠালেন যাবৎ পুঁজিও অবশেষে, হস্ত ভাগ্য পরিবর্তন হ'তে পারে। নিজেই ছেলেরা-বোনের নিয়ে ট্রেনে খানিক বিলাস নিয়ে এলেন।

মার্চ টোয়েন বার হলেন আবার পুঁজিবীর পক্ষে-প্রাচ্যে, ভারতবর্ষ ও তাঁকে বৃত্ত করেছিল। বক্তৃতা-নাথ গল্পে দেশবিদেশের ব্যক্তি-সম্মান স্বপ্নীকৃত করে কিয়দশ নতুন আশাও বৃদ্ধি পেয়েছে। আবার প্রকাশকরা এসেছেন এগিয়ে—জনাবের ব্যাকনোট নিয়ে, আজ বেশ-বিদেশে তাঁর ব্যক্তি; এইও বিক্রী হচ্ছে অল্পস্বল্প বকম, বোঝানোই তিনি বিয়েছেন বৃত্ত করে এসেছেন সে-দেশের বনগণকে। আজ মার্চ হুপ্তিত্ত। বৃদ্ধতা আশা নিয়ে পৌঁছলেন বাড়ীতে, কিন্তু সব অঙ্ককার হয়ে গেল প্রিয়তমা কল্পা স্থি—যে তাঁর ছুঁতনের দাওও গিয়েছিল আশা-মানবের আলো, সে আজ নেই। স্তম্ভিত হয়ে বান তিনি, জীবনে এমন আশাতেই তিনি মুগ্ধ পড়লেন, কিন্তু বাহিরের জাক তাঁকে রেহাই দিল না। কীর্তিমান মগনের ঠোঁট তাঁর অঙ্করের দুঃখ বৃদ্ধলেন না। মোক চাইছে তাকেই। তপস্বান একদিকই দৃষ্টিবকে বেন—তাই মার্চ জীবনে পেলেন সম্মান, প্রভা, ব্যক্তি, কিন্তু নিজ বাঁধার আশা তাঁর মিলিয়ে গেল খুঁনা,

দাম্পত্য জীবন—সংসারিক জীবনটুকু একেবারেই মুছে গেল। যে জীও তাঁকে প্রতিদিনের সাধনার এগিয়ে নিয়ে গেল শিখিলো, সে-ও রইল না। সবকিছুর দ্বারা কাটিয়ে চলে গেল কোন অম্মান: সেপে—যেমন হতে কেউ কোনদিন কেবের নি।

মৃত সংসারেটোয়েনের আর আছে একমাত্র কন্যা সারা।

ব্যক্তির ভরবর তাঁকে নিয়ে চলেছে উর্জলোকে। এ সব আর অবাচিতভাবেই আসে; কিন্তু সারা মনে তাঁর দ্বিভাষা: আজ যেন মনে হ'য়ে ফিরে যেতে আশার সেই ফিরে আসা জীবনের দিকে। তাঁকেই কেন্দ্র করে লিখতে বসলেন কোন এক শিশুর কাহিনী "Adventures Of Tom Sawyer" কি যে অপূর্ণ ছুঁটি—তিনিই জানেন না, খুঁষে পান নিজে, বিনিত্ত রক্তনীর পর রক্তনী চলেছেন গিবে। ছুঁতে পারেন না তাঁর কৃতিমধুর বাণ-জীবনকে—সেই নদীর বুকে ছেলেবেলার সখীপের নিয়ে অল্পস্বল্প, রাজে বাড়ীও প্রাচীর ভিঁয়ে বাড়ী ঢোকা।

তাঁর নিজ ভগ্নে—রাজির অঙ্ককারে বাঁধার পাঠায় সব বেন জীবন হয়ে থাকে। ভাসের কেউ হয়ে নি, সব বেঁচে আছে—সমাইকে পুঁজিওতে অমর ক'রে রাখবেন তিনি।

বেশবিশেষের বনীবোরা স্পষ্টগামী মার্কে আর আর অদ্বৈতা কংতে পারলেন না, Yale University তাঁকে M A L D উপাধি দিল। যুগোত্তীও বার গেল না, পুঁজিবীর বিখ্যাত Oxford Universityও তাঁকে অর্জনা অভিনন্দন। লাল গড়িন পরে জীবনের সেই স্রেষ্ঠ সম্মানের দিনটি ছুঁতে তিনি পারেন নি।

বৃদ্ধ মার্চ একমাথা পদা ছুঁল—সেই গড়িন পরেই মেয়ের বিয়ের দিন পূর্ণ একচোটে ঘুরে বেড়ালেন।

সব কিছুই বদোই মনে পড়ে প্রিয়তমা জীবন। রেডিওর নিক্ত পর্মানিবাসে তাঁর জীবনের শেষ দিন-গুলো কেটেছিল জীবন সাধারণ পাশে। বৃদ্ধ মার্চ তাঁর স্মৃতি-অগন্তের সাননে অমর হয়ে গাড়িয়ে থাকতেন। এ সব তাঁরই দৃষ্ট লোক, তাঁর জীবনের কাহিনী। একদিন এক অপরিচিত বাসকের জীবনে যা ঘটেছিল, তাই ছড়িয়ে পড়ল সারা বিশ্বে, নিজের কাছে সব চেয়ে গ্লান বোঝ হ'ত তাই—

The Adventures of Tom Sawyer  
Life on The Mississippi, Huckleberry Finn—  
বইগুলো। তাঁর রচনায় কোন মতাল নেই, আরে শুধু  
হাস্যরসের 'সুখ' আর 'দুঃখ', তাঁর ব্যঙ্গ-বিদ্রোপ। তিনি  
বলছেন—

—“Any body seeking moral should be shot”

জীবনের শ্রেণিগত অবস্থি নির্দেশে থাকেন নি, ডাক্তার  
বার বার নির্দেশ করা সত্ত্বেও কলম-কাগজ টেনে নেন।  
অসুখ শরীর—স্বাস্থ্য বাবার হাত হ'তে সেগুলো সহ্য  
নয়, আত্মবিশ্বাসের দৃষ্টি সত্যাকার পাইনটাকেও সহ্য  
নিল তাঁর কাছ হ'তে, সবকিছু প্রিয়, সবকিছু আপন আঙ  
কি পর হয়ে থাকে।

তিনি ভাবাত্মিক ভাবে চেয়ে থাকেন, সারা শরীরে  
আজ অবসার। যখন কোন সূর্য পূর্ণিমাত্রী, চাঁদ রাত্রির  
অন্ধকার আকাশে আলো ছুঁতে গুঁঠে, সকলেই সচকিত হয়ে  
যায়, আকাশে দেখা দিতেছে আবার সূর্যকেন্দ্র, আলোকবর  
পূজারের আভাস সারা আকাশে আলোকিত। ডাক্তার,  
স্বাস্থ্য—সকলেই অবাক হয়ে চেয়ে থাকে।

স্বাস্থ্য আত্মবিশ্বাস করে গুঁঠে সারা-ছুটে বাবার বিছানার  
দিকে এগিয়ে যায়।

সার্ক টোয়েন আজ এ অগতে নাই, সব কিছু শেষ  
ক'বে কিরে যেনে তিনি তাঁর সাধনলোকে।

আবার অন্ধকার দ্বিগুণে এল আকাশের তারার তারার।  
এই রাত্রি ছিল ২১শে এপ্রিল—১৯১০।

## পরাদীন কেহ নয়

### ঐশ্বর্যবান সন্তোষাধার

হৃদয় এগেছে, হৃদয় দুঃখ,

বন্দী নই স্বাভাবিক।

হৃদয়ের স্বাভাবিক শ্রম কল্যাণ

কল্যাণ রতে পাখা।

রক্ত দিয়েই রক্তিম উষা

আবর্তা করেছি অথ।

সঞ্চিত নিশা গুণ হয়েছ

পরাদীন কেহ নয়।

ভীষণের পাশ সিন্ধু করেছি

প্রবীণ মেলেছি হেথা।

সুখ শব্দই নিঃশেষে ভোলে

সঞ্চিত সুখ-স্বাধা।

রাত্রির বুকে নুতন বসে

আবর্তা করেছি দান।

নিমিত্ত পুরে ত্রিপুর তেজীবে

প্রভাতের গায়ে দান।

ভীতির মধ্যে বন্দী নই

ভোম্বায় ডাকিয়ে স্বাধা।

অন্ধনে শুধু দর্শন আছে

গাঢ়ায়ে পরিত্যক্ত।

## তরঙ্গ

ঐউনারজন চক্রবর্তী

কলের করতরানিতে ঘুন গাশে শান্তিপেথেরে, ইহা  
তাহার আগাশে পরিণত হইয়াছে। ঘুন হইলে উদয়া  
এবমেই সে মানটা দাখিয়া নয়। একা একা কল ডাখিয়া  
দিয়া শিক্ষণে জান করিতে পারে। হাড়া,  
দশজনের সঙ্গে তাড়াহুড়া করিয়া : নে করিতে ভালোও  
লাগে না তাহার। জান দাখিয়া তাহের কোলোনে বাড়া  
সাঁটটা পায়ে চড়াইতে চড়াইতে সে বাহিরে কিছুক্ষণ  
বেড়াইতে আসে।

বোঝ বেড়াইয়া ফিরাবার মুখে সে বোড়ের তেতলা  
বাড়িটার সম্মুখে 'নাড়াইয়া' থাকে হকারের প্রত্যাশায়।  
হকার তেতলা বাড়িটার দরজা ঠাক করিয়া' কাগজ  
রাখিয়া চলিয়া গেলে শান্তিপেথের বা-হাতে দরজাটা ভিত-  
রের দিকে টেলিয়া' জান হাতে কাগজখানা' ডানিয়া লয়  
এং বিল বাইশ মিনিটের মধ্যে পড়া শেষ করিয়া' কাগজ-  
খানা যথাস্থানে রাখিয়া দেয়। ইহা তত্ততাবিক্ত এবং  
প্রথম প্রথম কঠিনও বাহিত; কিন্তু দীর্ঘদিনের অভ্যাসে  
এখন ইহা তাহার আর তত্ততাবিক্ত বা কঠিনবিগত  
বলিয়া বনে হয় না। কাগজ পড়ার সুখ আছে, অথচ  
কিছিয়া পড়িবার সামর্থ্য নাই। কাজেই এই হীনতাটাই  
সে পীকার করিয়াই লইয়াছে। কাগজখানা রাখিয়া দিয়া  
সে বেসে কিরিয়া আসে।

হরি যোব ষ্ট্রীটের একটি সম্ভার বেস। এই চড়া নুলের  
বাজারে মাত্র হুড়িটি টাকায় ষাওয়া-খাওয়া- সম্ভার  
চুকাইই বলিতে হইবে। হোতলা বাড়ি। শান্তিপেথের  
একতলাতেই থাকে। ঘরে একটা দরজা, জানালা একটা  
আছে বটে কিন্তু পাশের বাড়ির বেওয়ারের দরজা ইহা  
ধাকিয়াও নাই। একতলার ঘরটি একেবারে কলতলার  
উপরেই। সামনেই জানের চৌবাচ্চা। জানের সম্মুখে দরজা  
খোলা থাকিলে প্রানার্থীদের দলের জল ছিটকাইয়া  
আদিয়া ঘরের ভেতরে ভিজিয়া যায়। আবার অল্প সময়  
পড়া এঁটো-কাঁটার চূর্ণক্ষেত্রে দরজা খুলিয়া রাখিবার উপায়  
নাই। কলে, অধিবাসীরা ঘরেই বাতুক আর বাইরেই  
বাতুক, দরজা সর্বদা বন্ধ থাকে।

সেইদিনও যথাসময়ে শান্তিপেথেরের ঘুম ভাঙিয়াছিল,  
কিন্তু আগিয়াই তাহার মনে পড়িল কাগজ বন্ধ।  
কলিকাতার দালা-দালাবায় খবর ছাপিতে বারন করিয়া  
সবসময়ের যে আবেশ জারী হইয়াছে তাহাওই  
প্রতিপক্ষে কাগজ বন্ধ। সে প্রানটা দাখিয়া লইবে  
আবিশেষিত কিন্তু খবরের কাগজ না পাওয়ার অভাবটা  
তাহাকে এমন পীড়া বিতে ছিল যে, সে কিছুতেই এই  
দীর্ঘ দিনের অভ্যস্ত রুটীনের অক্সেপ্টা বাপ খাওয়াইয়া  
লইতে পারিতেছিল না।

তাঁর বেলায় কলের করতরানি তনিত্তে তনিত্তে বাদিল  
খাঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকার যাব তাহার জীবনে একেবারে  
অনুভূত না হইলেও বহুসূক্ষ্ম-অনুভূত। বনে পড়ে,  
কলেজে পড়িবার সময় সে অনেক বেলা পর্যন্ত বিদ্যাহার  
পড়িয়া থাকিত। না এবং ছোটখোনের অনেকদিনের  
ঘুম ভাঙাইবার অনেক প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিয়া বেলা  
নয়টা অবধি বিদ্যাহার শুইয়া শুইয়া কটাইয়া মিথার সে।  
বাধ্যও ভোরে উঠার অল্পকালে বলিতে ক্রটি না করিলেও  
অনেকটা অল্পবেদন করিয়াই ছিলেন, কারণ কলেজের  
সেরা ছেলে শান্তিপেথেরের একটু বেলা অবধি বিদ্যাহার  
পড়িয়া থাকিলে কিছুই আসিয়া যাইবে না—তাহা  
তিনিও জানিতেন।

বাংলায় তখন সম্মানসাধনের যুগ। চারিদিকে সাধের  
নারীর বিভিক। যুবকদের মুখে মুখে বোনা, পিতল, ব্রিডল-  
বায়ের কথা। বক-বল টাউনের ফুল-বাটার চক্রেপেথের  
বাতু নিজেই ফুল-স্টার্টার এবং প্রাইভেট টিউশনি দিয়া এক  
ব্যস্ত ছিলেন যে, ছেলে শান্তিপেথের দিনে দিনে ঘুম হইতে  
ঘুরে সরিয়া বাইতেছে তাহা তিনি টেরও পাইতেছিলেন  
না। শান্তিপেথেরের কলেজের বইয়ের জুপে ছুঁয়াইয়া,  
ক্যানাইপাল, সম্মানের জীবনচরিত নিষ্ঠার সহিত জান  
পাইতে লাগিল, জান পাইতে লাগিল—পথের দাবী, চলার  
পথে প্রবৃত্তি বই। বিশ্বাসহতা বলিয়া নহেন পোঁসাই এর  
প্রতি তাহার আক্রোশ হইয়া উঠিল পৃষ্ঠীভূত।

শান্তিপেথের বেলায় ঝাঁক-ইয়াবে পড়ে সেইবার সে

তাহার বলীয় বাড়ি গিরাছিল—হাসফুতো। যোনের  
 বিরুদ্ধে। হাসফুতো তাই বিপ্রনাথ তখন ফেলের পড়া  
 শেষ করিয়া এম. এ. পড়িতেছিল। বিয়ে উপলক্ষে বাড়িতে  
 শান্তিপেথরের সববয়সী ফেল-বরের অর্থাৎ ছিল না এবং  
 তাহার প্রত্যেকেই ছিল বিপ্রনাথের অধীনে তত্ত্বাধীশ্বর।  
 প্রত্যেক ভাড়াটিয়াদের আহার বস্ত্র নানকরণ করিয়াছিল  
 বিপ্রনাথ নিজের পক্ষ-স্বত্ব। কাহারও বাধা,  
 কাহারও প্রত্যাখ্যান, কাহারও বা সুমিত্রা। শান্তিপেথর বিয়ে  
 বাড়ীতে পাঁচিতেই ফেলবেরেরা তাহাকে বরিয় লইয়া  
 গেল বিপ্রনাথের সন্মুখ এবং তাহারও একটা নানকরণের  
 অস্ত্র বিপ্রনাথকে বরিয়া বলিল। বিপ্রনাথ সূচকি হাসিয়া  
 শান্তিপেথরকে 'নরেন' নামে অভিহিত করিলেন। অস্ত্র  
 ফেলবেরেরের হৈ-স্বরোড়ে সারা বাড়ি সরগরম  
 হইয়া উঠিল। কিন্তু শান্তিপেথরের কর্মস্থল হইয়া  
 উঠিয়াছিল আরক্তিম। সে দৃঢ়ভাবে বিপ্রনাথকে  
 বলিয়াছিল—আপনার নানকরণের আমি প্রতিবাদ  
 করছি, আপনাকে কেন বিষালমাতক নরেনের নামে  
 অভিহিত করিলেন—তা আমি জানতে চাই, নইলে  
 আপনাকে সেওয়া নাম আমি গ্রহণ করতে পারব না।  
 অস্ত্র ফেলবেরেরা তবু বঁচিয়া গেল—কি সর্বনাশ।  
 বিপ্রনাথ মুখে মুখে কথা। বিপ্রনাথ কিন্তু খুসি  
 হইয়াছিলেন শান্তিপেথরের কথার। তাহার শি  
 চাপকাইয়া বলিয়াছিলেন—'নরেন নামটা তো খারাপ নয়  
 শান্তি। নরেন নামে শ্রেষ্ঠ পুরুষ, তা তোমার বন্ধন আপত্তি—  
 তখনও নামে কাজ নেই। একটি নাম আমি তুলে  
 যেমতাদিগার উপযুক্ত ফেলের ক্ষেত্র—বরতো তোমার  
 ক্ষেত্রেই।

তোমার নাম নিম্ন সত্যসত্যি। জানিস সত্যসত্যি কে ?  
 তনেছিল তার নাম ?" খুসিতে মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়া-  
 ছিল শান্তিপেথরের, বিপ্রনাথকে প্রশ্ন করিয়া বলিয়াছিল—  
 "সত্যসত্যি কে আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারি নি, কিন্তু  
 শব্দবাহুর 'পথের দাবী' আমি পড়েছি বিপ্রনাথ। বিপ্রনাথ  
 আনন্দে কোলাহল করিয়াছিল শান্তিপেথরের সঙ্গে।

ইহার কিছুদিন পরেই শান্তিপেথর পুলিশের হাতে  
 বন্দি পড়িয়াছিল। বন্দি পড়িয়াছিল 'হিতমথার দল'।

সে নাকি কোন একটা ডাকগাভী গুঠের ক্ষমতা বেরি  
 ছিল।

বিচারে শান্তিপেথরের ৩৪ বৎসর জেল হইয়া গেল।  
 আকস্মিক আঘাতে যে সেই যে সুমিত্রা। লইলেন—আর  
 উঠিলেন না। যোন মূলতঃ বলমানো নতায় হতই  
 বজ্রাহত বনশ্রুতি চন্দ্রপেথরবাবুকে খিঁচিয়াছিল।

জেলের মধ্যে বলিয়াই শান্তিপেথর মূলতার বিরুদ্ধে  
 সংগ্রাম পাইল—তাঁহার দুই বোকার জন্ম-সংগ্রাম পাইল—  
 আবার পাইল তৃতীয় সংগ্রামের জন্য নিজে গিয়া মূলতাৎ  
 সূচক-সংগ্রাম। চন্দ্রপেথর বাবু মূলতার বিরুদ্ধে বিচার  
 চালী চলিয়া গিয়াছিল।

দীর্ঘ ছয় বৎসর পরে জেল-পেটের বাহিরে পাঁচ বিরা  
 শান্তিপেথর দেখিল এক নতুন পৃথিবী। জেলে খবরের  
 কাগজে নতুনদের হাজিরকোনের কাহিনী সে পড়িয়া-  
 ছিল, আর ক্ষেত্রাবী-আন্দোলনের সঙ্গে হইয়াছিল তাহার  
 চাক্ষুস পরিচয়। সে দেখিয়াছিল ক্যান্টন বন্দি আশ্রিত  
 কারাবাসের আবেশের প্রতিবাদে জাতি-ধর্ম-বল-নির্জি-  
 শেবে আনন্দাত্মের বিরুদ্ধে কি গভীর উত্তেজনা। বিবেচী  
 খালম উৎসাহবনের কি দুনিবার পন! যেখানে এক কোটা  
 বস্ত্র পড়িয়াছে সেখানেই জন্ম নিখোঁজে রক্তবীজের বস্ত  
 প্রতিরোধীদের সংগ্রাম। অতঃপর নয়—সত্য সত্য নাহুদি  
 প্রত্যাপ্রহণ নয়, প্রত্যক্ষ গণ-সেবিত। সেইদিন বর্মণী  
 উচাইয়া বিবেচী খালমতঃ সংগ্রাম করিয়াছিল—  
 ইংরাজ ভারত ছাড়। সেইদিনও এখানে সেখানে আগুন  
 লেগে গিয়াছিল। বোম্বো নোমো হাট হাট করিয়া  
 জলিয়াছিল বিজিটারী দরী। সেইদিনও সার্কেট, জব্বা  
 পুলিশ পাহারা গিয়াছিল প্রত্যেক বস্ত্র হাজার বোম্বো  
 মোড়ে।

সেইদিন তো হিম্মত মুসলমানকে তুণ্য করে নাই,  
 মূলমান হিম্মত অগ্রগতি রোধ করিয়া দাঁড়ায় নাই।  
 সেইদিন তো তাহার একে অস্ত্রের হাতে হাত নিলিইয়া  
 তৃতীয় শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইয়াছিল, উল্লাহীয়া সুমিত্রা  
 খিমেদী ছুঁশত বৎসর রাজত্বের তিত্তি। সেইদিনও দুই  
 তাই একসঙ্গে চাঁৎকার করিয়া বলিয়াছিল 'শাস্ত্রাত্মক  
 জন্ম হোক।'



আর আঁখি! হৃদয়াল বাইতে না বাইতেই একি কণ্ড  
হইয়া গেল! হিলোর লক লক শিখা, ত্রাকুখিগোষের  
সরুনাশা আগনে পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে কলিকাতা—  
সোনার বাংলায় শ্রেষ্ঠ নগরী কলিকাতা, শিকারীর  
কলিকাতা, দীকারীর কলিকাতা—মিলিত হিন্দু মুসলমানের  
কলিকাতা। একই স্থানে মিলিত হিন্দু মুসলমানের নর-  
নারী নির-বুদ্ধের দার্ষণীকভাবে ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল  
কলিকাতার আকাশ-বাতাস। মানুষ কোন এক চরম  
হুমসমানের মুহূর্তে বাড়করের দ্বারদ্বারের স্পর্শে বদমায়ে  
পরিবর্তিত হইয়া গেল। মাতের বুকে কচি ছেলের  
নিজার নাই, ছেলের লম্বা বারের লাহন, নারী-বৈর চরম  
অবস্থানঃ। মানুষ অবহেলার মানুষের গায়ে অংখ্য  
করিতেছে—দা, কুড়াল, কাণ্ডে, বাণা, বাহা হাতের কাছে  
পাইতেছে তাহা দিয়াই। মানুষের তাম্বা রাজ্যে কলিকাতার  
পথে পথে হইয়া গেল বীভৎস হোলিবেলা। অন্ধন  
ছপিতেছে—গ্রাসাদে, বহিতে, পথেপথে। অগ্নিব্রতের  
মর্ম্মন্বল আর্জনার ছাপাইয়া উঠিতেছে আত্মপাক, বর্ম্মব্রত-  
বাসীর কঠোর। আন্ধনের লক লক শিখা বীভৎস  
তাহাদের সুখ-চোখ, বীভৎসতম তাহাদের ধ্বংসের  
উদ্ভাষনা।

কিন্তু কেন এমন হইল, কেন এই দুর্দিন আসিল?  
হিন্দু-মুসলমানের বন্ধের কোথায় লুকাইয়া ছিল কত—  
বাধা ছাড়া বাইতে না বাইতেই বিবাক হইয়া সমস্ত  
সমাজকেই বিবাইয়া তুলিয়াছে?

শান্তিনেত্রের মনে পড়ে—ভাঙ্গগাড়ী লুটের নানালার  
কেন্দ্রী আসারীদেপে সে বখন পলাইয়া পলাইয়া বেড়া-  
ইর্ন্তেছিল, তখন সে এবং তাহার মত আরও অনেকেই বহু  
মুসলমান মাংসানের আদ্রের আশ্রয়ক্য করিয়াছে—বহু

মুসলমান তাইএর সতর্ক দৃষ্টি তাহারিগকে সম্বৎ বিপদের  
হাত হইতে বাচাইয়াছে। সেই সময়ে মুসলমান তাই-  
বোনের গকে মিলিয়া মিলিয়া আবার বাইতায়, সমস্ত  
বিপদ-আপদ বুঝে করিয়া নুতন বিপদের বুঝে কাঁপাইয়া  
পড়িয়াছে। শান্তিনেত্রের ভুলিতে পারে না সেই দুর্দিন-  
বাক্যবদের কথা—ভুলিতে পারে না হানিহার মত মাতের  
কথা—কান্তিহার মত বোনের কথা—আর গহরের মত  
তাইয়ের কথা।

সেইদিন তে। হিন্দু-মুসলমান পরস্পরের বিদ্বেষে  
শাপিত ছুরিকা উঠাইয়া বহিতে পাকিত, তাহারা তে।  
জাহা করে নাই। তবে আজ কেন এমন হইল।

সাম্রাজ্যবাদীদের এই খেলা—তাহাদের এই চক্রান্ত।  
শান্তিনেত্রের আবিতে লাগিল—তাহারা তাইয়ের বিদ্বেষে  
তাইকে উদ্ধারি দিয়া একের বিদ্বেষে অপরকে প্ররুদ্ধ করিয়া  
অন্তবিরোধের দৃষ্টি করে এবং সেই সুযোগ লইয়া তাহারা  
তাহাদের সাম্রাজ্য জীয়াইয়া রাখিতে চায়। গত নভেম্বর  
ও ডিসেম্বর আর কোলনেও রাজ্যের নোড়ে নোড়ে পুলিশ  
ছিল, সার্কেল ছিল কিন্তু তাহাদের মুখে-চোখে আভ্যন্তর  
চিক 'হল সুপারিশ' কিন্তু আজ আর তাকা নাই।

আমাদের ভুলের সুযোগ লইয়া খুঁট সাম্রাজ্যবাদীর  
হল আমাদের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া আক্ষালন  
করিতেছে, সবচেয়ে চমকেটা করিতেছে। কিন্তু—

আবেগে বিহ্বানায় উঠিয়া বলিল শান্তিনেত্রের। আবার  
আমরা নিমিত্ত বইব। আজ হোক, কাল হোক,  
আমাদের মিলিত প্রতিরোধে বিনেশী শক্তির সমস্ত  
এচোটো বার্ষ হইবেই হইবে। উত্তেজনায় লাড়াইয়া পড়িল  
শান্তিনেত্রের। তারপর আকাশের উড়ে চাহিয়া কি বেন  
চীৎকার করিয়া বলিতে চাহিল।



# অতুলনীয়া কল্যাণী

ঐনমিতা ঘোষ

যদিও সাহিত্যে যতগুলি নারী-চরিত্র আছে তাহার তিতর কল্যাণী-চরিত্র অতুলনীয়। কল্যাণী-চরিত্রে অবাণ্ণবতার চিহ্ন নাই। শ্রী, কপালকুণ্ডলা, শাকি, দেবী-চৌধুরাণী প্রভৃতি চরিত্রগুলিকে রক্ত মাংসের মানবী বসিমা মনে হয় না, ইহারা বহিরের স্বপ্নমতী কল্পনাবাত্র। বহিরের প্রথম স্পর্শতা ও অভিমানিনী, হৃদয়বৃত্তিক ও অভিমানিনী বল্য চলে, তিলোত্তমা ব্যক্তিবস্তুনা, কুম্মনিকিনী বাসুপটুস্বীমা, রমা তীক্ষ্ণ ও নির্দোষ, নন্দা স্বাতন্ত্র্যসূচী, বিমলা অতিশয় চটুলা—এইরূপ প্রতিটি চরিত্র বোলে গুণে ভরা; কিন্তু কল্যাণী-চরিত্র অপূর্ণ।

হৃদিকের পটভূমিকার কল্যাণীর সহিত আনন্দের সাক্ষাৎ হয়। প্রথম দর্শনেই আনন্দা হুড় হুড়। কল্যাণী পদচিহ্নের ধনী জন্মিয়ার মহেশ্বরের স্ত্রী; কিন্তু ছিয়ারারের মনওরে ধনী হরিত্রের কোন পার্শ্বক নাই। বিশাল অট্টালিকার জনপ্রাণী নাই; শুণু স্বামী, স্ত্রী ও তাহাদের কস্তাটী। কল্যাণী ধনী গৃহিণী—কিন্তু নিজহস্তেই গো-সোহন প্রভৃতি কার্য করিয়া স্বামী ও কস্তার জীবনরক্ষা করিতেছেন, স্বামী ও কস্তার জীবনরক্ষার জন্য প্রাণপণে শ্রম স্বীকার হানিমুখে করিতেছেন। কিন্তু ক্রমশঃই বিন-পারাপ হইতেছে, কল্যাণী তখন স্বামী ও কস্তাকে বাঁচাইবার জন্য স্বামীকে বলিলেন, “তুমি যেরেটীকে লইয়া পথের বাও।” নিজের জীবন হইতো তিনি ঐ অট্টালিকাতেই বিপর্জন দিতে চাহিয়াছিলেন। স্বামী প্রথমে ধনমৌলভের মত গৃহ ছাড়িতে চাহিলেন না কিন্তু কল্যাণী তাঁহাকে বুঝিবারা বুকাইয়া দিলেন, তাঁহার বুদ্ধিমত্তা দেখিয়া আনন্দা হুড় হুড়। কল্যাণী ধনী গৃহিণী, কখনও পথ হাঁটিয়া চলেই নাই, এই দশবরের দিনে যানবাহন পাওয়া দুষ্কর কিন্তু কল্যাণী বুদ্ধিমত্তা, স্বামী স্বধন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি পথ হাঁটিতে পারিবে কি?” কল্যাণী বলিলেন—“আমি পথ হাঁটিব, তুমি চিন্তা করিও না।” কিন্তু কল্যাণী যদের কথা ভাবিলেন না, তাহা হইলে আর স্বামী ও কস্তার জীবন রক্ষা হয় না—এখানেই কল্যাণীর স্তম্ভিত—এখানেই কল্যাণীর মনঃ পরিক্ষুট হইয়াছে। কল্যাণী মনে মনে

বির কল্পিলেন যে, না-হয় পথে মরিয়া পড়িয়া থাকিব, তবুও ইহারা হইতেন বাঁচিবে। এমন নিঃস্বার্থ ভালবাসা মরজগতে দুর্লভ। পথের বিপদের সময় যেহেতুই অন্য-বিধ, তাহা ভাড়া উপার নাই। এখানে মহাত্মা গান্ধীর কথা মরণ হুত, আত্মিকার হিন্দু-মূলভাবের যে নাক। লাগিয়াছে, যেহেতুই স্বাভিচার হিসাবে মহাত্মা এ তিনিবটী বিপদের সময় ব্যবহার করিতে বলিয়াছেন। বুদ্ধিমত্তা কল্যাণীও বিপদের দিনে আত্মরক্ষার উপায়স্বরূপ বিধ সংগ্রহ করিয়া বাঁচিয়াছিলেন এবং উহা পথব্যতীর সময় সঙ্গে লইয়া গেলেন। ভারতের হিন্দু-বৈরো ভিরদিন নিজের প্রাণকে তুচ্ছ মনে করিত; সে ভরই এদেশে নতীয়াহ, জহর-ভরতের অস্ত্রাধন আনন্দা দেখিতে পাই। নতীয়া পথমিনি, ইহা বিট হইলে হিন্দু নারী একমুহুর্তে জীবন ত্যাগ করিত।

কল্যাণীর ভ্রমবহিষ্কৃত! দেখিয়া মহেশ্বর বিমিত হইয়া-ছিলেন, আনন্দাও সেই সঙ্গে বিমিত চাই। স্বামীসী কল্যাণী পথের ক্রেশের কথা স্বামীকে বলিয়া অনর্থক কষ্ট দেন নাই—তিনি যে আর্থিকতা, ইহা যে এদেশের ভিরজন তপ। রাজবদু সীতাদেবী অল্পেই স্বামীর সঙ্গে যেনের ক্রেশ সহ করিয়াছিলেন। স্বামীর সঙ্গে এদেশের যেহেতু অল্পেই সহ্য কষ্ট সহ্য করিতে পারে।

সীতাদেবীর মত কল্যাণীও স্বামীর সন্তোষতা ইহা-ছিলেন। মহেশ্বর হুড় অবেশে বহির হইলে একদল হুতিকীর্ণিত গ্রামবাসী কল্যাণী ও তাহার কস্তাকে ধরন করে। কল্যাণীর ভগবৎভক্তি অসাধারণ; দম্ভার হাত হইতে নিজার পাইবার জন্য একমনে ভগবানকে ডাকিতে লাগিলেন,—“কোবার তুমি! ঐহাকে আমি নিত্য। পূজা করি, নিত্য। নমস্কার করি, ঐহার ভরদায় এই বনমধ্যেও প্রবেশ করিতে পারিয়া দিলাম, কোবার তুমি হে মনুষ্যন।” কল্যাণী এই দম্ভাবলে হুত হইয়া জানহারা হন নাই, হুতির সুযোগ হুজিতেছিলেন, এখানেই তিনি সাধারণ রমণী হইতে উৎকৃষ্ট। দম্ভাবিলের বিবাদের সময় তিনি পলায়ন করতেন—এখানেই তাহার অসাধারণ প্রকৃতি-পদ-

মতিত্ব। কল্যাণী সভ্যানন্দেরাচারীর গান “হয়ে বুঝতে  
বুঝেই কেউ তারে” তুলিয়া ধনে মনে নারায়ণের কল্পনা করিয়া  
ছিলেন। কল্যাণীর ভগবৎবিবাস অসাধারণ। যঃ  
সেবতার আদেশ পাইয়াই তিনি বিধি পালন করিয়াছিলেন।  
ভগবানে অগাধ বিশ্বাস বলিয়াই তিনি অতিশ্রম স্বীকার ও  
কষ্টকে ছাড়িয়া গ্রাম বিলম্বিত করিয়াছিলেন।

কল্যাণীর অসাধারণ পতি-প্রেম আশ্রমের মুখ করে।  
দ্বিজাঙ্গদের সহস্রের কে কি করিয়াছিল আবার চর্যচর্য  
সেই নাই, কিন্তু পঞ্চাশের সহস্রের হঠাৎ সেখানে  
দুর্ভাগ্য হইয়াছিল, সেখানে—যাক্তা সন্তানের হঠাৎ  
বাবার হিনাই—লইতেছে, স্ত্রী অসহায়ের শ্লাঘা স্বামীকে  
ভাগ করিয়া বাইতেছে। সেই সহস্রের সহস্র ত্রহস্য  
বহন তাঁহাকে ধারণা দিলেন, তখন কল্যাণী কৃৎসিপাশায়  
অভিনয় প্রভিত: “তখন কি তবুও তিনি বাতহস্য স্বপ্ন  
করিলেন না। ত্রহস্যের প্রসঙ্গের পটভূমিতে  
কল্যাণী বলিলেন—“আমার স্বামী এ-পর্বত অতিক্রম  
আছেন, তাঁহার শাখা না পাইলে কিবা ভোতন-  
সংগম তুলিলে আমি কি প্রকারে থাকব?” সেই  
সহস্রের দিনে স্বামী ও কষ্টের প্রতি এই সহস্রের  
ভাবনা আশ্রমের মুখ করে। ত্রহস্যের নত সাধ-  
সাধনাত্তেও কল্যাণী অতিক্রম স্বামী পূর্বে কিছুতেই আহার  
করিলেন না। এখানেই কল্যাণী-চরিত্রের দৃঢ়তা, সাধারণ  
মতের হইলে ত্রাহত্যের অসম্ভব দশা না করিয়া পারিত  
না।

বহিষ্কৃত বলিয়াছেন—“শান্তি প্রার্থী, কল্যাণী  
বিলম্বিত।” অর্থাৎ আশ্রমের জীবনমতের কাছে থাকিয়া  
শান্তি তাহার ব্রত পালনে সহায়তা করেন, আর কল্যাণী  
স্বামী হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিয়া যথেষ্ট ব্রত পালনের  
সহায়তা করেন। আশ্রমের শান্তি ও কল্যাণী-চরিত্র  
আলোচনা করিবার সময় সীতা ও উর্ধ্বা-চরিত্রের কথা  
মনে হয়। রামায়ণে সীতা-চরিত্রের সাহায্যে উর্ধ্বা-  
চরিত্র সকলের দৃষ্টি অস্তরালে রহিয়াছে। সীতার  
বাধ্যতাই আশ্রমের বন ভ্রমুর হইয়া থাকে, উর্ধ্বা  
নিঃশেষে যে কতক আত্মত্যাগ করিয়া গিয়াছেন তাহা  
আশ্রমের দৃষ্টান্তের হয় না, বহিষ্কৃতের আশ্রমের

এই ব্যাপার ঘটনায়ে। শান্তির শৌখিনতা, সৌন্দর্য,  
হৃদয় প্রার্থনা সমস্তই প্রকৃতভাবে আশ্রমের শান্তির দিকে  
আকর্ষণ করিয়াছে, অথচ দ্বিত-কোমল কল্যাণী-  
যে নিঃশেষে  
কতক আত্মত্যাগ করিয়া গিয়াছেন তাহা তাহিলে  
আকর্ষণ হইতে হয়। শান্তি-চরিত্র অনেক সময় অসম্ভব  
বলিয়া মনে হয় কিন্তু কল্যাণী-চরিত্র খাটা বাহালী মেয়ের  
চরিত্র, বাহালী মেয়ের আশ্রম গৃহস্থায়ী প্রার্থী কল্যাণী।

শান্তি যেন রামায়ণের সীতা-চরিত্রের প্রার্থী।  
স্বামীর সঙ্গে অস্ত্রের (চৌকর) সহস্রের সহস্রের ক্রম সহ  
করিবার ভয় হইয়াছিল বহন পরিধান করিয়া সীতাকে  
স্বামীর অঙ্গমন করিয়াছেন। রাজপ্রাসাদের সমস্ত  
বিলাসভবন হেলার কেলির আলিয়া রাক্ষস-রাক্ষসী, হিংস্র  
অশ্ব-ভালোয়ার পূর্ণ দুর্গর কষ্টকপূর্ণ বহন যথেষ্ট  
করিয়াছেন। শান্তিও সীতাকে অস্ত্র জীবনব্যাপন  
প্রার্থী ভাগ করিয়া পূর্বের বত জীবন ব্যাপনের ক্রম  
বহন করিত একমাত্র স্বামীর সহিত অর্থাচরণের ক্রম।  
স্বামীর সঙ্গে ক্রমভোগের তিতরও আনন্দ আছে। এই দুই  
জন মহিলা যদিও কষ্টভোগ করিয়াছেন, তবুও মনে হয়  
সে ক্রম সহনযোগ্য। কিন্তু উর্ধ্বা ও কল্যাণী বাহালী  
উভয় পুত্রের মেগণে রহিয়াছেন, তাহাদের কথা  
তাহিলে কখন হয়। উর্ধ্বা অসহায়ের প্রাসাদে স্বামীর  
দ্বিগে রাজপ্রাসাদের কক্ষতল ভিত্তিহীন নীরব  
অস্ত্রের দিনের পর দিন, অথচ সীতার হৃৎকৈ সমস্ত  
সামান্যে একটু হইয়া উঠিয়াছে। দশরথ হইতে সমস্ত  
অসহায়স্বামী সীতার হৃৎকৈ হৃৎকৈ হইয়া উঠিয়াছে, অথচ  
স্বামীর সহস্র উর্ধ্বা এই চৌকর সহস্রের ক্রমে কাটা হইবে  
সেদিকে কাহারও দৃষ্টি নাই। স্বামী বাহাতে দেশের কাজ  
করেন সে উদ্দেশ্যে কল্যাণী দিকে নিঃশেষে আত্মত্যাগ  
করিয়াছিলেন, তবু তাই নয়, পুনর্জীবন লাভ করিয়াও  
স্বামীর নিকট আপনার সম্বন্ধ মনে নাই, ভ্রমণ, তাহাতে  
স্বামীর অর্থাচরণে বিশ্ব হইবে। দিনের পর দিন বহু ক্রম  
সহ করিয়াছেন, তবুও স্বামীর কাছে নিঃশেষে আশ্রম  
নাই, নিঃশেষে হৃৎকৈ বিলম্বিত দ্বিগে দেশের স্বামীমতা  
আশ্রমের ক্রম নিঃশেষে অস্ত্র আত্মত্যাগ সাধারণ  
মেয়ের দ্বারা সমস্ত নয়, এ একমাত্র কল্যাণীর নত  
অসাধারণ মেয়েতেই সমস্ত।

তবানন্দ যখন কল্যাণীকে উদ্ভাস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন, তখনও কল্যাণী স্বামীর নিষ্ঠুর গমন করেন নাই। কল্যাণীর ভক্তই মহেন্দ্র প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তবানন্দ ও জীবনেশ্বর ভ্রাতৃ বড় বড় সন্তানরাও প্রতিজ্ঞাচক করিয়াছিলেন। আশ্বাঘের মনে হয় পুনর্জীবন লাভ করিয়া কল্যাণী আত্মপ্রকাশ করিলে মহেন্দ্রের পক্ষে প্রতিজ্ঞারক্ষা কঠিন হইত।

তবানন্দের নিষ্ঠুর মহেন্দ্রের বর্তমান কাণ্ডাবলী শুনিয়া কল্যাণীর বুক গর্জে তুলিয়া উঠিয়াছিল। তিনি আল্লাহ্বিত হইয়া বলিয়াছেন—“আমি প্রাণত্যাগ করিলে কি এত হইত?” তবানন্দের বাস্তবাবলী প্রথম করিয়া আশ্বাঘের মনে হয়, কল্যাণী বিদগ্ধনের প্রয়োজন হইয়াছিল। তবানন্দ কল্যাণীর রূপরাশি বর্ণন করিয়া বলিয়াছেন—আমি জানিতাম না যে, সংসারে এ রূপরাশি

আছে। এমন রূপরাশি আমি ঢেকে দেখিব জানিলে, কখনও সন্তানদ্বন্দ্ব গ্রহণ করিতাম না। মহেন্দ্রের বিবাহিত ভবন বর্ণন করিয়া কল্যাণী বুঝিয়াছিলেন—মহেন্দ্র উভয় সন্তকে পড়িয়াছেন। কল্যাণী স্বামীর বেশদেবার প্রবল আশ্রয় পূর্ণ করিয়া তাহার পলগ্রহ হইয়া থাকিতে চাহেন নাই—নিঃশেষে প্রাণবিসর্জন করিয়া স্বামীর ধর্মকর্তব্যে সহায়তা করিয়াছেন। মন্দের জ্যোতির্ধর লোকের নিমন্ত্রণও ও কল্যাণী প্রথমে স্বামী ও কন্যার জন্ত ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু যখন কন্যা বিধি বড়ি গিয়া ফেলিল, তখন কল্যাণী যেবৎকা অবহেলা করিতে নাহক করিতে পারিলেন না।

মহেন্দ্রের বর্ণচরণের জন্ত কল্যাণী-বিসর্জন প্রয়োজন হইয়াছিল। কল্যাণী তাহার সংকর্তব্যের জন্ত পুণ্ডরাক লাভ করিয়াছিলেন, স্বামী ও কন্যার সহিত আবার মিলিত হইয়াছিলেন।

## পথ চিনে

### ঐজ্যোতির্ধর গোপাপাধ্যায়

যেহা যদি অবশেষে, একপেঁয়ে ভবদুরে মনে

একান্ত নির্ঝর্নে—

ওপাড়ের ভেঙ্গে পড়া, ফল-ফান: বাতুলটে

রাগ দিসন্তের প্রজ্বলপটে

আমি বেঁচে থাকি :

আর থাকে তুমি ত'টি নিদ্রানীত আঁধি :

ব্যর্থতার ক্ষতভারনত

সীমাহীন বেদনার বত :

আপনার মনে কবে বসে, হুঁটি কথা লিখি যদি ও বাতুল বুক,

বেলা মনেতে কি লিখেছি ত্য পড়ি যদি হুঁকে,

অর্থ যদি কিছু নাই বুঝি...

অকাঙ্ক্ষণে তবু যদি হুঁজি ?

আর যদি হুঁজে ফিরে যবে

শিখিল মেহটা ছয়ে পাঁড়ে ?

তুমি যদি এই অবসরে

আমার দেখায় অর্থ কিছু হুঁকে পাও

তোমার থাকর তার পাশে যেবে যাও

হুঁকেটা অস্তর হান দিয়ে :

তারপর বুধ-ভালা চোখে, আমি যদি তাই নিয়ে নিয়ে

কায়ারীন স্বপ্ন-ছায়া পড়ি,

আমার এক-জীবনাকে বেলে বরি :

কোন এক বেদনানীল ভবদুরে মনে

চুপি চুপি একান্ত নির্ঝর্নে

হুঁপি ঝিক-কপেছিলে পথ চিনে চিনে

কোন বোর হুঁজিনে :

বাইরের পাভাটা বন্ধ করে নক্ষা বাইরের দিকে ঠেঙে দেবে। জানালার গরাদেব নক্ষা দিবে দেখতে পার যুগে নাটিকেল গাছের মাথার উপর চাঁদ দেখা দিবে, তাইই বাকী হ'লি এনে পড়েছে মাঠের বুকে। গাছের ছায়া পড়েছে মাঠের উপর, বাকীটা গেছে জ্যোৎস্নার ঢেঁকে। আকাশের গায়ে চৈতঃ হৈজা মেঘ। মাকে মাকে চাঁদ যেন ভুবে যাক্ তার মাতে, মাঠের মাতে বসিবে আসছে চাঁদা—

নক্ষা মনে পড়ে বহুদিন আগেকার কথা—

এমন দিনে সে তখন ঘরের কোণে থাকতে পারতো না, চুপি চুপি মাকে লুকিয়ে চলে যেতো চাঁদে—  
আঁচলে আঁচলে লুকানো থাকতো কবিতার খাতা।  
আজকে সেনসব পাণ্ডুলীখী কথা মনে পড়লেও হাসি আসে ওর। একদিন ছিল কত আশা—কত আকাঙ্ক্ষা—  
সেই মনে তরুণা তার বাবা মানুষতো না। কুল কলছে সেইদিন সবচেয়ে পেয়া হাজী—রূপ-ভাণ্ডে উৎসাহে চাকশ্যে তার উপস্থিতিতে সে যেন প্রকাশ করে বাহ্যে সব হাসিনেই। কিন্তু বাইরে এই তরলতা তার অন্তরকে স্পর্শ করতে পারেনি কোনও দিনই; সেখানে ছিল এক অচল শাখ বিকাশোদ্ভব মন, তাই সবসে সবসে তার মনে কি হোত সে জানে না, হঠাৎ হঠাৎ যেত গম্ভীর। বন্ধুতা আদর্শ হ'য়ে বসতো—“কি ব্যাপার, হঠাৎ যে গম্ভীর হয়ে গেল নক্ষা? তোর কি রাগ হয়েছে নাকি তাই?”  
নক্ষা উত্তর দিতে পারতো: না, শুধু আরও গম্ভীর হয়ে যেতো। সত্যি রাগ তার হোত, তবে বন্ধুরের উপর নয় নিজের উপরেই। মনে হোত—“ওহুই হাসি আর গল্প বোলালো আর লেখাপড়া—কই এতে তো মনে কুড়ি আসছে না, শুধু যেন বয়সিকার পেছনেই ছুটে চলেছি—  
আদি বা চাই তা তো পারছি না এ শবে। কি যেন থাকি রয়েছে, কি কাজ করতে চেয়েছিলাম, তা যেন করা হোল না—। আবার হয়তো মনের বেধ কেটে যেত, কিন্তু এই অকৃত্রিম তার আর দুটো না।

যুগের ঘড়িতে চং চং করে এগারোটা “বাক্সো—  
আলোটা নিভিয়ে দেয় নক্ষা—নক্ষে নক্ষে এক কলক জ্যোৎস্না কানিগে পড়লো তার বুকে, যুগে আর ঘরের বেকের—

সেদিনও এমন ছিল। তারা দুজন বসেছিল পাশ-পাশি চেয়ারে। অলক হেসে বসেছিল—“নক্ষা, জ্যোৎস্নার দিনে জান্না বন্ধ ক'রে রাখতে মেই।” নক্ষা যুগ টিপে হেসেছিল, “তবে কি করতে হয় তুনি?”

অলক উত্তর দিয়েছিল, “কাব্যচর্চা।”

“তবে তাই হোক!” বলে নক্ষা যুগে দিয়েছিল বাতায়ন এককলক স্ত্রি বাতাসের সঙ্গে চাঁদের আলো।  
বুকে পড়েছিল ঘরের মধ্যে। জানালার গরাদেব উপর হাত রেখে বাইরের দিকে অবৈধ-বিজ্ঞান নেয়ে চেয়েছিল নক্ষা, কখন যে শিখন বেচে অলক এসে তার কাঁধে হাত দিয়ে পাড়িয়েছে তা সে জানেও না—। হঠাৎ সন্ধ্যা পেয়ে পেছ কিয়ে চেয়ে বেরে—অলকের সিঁদু মুষ্টি তার বুকের উপর। অলক নক্ষার হাত দুখানি টেনে নিয়ে বলে—  
“জান্নাদের উত্তরের মল্ল ও কুস্তির জন্ত জান্নাদের মিলন হওয়া প্রয়োজন নক্ষা—। আমি তোমাকে নিয়ে করবো।”  
কিন্তু অলকের প্রেমে কুস্তি পার না নক্ষা—অলকের আদর্শ বাড়ী গাড়ী ঢাকা ঘিরে; যুগি নহুত্বকেও বিকিয়ে দিতে পারে এই ঢাকার ভেত্রে। জান্নার এই বনোড়িতিকেই ওরা অহুতার করে বলে Practical; বনোড়িত। তাই অলককে ভালোবেসেও একটা মস্ত বড় কাঁক হয়ে যায় কোথায়—  
তার অন্তরে পরিপূর্ণ গাভ-জাগে না। প্রেমেব অভিনয়ে হ'দিনেই এসে যায় ক্রান্তি, কেমন একটা বৈরাগ্য আসে জীবনের উপর। কলে অলক তাকে কুল বোঝে, মনে করে নক্ষাও আর মশজম ক্রাট করা মেয়ের গাফিল। কিন্তু অলক কেনে চলে যায় নক্ষাকে—নিজের অকৃত্রিম অকৃত্রিমকে অভিশাপ দিতে বিতে নক্ষা কাঁদে—

মনের পাভা উল্টিয়ে চলে নক্ষা—।

১৯৯২ সাল। নক্ষার তখন দ্বিগুণ ইয়ার। জান

হঠাৎ পর থেকেই সে নিজেকে ঐক্য করে রাখছিল বেশভাষাকার সেবিকারূপে। তেতরে তার হোমানল ঐক্যত হয়েই ছিল। আগের আন্দোলনে পরিপূর্ণভাবে কাঁপিয়ে পড়লো নম্বা। মলের সীভায় সে—তার উদী-পনা ও উৎসাহ—তার আবেগবহী প্রাণল বহুভাব বলে বলে ছাত্রছাত্রী উপস্থিত হয় তার ত্রিবর্ষস্থিত পতাকা-ভলে। বলে, “নম্বা দি, বলুন আমাদের কি করতে হবে?” নম্বা তাদের বাছাই করে নেয়—তারপরে রাতের আঁধারে ঘেরিয়ে পড়ে একদল গোপনচাত্রী। রেলের লাইন-ভলো সরাসরি হয়ে এসেছে, এমন সময়ে তারী গলায় শিছু থেকে কে বলে ওঠে, “হাওনু আশ।” বিদ্যারীনের কবেও ভিতরটা একবার চলে ওঠে, তাদের হাতের কাজ বন্ধ হয়ে যায়। একে একে যখন সকলের হাতে হাতকড়: পড়ে যায়, তখন বিস্মিত দল চোরে দেখে নম্বা উঠাও। কেমন একটা তরসারিত্রিত আনন্দে বকীলের মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে: নম্বা দি একাই অনেক কাজ চালাতে পারবে!

তারপর চলে নম্বার নিজস্বাতিবান। নগরের পং নগর অতিক্রম করে চলে নম্বা তার শিছু শিছু দল গড়ে ওঠে। চারিদিকে ভেগে ওঠে গণচেতনা—বাটার পাতী ডানা কাঁপটিয়ে ওঠে। কিয় এ বে লোহার শিকল, ডানায় বে বড় কোদল। শিকলের গারে আঘাত মেগে ডানা তার ক্ষতবিক্ষত হয়ে ওঠে। আগষ্ট বিপ্লব তাই রক্তস্রাবার মধ্যেই ব্যর্থ হয়ে গেল। নম্বা হ’ল বন্দি।

১০৪৫ সাল—এক বৎসর হ’ল নম্বা মুক্তি পেরেছে কারাগারের বাইরে এসে বন্দুক দাঁড়িয়েছিল নম্বা। তাকে দাশা নিয়ে অত্যাধনা করতে এসেছিল একদল তর-তরী। তাদের মুখের দিকে চেয়ে নম্বা চমকে উঠেছিল! একটা ক্রান্তির ছাপ এদের মুখে। তারপর বতাই অগ্রসর হ’ল ততই তার বন ছাখে ভাষাকাত হয়ে উঠলো। কারাগারীতের অকরণে বহির্গতের যেটুকু শব্দন সে পেরেছে, তাতেই বুঝেছিল—যেখের উপর একের পং এক যে বড় বয়ে চলেছে, তাতে সেন বিদ্রুত, বিভলিত হয়ে উঠেছে, কিয় ব্যাক রাখার ছুঁইবার জনতাভ্রমণীক দিকে তাকিয়ে নম্বার ছুই চোখ অলে তরে ওঠে।

সকলেরই উপর বিতীরা বহুভূত হাত বুলিয়ে গেছে দ্রুতিক বসিয়ে গেছে তার করাল-বাত্তা।

এ দুর্ভু আতকে বাঁচাতেই হবে। নম্বা লব কিছু ফুলে যায়, ফুলে যায় বিগবের কথা, ফুলে যায় হিংসার কথা, ফুলে যায় কারাবাসের কথা। তার নাগে যে চিরন্তনী নারী খুঁষিয়ে ছিল, সে ভেগে ওঠে সেবাকার্যের মধ্য দিয়ে। তরুণ ছেলেবেলাবের সে তার আদ্যান জানায়, বলে, “আগে এই আশ নরালের বাঁচিয়ে তুলি তাই, তবেই তো আবার শক্তি ফিরে পাবে। আশ এদের বাঁচাই, কাল আবার এরাই আমাদের পাশে এসে দাঁড়াবে আগামী বিদবৎ সন্ধ্যা করে ফুলতে।” নম্বা গঠনমূলক কাজে নিজেকে নতর্পণ করলো—তাই আবার দু’একটা গ্রামে ফিরে এলো নিরাপত্তা, পূর্বের জীবন ফিরে পেল সেই লব হস্তাগোণার দল দ্বারা দ্রুতিকের বিনে একমুঠো তাতের আশায় গ্রাম ছেড়ে পালিয়েছিল। তারা পূর্ব জীবন ফিরে পেলো আত তার লকে পেলো এক নতুন চেতনাবোধ। বুঝলো তারা কার অপরাধে এই বাহুবেরই খুঁট দ্রুতিক তাতের জী-পুত্র পরিবারকে যনের মুখে টেনে নিয়ে গেছে, কার অত্যাচারের কলসরূপ তাতের নরকগোণ করতে হয়েছে নগরীর পথে পথে। আত তারা দুইয়ের কয়েকজন কোনওমতে দ্রুতিকের হাত এড়িয়ে টিকে রয়েছে বুকের ভিতর তাদের জলছে যখনই চিতানল—কত সাধের শাস্তির সীড় তাতের তেগেগিয়েছে—এর মূল্য সেবে কে?

নম্বার কাজ পরিপূর্ণভাবে চলেছে, দ্রুতিবটে গ্রামের মধ্যে কেমন একটা একান্তবোধ ভেগেছে! নম্বার আদর্শ আশ রূপ সেতে চলেছে, তাই যবে যবে চলেছে চরকা আর তাঁত—গাছা-বিভালরগলোও আর ছাত্রের অতাবে বড় থাকে না। কবক-দল-সদিস্তির কাজ যে এত ক্রত যোতে বয়ে চলেবে, তা নম্বার কাছে একদিন বয় ছিল।

আদর্শবাদী নম্বার মনের যে আশ গোপন হয়েই দিয়েছিল সেখানে অন্যকের মত রূপে ওবে বরষীর ছেলেও তার অকরের প্রথম প্রেম দিয়েও স্পর্শ করতে পারে নি—সেই “নীলব তরী”তে আঘাত হানলো নম্বারই মত আদর্শবাদী একটা ছেলে। নির্বল ও নম্বা কর্ণশবে পাশাপাশি

এসির চলে—যে চলার পথ একদিন যেন হয়েছিল বড় দুর্বল, বড় বন্ধু—আজ তার পথের পথে পথ হয়ে উঠলো হৃদয়—নয়।

একমাত্র বোধ হয় কাঁটে নি। সেদিন তারের কবচ ফল সন্নিহিত একটি বিশিষ্ট অধিকরণে তো-লপারেরীত সোপাইটী খোলবার দিন। বিকল বেলা নির্মল আসে নব্বকে চাকতে। নব্বাধ নুখের দিকে তাকিয়ে যেনে চমকে ওঠে নির্মল। চোখ ছুটো হাতা জ্বালালেব বড় হয়ে উঠেছে—সমস্ত দুখট: সম্বন্ধ ক'নছে। নির্মল পড়িত যত্নে বলে, "নন্দা, তোমার কি জর এসেছে না কি ? নন্দার কণ্ঠস্থের ক্রান্তি মুটে ওঠে, বলে, "কি জানি নির্মল আমার ক'র ভর লাগছে।"

দিন দুই পরে ডাক্তার আসেন। গভীর ঘুমে নির্মলকে তেঁকে বলেন, "কাশির সঙ্গে তো রক্ত উঠেছে—একবার একেরে করার প্রয়োজন।"

ব্রিটিশ কাগ্যারের ছোরাচের হাত থেকে নন্দা দৃঢ় পাঠ না, ডাক্তারের অভিমতে জানা যায় যে, এ চাটীর খাইসিগে মুহূ কিস্তু বিশেষই আসে, কিন্তু পরিপূর্ণ বিশ্রাম গেলো জীবনের আশা কিছুটা থাকে।

রোগের প্রথম বেগটা কেটে যাবার পর নন্দা উঠে যেন। নিকট অঙ্গ তার যাবা হান্ধতে চায় না। নির্মলের

সাক্ষ্যার সে কেঁদে ফেলে। বলে, "নির্মল ? কত আশা ছিল আমার। প্রাণটাকে কতটা গড়ে তুলেছিলাম, আমার হয়তো তা ভেদে পড়বে। আমার আশ্বাসন আস্তে তেবেছিলাম স্বাধীনতার যজ্ঞেই নিজেবে আহুতি দেব কিন্তু যেহেতু, বিঘ্ন হলেন। আজ শুধু জটা হতে থাকে আনি, এসিরে যেতে পারবে না। এর চেয়ে যে মুহূ ও শতপনে ভাল বন্ধু।"

বেশবেসার অপরবে (৭) আজ নির্মল কারাবন্দী। জঘন্য-মল-সন্নিহিত কোনও খবরই আর নন্দা পায় না। আজ বোধ হয় প্রাণেব কাছে তার নামটাও বিবৃতির কোঠার চলে গিয়েছে—সম্ভবতার সমিতিও গড়ে ওঠে নি। ক্রী-পূজ-কড়া নিয়ে অলক মুখের সংসার গড়ে তুলেছে তার চাকুরীস্থান কাগপূবে...

হেঁপে হেঁপে উঠেছে ছাত্র-আশ্বাসন। সকালে মাতা ঘিরে একবল শোভাযাত্রী বাক্সিন 'জয়হিন্দ' আর 'বন্দেমাतरम्' গেরে। আজ রাতে টান উঠেছে—নীল যজ্ঞ আকাশে...। হাত আকাশে এগো না কি টান—চোকাটা ঘুরে ঘুরে মরছে—দূর থেকে হেনাথ গন্ধ ভেসে আসে—

যক্ষ-জান্না নন্দা কায়ছে না কি ?

সবগ্র মানবসমাজের প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক মানুষের সর্ববিধ দুঃখ সর্বতোভাবে দুঃ করিবার ব্যবস্থা সম্পাদিত না হইলে কোন একটি মানুষের একেলার সর্ববিধ ব্যক্তিগত অথবা সমষ্টিগত দুঃখ সর্বতোভাবে দুঃ হইতে পারে না—এই কথাটা বর্তমান মানব-সমাজের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় নেতৃবর্গের ও কর্মকর্তাদের কাছারও জানা নাই বলিয়া সঙ্গ্র মানবসমাজের প্রত্যেক দেশের নেতৃবর্গের ও কর্মকর্তাদের সকলকে একজিত করিয়া সঙ্গ্র মানবসমাজের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সংগঠন ও শাসন এক নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার কোন প্রথম বর্তমান ঐতিহাসিক কালে বরনও হয় নাই। উহা হয় নাই বলিয়াই কোন মানুষের—তিনি বতাই প্রকৃত ও সমতাপাদী ছউন না কেন—সর্ববিধ ব্যক্তি-গত অথবা সমষ্টি-গত দুঃখ সর্বতোভাবে দুঃ হয় না।

—সচিবানন্দ

# বিচিত্রাঙ্গ বিহঙ্গম

ঐশ্বর্যশালী ঘোষ



শিকারী পক্ষীবিগকে যেমন সিং-  
বাঘের সঙ্গে তুলনা করা যায়, তেমনিই  
চিত্রিতকার। বিচিত্রাঙ্গ বিহঙ্গমকে পক্ষী-  
জাতির বিচিত্রাঙ্গই বিলাসী মানুষ বল  
বসিমা অভিহিত করা গলে। ইংরেজীতে  
এই বিচিত্রাঙ্গ বিহঙ্গমগণকে 'কিত্যাট' বলা  
হয়। হর্নবর্ধাশালী বিচিত্র-পক্ষ-বিশিষ্ট  
কিত্যাটজাতীয় পক্ষী প্রাচীতেই পণ্ডিত  
হইয়া থাকে, যিনিও ভাবতর্ক্যে।

ভাবতর্ক্যের অধ্যাত্মিক উচ্চ গড়ন-প্রাপ্তই শিখরজাতীয় শাবীর  
প্রধান বাদ্যবল। বিশেষ, পূর্ণভবাক হিমাদ্রি—বাগকে চিত্র-  
চমৎকারী বৈচিত্র্যের সীমাহীন বসিলেও আত্মিক হয় না—তাগার  
ক্রোড়লেশে বিলাস ও প্রপঞ্চ কাত্যবলম্বী নৃনান্দিভ্য  
বিচিত্রাঙ্গ বিহঙ্গমগণেরও অভিনয়কর্ম। কানীয়েব ব্রহ্মবলীতে  
পঞ্চপুণ্ড এবং কাত্যবলম্বী পণ্ডিতশ্রেণীতে বিচিত্রাঙ্গ চিত্রাঙ্গ  
বিহঙ্গমগণের যে গৌণধা-সমাহার হুই হয়, তাহা বর্ণনাতীত।  
সিকিম্বেও অসীমব্রহ্মপুণ্ড কৃত্তবল ও পঞ্চমজীতিপ্রব প্রাণাতি-  
শাল্যের কমনীও ক্রীড়ার সঙ্গে সঙ্গে হর্নবর্ধাশালী বিচিত্রাঙ্গ  
বিহঙ্গমগণের লসিত সীমাত পণ্ডিত হইয়াছে। হিমাদ্রিও প্রার  
মর্গক্রই আশ্রয় কিত্যাট বা মন্থাজাতীয় মনোজ বিহঙ্গ দেখিয়া  
বিশ্মিত ও বিমূঢ় হইয়াছি।

কুমল-মোহন তাণ্ডতর্ক্যের নিকশন নৈনদিক সৌন্দর্য্যসমুদ্রে  
একটি পদমধ্যনাথ তখন এই সকল বিচিত্রাঙ্গ বিহঙ্গ। হিমাদ্রি-  
বক্ষিত বিলাস বনানী-নান্যপ্রদেশী বিচিত্রাঙ্গ বিহঙ্গমগণের  
বয়তম বসন্তলী। আগাণ ও ব্রহ্মদেশের পণ্ডিতশ্রেণীও সিকিম্বেও  
'কিত্যাটজাতীয়' পক্ষী লক্ষিত হয়। এই শ্রেণীর বিহঙ্গমগণকে  
'শিখরজাতীয় শাবী' আখ্যায় অভিহিত করিলে তুল হয় না।  
শিবী বা শাস মন্থ ইংরেজের মধ্যে প্রধান।

মন্থ পৃথিবীর নামা কেনে গালিত হইলেও ইহার আদি-  
বাসস্থল ভাণ্ডতর্ক্য। ভাণ্ডতর্ক্য কবিজুলেও কল্পনাযোজ্য কোকিলের  
ভাব কল্যাণীও অপরূপ প্রভাব প্রদর্শিত করিতেছে। বিশেষ,  
নন্দ-নন্দনের সীমাহীন কৃষ্ণাধরের যে দিয়া আসলো আশ্রয়  
বৈকুণ্ঠ কবিজুলেও বাস। অজিত তেজি, তাহাতে মন্থ কোকিল  
অপেক্ষাও কল্পবর্জিতানি অদিত্যের কবিরা রহিয়াছে। কল্প-কট

পক্ষী নীচে বসিয়া আছে

পক্ষীকে কোকিল তুলনিত হুয়-শব্দীতে কাননতল কণ্ঠিত  
করিয়া তুল হটে, কিন্তু চকুতর্পণ, চিত্ততরঙ্গন বর্ণবৈচিত্র্য উৎসাহ  
নাই। অথচ মন্থের মধ্যে এই বৈচিত্র্য প্রচুর বিস্তারিত।  
বিতর্ক্য অল্পে বর্ণের এই বিচিত্র সমাহার আশ্রয়িত চমৎকৃত  
করে। কৃষ্ণাধরবিলাসী শিবপুঙ্খবাহী স্ত্রীমন্দনধনের উপায়ক  
কল্পবর্ধের জীবনের সহিত শিবীর অপরিস্রব সঙ্গর্গ সজ্জিত সবেহ  
কোথায়? কৃষ্ণাধরব বনে বনে মন্থের মনোমদন নৃত্য আভিও  
লোকা যায়। আকৃশ্য দেব যন্ত্র হইয়া আসিলে শিবীয়া বিস্তার  
এবংবার বিচিত্র কল্পবর্ধকতার প্রকাণ্ড পাখা প্রদর্শিত করিয়া যে  
চিত্তশাসন নৃত্য আভিও করে, তাহার সৌন্দর্য্য না দেখিলে উপলব্ধ  
হয় না। অদিকনি বাসীকির বামাণ-মহাকাব্যের কিত্যাটকেও  
আদর্শ লক্ষ্যকে দেখান করিয়া স্ত্রীমন্দনধর অজিত প্রাচীত-  
কৃত্তি যে চিত্তকল্যান বাসার আলম্ব্য দেখিতে পাই তাহা  
কল্পবর্ধী। অথচ বর্ধার বনানীবর্ধার শিবীও কথা বার বার  
ইঙ্গিত হইয়া আভ্যাতিক। যাবত্ন বলিতেছেন, স্ত্রীমন্দন  
পশুপত্নী বর্ধার বাহিন্যবাহর বামা আশ্রয়িত হওয়ার শিবপূর্ণ  
নৃত্যোৎসবে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

"কল্পবর্ধকপাণ্ডিতপাণ্ডানি

প্রবৃত্তনৃত্যোৎসব-বহিগানি।" (বাসীকি)

এই 'নৃত্যোৎসব' শব্দ শিবীকে শব্দে যেমন প্রযোজ্য, তেমনি  
যোগ হয় আর কোন প্রাণীর পক্ষে নহে। বিবর্তন বসীকল্পনাধর  
নন্দ বর্ণাধরে বন্দন হুয়-বর্ণ উৎসাহ উত্তীর্ণ হইয়া তখন তিনি  
ভাববিজুল-কটে গাঠিতহেন—

ওগো আমার মাঠে যে আজিকে মন্থের মত মাঠে যে।

মন্থের মত মনোজ নৃত্য কোন প্রাণীও কল্পিত পাংহু না।



বলিয়া কবিরা মন্থ-প্রসঙ্গে নৃত্য এবং নৃত্য-প্রসঙ্গে মন্থের কথা  
প্রায়েই বলিয়াছেন। বহাতিব কালিয়ার অনেক বিধের আঁতবি  
বাস্তবিকের অনুসরণ করিয়াছেন। কোন কোন স্থানে কালিয়ার  
বাস্তবিকের বাস্তবত নত পৰ্য্যন্ত গ্রহণ করিয়াছেন। বহুসংখ্যক  
বর্ষাবধি বহিরাগে -

“সকল মনোজ্ঞা অনন্তরূপে বাস্তবকে বিকীর্ণবিকীর্ণকলাপশোভিতম্।  
সংস্কৃতমালিন্যচূষনস্তিগ্ৰহ প্রবৃত্ত-নৃত্যঃ সুলভমহা বহিগাম্  
অনন্তরূপে—সহ্যাকবি কালিয়ার।”



মন্থ কলাপ বিজ্ঞান কবিরা নৃত্য কবিতা

অর্থাৎ বহুসংখ্যক মন্থের আঁত অনন্তরূপে উদ্ভূত  
হইয়া উঠিয়াছে। এই বহু, কলাপ প্রসঙ্গপূর্বক কি শোভা  
লাল কবিতা এবং নিবন্ধ আলোকন চূষন চন্দ্র আলোক  
হইয়া মনোহর কেবলমাত্র সহ্যকবি কেমন নৃত্য কবিতা।  
বাস্তবিকের প্রবৃত্ত-নৃত্য পদটিও কালিয়ার লিখিয়াছেন। এই পদ  
আনন্দের বর্ষাবধি একাধিক প্রকারে লেখিত পাই।

“সিদ্ধান্ত-পলাতকুলুচিভিত্তাপলাঃ সত্যভিত্তাঃ প্রসঙ্গঃ সমস্ততঃ।  
প্রবৃত্তনৃত্যঃ পিণ্ডিতঃ সত্যভূগাঃ সত্যপ্রককঃ জনকি কুখাঃ।”  
( কালিয়ার )

অর্থাৎ—প্রায়ে, আঁত পিণ্ডিতকী ছবির অত্যন্ত উৎকর্ষ  
চন্দ্রাইতেছে। এই বহু, কালিয়ার উপলব্ধিকের বহু-ত-সমিত  
বেশবল্লভ কেমন বায় বায় চূষন কবিতা এবং চন্দ্রিক বিজ্ঞ  
কি প্রত্যক্ষের নিবন্ধ-মিত্র বহিরা চলিয়াছে। এই সকল  
উপলব্ধির উপর সঙ্গ-চন্দ্রিত পুঙ্খভাব প্রসঙ্গপূর্বক  
পিণ্ডিত কি বহুসংখ্যক নৃত্য কবিতা। বর্ষাবধি নিবন্ধ বহুসংখ্যক  
নৃত্য কবিতা। কালিয়ার নৈবেদ্যের নৃত্য প্রত্যক্ষ না লেখিলে  
উদার সৌন্দর্য উপলব্ধ হয় না। বাস্তবিক বর্ণিতছেন—“মন্থের

কেবলমাত্র বহুসংখ্যক এবং বায় বহন কবিয়া পার্শ্বভা প্রবাহিত  
সকল প্রত্যক্ষের সমন কবিতা।

মন্থককালিয়ার প্রবৃত্তঃ  
পৈলাপলাঃ পৈলাপলাঃ বর্ষিকঃ ( বাস্তবিক )  
মন্থ কেবলমাত্র গান কবিয়া নৃত্য কবিতা এবং পৈলা  
নৃত্যের তালে তালে নাচিতে নাচিতে পিণ্ডিতকী পদতর বেদে  
চুটীয়া চলিয়াছে। ওহু তাহার নহে, মন্থের নৃত্য-পৈলাপলা  
মনে হইতেছে, সঙ্গ বহুসংখ্যক নৃত্য-পৈলাপলা হইতেছে।  
যেন বনসী, কালিয়ার-কালিয়ার মন্থের মন্থে পিণ্ডিত কবিয়াছে।  
বনসী, কালিয়ারের কালিয়ার মন্থের বায় বহু পিণ্ডিত, তত আঁত  
কোন বস্তুই বায় নহে।

কবি প্রবৃত্তঃ কবিপ্রবৃত্তঃ  
কবি প্রবৃত্তঃ কবিপ্রবৃত্তঃ।  
বাস্তবিকের বর্ষিকঃ  
বনসী সত্যভিত্তাঃ প্রবৃত্তঃ ( বাস্তবিক )।

অর্থাৎ, বনসী কোন কোন স্থানে লিখিত বহুসংখ্যক  
মন্থের বহুসংখ্যক নৃত্য এবং কোন স্থানে উল্লিখিত পদ কবিয়া এবং  
কোন স্থানে কালিয়ার অস্ত্রভাবের পদ কবিয়া কবিয়া কবিয়া  
হইতেছে—যেন বন নৃত্য-পৈলাপলা হইতেছে। মন্থ-মন্থের  
তালে তালে শ্যামকালিয়ার বনসীকে বিজ্ঞ বর্ষিকিত পদ  
প্রসঙ্গিত কবিয়া মন্থের বনসী নৃত্য অত্যন্ত নৈবেদ্যপূর্ণ।  
সংস্কৃত কালিয়ার বহুসংখ্যক মন্থের উৎকর্ষ, সৌন্দর্য-  
বহুসংখ্যক প্রায়ে আঁত অনন্তরূপে বর্ষিকিত পিণ্ডিতপূর্বক  
বাস্তবিক হইয়া কালিয়ার অস্ত্রভাব কবিতা—বাস্তবিকের এই  
বর্ষিক গোষ্ঠিক হইয়া অত্যন্ত বস্তুভিত্তিক।

“নভঃ সত্যভূগাঃ পিণ্ডিতঃ  
বিজ্ঞবর্ষিকিতঃ বনসী।  
প্রায়ে বস্তু ভিন্ডিতপোভা।  
পোভাঃ বাস্তবিক মন্থঃ ( বাস্তবিক )

বাস্তবিক বর্ষিক-বর্ষিকের বনসীতেও মন্থ-মন্থের নৃত্যের  
কথা বহুসংখ্যক উল্লিখিত হইয়াছে। কালিয়ার সত্যিক এই  
বিজ্ঞপদ কবিতার পদ্যের অস্ত্রভাব। পিণ্ডিতকী এত  
পদ্যে লিখিত কবিতা মন্থের অস্ত্রভাব কবিয়া ইহার বহুসংখ্যক  
অস্ত্রভাব বহুসংখ্যক, সত্যিক নহে। বহুসংখ্যক বিজ্ঞকালিয়ার  
বহুসংখ্যক মন্থ এবং প্রবৃত্ত হইতেছে। বহুসংখ্যক বহুসংখ্যক  
কালিয়ার পদ কালিয়ার প্রবৃত্ত পদ মন্থের বহুসংখ্যক বহুসংখ্যক  
বহুসংখ্যক বহুসংখ্যক বহুসংখ্যক বহুসংখ্যক বহুসংখ্যক

জায়ে নিগলিত হইয়া জীতি নাই, প্রাকৃতিক পদার্থই  
তাঁহাৰ জীতিপ্রব।

যেখনকাল যুগ্মেব নৃত্যেৰ কথা কথিবা বসিয়াছোম, তেঁও  
এ বিষয়ে সন্দেহ নাই যে যৌন সংযোগেৰ সময়তই তাঁহাৰ  
একমিলিতকৈ আকৰ্ষণেৰ বহু কলাপ বিস্তাৰ কৰিয়া মনোজ নৃত্য  
আৰম্ভ কৰে।

আৰ্গাপ্ৰ একপ্রকাৰ শিবিজাতীয় পানী। ইয়াবিগতে সন্মত  
টোনাগেৰিৰ মকলে মকি দেখা যায়। নিৰ্ভিত অৰ্গাপ্ৰানীৰ বক  
কোন অতি নিতৃত্ত ব্যৱসায় তত পৰা-পুল ও আগন্তু সাতাইশ  
তাঁহাৰ আগমানেৰ বাস-স্থান হওন কথিবা লয়। এমন তাঁহাৰ  
বাছিয়া লয়—যেখানে থাকিলে তাঁহাৰে বাহিৰ হুইতে লগতে কেত  
খোঁতৰে পাইবে না। এইজাতীয় ময়ূ (আৰ্গাপ্ৰ) একাঠ  
একটি ভালে থাকে। যৌন সংযোগেৰ সময় না আশা পৰ্যন্ত সে  
সেই নিতৃত্তে নিঃসৃত্ত অমৃত্যুতই অবস্থান কৰে। হাম্ভতা  
সংযোগেৰ সময় আগমাত উচ্চ কেকাক্ৰম উচ্চাৰণ কৰিয়া  
ময়ূকৈ ডাকিতে আহত কৰে। সেই ডাকে কোন ময়ূী দুটি  
আগিলে তখন আৰ্গাপ্ৰ ময়ূৰ তাহাৰ ময়ূৰে কম্বীৰ কলাপ  
বিস্তাৰ কৰিয়া মেজাতিভান নৃত্যে প্রবৃত্ত হয়। লবিত পূজকে  
উচ্চ কৰিয়া এক আগন্তু চকুৰংগিহে বিভিন্ন শব্দ প্রসাৰিত  
কৰিয়া আৰ্গাপ্ৰজাতীয় ময়ূৰেৰে বহন নৃত্য কৰে, তখন সত্য সত্যই  
শিবিজক বুণা অভিযুক্ত হয়। আমাৰ ভাষায়ে উদৰকাণে  
এইজাতীয় ময়ূৰেৰে নৃত্য একাবিক বাৰ দেখিছিলোম।

তুৰু আৰ্গাপ্ৰ নহ, লব শ্ৰেণীৰ ময়ূই হাম্ভতা মিলনেৰ সময়  
পক্ষপাত পূৰ্ণতঃ প্রবৰ্ণন কৰিয়া উল্লেখ সহকাৰে নৃত্য কৰে।



পক্ষি-বংশতি

অন্য সময়ত তাঁহাৰ বাহায়েৰ বৰ্ণিত (গড়োংগৰা বাহনপৰা  
ময়ূৰা) অবস্থা সত্য সত্যই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বৰ্ণাই  
ময়ূৰ-ময়ূীৰ মিলনেৰ সময়। বৰ্ণাপনে যেনে আকাশ দেখ-  
সেয়াই হইয়া আসে, অমনই যেন কন ময়ূৰেৰে নৃত্য-প্ৰীত আৰম্ভ  
কৰে—এই বুণাটি আনিকনি বাণীকিৰ মায়া কেইই কৰিয়া কহিতে  
পালে নাই। তুৰু বিভিন্ন পক্ষপালী ময়ূ নহ, অন্যন্য পক্ষীও

হাম্ভতা মিলনেৰ সময় আগমাত সৌন্দৰ্য পক্ষিবিগৰ প্রবৰ্ণন  
কৰিতে চাটে। প্রথম প্রকাৰ কথিবাৰ বিভিন্ন প্রণালী বিভিন্ন  
পক্ষীৰা আশ্ৰিত কৰে।



ডিং হুইতে লগা নিৰ্ভিত পাতক

এক এক শ্ৰেণীৰ পক্ষী এক এক পৰাৰ অন্তৰ্বে উদ্ভূত প্রবৰ্ণনকৈ  
প্রকাশ কৰে। কেত নেতৃত্বপূৰ্ণ নৃত্য কৰে, কেত চিত্ত-মসায়ন  
সকীত লাবনা প্রক কৰিয়া দেখ, কেত-বা নৃত্য-প্ৰীত হুইট কথিবা  
থাকে। কোন কোন পক্ষী বা পত ময়ূৰবিৰ অভিন্নতায়েৰে মত  
নানা প্রকৰ কলমে দেখাইঃ প্রবৰ্ণনকৈ হুত কহিত চাটে।  
অন্যক্ষেত্রে কোন প্রতিবন্ধী থাকিলে তাঁহাৰে পৰাশিত কথিবাৰ  
প্রবল প্রবৃত্তিও পূৰ্ব পক্ষীয়েৰে মনো দেখা যায়। যৌন কাহনা  
বা উকীপনা পূৰ্ণ-বসন্ত বিচলন থাকিলেও জীজাতীয় পক্ষীৰ  
ংগে কিয়ানীলতা কম দেখা পিয়া থাকে। ইহাৰ তাৎপ.  
তাঁহাৰে সজিত সজি পৰ্বকাল ও ডিৎপ্রসব এই দুটি কথা  
অধিক স্মৰিত হয়। হুতৰ পূৰ্ব পক্ষীৰ আছানে গাড়া  
গেৰাই তাঁহাৰেৰে প্রধান কাৰ। আকৰ্ষণ কৰিব পক্ষী, আতুট  
হইবে পক্ষী—এওণ অবস্থায় পক্ষীৰ পক্ষেই বৰ্ণিতা, বৈচিত্ৰ্য-  
বিমণ্ডিত পক্ষৰ অধিকাৰী হওগা প্রয়োজন বলিগ। বিবাহ-  
পূৰ্ব তাহাৰে উচ্চ বান কৰিয়াছেন। কিন্তু বাছৰেৰে দেখাৰ  
আমৰা সাধাৰণতঃ মকেই নানীৰ আছানে গাড়া কিতৈ দেখে।

যে শ্ৰেণীকে বাস শিবি-পক্ষপাল কণা যায়, ইহাজীতে তাঁহাৰা  
শীকৰ আখ্যায় অভিহিত হয়। অমত পূৰ্ব পক্ষীকেই 'শীকৰ'  
বলা হয়। পক্ষীৰ 'শী-হেন' নাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে।  
গাঙাত পক্ষিততঃ-হতায়া বাস ময়ূৰাজিক হুইতাণে বিতক  
কথেন—'শ্ৰে শীকৰ কিয়ান্ট' বা ময়ূৰ পৰিণতি ময়ূৰ এবং 'মাল  
শেণী-ময়ূৰ'। উভয় শ্ৰেণীৰ মধ্যেই বুণৰ বৰ্ণেৰে প্রাণত দেখা  
যায়। কেহ কেহ বুণৰত বাচাবী। পাৰা বুণ হইলেও  
উহাৰ গায়ে তুৰুৰে বিভিন্ন বৈশাখিক বিবাজিত থকাৰে। পক্ষ

এম পুঙ্খ হুইই বেঙনী ও সবুজ চকুং বিচিত্র চিত্রসমূহে চিত্র-  
চক্ৰকারী। মধু ভাৰতবর্ষের নানা অংশের অরণ্যে অস্থানে  
করিলেও ইহাঙ্গের প্রধান বাস-স্থান সিংহ, জুটান, আলাম ও  
ভ্রমের বনানী। বিশেষ, পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা বাসকিপারে 'শীক  
কিড্যাট' আখ্যায় অভিহিত করেন, সেই সম্ভাষণ এই সকল  
অংশে দেখা যায়। ছোটিনাপপুং অথবা একজাতীয় শিবী  
সেখিত পাণ্ডা যায়। কুমারের পাখি পাণ্ডা ও অংশে  
একত্রীয়া মধু প্রভৃ পৃথিব্য আভিও বিদ্যমান। বিন্যাস  
হইতে কুমারের পৃথিব্য পৃথিব্য কবিরা। সমগ্র পৃথিব্য উত্তর পার্শ্বে  
বনভাগ বৈদ্যনাথের আশ্রয় বৃক্ষসমূহ দেখিতে পাই। কিং

বিশ্ববস্তুর অত্যন্ত চিত্রাকর্ষক। ইহাঙ্গের কোর ভেলভেটের  
ভার কুমার, কোর ই-পাণ্ডের ভার নীল, কোর চেটনাটের ভার  
বাহ্যী।

এইজাতীয় বিশ্ববস্তুর একটি সম্ভাষণকে 'ট্রাপোপাল' বলা  
হয়। ইহাঙ্গের বকঃস্থল সামান্য কিছু পৃথিব্য বায়বী। সেখানে  
অনেকটা গিলি কাউলের মত। বোম্বাইর ভর হামীর পানক  
ইহাঙ্গের অত্যন্ত চিত্রাকর্ষক বৈদ্য। পূজন পক্ষীরেও  
মধু ও দুকুটের মত প্রভাষ এবং চিত্রকর নিকটেও গল-কমল-  
জাতীয় লক্ষ্যমান প্রভাষ বিদ্যমান। এই বংশের বিভিন্ন প্রভাষ  
আমরা লক্ষ্যমান বোম্বাইর দেখেও দেখিতে পাই। ট্রাপোপাল



বক মোরগপন হুই কয়িত্তে

সিংহ ও জুটান, আলাম ও বক্ অংশকাত্ত কুমার। এম  
বিভিন্তর মধু হুই হইয়া থাকে। শুধু বিদ্যমান নয়, এট সকল  
অংশে বৃক্ষ ও বিভিন্নর পতন, বৃক্ষ, জুটান এবং এমন  
কি মাতঙ্গের পৃথিব্য আশ্রয়ে হুইয়াও যায়। শিকারীরা অনেক  
সময়ই মিকার কবিরা কত এই সব অংশে আসিয়া থাকেন।  
কিছু পক্ষ শিকারী কুমারের সত্যতা ভিন্ন মধু মিকার প্রাই  
সমগ্র হয় না। এই অংশে নীচত কিড্যাট হুইয়া আর এক  
সম্ভাষণ দেখা যায়—পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা বাসকিপারে নামকরণ  
করিয়াছেন 'ট্রাপ কিড্যাট'। ল্যাটিন নাম 'কেজিরা নাম  
এলিপ্যাল'। ইহাঙ্গা টীনা মধুবিষের অত্যন্ত মাথা বলিয়া  
আমাদের মনে হয়। টীনা মধুই ট্রাপোপালদের বাস অধিক  
পালিত হইয়া থাকে। আর একপ্রকার মধু এই সকল অংশে  
হুই হয়—বাহ্যিকপক্ষে 'মিসেস হিটসের কিড্যাট' বলা হয়।  
ল্যাটিন নাম 'কেজিরা নাম হিটসাই'। এই সম্ভাষণে বিভিন্ন

সম্ভাষণের পৃথিব্যের বায়বী-বর্ণ-বিধি দেখে  
উপর বেষ্ট-কুমারি নাম। বকের হামীর দেখা  
বিদ্যমান হইয়াছে। তবে মধু, দুকুট ও গল-কমল-  
এ প্রভাষগুলি পৃথিব্যের পৃথিব্যে লক্ষিত হয় না।  
এইজাতীয় বিভিন্ন সম্ভাষণের পাণ্ডা বিভিন্ন  
প্রকারে দেখা যায়। চাইটি প্রকারে  
পৃথিব্যের উত্তর অংশে বিদ্যমানের আবিষ্কার,  
একটি ইষ্টো-টীনা। বিভিন্ন বনানীর বকে বাস  
করে। মধু মধু মল দেখা গেলেও এইজাতীয়  
পক্ষীরা লক্ষ্যমান; একাই থাকে। সম্ভাষণী  
বলিয়া ইহাঙ্গা সমগ্র কাহারও লক্ষ্যে আসে না,  
মিষ্টের নিবালায় আশ্রয়পান কবিতেই ভালবাসে।  
আশ্রয়পান ব্যাপারে ইহাঙ্গা এমন গুঢ়

প্রভিৎ যে, শিকারীরে পক্ষে ইহাঙ্গিক বলা অত্যন্ত কঠিন  
কাজ। সেখানেও পাণ্ডে অত্যন্ত কঠিন পণ্ডিতে। ট্রাপোপালরা  
বুকে। বকে নীচ শিকার কবিয়া অবস্থান করে কিন্তু কুমার  
'নামিরা ভক্য মাধব কবিয়া থাকে। কীট-পতঙ্গ এবং বকের  
মধু, মধু, কল ও বীজ ইহাঙ্গের প্রধান খাদ্য। কুমারের ভার  
একপ্রকার সমগ্র ইহাঙ্গের কঠিন হইতে নির্গত হইতে দেখা যায়।  
নিজের বনানীর বকে দেখা। হইতে উত্তর এই বৈদ্যবিদ্যার  
একপ্রকার (উচ্চ কুমারের ভার) সব শুনিতে মনে হয়, অত্যন্ত  
অব্যয়ী বেন কোন অব্যক্তি বৈদ্যনাথ করিয়া উঠেন।

যৌন-পরিচয়। সমগ্র ট্রাপোপালের মাসল পৃথকভাবে 'কীট  
হইয়া ইষ্টো-টীনা উঠে। এই সমগ্র পৃথিব্য পক্ষী পৃথিব্যের  
মধু-বকঃস্থল হইয়া পৃথকভাবে খাদ্য কবিয়া বর্ণ-বিভিন্ন উচ্চ  
গল-কমলও কণ্ঠিত কবিয়া, পক্ষ এবং পুঙ্খ প্রদর্শিত কবিয়া  
আপনার অপরাধ গুণ পৃথকভাবে প্রদর্শিত কবিতে প্রয়াস করে।

এই সময় বহুবর্ণ বকঃখলক আনত করিয়া তুলত সর্প বহাও নিয়া। হ্রাত বিজ্ঞাপ্তি বা বহুবর্ণ শিবিজাতীয় পাখী অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। ইহারা প্রকৃত মন্থর এক ভিত্তি উল্লেখ্য মাকামতি। ইহাদের পাখা লাল বলিত এইজন্য নাম। কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন লাল হতে। লালের তিতব বৃদ্ধি এক ক্রিকে সত্ত্ব বর্ণ অংশও বিদ্যায়। পূর্ণ-বিষাটসবানী এইজাতীয় বহুবর্ণ বিহঙ্গমবিশেষ বৈজ্ঞানিকগণ 'ইথোডেনিস স্কুভেন্স' আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন। বহুবর্ণ লালটের উপরে পীতবর্ণ দিবা বা সূর্য অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। শব্দ ও পুঙ্খ সীমার প্রায় হঠাৎ। গভীর, মনোহর এক পুঙ্খের আচ্ছাদন লাভ লাগে। বকঃখল ক্রিকে সত্ত্বের উপর লাগে সোহিত তেজাশ্রুত। পক্ষীরাও সত্ত্ব পুনর, বায়বী ও পীত—এই ত্রিবিধ বর্ণ গৃহে হয়। হ্রাত বিজ্ঞাপ্তি বা বহুবর্ণ শিবিজাতীয় পাখী সত্ত্ব শৈলশ্রেণীর কথিবানী। সত্ত্ব-পূর্ণ হইতে ৮ গাভার ফিট উচ্চ এবং তলদেশও উচ্চতরস্থানে ইহারা অবস্থান করে। ৮ গাভার ফিটের নীচে ইহারা কখনও নায়ে না। এইজন্য উচ্চস্থানে ইহারা আহার্য আতরনের জন্য তুল্যে বিভ্রম করিয়া বেড়ায়। ত্বণ, কীট-পতঙ্গ, পার্শ্বতঃ বস, জ্বলিপায় ও শাটন-পাখির কঠি ক্রিয়ায় ইহারা জীবনধারণ করে। ইহাদের উড়িবার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ হইলেও লৌহিরা পলাইবার দক্ষি অসাধারণ। শিকারীরা এইজাতীয় বিহঙ্গমগণকে লালবর্ণতঃ শিকার করে না। ঘনিতে চেষ্টা অনেক করে ঘটে কিন্তু গুলি করিয়া ইহাদিগকে মাঝিরা টাঙ্কা বৃক কম লোকেরই হইতে পারে। আখরা বিহঃ অবাক হই এই ভাবিত যে, প্রায় প্রতীকৌশলের এইজন্য প্রেত নিবন্ধকে যাত্রণ কেমন করিয়া হত্যা করে? আখর, শিবনী প্রভৃতি বিষাটসব পূর্ণকলবানী বর্ষের সজ্জারসমূহ বাগাই কক, কিন্তু কোন সভা ও শিকিত শিকারী এমন পণ্ড মনোহর উচ্চতর প্রকৃতি নষ্ট করিতে চেষ্টা করে কিন্তু—তারা কিছুতেই দিব করিতে পারি না।

বহুবর্ণ বিজ্ঞাপ্তির মধ্যে একটি সম্মান আছে—পাকাতা পতিতগা বাহার মাধবণ করিয়াছেন 'এলওয়েস লুড্' জিহাজি অর্থাৎ 'এলওয়েস লুড্' সূর্যবানী শিবিজাতীয় পাখী। এই সম্মান্য অত্যন্ত পণ্ডায়। ইহাদের আকার বৃদ্ধি এবং বর্ণ বৃদ্ধি। বহিষ পুঙ্খের পালকগুলি নীল ও কক এবং ইহাদের উপর

সত্ত্ব আভা। কর্ণাচ্ছাদক পালকগুলি দুইবিধে দুইটি পুঙ্খের আকারে গলিত। এইজন্যই নাম লুড্‌বানী। আখাদের উক্তের এক তিনতের দক্ষিণে অবস্থিত 'আখর ও শিবনী শৈল-শ্রেণী' আখায় অভিহিত বিষাটসব পুঙ্খের এই লুড্‌বানী শিবি জাতীয় পাখী দেখা যায়। আখরা ঐ অঞ্চল সত্ত্বকালে এক শিবনী বর্ধার পুঙ্খ এইপ্রকৃতি একটি পক্ষী দেখাছিল। একজন আখর শিকারী একদিন এইজাতীয় একটি পক্ষীকে দিয়া মন, মারিয়া আনিয়াছিল।

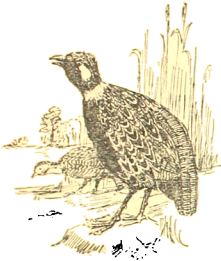
উক্ত-ভাষ্যের বিষয়ান্তরেই পুঙ্খের শৈলবাসগুলি ও গাভার ফিট হইতে ১ গাভার ফিট পর্যন্ত উচ্চতায় অবস্থিত। আখরা এই সকল শৈলবাসের অধিকাংশই পর্যটন-ব্যাপারে



শব্দ-পাখক সত্ত্বপুঙ্খ-পরিপূর্ণ নীচে বসিয়া আছে

মিয়ারি এবং উহাদের পার্শ্বতঃ পরিবেশসমূহের সত্ত্বও পরিচিত হইয়াছি। উক্ত-পক্ষী সীমাত ও কালী হইতে আসা ও উক্তর ত্রাণ পর্যন্ত সময়ের সময় নানাপ্রকারে বিভিন্ন বিভিন্ন আখাদের দৃষ্টগোচর হইয়াছে। আখরা স্থানে স্থানে পাকাতা এক সৌন্দর্য শিকারীদিকে বৃদ্ধি ধর-সত্ত্বের প্রকৃতি অত্যন্ত বাহিত হইয়াছি। কোক্লা, কলিঙ্গ, চীং এবং মোনাল—এই চারিজন্য শিবি জাতীয় পাখী (পুঙ্খের বিভিন্ন বিভিন্ন গুলি ছাড়া) আখরা বিষাক্তির পক্ষি সীমাত হইতে পূর্ণ-সীমাত পর্যন্ত পর্যটনের সময় দেখিতে পাইয়াছি। মোনাল এবং কোক্লা, বিশেষ মোনালগণ লীর্ষতের সেরা-কালে পরিপূর্ণ নিবন্ধ অধ্যয়নীয় নিবৃত্ত বকে বাদ করিতে ভাবনায়। চীং এক কালিঙ্গ অধ্যয় অধ্যয়কৃত হৃত অধ্যয়কৃত অবস্থান

করে মধ্যে মধ্যে পাইনপাশপাশেই এবং বোভোডেডুন ইক-  
বৌধি—বন্যাদিও এইরূপ নৃক অংশই আশ্রয় এই দুইটি সপ্তাহকে  
সেখানে পাই। যে সময় স্থান বহুদূর পর্যন্ত বৃষ্টি



চিত্র

—উহারে মধ্যে এইরূপ পক্ষী আছে। লক্ষ্য হইল। কারণ,  
কোন নির্দিষ্ট জাতীয় পক্ষীই লোকলোভের গোচরীকৃত হওয়া  
পছন্দ করে না।

মোনাল ৭ হাজার ফিটে নীচে পর্যন্ত আছে না। কোক্সা-  
গিপক ৮ হাজার ফিটের নীচে নামিতে দেখা যায় না। চীম ও  
ফালিগা ৭ হাজার হইতে ৮ হাজার ফিট পর্যন্ত উচ্চতায় দেখা  
যায়। বর্ত্তমান কালে উহা অল্পে অল্পে নিম্নে নামে। পশ্চিম  
হিমালয়গামী বহুদেশের অংশকা পূর্ব হিমালয়গামী বহুদেশ উচ্চতায়  
হানে অবস্থান করে। উহার কারণ—পূর্ব হিমালয়ে একদল  
নিম্নদেশে উচ্চতা হাজার হাজার ফিটের প্রাচুর্য  
যে, নামিলে বিপরীতে হয়। সাধারণতঃ বহু। বেশপ বর্ষ-  
বৈচিত্র্য-বিষয়িত পক্ষ্যপালী হইয়া থাকে, চীমপাশেই তাহা নহে।  
তবে ইহাও বিচার্যক না। শিবি জাতীয় পক্ষী অস্ত্রই হইবে।  
উহারে বৈচিত্র্য লক্ষ্যমান লক্ষ পুঙ্খ এবং মজবুৎ বয়োজ দিয়া।  
প্রায় সমস্ত হিমালয়ী চীমের আসবাব কিছু কোন কোন অংশেই  
ইহাশিগকে লক্ষ্যগত লক্ষ্যবস্তুতে বাস করিত দেখা যায়।  
আহার্য আহরণের প্রথিমা দেখানে অধিক দেখানেই ইহায়া  
বেদী বাস করে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। শিমাঙ্গণ দেখানে

হেটে হেটে পাহাড়ের আকারে গাঁড়াইয় আছে এবং উহারে  
পাহাড় নামা বহু অংশ। আশপাশের পক্ষী কথিত্যে, অধিক  
অন-পরিষ্টিত বহু বহু যোগ বহিরাহে—হিমালয়জাতীয় এইরূপ  
অংশই ইহায়া পছন্দ করে। তখন পুঙ্খ ইহায়া থাকে না, দেখানে  
আহার্য আহরণের জন্য উচ্চতায় প্রবিধানক দেখানেই  
ইহায়া থাকে। শিমাগীরের মাধ্যম উচ্চতায় পাহিলে চীম  
লক্ষ্যবস্তুতে পক্ষী হুপ করিয়া এক জাগরণ বহুদূর বসিয়া থাকে।  
ইহাতে অনেক সময় আশ্রয় বৈধের পর্যন্ত আশ্রয় পাই। তাহ  
পক্ষ প্রযোগ পুঙ্খ মজবুৎ সেই পুঙ্খইহায়া স্থানটি হইতে  
সংবেগ এবং লক্ষ্যে উচ্চতায় আসিত করে। উপরে না দিয়া উচ্চতায়  
নীচে নামিয়া যায়। এত বেগে উচ্চতায় যা, শিমাগীরে আসিত  
বা সুস্থ বৈচিত্র্য তাহাও লক্ষ্য পাইতে পারে না।

পশ্চিম হিমালয়ে মোনাল, কোক্সা এবং ফালিগা—এই  
ত্রিবিধ বিচিত্রতা বহু জাতীয় বিহীনমতে আশ্রয় প্রাপ্ত প্রথিমা  
সেখানে পাই। অস্থূল অধিক ও আশ্রয়তা দেখানে পাইয়াছে  
সেখানেই ইহায়া বাস করিয়াছে। আশ্রয় শিমাগীরে অবস্থান-  
কালে ঐ স্থান হইতে প্রায় ৩০ মাইল দূরে বিধাষিত একটি  
অংশে মোনালজাতীয় অত্যন্ত মনোহর বহু লক্ষ্যবস্তু দেখিয়া-  
ছিলাম। আশ্রয় বৈধবিশ্বপালী পক্ষের জন্য এই পক্ষী শিমা  
কথিবার কথন শিমাগীরের মনে অত্যন্ত প্রিয়। ঐ সময়  
শিমাগীর হইতে দুই মল শিমাগীর ঐ অস্ত্রগাই মোনাল শিমা  
কথিবার মজ দিয়াছিল। একটি মলে তবু যেতাত এবং একটি মলে  
পার্বত্য কোন ব্যক্তার নৃপতির লোকজন ছিল। পক্ষী প্রেই  
চীম যাহা মোনালের বহু মনোহর পক্ষীর দিকে আকৃষ্ট হইয়া  
উদ্যমিতক লক্ষ্য করিয়া বহুত হইবে, না তাহাশিগকে নিষ্ঠুরতাবে  
নষ্ট করিতে চেষ্টা করিতেছে। পৃথিবীর মধ্যে অতি সুস্থকায়  
জাতি গার্ড নামক পক্ষীর প্রায় বৈধবিশ্বপালী পক্ষ আশ্রয় কোন  
পক্ষীর নহে। পক্ষের অসুস্থ সৌখ্যে হাদি বার্তা হাজা আর  
কাহারও সহিত মোনালের জুলাই করা চলে না। এই সময়  
মদ্যেয়ম বিচিত্রবর্গে বিহীনমের লক্ষ্যে নীল ও বেগুনী রং  
জায় পালক মণি-মণিকায়মিত্ত বহুদূর পক্ষিমের বহু বিস্তারন  
বহিরাহে। বর্ষবেশের পালক লক্ষ্য ও বর্ষবর্গিত। পুঙ্খ মোনাল  
যখন পার্বত্য উপত্যকা উপর দিয়া সুস্থক শিমা হাজা কথি  
উচ্চতায় বহু এবং বর্ষবর্গিত হাজা নামকবিশিষ্ট পক্ষ ও  
পুঙ্খ উপর প্রতিকলিত হইয়া বহুদূর-বহুত বা বহুত বলিয়া  
মনে হয়, তখন লক্ষ্য লক্ষ্যই বিহীনমের লক্ষ্য প্রকটিত হইয়া উঠে।  
উচ্চতায় সময় বাহুজাতীয় পক্ষ্যবাহে একপ্রকার বিচিত্র পক্ষ

সম্ভব হয়। সুখ্যকোষাদিত-পক্ষ যোনালেশ্ব মনোজ নৃত্রি  
 যিনি না বৈদ্যোদেহ, তীরাতে বর্ণনাথ সাধায়ে ঐক্য বৃত্তান  
 বাস না। কোম বর্ণবিষয়ে বিশেষ নৃত্রপদে শিল্পীমত সাধা নাই—  
 পটের গায়ে এমন হই কলারিতে এমন বর্ণ-বাস, বর্ণ-বৈচিত্র্য  
 কুটাইয়া বৃত্তিতে। যেন একটা বহুবর্ণে বিভিন্ন নামাকরে বচিত  
 ঐক্যজালিক-বচিত মাতা-বিভব উদ্ভিগ্ন হাইতেছে। প্রত্য  
 অপূর্ণ সূত্রী-কৌশলে উচ্চ প্রেক্ষিত উচ্চারণ কথিত কথিতে  
 চমকিত চিত্রে বিশ্ব-বিস্তারিত চমকিতে যে বিচিত্রকার চিত্রিত  
 বিশ্বকর্মে যেথিতে হয়, মাহুৎ কেমন কথিয়া  
 তাগকে লক্ষ্য কথিয়া বৃত্তাক্ষরক অপ্রিয়োলক  
 নিষ্কল কথিতে পাবে—ভাষা আদ্য  
 কিছুতেই জবাবন কথিত পাঠি না।  
 বিশেষতঃ কুতোপাসক চিত্র পক্ষে এই  
 অপূর্ণ অমার্জিত। উপাত্ত বেবতা  
 পদমুখ্য বসিয়া বাহ্যে পাখা মানসে  
 শীর্ষে বাহ্য কথিয়াছেন, দেই মধ্যকে  
 বাহ্যের ভেট্টা কোন চিত্র কথ্য কখনই  
 উচিত নয়,—আদ্য কথেকটি ব্যক্তিকে এই  
 কথ্য বসিলে ভাষা লক্ষিত হইয়া এই  
 কথ্য কার্য হইতে পটভিত্ত হইয়াছিল।

আদ্য বিশ্বকর্ম অবস্থানকালে শিতাই  
 পার্শ্বভী আদ্য বাইতায়—প্রথমতঃ  
 যোনালেশ্ব মনোজমুখি বর্ণনায় জগই।  
 আদ্য পূর্ণেই শিল্পী, মনোজ মনোজ  
 নৃত্র মনোজ মনকে আকর্ষণ কথিবায় জগ।  
 মনোজ মনোজ মনোজ মনোজ এই  
 মনোজমুখি নৃত্র মনোজ হইয়া থাকে।  
 মনোজমুখি যোনাল পূর্ণমণ্ডল কথনীক-কাত  
 কথনকে মনোজমুখি মনোজ, পূর্ণমণ্ডল  
 পালকমুখি উচ্চ ও প্রাণবিত্ত কথিয়া এক  
 মনোজ মনোজ মনোজ পালকমুখিক  
 বাজা কথিয়া যোনালী মনকে নৃত্র কথিবায়  
 মনোজ মনোজ নৃত্র আদ্য কথ্য। একবার এককে, একবার  
 এককে আদ্যই বাইতায় তালে তালে না কথিয়া নৃত্রাকলা-  
 কৌশলে পথ্যাক্টা প্রাণন কথিতে জগ। এই নৃত্র অকথ্য  
 বাহ্যে যায়। পার্শ্ব মনোজ মনকে যোনালেশ্ব মনোজ নৃত্র

আদ্য মনোজ কথিয়াছিল। যেথিলে আদ্য হইতে জগ।  
 বৈক্য-কথিব ভাষায় মনোজ উচ্চ জগ—মনোজ না চিত্রিত  
 ভেল।' পক্ষ ও পূর্ণমণ্ডল পূর্ণমণ্ডল বর্ণ-বিত্ত অমলক মনোজ  
 হয়। যেন মনোজ মনোজ মনোজ মনোজ মনোজ  
 নৃত্র হইয়া উদ্ভিগ্ন।

শিতাটী মনোজ পদ্যাবান করিলে যোনাল চিত্রাক্টা এই  
 উচ্চ মনোজমুখি উদ্ভিগ্ন মনোজ। শিতাটী মনোজ মনোজ  
 কথ্য, যেন শিতাটী মনোজ মনোজ মনোজ মনোজ।



যোনালেশ্ব মনোজমুখি—মনোজমুখি

হইতে যে তাহার মনোজমুখি উচ্চমণ্ডল মনোজমুখি  
 উচ্চমণ্ডল কথ্য। মনোজমুখি মনোজমুখি ও মনোজমুখি  
 মনোজমুখি মনোজমুখি, উচ্চ উচ্চমণ্ডল মনোজমুখি  
 মনোজমুখি ও মনোজমুখি। মনোজমুখি মনোজমুখি

আধাঙ্গিক ভানাইয়াছিল, মোনাল পিকার কথা সহ্য নয়, খুব চণ্ডাও তাহারা। পিকারীর অস্ত্রশালক কোন্‌ ভিত্তি হইতে আনিয়াই সম্ভবনা, তাহা বুঝিয়া তাহারা সেটিকে এড়াইয়া এমন ভাবে পালিয়াই যাব যে, তাহাদের দুইদিকের পবিত্র আশ্রয় পাই।

কোন্‌কালেই বৈজ্ঞানিক নাম 'পুন্ড্রাণিয়ার ম্যাক্সিমেলি'।

ইহাওও কিছাট্ট বা শিবি জাতীয় পানী ঘটে, তবে বাস মধু জাতীয় পক্ষীসংগে অপেক্ষা ইহাদের পুন্ড্রা ভিত্তি বর্ধিত এবং পুন্ড্রা পুন্ড্রা। পুন্ড্রা বর্ধিত হইলেও বর্ধকের শিবিটি পুন্ড্রা এবং বর্ধকের পালকগুলি বনভুক্ত। বিভিন্ন অঞ্চলের কোন্‌কালি বিভিন্ন-বর্ধ-বিশিষ্ট, এই সত্য জানিয়া প্রবণতাপ্রণে উপলব্ধি করিয়াছি। আকগামিহান এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের অংশে যে সকল কোন্‌কালি বাস করে, তাহাদের বর্ধ এবং মেগাল ও পিকারের কোন্‌কালির বর্ধ এক নহে। কোন্‌কালির বর্ধ সাধারণতঃ দুই। পক্ষীয়ে নিরাপে জটিলতায় তার বাসায়। কতকগুলি বর্ধ বাসাতেই বিস্তার। দুই হইলেও পুন্ড্রা পালক-গুলির উপর একপ্রকার কুক বেগ বা চিত্রাবলী বহিষ্কার। এই কুক-বর্ধ চিত্র-গুলিও পুন্ড্রা একরূপ নহে। কোথাও ইহারা বন বিভূত, কোথাও বা অধিক বিভূত ভাবে বিরাচিত। মেগাল-বাসী কোন্‌কালির প্রায় সর্বত্রই পালকগুলিতেই এই কুক-চিত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে।

সিমলার নিকটবর্তী অধ্যাক্ষলে মোনালের ন্যায় কোন্‌কালিও প্রচুর পরিমাণে দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই প্রদেশের সাত্তে সাত হাওয়াই হইতে বটে হাজার কিট উচ্চ দেবদেবতা এই জাতীয় বিস্ময়ের বাসগৃহ। অংশে যেখানে নিবিড় দেবদেব ইহারা থাকে না। অংশেও বৃদ্ধাঙ্কিত পক্ষিদের অংশই ইহারা পালক করে। বৃদ্ধাঙ্কিত হইতে আশ্রয় আশ্রয় সহ্য হয়। বিশেষতঃ কথা বুদ্ধিতে পারিলেই ইহারা বনানীর নিবিড়তায় অংশে প্রবেশ করে। এই প্রদেশে পক্ষীসংগের ভাট্টাও চিত্রাঙ্কিত। পক্ষীসংগের যেহে বর্ধ মোটামুটি বাল্যী। পিকারের নিকট ভানিয়া, মোনালের নত কোন্‌কালি পিকার কটন নহে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত ও সিমলা-অঞ্চলের পিকারীরা এক একদিন অনেকগুলি (এইজাতীয়) পানী পিকার করিয়া থাকে।

বর্ধ-বিশিষ্ট এই অঞ্চলের ন্যায় পুন্ড্রাবাসী একপ্রকার শৈলবাসী শিবিজাতীয় প 'এক কালিক আখ্যায় অভিহিত করা হয়। কালিকদের খুব লাল এবং শরীর কুক ও বেতবর্ধ পালকে আচ্ছাদিত। ইহাদের দেহ জরি, অধ-প্রায় পুন্ড্রা ও পশ্চিমালী, পক্ষ বর্ধ লাকার এবং অংশাকৃত খণ্ডে।' পুন্ড্রা পক্ষীর প্রত্যেক

পায়ে কটকট প্রত্যেক বিভবান। কোন কোন প্রদেশে কালিকের পায়ে দুটো কটকট দৃষ্ট হয়। এই কটকগুলি পক্ষীর আশ্রয়কার পক্ষে পক্ষিমালী পালক করিয়া থাকে। প্রাণ-তত্ত্ব-কোন্‌কালি ইহারা বর্ধের ভাট্টাও প্রাণ-তত্ত্ব-পক্ষীর পুন্ড্রার ন্যায় পালক করিয়াছিলেন। পক্ষির হিমালয়ে যে প্রদেশে কালিক সাধারণতঃ বেগা বাস, তাহাও পিকার 'বেতবর্ধ কালিক' বলা হয়। বৈজ্ঞানিক নাম 'কেনাইয়াস ম্যাক্সিমেলি'। এই বিভিন্ন বিবরণ-বিবরণে চিত্রাঙ্কিত। এক একটি পুন্ড্রা পক্ষীর ওজন দুই পাউন্ড হইবে। বেত কিবা-কিবে বাল্যী পালকে পক্ষিপূর্ণ লোনাঙ্কিত বর্ধ দেখা ইহাদের বৈশিষ্ট্য। বর্ধক, পুন্ড্রা এবং পুন্ড্রা পালকগুলির নয়নয়ন নীল আভা নীল-মি বা নবনীতবেগে তার একান্ত চিত্র-তপন। বেগিলে কুক-অংশের অধিকার বর্ধীরা বেগা অধিকতর চিত্রাঙ্কিত। অংশে প্রায়ের বিস্তার তার দেখাযায়। বর্ধী তার আচ্ছাদিত-বিশিষ্ট নিরাপে পালকগুলিতেও বেত বা বেত-বাল্যী বর্ধের আভা সাধারণতঃ উপরে বিভবান বহিষ্কার। প্রদেশে চারিধারে বিরাচিত সন্ধ্যের তার বর্ধবর্ধক অত্যন্ত সন্ধ্য। পক্ষীর বর্ধ প্রায়ই এই তার বাসায় এবং পক্ষীর পক্ষীর তার দেখা যায়। এই শিবির বর্ধ শিবি আখ্যায়।

কালিক কোন্‌কালি অংশে বৈশিষ্ট্যের নিরূপণ তার বাস করে। নিবিড় অংশে বা অংশে কালিক ইহারা লুকাইয়া থাকে এবং নিরাপে আলো ছাড়াই সহজে হানাতের ব্যতীত চায় না। কোন্‌কালি বর্ধ করিলে কালিক পক্ষীর মত সন্ধ্য (সুতলেই) বর্ধিত হয় এবং বর্ধ উপলব্ধি থাকে না—তখনই পক্ষের সাহায্য লইয়া উদ্ধিতে আশ্রয় করে। সুতলে ক্ষতপতিতে বর্ধবান কালিক এক অপরূপ দৃশ্য। বৈশিষ্ট্য তখন পানী পূর্ণে কখনও পিকারীর সহিত পরিচিত হয় নাই, তাহারা দুইপে বর্ধ অংশাকৃত বর্ধী হইয়া পক্ষের আলো এবং পূর্ণক উজ্জ্বলমান হয়। ইহারা আচ্ছাদিত পক্ষীর মত বর্ধবান করিয়া একপ্রকার ভীম ভিষ্ম-ভাড়া উচ্চারণ করে। উদ্ধিতে উদ্ধিতে কোন উচ্চ কুক-পালক উপবেশন করে এবং অত্যন্ত উদ্বেগিত না হইলে এই কুক হইতে নামে না, যা কুক-ভাড়া যায় না। নির্ভর পিকারীর সহজে সহজে শিবির পক্ষি শিবির করিয়া পক্ষীর কুক হইতে অন্যতরং যায় করে। বর্ধক পক্ষীর অত্যন্ত বর্ধ হইয়া থাকে এবং পিকারীর সাধারণ কুক-পালক





একপ্রকার বস্ত্র যোগ্য দেখা যায়। যাদব-উপবীশ এক দেবীর  
বস্ত্র যোগ্য প্রচুর পুত্র হয়। বস্ত্রিণ ভাষ্যতঃ, ত্রিশব গোলাবতী-  
তীরবর্তী অবশ্যসমুদ্রে এবং সিংহল দ্বীপে আশ্রয় বস্ত্র যোগ্য হাতীর  
পক্ষীনের কতিপয় সম্ভাষণ দেখিতে পাই। পাক্কাতা পণ্ডিতরা  
এক শ্রেণীর পক্ষীকে 'বড় ভল্ল কাইল' বা লাল ভল্লনী যোগ্য  
আখ্যা দিয়াছেন। আশ্রয় যে লক্ষ্য পুত্র-যোগ্য সাধারণতঃ  
কেনি, তাহাও ঐ শ্রেণীর বস্ত্র যোগ্যের সংসদ্য বলিয়া পাক্কাতা  
পণ্ডিত-বর্গ-অভিহত। তাহাজী বস্ত্র যোগ্যের হর্ষে নিবৃত্ত-তী  
গদ্যবল্লের চাহু লবিত প্রত্যক বেষ্টন্য ভিত্তি তৎসংগী বস্ত্র  
যোগ্যের উচ্চ লোভি বস্ত্রী থাকে। লাল ভল্লনী যোগ্যের  
শ্রেণী কতক মণ ভল্লসেতু তার হর্ষে। পুত্র বেষ্টনী এবং  
পুত্র সন্তান। ইত্যাদি জ্ঞান ও জ্ঞানী যোগ্যের দ্বারা বস্ত্রী সমস্ত  
পুত্রসন শাসক পরিচাল্য করে এবং অস্ত্রী-বর্গ যোগ্যে পুত্র-পালক  
ইলাত হয়। বস্ত্রিণ ও পণ্ডিত-ভাষ্যতঃ 'বড় ভল্ল কাইল' বস্ত্র

যল্লী যোগ্য ল্যাবক বস্ত্র যোগ্য-সম্ভাষণ দেখা যায়। উদাহরণ  
কছের পাখার লোমের দ্বারা একপ্রকার পর্যায় আছে। এই পর্যায়  
পাইবার জন্য এই সম্ভাষণের-পাকীকে পূর্ণকৈ দাবিয়া, ফেলা হইত।  
পাক্কাতা এই পক্ষী-বস্ত্র যোগ্যে ইত্যোশে চালান হইত। পবে  
আইএম সাহায্যে এই বাণাশ বস্ত্র করা হইয়াছে। বস্ত্র যোগ্যের  
বল্লী-বর্গ একটী কৃক-পুত্র অংশে বাতিয়া তৎসংসদ্য বুদ্ধ করে।  
এই বুদ্ধে অনেক অধিকার হয়। একবার বস্ত্রিণ-ভাষ্যতঃ এক  
বল্লী-বর্গ লাল ভল্লনী যোগ্যের বুদ্ধ আশ্রয় দেখিয়াছিল।  
যাঙ্গর অকলে (যাঙ্গর উপবীশ এবং বীশপুত্র) যোগ্য পুত্রী সেই  
যোগ্যকে লড়াই দেখান হয়। পবে শ্রীর বাণাশ। আশ্রয়  
যাঙ্গর-উপবীশ ও বীশপুত্র সম্ভাষণে এই লড়াই বস্ত্র-  
কেনিয়াতি। এই লক্ষ্য যোগ্য পুত্রপালি হইলেও বস্ত্র যোগ্যের  
বস্ত্রী বুদ্ধ এবং বিচিরাঙ্ক। দেখিলে মনে হয়, অতি অল্প দিনে  
আশ্রয় যোগ্য পুত্রপালিত যোগ্যে পণ্ডিত হইয়াছে।

## তোমারে হারায়

### শ্রীরমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

তোমারে হারায় পেয়েছি অনেক কিছু—

দেখি তারে যাবে পূর্বে দেখিনি চেয়ে;

কত তপ-তপ অগতে কত না বেয়ে,

ল্যাক্ষ্যতা চলে নয়ন করিয়া লীচু।

কেহ চকন;—ভানে নাক অভিনয়,

পথ দিয়া যায় চেয়ে চেয়ে—হাসিভূষণ—

কণিক হেলিলে তুলি যেন মালা চুখ;

নুতন বৃত্ত মনে আনে বিশ্বয়।

হলিন অধরে শালীনতা উঠে স্মৃতি,

লগ্ন বস্ত্রতে দুর্গীর উদ্বেগ;—

পুমানো বহায় অভিনব পরিবেশ;

নুতন আবেশে তপ্ন নয়ন ছুটি।

মনে ছত যৌব আশ্রয়-যেহা সব—

অরশায় থাকে তপের অস্ত্র মাই;

ভিতরে আঙন উপরে তরোতে চাই;

বুকেতে রানিবা কুকেতে প্রোবেশব!

ঐ যে পানিপ বহু কাত দির—

যেখি তারে যোগে সন্তুভতা আসে বীথে,

যে জন কেঁদেছে শোকের অশ্রু-বীথে

সে জন হাসিছে ক্ষুব্ধ-বীথী বীর।

বরে পেছে কত ভেঙেছে কৃক-লতা—

নুতন কৃকে এগেছে কিয়দা-প্রাবী,

চুত-বল্লরী লতারেছে নব শাঁখী—

বনবর্ষের লীগে যেন আবুলতা।

জীবিতা প্রেমদী আভিলে আনায়ে ঢাকি'

বেধিতে আনায়ে হাও নি কিছুই ঠিক,

নব সঙ্গীত পায়ে পুরাতন শিক,

নুতন অগণ বেধিতে পুমানো আঁখি।

তোমারে হারায় পেয়েছি অনেক শ্রিয়া—

যতদিন ছিলে দিয়াছিলে প্রতিদিন,

ঐহণে কেগনি বাড়িয়ে গিয়াছি বণ;

মহিমাও কুনি গিয়াছ অনেক দিয়া।

## অনাগত

জীবলা দে

সন্ধ্যার পর অসিত তার রূপ আত্মসম্মত দেখতে একলিয়ে দিয়েছে একটা ডেক-চেয়ারের উপর। আর ওর চেতনার পাটে চিত্রার আঁকাবাঁকা কত রেখাই যে উঠে খেলো যাচ্ছে, তা কে জানে! বনীর এক মাত্র সন্ধান সে, কিন্তু ভগবানের বী অভিসম্পাত যে ছিল শুধের বংশের উপর, সে কথা কেউ জানে না। তাই বুঝা বরেন্দ্র সবকিছু ঐশ্বর্য্যের অবিকারী হ'লেও আজ সে লোকসমাজের বাইরে এসে জীবনের বাকী কয়টা দিন কাটিয়ে বেঁচে থাকা করেছে। অনেকই হয়তো বলবে—কেন এমন করে লুকিয়ে থাকা? কিন্তু যে ভুল একদিন পূর্ণপুঙ্খ থেকে হয়ে এগিয়ে, আজ এই বিংশ শতাব্দীর প্রাচ্যে বাস করতে গেলে আর সে ভুল করা ঠিক হবে না। তাই সে যেদিন বর্ষা জ্ঞানচক্রে মেলে পৃথিবীর পানে চেয়ে দেখলে, তখন থেকে বংশের এই কুৎসিত দুরারোগ্য ব্যাধির হাত থেকে রেহাই পাবার একমাত্র উপায় বুঝে পেলেন নিজেকে লুকিয়ে রাখা। তাই, বাবা-মার মৃত্যুর পরই কোলকাতার বাড়ী-ঘর গাড়া দিয়ে চলে এসেছে ছোটনাগপুরের কাছে ছোট্ট একটা পাহাড়ের ধারে। সম্মিষিত মনস্তত্ত্বাধীন মনন করে যে কাটো—জা কেউ জানে না। এমনি একটা দিনে অসিত—ভাবছিল ভগবান আর তাকে কতদিন বাড়িরে রাখবেন! এক পিলীয়া এখনও জীবিত, তিনিও ঐ হালস ফুঁটাবার হাত থেকে রেহাই পান নি। ছেলে-বোলায় থিয়ে হয়েছিল কিন্তু বস্তুরবাজীতে বধন সকলে এ কথা টের পেলেন, তখন থেকে তাকে সেবারকার সচর শেষ ক'রে আবার ফিরে আসতে হয়েছিল বাবা-মার কাছেই। অসিতের ঠাকুরদার কাছেই বিশ্বাসিনীর অধিন কেটে পড়ল। কিন্তু একে একে বধন দে তাইপোতা হাতা আর কেউই জীবিত রইল না, তখন উপায়হীন অসিত পিলীয়াতে পুরীর একটা কুঠিহানপাতালে ভরতি করে থিয়ে মিষ্টান্ন চলে এসেছিল। কিন্তু এ অস্থায়ী ভিনি আর থাকতে রাজী হলেন না। তাই তজ্জিপোর কাছে ফিরে এসে বললেন—অসিত, তুবিই বা কেন এমন করে নিজের জীবনকে বিপর কর্তে বলছ? তার চেয়ে বেশি

ফিরে গিয়ে বিয়ে-বা করে সংসারী হও, অনেক বাড়ি পাবে। অসিত বলল—বল কী পিলীয়া! তোমার নিজের কথা ভেবেও তুমি এ কথা মুখে আনলে? না না, তা হ'লে পারো না! এ কলঙ্কের বোতা আর না বাড়িয়ে যাওঁ এইখানেই এর শেষ হয়ে যায় আমি তাই করব। কতদিকের জ্বরের বোহে আর একটা মেয়ের সঙ্গরণ করা কোমি বতেই উচিত নয় পিলীয়া। বিশ্বাসিনী তাইপোর কথার মর্ম বুহতে পেরেও বললেন—সে আর কী হবে বাবা! আমি ছিলাম বেহে মাহুয! আমার জীবন নষ্ট হয়েয়ে বলে কি তোমার হবে? না পিলীয়া, তোমার যা ঘটেছিল সে তোমার ইচ্ছায় নয় কিন্তু আমি যদি এ অস্ত্রায় করি তা হলে সে হবে আমার ইচ্ছাকৃত পাপ। পিলীয়া! আর এ কথার প্রতিবাদ কর্তে পারলেন না। তাকে আবার ফিরে যেতে হ'ল পুরীর সেই আশ্রমেই।

অসিত ঠিক করে রেখেছে, তার মনস্ত সম্পত্তি বিচে থাকে তার মন থাকে এই সাক্ষ্য বহিতে কই পাচ্ছে তাদের সেবার—দিনের পর দিন ওর দেহের রং যেন জীবন লাগে হয়ে যেতে লাগল, তাই ভক্তায় পারের মনত থেকে একেবারে সাদা হয়ে বাবার জন্ত জুখু বিলে। হাতে মলক সে এখন তার নিজের চেহারা আরনার বেঁধে তখন চমকে ওঠে। এ তো রূপের কাহি নয়, এ যে তাদের বংশের কলিমা! আর সে পারে না, মনে হয় আত্মহত্যা করে সব জীবনের সমাপ্তি করবে। বতবিন আর এই তরাবহ চিত্তা তাকে পাগল করে তোলে।

তখন সবমাত্র সন্ধ্যার বী তার কালো গুত্তনাখানা থিয়ে হরার কুকে নেবেছেন আর হিরাতে তার শেষ বসি-টুকু হুড়িয়ে থিয়ে বিহার মিষ্টান্ন, ঠিক এমনি মনত পূরে ফিসের যেন বাজনা খোনা গেল। অসিত বাইরে এসে দেখল একমল সাজ-পোষাক পরা লোক, আর তাদের নকে হাতীর উপর বসে রয়েছেন একটা পরমা সুন্দরী মেয়ে। যেহেতে দেখতে তারা অসিতের ছোট্ট বায়োজীয়া প্রায় কাছেই এসে পড়ল। অসিতকে বেঁধে তাদের একমল লোক এগিয়ে এসে জিজ্ঞাস করল—এ বাড়ীতে কে থাকে?

অসিত বলল—এ-বাকী আমার এবং আমিই থাকি।  
 যেখানে যেখানে তারা সকলেই অসিতের কাছে এসে  
 পৌঁছাল। হাতীর উপর যে ঘোড়ার বসেছিল—সে একপুটে  
 অসিতের দিকে ছেঁকে ছিল! তারপর সেখানে এসে সেই-  
 বাকীই তাদের তাঁর কাটাবার হুকুম দিলে। ঘোড়ার  
 পেছের বনে হ'ল বেশ একটু দখল বরগেল, সঙ্গে যাব হর  
 তার দলী ছিল।

অনেকখানি জাঙ্গা বিয়ে তারের তাঁর বাটানে  
 হ'ল। অসিত কিন্তু খেপ অস্বস্তি বোধ করল। কারণ,  
 নির্জনতাই তার খেঁপে পড়ল ছিল, কাজেই এত দোক  
 আর তাদের এই ঐশ্বর্য বেন তাকে অস্বস্তি করে তুলল।  
 সেদিন রাত্রে তার ভাল ক'রে ঘুম হ'ল না। ওর চাকর  
 বনিয়া বলল—‘দাদাবাবু, তুমি অত বিরক্ত হচ্ছে কেন ?  
 ওরা এতিকে শিকার কর্তে এসেছেন ? ঐ যে, ঘোড়ার  
 পেছের, উনি তোমার সৈন্যের নাকি রাজার ঘের ? এখন  
 বাবা-বা কেউ নেই। কাজেই ইনিই এখন দরওয়ান, তাই  
 সব করে এসেছেন শিকারের—’ অসিতের কিছুই ভাল  
 লাগল না। কি হবে তার এসব ওনে ? সংসারের যদি  
 বাহুব হ'ত সে, তাহ'লে হর তো কাজে লাগত এসব  
 কথা। কিন্তু বাহুব বাহুবকে দেখে কখনই কথা না বলে  
 থাকতে পারে না। তাই অসিত ঘর না গিয়েও রাজকন্যা  
 এগিয়ে এল তার ঘর কাছেই—তারপর বান্ধবপরি-  
 চয়ের বয়ো ভিজ্ঞান। কখন—এ ভীষণ জনের কাছে  
 আপনি কেন থাকেন ? অসিত ছোট একটা উম্মর দিনে  
 তার ঘর ভাল লাগে। অসিতের জিজ্ঞাসা করার যেন  
 কিছুই ছিল না ? হর তো তার মত করলে এমন একটা  
 রাজবীর স্বর পেলে কত খুসীই না হর দোক। রাজকন্যা  
 সে-দিনের মত বিবাহ নিয়ে চলে গেল। পরদিন আবার  
 সে এসে অহোরাত্র আবার অসিতকে—চলুন না অসিতবাবু  
 আমারের সঙ্গে শিকারে ? জঙ্গলে যখন বাগ করেন এখন  
 ঘুম ভাল শিকার জানেন নিশ্চয়ই ? অসিত বাড় বেড়ে  
 জানার—তার ও সব ক'টি নেই, আর বনের পতঙ্গ,  
 তারের হুতা করার মধ্যে কি এত আনন্দ তা সে  
 তারকেও পারে না ? বিকলবনোদয় হয়ে রাজকন্যা  
 তার দলবল নিয়ে শিকারে চলে গেল। বনিয়া এসে

অসিতকে বললে—দাদাবাবু, তুমি এখন বোকা কেন ?  
 রাজবাকীর লোকেরা বলছিল রাজকন্যা নাকি কোন  
 পুরুষ বাহুবকেই পছন্দ করে না, আর কাউকে কোনদিন  
 বিয়েও করবে না। কিন্তু তোমার সঙ্গে এত ঈশ্বরী কি  
 করে আপন হল—তা ওরা ভেবেই পাচ্ছে না। আর  
 তুমিও তো মেয়েদের পছন্দ কর না, কাজেই হু'লে যদি  
 মনের মিল হয়ে যায় তাহ'লে বিয়ে যা করে সংসারী হও।  
 এক বরক দিয়ে অসিত বলে, তাকে আর বকতে হবে  
 না। কিন্তু পুরানো বাহুব-করা চাকর বনিয়া খটখাটী  
 পাঁকাবার জন্ত বেশ একটু ব্যস্ত হয়ে ওঠে। যেখানে  
 যেখানে রাজকন্যা শিকার থেকে ফিরে এল—এসেই  
 আসে অসিতের কাছে এসে বলল—সত্যি, আপনি ঠিক  
 বলেছিলেন, এমন করে পণ্ডিত্য করে কণিকের আনন্দ  
 অস্বস্তি করার মধ্যে কিছুই নেই। আমি মাত থেকে  
 জন্ম নব্বু হয়েছি দাদাবাবু। অসিত একটু হেসে উত্তর  
 দিলে—সে কি, আপনি এতদিনের সবটা এত ভাড়াভাড়ি  
 বিসর্জন দেবেন ? রাজকন্যার পক্ষে এটা কিন্তু ঠিক হ'ল  
 না। রাজকন্যা নিরবে ওর কথা বলে নেই।

এমনি করে হর তো হুঁচী হুঁচ-হুঁচীর গোপন  
 জালবাজি রাইরে না ছুটে উঠলেও অন্তরে নিবিড় হতে  
 নিবিড়তর হয়ে উঠেছিল। কিন্তু এ কথা কেউই প্রকাশ  
 করতে পারে না। যে-যেই অসিত তার অস্বস্তি আর  
 সে আশা চিরদিনের জন্ত বিসর্জন দিয়েছে, আর রাজকন্যা  
 রহা কোন পুরুষের কাছেই নিবের বস্তা বীকার করবে  
 না—এই ছিল তার প্রতিজ্ঞা! কিন্তু এতবড় প্রতিজ্ঞাও  
 মুক্তি লাগ তার থাকে না।

এ-দিকে রাজপুত্রী থেকে দুই বরী বর পাঠার—রাজ-  
 কন্যা আর কতদিন শিকারে থাকবেন ? রাজকন্যার সখী  
 সাবীরা তাহে রাজকন্যা কি রাজকন্যাকে সঙ্গে না নিয়ে  
 রাজপুত্রীতে কিরবেন ? কিন্তু কেউই কোন কথা  
 বলতে সাহস করে না। রাজকন্যা অসিতকে ডেকে  
 বলে—জানেন অসিতবাবু, আমারের তো প্রুথার ফিরে  
 যেতে হবে ! অসিত একটু রান মুখে উত্তর দেয়—কবে  
 যাবেন ? আর না-ই যদি যান তাহেই বা ক'টি কি ?  
 রহা অনিচ্ছা সত্ত্বেও উত্তর দেয়, যদি রাজকন্যা না হোঁজাব

তা হলে না পেলেও কতি ছিল না, আপনার বস্তু অসুখেই  
কাজের নিত্য। সত্যি! কি সুখের জীবন আপনার।  
উত্তেজিত হইবে অসিত বলে তাই না কি? কিছ কেন  
বনবাসী হয়েছি—সে প্রশ্ন তো কোনদিন করলেন না?  
হ্যাঁ বলে—তুল হয়ে গেছে অসিতবাসু, মনে করেছিলাম  
হাঙ্গুরের তো খেয়াল হ'তে পারে? হুঃখিত হয়ে অসিত  
বলে—না হ্যাঁদেখী, এ আহার খেয়াল নয়। রাজকতা  
অধীর আশ্রয়ে প্রশ্ন করে—তবে বস্তু না অসিতবাসু, কেন  
আপনি এখানে থাকেন? তবে শুধু হ্যাঁদেখী, আমি  
নিজেকে হাঙ্গুরের নজর থেকে দূরে রাখবার জন্য এখানে  
আছি। বাবা দিবে রাজকতা বলে হাঙ্গুরের লক্ষ আপনার  
ভাল লাগে না? না—হাঙ্গুরের সঙ্গ পাবার যোগ্য হয়ে  
আমি পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিনি—আমাদের এক পূর্ব-  
পুরুষ তাঁর খেয়ালের বশীভূত হয়ে সমস্ত হুঃখ বাহিরা  
লোকদের নিজের হাতে সেবা করতেন, তার কলে তিনি  
নিজে দারুণ কষ্টযোগে প্রাণত্যাগ করেন এবং সেই ব্যাধি  
বংশোদ্ভূতেরে আমাদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। বাবা  
জানেন না, তাঁরা হয় তো অনেক কিছুই ভাবেন, কিন্তু  
নির্বোধ বহুরের মধ্যে যে কতকগুলি নিরাক্ষর কলঙ্ক  
থাকতে পারে—সে বিচার উপস্থাপন করবেন কি না জানি  
না। অথচ হাঙ্গুরের কারে বাগ করতে হলে নিজেকে কলঙ্ক  
বলে নিজেকে সূঁচিয়ে রাখা হাঁড়া কোন উপায় আমি  
বুঝে পাই নি, তাই এই বয়সে বনবাসী হয়েছি। আহার  
এত রূপ দেখে আপনি প্রশ্ন বিনে চমকে উঠেছিলেন, সে  
কিছ আহার প্রকৃত রূপ নয়, সে আহার রূপের কালিমা।  
আশ্চর্য হয়ে রাজকতা বলে উঠল—সে কি? এত হুঃ আপ-  
নার নিজের নয়? অসিতের হুঃের কথা আপনা হতেই  
বস্তু হয়ে গেল। সে যেন জীবন অভ্যাস করেছে—এমনি  
ভাবে বাবা চিহ্ন করে বসে উঠল। আর তার চোখ দিয়ে  
অবিস্রাভ জল পড়িয়ে পড়তে লাগল। রাজকতা উত্তে-  
জিত হয়ে বলল—কীভাবে কেন অসিতবাসু? এ তো  
আপনার ইচ্ছাকৃত পাণেয় ফল নয়, আহার বনে হয়, এমনি  
করে না থেকে আপনি এ রোগের দ্বারা উপস্থাপন হয় তাই  
করুন। অসিত বলল—আমি অনেক চেষ্টা করেছিলাম  
কিন্তু সম্পূর্ণ বীরোগ হতে পারিনি, সেজন্য ডাক্তার আহার

ইচ্ছাকৃতভাবে দিয়ে সমস্ত পারের হুঃ একেবারে লাগা করে  
দিয়েছে। সব তখনও রাজকতা ওকে কাতর মিনতি  
ভানায়—যেন সে ওইই সঙ্গে রাজপ্রাসাদে গিয়ে থাকে।  
আর সেই সঙ্গে এ কথাও বলতে সে থিরা করে না যে,  
অসিতকে পক্ষিপূর্ণ বরণ করতের তার আগুতি নেই।  
কিন্তু অসিত তা হতে ধৈর্য না, দেও তিকা চেয়ে নেয়,  
তুমি আহার করা করো বন্য, তোমার লক্ষ বস্তু আমার  
চিরদিন থাকবে কিন্তু সে বস্তুদের দাবী নিয়ে করে তার  
কতি করার মধ্যে নয়, সে বস্তু দাবীকে হাঙ্গুরের দাবী  
বহুতের বা কিছু অসিত, তাইকেই বস্তু করে দেখে। তোমার  
আমার বাস্তবানে আর থেকে এই আশ্রয় সুখের হতে  
অসুখের হয়ে উঠুক—এই প্রার্থনা জানাই। বাবাদের এই  
কষ্টকের মোহকে দূর করতে হলে, তোমার দ্বিধা যেতে  
হবে সেই কষ্টের কর্তব্যের দাবী, আর আমার থাকতে  
হবে বনবাসী হয়েই—পারবে তো বন্য? দাঁত নেড়ে  
হ্যাঁ উত্তর দেয়—তাই হবে। তারপর কিরে আগে  
তার তাঁবুতে, সঙ্গে সঙ্গে সকলকে হুঃখ দেয় আশ্রয়  
দেয়ার ভানয়ে রাজপুত্রীতে কিরে যেতে হবে, যেন সকলে  
প্রস্তুত হয়ে নেয়। কেউ এ রকমের বস্তু করতে পারে  
না। কিন্তু সাহস করে কোন কথাই কেউ বলে না। সকলে  
তৈরী হয়ে অপেক্ষা করে রাজকতার অন্তে—রাজকতা  
আমার আগে অসিতের কাছে এসে বলে—অসিত বাবু,  
আমি তো জন্মলগ্নে পায়পাশবদ্ধ কষ্টের কর্তব্যের দাবী—  
...কিন্তু আপনাকে বেরবার জন্য কে রইল বস্তু তো?  
হুঃখি হলে অসিত বলে—আমার জন্য কেও না বন্য,  
আমার দেখে বনের পশুপক্ষী আর ইঁদুর। এমনি করে  
পূর্বকালের প্রায়শ্চিত্ত সাধা হলে পরকালে নিশ্চয়ই শাস্তি  
পায়। তাই হোক অসিতবাসু, আপনার বহুরের কথা  
যেন সকলে বুঝতে শেখে, তা হলেই পৃথিবীর পতিতার  
হাঙ্গুরের উপকার করা হবে। বাবার আগে আমার  
হাতের এই আঙুলী রেখে যেতে চাই—হাত বাড়িয়ে  
অসিত ওর হাত থেকে আঙুলী নিয়ে বলে—এই তো বন  
রাখবার বস্তু দখল হইল? দড়ির দিকে চেয়ে বন্য  
বলে চমকিত অসিতবাসু? জান চোখে অসিত হন্যাক  
বিনাশ দিয়ে কিরে আগে শূঁত হয়ে। তবে—বনবাসী

হয়ে ছিলার কিছু নাহি ক'বিনের ভক্ত একটা নারী এসে  
আমার সমস্ত জীবনটাকে ভোলপাড় করে দিয়ে গেল।  
হুতো বন্য চিত্র-কুবারীই থাকবে কিছু এর ভক্ত একান্ত  
দায়ী কে ? অসিত, না বন্য ? অসিত এ চিত্রার কোন  
হীমাংসাই কর্তে পারে না। শুধু দিন দিন এই সব  
ভাবনা ও দাক্ষণ্য বাহির সজ্জা দিতে দিতে ওর বেহ  
ভক্তে পড়তে লাগল। মনিয়া বৃদ্ধ হয়েচে, তাল করে  
চোখে দেখতেও পার না, আর দায়াবাহুর সেবাও কর্তে  
পারে না। তাই ওর রোগ দিন দিন বেড়ে বেতে লাগল।  
এমনি করে এক বছর কেটে গেল—রাজপ্রসাদের  
সামনে গিয়ে কতকগুলো দাঁওতালদের চেলে সেদিন একটা  
অপুঙ্খ হৃৎককে বনহুলেঃ বাল্য গরিয়ে লাভিয়ে পুশানের  
দিকে চলেছে। রাজপুত্রীও কোন কোন লোক ভীষণ  
চীৎকার করে বলে উঠে—এই এ মৃত দেহ কার রে ?  
বিরক্ত হয়ে তারা উত্তর দেয় আমাদের বাবুর আছে।  
আজ সকালে নান্না গেছেন তাই এর যে নবর আছে,  
এ বললে রাজবাড়ীর সামনে গিয়ে গিয়ে যেতে—বলতে  
বলতে তাতা হুহুন্ করে চলে গেল। এ বয়স যখন  
রাজপুত্রী অন্ধ-পূরে পৌছাল তখন বোধ হয় মৃত সেহের  
সব কাছই শেষ হয়ে গেছে.....রাজকন্যা নিজের ঘরে

বিরে এসে তার সব সাজ-সজ্জা খুলে ফেলে একটা দাসী  
শাড়ী পরে ভাবতে লাগল এ ঐশ্বর্য তার কি হবে ?  
এক বুঢ়স্তের কল্পেত তো মনের হুহু ঘিটে পারবে না।  
রাজ-অন্ধ-পূরে বাস করে রবার বতহুহু অস্তিত্তভা হয়ে-  
ছিল, তা থেকে সে অসিতের মতো নিঃস্বার্থ হুল্লয় ছেলে  
কোথাও বেবেদিনি—তাই অস্ত কোনো পুরুষের কাছেই  
সে অধীনতা স্বীকার কর্তে যাকী হতো না...জীবনে  
অনেক পুরুষই তাকে চেয়েছিল, অবশ্য সে চাওয়ায় যথো  
ছিল না তাদের প্রকৃত ভালবাসা, ছিল রাজকন্ডার  
ঐশ্বর্যের মোহ, কাছেই বন্য তাদের চুপা করত।  
তাই সারা জীবন ধরে সে অসিতকে ভুলতে পারে নি।  
আজ থেকে সে আর এ ঐশ্বর্যের অধিকারিণী হতে চায়  
না—তার সবস্ত সম্পত্তি দিয়ে রমা ঐ বনের যথো বেথানে  
অসিত তার সারা জীবনটাই কাটিয়ে গেছে সেখানে  
একটা প্রকাণ্ড হাঁদপাতাল তৈরী করে দেবে। আর তার  
নাম হবে 'অসিত-সেবাসনন'—শুধু ঐ বাবিরক্ত লোকদের  
উদ্দেশ্যে।

রাজপুত্রীর সকলে ভাবে—রাজার দেহের খেদাল !  
আর অশাক্ষে বিধাতাপুঙ্খ বলেন—এই তো সত্যিকার  
ভালবাসা !

## সম্ভাবনা

### ত্রিভুক্তকুমার নাগ

আমার এ জন্মস্থানি হুহু আনন্দনা

মাকে মাকে জীবনকে ভাল লেগে যায়

অনেক স্মারি এসে কোণে ওঠে সূর্য্য সম্ভাবনা

নিরাশার মাঝে বেথি—আশা বেঁকে এক অধ্যাত্ম।

যে হেঁচু জন্মের স্মারি—বনে জাগে নতুন আবেগ

স্বপ্নের আধরণ বুঝি বসে যায় সে এক জন্মবেশ।

নতুন সে আশা আশা বুঝি মনে

অজানার ডাক আদর্শ—প্রাণে বেথি নতুন লবণ্য।

যে আশা হোলো স্নেহ—সোমাকিত কণে

।।।

।।।

।।।

যেখানে আমার মনে বোলো বের দাক্ষণ্য বিশ্ব।

স্বপ্নের ছিনিছিনি কোণে ওঠে জীবনের স্তর।

হুহু হোক জীবনের আমার তো সেই কোন মাগা

আমার আরক্ত আনি শতভাবে প্রকাশ আমার,

আমার রক্তে জ্বলি ডাক দেয় আদি-ই যে সব

আমারি মনের সান বোলো গিয়ে কক্ক-বিজ্ঞার

স্বপ্নকে চিনে ফেলি আর পাই নতুন আশা

জন্মটো ভালো লাগে ভালো জাগে আকাশ বাতাস।

# বেগার ঘাই নেবার

( দ্যাওনেস কিলডেন )

ঐপ্রগতিসূচক সুখোপাধায়

গান্ধীজীর বক্তব্যের মধ্যে অনেক খুঁত থাকতে পারে, অসিমানীতির মধ্যেও খুঁত আছে, কিন্তু এই নীতি এমন একটা কিছু, যা মানুষ গ্রহণ করে বেবেশি—অন্ততঃ পূর্ণ-মাত্রায়। গান্ধীজী দেখিয়ে দিয়েছেন যে, এটা কার্যকরী; এবং তিনি নিজে কেবল কলমাবিশালী নয়। এর মধ্যে তিনি দেখেছেন ভারতীয় মনোভাব, ভারতীয় আত্মবিশ্বাস এবং ভারতের স্বাধীনতা—আর দেখেছেন যুগের চরম পরিণাম। তিনি চতুর্থাংশের চাইতে, যে চতুর্থাংশের ভারতের প্রাথমিক না হওয়া পর্যন্ত যৈষ্ঠ্য বহুতর প্রাথমিক পক্ষপাতী এবং মনে হয়, এই অসিমানীতিকে ‘নিঃস্বার্থ ও নিরপেক্ষ’ ভাবে বিচার করলে এর মধ্যে ‘ধেমন-করেই’ হ’ক বুদ্ধি বহুতর করতে হবে’ ভাবের লোকের আকর্ষণীয় কিছু পেতে পারে। গোটা ভারতকে আমরা অস্ব-সম্মিত করতে পারি না এবং বর্তমান অবস্থার বোধ হয় আমাদের নিজেদের অস্ব-মিহাও ভারত রক্ষা করতে পারবে।

কারণ, অস্ব-আগ্রহণ আমাদের সৈন্ত ও অস্ব-প্রয়োজন। দুই-প্রাথমিক কাছে কৃতজ্ঞ এবং স্বাধীনতা সংরক্ষিত রাখতে চুক্তি-প্রতিজ্ঞা স্বাধীন ভারত, বর্তমান প্রাথমিক ভারতের চাইতে বহুলাংশে ভালো হবে। জাপানের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক যে আকর্ষণ। বৃটিশ জনসাধারণকে বোঝানো হচ্ছে—তা আর্থনীয় সঙ্গে রাশিয়ার বৈজ্ঞানিক সাপেক্ষের চেয়ে অসম্ভব। একবার পরাজিত ভারত বিজয়বাহার সন্তোষ সাধন হবে, —অন্ততঃ ১৯৪২ সালের ১৪ই জুলাই কংগ্রেস কার্যকরী নীতি/সেই কথাই বলেছিল।

“স্বাধীন ভারতবর্ষ নিজেদের বাচাতে কিংবা মানবত-প্রসঙ্গকারী হুজু সাহায্য করে কল্যাণের উপর প্রগ্রহ বিস্তার করতে পারবে না। কাজেই নিজের স্বার্থে অস্বই তৎপর, বিশ্ব-নিরাপত্তার, মানসীবার, ক্যাসিষ্টবাহ, হুজু-নীতি, আত্মশাস্ত্রবাহার বিভিন্ন রূপ প্রকৃতি প্রাথমিক করতে এবং এক জাতির উপর অস্ব-জাতির অকাংক্ষ আক্রমণ প্রতিরোধ করতে, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা প্রয়োজন। তাহলে কংগ্রেস বর্তমান কুটন-বিরোধী নীতি

পরিত্যাগ করে কুটন-বক্তব্য-নীতি অবলম্বন করবে এবং ভারতের সঙ্গে সংজ্ঞা ভাবে বিশ্ববাসী এবং সর্বজাতির স্বাধীনতা অর্জনের প্রচেষ্টা করবে। এটা সন্তোষজনক, বহন ভারতবর্ষ স্বাধীনতার উচ্চতা অস্বত্ব করবে।”

“বৃটিশ শাসন ভারতবর্ষ থেকে অপসারণের স্বাধীনতা কংগ্রেস চায়না প্রোটন অথবা অস্ব কোন বিজ্ঞান-প্রকৃতি সূচক-প্রতিষ্ঠান থেকে নিবৃত্ত করতে, কিংবা প্রাথমিক আক্রমণে কোন শক্তিকে অস্ব-প্রাথমিক করতে, কিংবা চীনের উপর জাপানী আক্রমণে স্বাধীনতাতে বুদ্ধি করতে, কিংবা চীনা-শক্তির অস্ব কোন অস্ব-প্রাথমিক সাহায্য করতে, কংগ্রেস এও চায় না যে, বিজ্ঞান-প্রকৃতি প্রতিরোধ-কমতা সূচক হ’ক। কাজেই জাপানী আক্রমণ প্রতিরোধ করতে, অথবা অস্ব-প্রাথমিক করতে এবং চীনের সাহায্য ও রক্ষা করতে যদি ভারতবর্ষের সৈন্ত প্রাথমিক হয়, তা হ’লে কংগ্রেস তাতে স্বীকৃত আছে।” কংগ্রেস জাপান-সমর্থক, কংগ্রেস-সমর্থক, কিংবা বৃটিশ-বিরোধী, কিংবা বিশ্ব-স্বাধীনতা—ইত্যাদি অভিযোগের এইটাই বোধ হয় বড়ই উদ্ভব। গান্ধীজী নিজে কি? “প্রত্যেক জাপানীর প্রতি” তাঁর চির আকর্ষণে চক্রান্তে তা ঘাই মনে হ’ক—ভবিষ্যতে দশ-বিংশ-হুজু বংশ-পরে বহন আবার আবার জাপানের সঙ্গে বহুতর-হুজু আকর্ষণ হবে, তখন সেটা প্রাথমিক হবে। সে চিঠি এখানে উদ্ধৃত করা প্রয়োজন, কারণ তাতে তাঁর, কথিত, জাপান-সমর্থক অভিযোগের উপর হুজু’ মানবতা আলোক-সম্পাত হ’বে।

“সর্বপ্রথমে আমি স্বীকার করছি যে, বহুতর জোনাবের বিরুদ্ধে আমরা কোন বিতপতা নেই, ভুজু জোনাবের চীন আক্রমণ আমি দুঃখ করি। জোনাবের হু-উচ্চ আদম থেকে জোনাব-নেবে এসেছে রাজ্য ইন্দো। সে জোনাব জোনাবের পূর্ণ হ’বে না, উপরন্তু জোনাব হ’বে এসিগ্রাকে বিভিন্ন করার অপরাধে অস্ব-প্রাথমিক, বাহ ফলে জোনাব বিশ্ব-শান্তিনী এবং বিশ্ব-স্বাধীনতা, —বা জোনাব মানবতার গতি নেই,—দ্বিগ্ন করে দেবে। ৪০ বংশের আগে ১৮ বংশের-বহুতর

বালক আমি লঙনে অধ্যাপনাকালে তার এডটাইন আরনন্দের হুচনার কথা দিয়ে তোমাদের জাতীয় বিশেষ ভগবানীকে আমি স্থান করতে নিবেদিত। দক্ষিণ আফ্রিকার অধ্যাপনাকালে তোমাদের কথ বিজ্ঞে আমি আনন্দিত হ'য়েছিলাম। ১৯৫৪ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারত এডটাইনদের ১২ আশ্রমের আশ্রমবাসী আপনানী সাধকদের সঙ্গে বিশেষ দক্ষিণ তাবে পরিচিত হ'য়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন দেবপ্রাণে আশ্রমের আশ্রমে বিশেষ বস্তুতাবে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে পড়েছিলেন। তাঁর কর্তব্যপরায়ণতা, তাঁর অগাধী যুক্তিযুক্তি, যৈনকিন পুণ্যকর্মের তাঁর তত্ত্ব, সহনশীলতা এবং হুসমের সংযম, দীর্ঘ ও শান্ত মনের বৃত্তি, তাঁর স্নেহের হাসি—সবই তাঁকে আশ্রমের প্রতি নিকটে টেনে এনেছিল। এখন গ্রেটব্রিটেনের বিরুদ্ধে তোমাদের হুচ-ঘোষণায় তাঁকে আশ্রমের মাধ্যমে থেকে অপসারিত করা হয়েছে, আশ্রমের মধ্যে তাঁর আসন শূন্য। তাঁর দৃষ্টিভিত্তি তিনি তেবে গেছেন যৈনকিন পুণ্য ও ছোট পদার্থ—যে দ্বারা তার শূন্য-তরঙ্গে আশ্রম আশ্রমের প্রারম্ভ: দ্বারা প্রারম্ভ: আশ্রম হয়। এই সব স্নেহের দৃষ্টির পটভূমিকার বর্ণন আমি তাই তোমাদের স্বতঃ-স্ফূর্ত চীন-আশ্রম এবং ঐ প্রাচীন মহাদেশকে স্নেহ-স-তাবে প্রণয় করার কথা, তখনই আশ্রমের অস্তর ভাবে ওঠে।

পৃথিবীর পটভূমালী আশ্রমের মধ্যে নিজেদের স্থান ক'রে নেওয়ার উচ্চাশ্রম প্রণয়নীয়। কিন্তু তাঁদের বিরুদ্ধে স্বতঃ-স্ফূর্ত আশ্রম এবং চরুপট্টের সঙ্গে যৈনকিন সেই উচ্চাশ্রমের অস্তিত্ব এবং অস্তিত্ব প্রকাশ।

আমি ভেবেছিলাম, যে প্রাচীন নব্যজাতির প্রাচীন সাহিত্য আপনানী নিজেদের বলে স্বীকার করে দিয়েছেন সেই জাতিকে প্রতিবেশী মনে ক'রে আপনানী গর্ব অনুভব করবেন। আপনাদের পারস্পরিক ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং সাহিত্যের আশ্রম-প্রণয়নে আশ্রমের শূন্যতা চাইতে বস্তুতবে বস্তুই প্রগাঢ়। আমি যদি আশ্রম স্বাধীন হ'তাম এবং আপনানী যদি আমাকে আপনাদের দেশে যাবার অনুমতি দিতেন, তাহ'লে হুচল আমি, আমার

বাহ্য এখন কি আমার জীবন বিপর ক'রে আপনাদের দেশে সকলকে চীনের প্রতি এই যৌতুর অবিচার থেকে বিরত থাকবার জন্য আবেদন করতাম। চীনের প্রতি আপনাদের এই অবিচার সমগ্র বিশ্বের প্রতি অবিচার' নিজেদের প্রতি অবিচার।

কিন্তু এখন স্বাধীনতা আমার নেই। এবং আমার আশ্রম সাংসারিকতা প্রতিবেশে সংগ্রামরত—যে সাহায্য-বাদিতা আমার ততটাই হুচা করি, যতটাই করি আপনাদের সাহায্যনিষ্পাকে এবং নাৎসীবাদকে। কিন্তু, আমাদের এই সংগ্রাম বৃটিশ জনসাধারণকে আঘাত করার তরঙ্গ নয়, আমরা চাই তাদের পরিবর্তিত করতে। বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে আমাদের অহিংস বিদ্রোহ, দেশের এক প্রধান প্রতিষ্ঠান বিদেশী শাসকদের হাতে দারিদ্র্যক অবতরণ প্রাচীন সংগ্রামরত।

এই সংগ্রামে বিদেশী শক্তির কোন সাহায্যের প্রয়োজন আমাদের নেই। আমি আমি, আপনানী তনেছেন, কিন্তু আপনানী অত্যন্ত স্নেহ তনেছেন, যে আপনাদের ঠিক ভারত-সম্রাজ্যের সময় আমরা এই সংগ্রাম আরম্ভ করেছি নিজেদেরকে বিপর্যস্ত করার জন্যে। আমাদের উদ্দেশ্য যদি হ'ত বৃটেনের বিপরকে আমাদের স্নেহ-সময়ে পরিণত করা, তা হ'লে, আশ্রম নয়, তিনবছর আগে যখন বুদ্ধ প্রথম আরম্ভ হয়েছিল, তখনই আমরা আপনাদের সংগ্রাম আরম্ভ করতাম।

তারতম্য থেকে বৃটিশ স্বতন্ত্রতা অপসারণের এই যে আবেদন, এটাকে কোনক্রমেই ভুল বুঝবেন না। ভারত-বর্ষের স্বাধীনতা সম্বন্ধে আপনাদের কথিত উৎসর্গ যদি সত্য হয়, তা হ'লে বৃটেনের স্বাধীনতা স্বীকার করে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের ভারত আক্রমণের কোন কারণই থাকতে পারে না। তা ছাড়া, চীনের বিরুদ্ধে আপনাদের স্বতঃ-স্ফূর্ত নিষ্ঠুর অভিযানের সঙ্গে আপনাদের এই কথিত উৎসর্গ কোনই সাংগতি নেই।

আপনানী যদি মনে করেন যে, তারতম্য থেকে আপনানী আশ্রমিক অস্তিত্ব পাবেন—তা হ'লে আপনানী যে নিদারুণ হত্যা হবেন, সে বিষয়ে কোন ভুল ধারণা বেন

আপনাদের না থাকে। দুটিন আপনাদেরে বাবীৰ চৰম ও বুখা উদ্দেশ্য হ'ল—ভাৰতকে স্বাধীন ক'ৰে সাময়িক এবং সাম্ৰাজ্যবাদী আশাৰে এতিয়াৰে কৰা, তা সে এটিন সাম্ৰাজ্যবাদী হ'ক, আৰ্থিক স্বাধীনগায়ী হ'ক, কিবা হ'ক আপনাদেরে পৰিষ্কৰণ। তা যদি না কৰি, তা হ'লে, আবার সাময়িকতা এবং অধোপায়ী আশা আকাশৰ সন্ধান অহিংসানীতি এই বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও পৃথিবীতে সাময়িকতাৰ একোবিধায়ে বুক বৰ্শক হওয়ার অপরাধে অপরাধী হ'তে হবে। ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে কৰি যে ভাৰতের স্বাধীনতা যোগ্য না কৰলে, বিজয়শক্তি, যে, চক্ৰশক্তি হিংসাত্মক হৰ্ষে সত্ত্বেও বিঘেৰে, তাৰে কোন হতেই পৰাজিত কৰতে পাৰবে না।

আপনাদেরে নিষ্ঠুৰ এবং সুনিপুণ হুচ-কৌশলকে চৰ কৰতে না পাৰলে, বিজয়শক্তি, আপনাদেরে অথবা আপনাদেরে অস্বীকাৰেরে কামনাই হাৰাতে পাৰবে না। যদি তারা আপনাদেরে অস্বীকাৰ কৰে, তা হ'লে, 'গতাত্মিকতা'ৰ জন্তে পৃথিবী এবং স্বাধীনস্বাধীনতাকে বাচাবাৰ যোগ্য বিফল হবে। আমি বিশ্বাস কৰি, আপনাদেরে অস্বীকাৰ কৰাৰ অপরাধ থেকে মুক্ত হ'তে উদ্যোগ ন্যায়ন,— যদি তারা ভাৰতবৰ্ষের স্বাধীনতা যোগ্য ক'ৰে নিষ্ঠাৰ ভাৰতের জোৰ কৰে নেগাৰ সহযোগিতাকে সনিষ্ঠ সহযোগিতাৰ পৰিণত কৰেন।

হুটেন এবং বিজয়শক্তিৰ কাহে আৰম্ভ উভয়ের জাতি-প্ৰাণবন্তাৰ দাবী এবং উভয়ের স্বার্থের মোহাই দিয়ে সুবিচাৰেরে আবেদন জানিয়েছি। আপনাদেরে কাহে আৰম্ভের আবেদন মানবতায় মোহাই দিয়ে। আমি আশ্চৰ্য্য হ'ৰে তাৰি, আপনারা বোম্বেন না কেন যে, বৃহৎ মুহুৰ্ত্তি কাৰও একাবিপত্ত) হয়। বিজয়শক্তি না হ'লেও অজ কোন শক্তি একদিন আপনাদেরে হুচ-কৌশলেরে চাইতে নিষ্ঠুৰ ও নিষ্ঠুৰ কিছু আবিষ্কার ক'ৰে আপনাদেরে পৰাজিত কৰবে। তা ছাড়া, আপনারা জৰলাভ কৰলেও, তবিশেষতঃ জন্তে আপনারা এমন কিছু যোগে বাবে ন: থাকে, তারা গৰ্জ অস্তিত কৰতে পাৰে। কৌশলে নাথিত নিষ্ঠুৰ ও নিষ্ঠুৰ কাৰ্য্যাবলী স্বয়ং কৰে তারা কখনও গৰ্জিত হ'তে পাৰবে না।

আপনাদেরে জৰলাভ কৰলেও এ ব'ধ প্রমাণিত হবে না যে, আপনারা সত্যাস্বী, তত্ত্ব প্রমাণিত এবং আপনাদেরে জাতিশক্তি উৎকৰ্ষ। এবং এই উৎকৰ্ষ ব'ধা বিজয়শক্তিৰ পক্ষেও প্রযোজ্য—যদি না তারা এতিয়াও আত্মিকায় সুস্থিত কাৰ্ত্তিৰ মুক্তিৰানে এতিয়াও প্রমাণ-বহন ভাৰতবৰ্ষকে স্বাধীনতা দেয়।

হুটেনের কাহে আৰম্ভের আবেদনের সঙ্গ সহযোগিত স্বাধীন ভাৰতে বিজয়বাহিনী অধ্যায়নের অধোদোহন। এ অধোদোহনের অস্তিত কাম প্রমাণ কৰা যে, ভাৰতের হুচ-উদ্দেশ্যকে আৰম্ভ কৰিগ্ৰহ কৰতে চাই না। কিবা পৰি-ভাজ্য ভাৰতে আপনাদেরে ইচ্ছা কৰলেই পৰ্যাপ্ত কৰতে পাবেন—এ ভুল ধারণা ভেঙে যেওনা। একবা পুনঃজন্মের নিষ্ঠুৰ আবেদন নেই যে, যদি ভাৰত আপনাদেরে আপা আপনারা পৌষ কৰেন, অথবা তা আপনারা কাৰ্য্যে পৰিণত কৰেন, তা হ'লে আৰম্ভ আবেদনের সন্ত স্বার্থ দিয়ে শু এতিয়াও কৰতে চেষ্টা কৰব। আপনাদেরে কাহে আৰম্ভ এ আবেদনের উদ্দেশ্য—আপনাদেরে এবং আপনাদেরে অস্বীকাৰেরে সংগে যেহে একোবিধিত কৰা, যে পৰে গেলে ন্যায়ন যন্তে পৰিণত হবে, আৰম্ভ হবে আপনাদেরে নৈতিক ক্ষে, সেই পৰ থেকে আপনাদেরে নিষ্ঠুৰ কৰা।

আপনাদেরে কাহ থেকে আৰম্ভ আবেদনের উত্তৰ এতিয়া কৰা হুটেনের কাহ থেকে একতমস্বাৰ চাইতে নীপ। হুটেন যে ভাৰতবিচাৰে অজ নয় তা আমি জানি এবং তাহাও আৰম্ভ জানে। আপনাদেরে বিচাৰ কৰতে পাৰি, আপনাদেরে সন্তে একতম জান আৰম্ভ নেই। আমি বতৰু পড়েছি তাতে মনে হয়, আবেদনকে আপনারা অগ্রাহ কৰেন, শক্তিকে কৰেন শক্ত। আৰম্ভ আত্মিক কাৰ্য্য, আপনাদেরে সন্তে আৰম্ভ এ ধারণা ভুল হ'ক এবং আমি যেন আপনাদেরে অস্তৰ 'পৰ্ণ' কৰতে পাৰি। মনুষ্য-প্রকৃতির 'প্রতিদান-প্রকৃতির' ওপর আৰম্ভ মুহুৰ্ত্ত আৰম্ভ। সেই বিশ্বাসের ওপর নির্ভর কৰে ভাৰতের বৰ্ত্তমান আকাশন আমি দায়িত্ব কৰেছি এবং সেই বিশ্বাসই আৰম্ভে অধোপায়িত কৰে আপনাদেরে কাহে আবেদন জানতে।

আপনাদেরে বন্ধ এবং বন্ধালাকী এম, কে, গাভী।"



গান্ধীজীর অহিংসানীতি যে পরাজয়-বনোত্তীর্ণ নয়, এই চিহ্নই তার যথেষ্ট প্রমাণ এবং তুর্ভীক্তি বলতে বর্তমানে ইংলণ্ডে আন্দোলন বা বৃত্তি, এ ভাও নয়। গান্ধীজী অগৃহীত নিষ্ঠুর মন। ভারতের নর, নরক এবং নিরপেক্ষ জনতার মধ্যেই অশান্ত-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক ও পরিশ্রমক গান্ধীজী।

তারের ওপর দিয়ে চললেই সংগ্রাম আত্মসম্মতিতেই যোগে যুক্তাত্মিকতার। কনভা, প্রার্থনা এবং শ্রমোত্তীর্ণ আক্রমণের অপরাজেয় শত্রু গান্ধীজী, শিষ্টবিশ্বাসের শত্রু তিনি। বর্তমান যুগই প্রেমের পরাজয় প্রাপ্তকাল তিনি। আমার মনে হয় এবং আমি আশেপাশে বলেছি যে, তাঁর অহিংসানীতি, অস্তিত্ব ভারতের জনোৎসাহবিলাসের মনোবৃত্তির কুলবে। অথচ আশ্চর্য্য কথা এবং হৃদয়ের বিষয় যে, জীর্ণান্নময় এবং বিশেষ করে পাত্রের দ্বিগুণ ধার্য্য কেবল মুখেই বসেন, দুগ্ধাচ্ছাদিত শ্রুতিকাঠি ধার্য্য উঠাই দেবতার বসন্তের নামে অধিষ্ঠিত হন—তাঁরা আক্রমণের পাইপেটের এই গান্ধী-অবমাননা কেবল অংজাই

করেন না, সম্বলনও করেন। গান্ধীজী ৭৩ বছর বয়সে কারাকান্ড, ওলিফে আনেকিরা এবং বুটেন ভাষান্তর্য্যে শির-বিশ্বাসের প্রচেষ্টা করছেন। হয় ত জীবদর্শন গান্ধীজী সত্যিকার অর্থবোধের মনন তাঁর আকোলনের বিকলতা। চাড়া আঁর কিছু দেখে যেতে পারবেন না, কিন্তু সত্যাস্ত্রী নীতি মুক্ত-কৌশল অথবা রাজনীতির চেয়ে অধিকতর স্বামী। অন্যের ধারণা, গান্ধীজী-উপকথা ভবিষ্যতে কেবল প্রাচ্যে নয়, প্রতীচ্যকেও অনুপ্রাণিত করবে। কিন্তু আশাততঃ এই সত্যাস্ত্রী নীতির ভাঙে, প্রাচ্যই উপযুক্ত ক্ষেত্র, কারণ প্রতীচ্যের মনন প্রাচ্যে আশ্রয় পর্ব্বত প্রাণহীন বর্ষ প্রতিমার মোহে আচ্ছন্ন হয়নি এবং হয় ত একদিন এই প্রাচ্যই প্রাণন করে যেবে যে, প্রতীচ্যের স্বপ্নগ্রহিত উপাদান্য বাহুরে সুখ ও শান্তি নির্ভর করে না। প্রমাণ করবে যে, বসন্ত-অতিক্রমকে অর্থ করা মানেই মুক্তকেও ভয় করা।

[ জয়দেব ]

## বাস্তব

### অধ্যাপক ঐয্যাত্তোষ সন্তাল

মুসলমান ভীষনভার বঁড়ার কেবল  
চক্রে-নিগ্রাহ তুটে গেলি অবিদ্যে  
কল্যাণী। নিঃশব্দে শান্ত অন্ধকার  
নর-সমূহে মল বিধায়ে আমায়—  
প্রেরণ। অদর্শক সিন্ধুর তার  
অনন্ত রেনমা বহি লীন হয়ে যায়  
কালপথ্যে-বহলে। প্রত্যেকে ইষ্টতা  
করোব জীবনযুদ্ধ ! খাতিয়া দুটিয়া  
কোমল অংশে ফাটল সেম চাঁকি  
কিঞ্চিৎ হবে—কবু সেই বাঁচিয়ে প্রাণি,—  
সেই কৃপা পতন্য বৈরাগ্য-বীণা—  
অসীম-অজ্ঞান আর সেই সজ্জা-বীণা  
জিহ্বাবিকা। এ কীমনে-বসন্ত-আই জায় !—

এইতো সংসার !—  
ঈশ্বরোত্তর, বাবা জালা, সুখা আর দুখা—  
তারি পাশে দুনিয়ার অন্ধত পরালা।  
এ যেন অশ্রু-নয়ক বপুঁরে বাতি  
মিটি ফেলি নরকর অশ্রু-স্রাব্যারি  
ঐশ্বর্য্য। কোথা সেই কাম্য করলোক ?

কোথা সেই মনোহর অ-লোক-অলোক ?  
মুখে যায় হৃদয়হরি নয়ন লক্ষ্যে,  
কিবে আসি এ বট্টন মুক্তিবার বুক  
যায়যায়। গোখা রক্ত বাহুর ভীষণ—  
ফাগুন ঘাবী নিয়ে করে সংকট।  
সে হৃদয়ে কোব বচ স্বপ্নভঙ্গ হার,—  
চিড়ে চিড়ে যায়।  
এ সন্ধ্যার আলি তাই ভাবি স্মৃত মনে,—  
অন্যত্রাত বনপুশ্পের বিরজনে  
মগনের অন্ধরণে জীবন আমায়  
যার বহি করে—নিরে আশ্রয়তা তার  
পঞ্জীবাট-পথে। ওগো এ প্রাণের শিখা  
অতশ্রমে নিয়ে বহি করে নাকি শিখা  
মতাকাল-উত্তরনে আকৃতি আমায়—  
বিদ্যার ক্রন্দন মোহ—চির হৃদয়ভার ?  
প্রাণের সাধনা কিগো বার্থ এ যথায়—  
বেদ্যের সকল শাক্তে—কিছু না হারায়  
একটিম ? এই কি গো বেদ্যে তোমার—  
মিহন্তর বিদ্যাত আমায় ?

# ভারতের জাতীয় কংগ্রেস

ইণ্ডিয়ানদের দাবীগুলি ..

[ ১৯২০-১৯২১ ]

দেশবন্ধু পাণ্ডা, বিদ্যুৎ, মুক্তপ্রাণ প্রভৃতি দেশ  
 বৃত্তিগণের, কিন্তু মুসলমানের স্বাধীন ছিল ভিন্ন উপাধি নাই। তার  
 ব্যবস্থাক্রমে পঞ্চাশ করিতে হইলে কিন্তু মুসলমানের মধ্যে যে সব  
 কারণে সাধারণতঃ বিরোধ হয়, সেগুলি সমাধান না হইলে  
 হইবে না। ইতিপূর্বে যাহাট বৈ মাসে (১৯২০) দেশবন্ধু সম্পাদিত  
 গ্রন্থের আভাসে এই ও ডাক্তার আমানুল্লাহ National Pact-এ  
 একটি সাক্ষিপত্র লিখিয়া প্রকাশিত করিয়াছিলেন।  
 পরে A. I. C. C-র পক্ষে প্রকাশিত হয়। ( Vide Resolution  
 XVIII. Working Com. Bombay 23rd May 1923 )  
 বিদ্যুৎ বিদ্যেবিশেষে অবশেষেও স্থির হয় ডাক্তার আমানুল্লাহ,  
 লাল সাহায্যে যাহা (অথবা পণ্ডিত মালব্য) ও লর্ডের প্রস্তাব  
 দিতে যেন একটি প্রস্তাবনা পাইয়া যাহা করিয়া সভাস্থের মত হইবে  
 এবং কোনভাবে উপস্থিত করেন।

এখন কান্টন-কমিটি করিয়া, তথ্যের একতা বন্ধন কর  
 চিত্তবদ্ধ কোনভাবে যাহায্য পূর্ণকর্তা বাহ্যিক বৈশেষিক ভাবে  
 যেমন পাইতে পারেন। তিনি বৃত্তিগণের, সমস্তের পক্ষে  
 আমানুল্লাহকে আক্রমণ করিতে হইলে কিন্তু মুসলমানের মধ্যে  
 বিশেষ বৃত্তি থাকিলে চলিবে না, যাহা উভয় কাৰ্য্যগুলি অর্থাৎ  
 মুগ্ধ উপাধি করিতে না পারিলে উভয় সম্প্রদায়ের বিশেষের আশা  
 স্থির পণ্ডারত। সামান্য সামান্য বিষয় লইয়া উভয়ের মাঝামাঝি  
 কটাকটী পূর্ণকর্তা করিলে তাহাতে ব্যবস্থাক্রমই আরও প্রবল  
 হয়, আমানুল্লাহ দুর্বল হইয়া পড়ি। তাহাও আমানুল্লাহ কৃত কৃত  
 কার্যগুলি বিশুদ্ধ করিয়া দ্বারা কৈফা সম্বন্ধে হওয়াই কর্তব্য।  
 সমস্তের সম্মুখে বাতনা, প্রস্তাবনা প্রভৃতি ব্যাপার লইয়া  
 অস্বস্তিকর থাকিলেও মধ্যে প্রায় অগত্যা হইয়া থাকে। তাহাও  
 চাহুই প্রায় প্রবল হয় এবং সমস্তের নির্বাচন প্রথা বিবেচনা  
 প্রদান বিবর্ত। সর্বত্রই এই বিষয়ে উদ্ভাবনার বাধ্য করিয়া।  
 কলিকাতার টালা অফিস ১৯২১, ১৯২৪-২৫ পর্যন্ত হয়, এবং  
 ১৯২২ বৃত্তিতে বহু কিন্তু মুসলমান এই বিখ্যাত বিবর্তে প্রায়  
 হওয়াই থাকে। লর্ড কর্ণওয়ালিস, লর্ড Benetilde-কর্তৃক  
 পরে বিদ্যোৎপাদন প্রকারে কার্য্যতঃ এই বিষয়বস্তুকে আলাদা  
 বিচারে। লর্ডের মতে কিন্তু মুসলমানের মধ্যে কংগ্রেসে যে  
 ১৯২৬-৬৭ বহু নির্বাচন প্রথা সম্বন্ধিত পাইতে হয়, তাহাও  
 ব্যবস্থাক্রম, কার্য্যকরী হয়ে নাই। ১৯২০-এর বিটলিগিপাল

পার্টেও মুসলমানকে কিছুদিনের বহু বহু নির্বাচন প্রথা হওয়াই  
 হইয়াছে, তাহাও এখনও কিছু কিছু প্রকারে। এই সব কারণে  
 তিনি সম্মিলিত সারী এবং সম্মিলিত কার্য্যকর, উপস্থিত করিয়া  
 ( Joint demand and joint action ) নির্দেশিত সর্বত্র একটি  
 পার্টের বহু বহু—

(১). Representation  
 Council—

Be it resolved that representation in the Bengal  
 Legislative Council be on the popular basis with  
 separate electorates subject to such adjunction  
 as may be necessary by the All India Hindu Muslim  
 Pact ( National Pact ) and by the British  
 and Congress.

এখান হইল যে বাহ্যিক বাহ্যিকের সভার বহু নির্বাচন  
 পক্ষের লোক সম্মুখে অস্থায়ী প্রতিনিধি নির্বাচিত হইত  
 তবে সমস্ত ভারতীয় কংগ্রেস পার্টে কংগ্রেস ও বিশেষতঃ বাহ্যিক  
 ইঙ্গা পরিবর্তিত হইতে পারিবে।

(২) Representation in Local bodies 60:40  
 অর্থাৎ যে জিলায় কিন্তু ইন্দো ৬০ জন সভ্য হইবে, যে  
 জেলায় মুসলমান ইন্দো, ৪০ জন হইবে।

এই ক্ষেত্রে মুক্ত কিন্তু বহু নির্বাচন প্রথা হইবে, যে প্রকার  
 এখন স্থগিত করিল। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যস্থত কান্টন পরে  
 গ্রিক করিবে।

তবে এই সিদ্ধান্ত পাই ৩৫—“এই পার্ট” অস্থায়ীভাবে তাহা  
 এখন হইবে না; হইবে—কিন্তু মুসলমানের প্রস্তাব প্রকারে কিন্তু  
 সম্মিলিত হইবার পরে—

Representation comes into force only after  
 foundation of Swaraj is established.

এই পার্টে তাহাও পরিবর্তিত হইলে অস্থায়ী প্রকারে হইবে  
 থাকিতে হইত। অস্থায়ী প্রকারে পার্টে আমানুল্লাহ  
 পার্টের পক্ষে প্রবল হইত। তাহাও বসিল, এই পার্টে।  
 অবশেষে করিয়া আমানুল্লাহ মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকের পাইবার  
 বাসনাকারিত করিয়া বিশেষ তাহাও নিত্যকাল কী-সুই  
 ইতিহাস সম্বন্ধে হয়। বাহ্যিক কিন্তু পূর্ণ হইবে, অর্থাৎ বাহ্যিক  
 যেইই কৌশলিক নয়; প্রকারের অর্থ প্রত্যাশিত করিবার

করই প্যারী সংঘাতনা হয়। ইতিপূর্বে লগোবে এক বিশিষ্ট বৈয়াক্তিক তিনি প্যারী বলেন—

Idea of joint electorate with a fixed proportion of seats would appeal to me and if Mohammedans could accept it nothing could be better. For the sake of peace and to remove suspicion I am even willing to provide for separate electorates as a tentative measure pending greater National solidarity.

অব উপর সমাজের বিশিষ্ট একটা কথা উচিত। কোকনন সংগ্রহে ডাক্তার আনবারী ও লাল লালপত ও এম এম প্যারী আনেন। এবং তাগতে প্রস্তাব হয় (১৯২২)।

Various communities shall have separate representation both State & Federal. Dr. Ansari writes to extend this to Municipalities & Local Boards. Lajpat Roy does not agree to this. He says, "a time limit may be fixed during which communal representation will be enforced and at its expiry, it will be abolished altogether. Such representation will be in proportion to the numerical strength of each community in the constituencies—Sikhs, Christians & Parsis.

বঙ্গ, প্যারী ও প্রস্তাব বর্ত—

Government posts. 55 : 45. মুসলমান শতকরা ৪৫টি চাকরী পাইবে। শতকরা মুসলমানের শতক হুজিগতক হইবে।

হিন্দুস্তান বঙ্গদেশ, "বঙ্গ সংগ্রহের ভক্ত মুসলমানেরও হিন্দু আত্মত্যাগ করিতে হইবে, তখন তাহাদের ভাষা শাবী না দিলে চলিবে কেন? তাহার বিবাস ছিল চাহুদীয়েই হিন্দু বিন দিল গীন হইতে চলিয়াছে। মুসলমানেরও পরে উহা ভাল লাগিবে না। অতএব চাহুদী নিরা হিন্দুদের মধ্যে দিলের পোষাক হইবে না। Religious Toleration—

(1) No resolution affecting the interest of any community is to be allowed unless 75 p. c. of the elected members of that community consent to it ১৯১৬ সালের লজ্জা প্যারীও এটি ছিল, নির্ভরিত সমস্তের শতকরা ৭৫ জনের সম্মতি ব্যতীত বর্ধনকালে কোন প্রস্তাব বা আইন হইবে না।

(2) No music in procession to be allowed before any mosque. যশ্বেদের সম্মুখে পোজাবান বাজাইতে পারিবে না।

3) Cowkilling for religious sacrifices is not to

be interfered with. হাৎসি ভক্ত পোষাক বা বাজা হইবে না।

(4) In providing that no legislation or enactment in respect of cowkilling for food will be taken up in the Council, but endeavour should be made by members of both communities outside the Council to bring about an understanding between the communities হাৎসি ভক্ত ব্যবস্থাপক সভার বাহিরে আশাশ্রয়ী বাহিনী করিতে হইবে।

(5) Cowkilling should be carried in such manner as not to wound the religious feelings of Hindus. গোহত্যা এমন ভাবে করিতে হইবে যে হিন্দুদের বর্ধনকালে আঘাত না লাগে।

(6) প্রত্যেক সম্মুখ হিন্দু-মুসলমান প্রদেশ বাহিনীতে পোষাক না হয়, পোষাক হইলে আশাশ্রয়ী ব্যবস্থা করিতে হইবে। এবং সেই আশাশ্রয়ী বৈধের অর্ধেক হিন্দু অর্ধেক মুসলমান বাহিনীতে।

আইন করা হোয়া করিয়া বঙ্গ করিলে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিরোধ আরও বাড়িবে বলিয়া আশাশ্রয়ী পূর্ণ প্রতিক্রিয়া হয়। অতঃপর সিদ্ধান্তকর কনকালে সিদ্ধ হয় যে মুসলমানেরও হিন্দু হাৎসিদের দিকটা বাজনা বন্ধ করিবে।

বঙ্গ-১৪৭ বঙ্গ একটা বঙ্গ দান। ইহাও অনেক পরিবর্তন হইবে, অনেকের দত্ত লগা হইবে, বেশবন্ধ এইকণ বিবাস করিবে না।

ভারতীয় ভাসান প্যারীও পূর্ণ হয় স্থানীয় বাহিনী বোর্ড কর্তৃক নির্ভরিত সমস্ত ভাসানবাদের উপায়নাং হাৎসি (বঙ্গ, মঙ্গি, প্রিন্স, ভক্তব্য) লক্ষ্য বাজনা বন্ধ করিতে হইবে।

No music shall be allowed in front of a place of public worship at such a time as may be fixed up local Conciliatory Board.

প্যারীও ব্যবস্থা কোন সময় হইতে আরম্ভ হইবে, এই প্রস্তাব উক্ত বঙ্গবাই তিনি বলেন, "বঙ্গ লালপত পরে, অথবা উহা তিতি প্রকৃত হইয়াছে বৈধিবার পরে—Fact would not be enforced unless they had Sawarnaj Government but the Fact should be concluded at once in order to remove suspicion,

এম—যদি মুসলমানগণ এখনই উহাও কার্যে পরিণত করিতে চায়।







আলী গায়েবের শক্তি স্থাপনের প্রায় সমস্তসমকে বিঘ্নাবিত করিয়াছিল।

মহাত্মা যখন সভার প্রবেশ করিলেন তখন তাঁহার সঙ্গাঙ্গা দুইশতদশ এবং তাঁহার প্রান্ত বেগবন্ধ প্রতীতি বহাযোগী সম্মান প্রদর্শন ও তেবিরার তিনি চাইয়াছিল। আলোচনায় হইবার পর অবশেষে মহাত্মা যখন প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন যে প্রান্ত দ্বালা নিজের হাতে কাটা ২০০০ পাণ্ডা না দিলে কেহই কংগ্রেসের সভাপতিত্ব গ্রহণে পারিবে না এবং যদি কেহ ঐকমত্য হতা না দেখে, তাহাও নয় অংশই কাটা হইবে।

মহাত্মার দ্বিতীয় প্রস্তাব ছিল পক্ষ প্রকাশের বর্জন, উপনি, স্থূল আলোচন, কাউন্সিল এবং বিবেচনা বহু। প্রথম প্রস্তাবেই যাহা ৩৮ Print of order উপস্থিত করিয়া বলিলেন যে, “বাহায়া Creed প্রতি কথায় কংগ্রেসের সভ্য এবং অঙ্গ-ইতিহাস সমস্ত নির্বাহিত হইয়াছেন এবং বাহায়া কংগ্রেসের ভূতপূর্ব সভাপতি রূপে অঙ্গ-ইতিহাস ex-officio সভ্য, এই প্রস্তাবে কংগ্রেস-প্রবর্ত ভাষ্যের সেই বিবরণ সূত্র করা হইবে। বিঘ্নেী সম্পূর্ণ নূতন এবং ইহা একমাত্র কংগ্রেসের অধিবেশনের নির্বাহিত হইতে পারে, অঙ্গ-ইতিহাস কংগ্রেস কমিটি দ্বারা নহে।” সভাপতি মহাশয় এ সম্বন্ধে ইতিবর্তন্যতা নির্ধারণের ভিত্তি তৈরি করণ। তেঁতে বিধি হয় যে, এইমত প্রস্তাব স্থল অধিবেশনে না হইয়াও অঙ্গ-ইতিহাস কংগ্রেস কমিটিতেই উপস্থাপিত করা হইতে পারে। মহাত্মার পক্ষে ৮০ ভোট এবং বহাগ সমস্ত পক্ষে ১১ ভোট হইয়াছিল।

অনেকে ভোট দানে বিবর্ত ছিলেন, আশা করিনি পক্ষ মাননিক উত্তেজনার অবস্থানে প্রীতি করিতে যাবে হইতেছি। এইমত প্রস্তাবগ্রহণার্থী কার্য হইলে যদি সভ্য সংখ্যা দুইই কম হইত এক কংগ্রেসের অস্তিত্বই বিলুপ্ত হইবার পথে অনিত। অধিকাংশ সভ্যই হতা ক্রান্তি ভাবিত না—এক সভ্য থাকিবার জন্য অন্য লোকের প্রবর্ত হতা দিলে কংগ্রেসে নিষাধারণ অতিমান্য্য বুদ্ধি পাইত। এবং তাহাতে মহাত্মাভীর নীতি অক্ষত হইত না।

পতিভবী ও লেবন্থ এই প্রস্তাবের অস্তাব্যতা সম্বন্ধে তাঁর ভাবে সন্তোষ প্রকাশ করিয়া বলল উক্ত ২০১০ জন সভ্য সম্মেলন হইয়া সভাপতি পদত্যাগ করেন। (we are going today but will come in larger number) তৎপর সভ্য বাহায়া উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে বঙ্গবর্ত (penalty clause)

উঠাইয়া বেওয়ার্থ পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু ২১ : ৩১ ভোটে মহাত্মার প্রস্তাব সভ্য পৃষ্ঠিত হয়। বহাগ বলা সভাপতি পদত্যাগ করাতেন এই প্রস্তাবে অধিক সংখ্যক ভোট পাইয়াছেন মনে করিয়া এবং বহাগ বলা সভাপতি উপস্থিত থাকিলে যেহিঁকে ১০১ ভোট হইত বলিয়া সভাপতি মহাত্মাভীর পুনরায় একটী নূতন প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া বঙ্গ বঙ্গবর্ত (penalty clause) উঠাইয়া দিয়াছিলেন। অতঃপর আবার বিটমাস্টার প্রস্তাব হয়।

অপর্যন্তে তাঁর আধাঙ্গল সাগা তাই মহাত্মার ঘাড়োতে—বহাগবলা সচিবিত হইলে মহাত্মার নিকট বাহায়া পরামর্শ কথিবার কথা হয়। বেশবন্ধই মহাত্মার সঙ্গে লাক্ষ্য কথিত প্রীতি হই, এবং বলেন, “মহাত্মার সম্বন্ধে ‘সহস্রবাহ’ লাক্ষ্য কথিতও যোগ্য মনে করি না।” বৈকালে অধিবেশনে সন্তোষ বিবর্ত, এবং ভাষণ বিলা আলোচন, বিজ্ঞান, বেতাং, যোগীবল্ল বর্জন সম্বন্ধে অসহযোগ বিধান কর্তব্য বাহায়া কাউন্সিল সম্বন্ধে বিদ্রোহ ও কোকন্থ কংগ্রেসের পৃষ্ঠিত প্রস্তাব গ্রহণার্থী কার্য চলিবার কথা হয়। বাহায়া ভাবিয়াছিলেন, মহাত্মার যুক্তি প্রস্তাবে কংগ্রেসের সহিত স্বাভাব্যদের সম্বন্ধে একেবারে বিচ্ছিন্ন হইয়া জাইবে, এবংও তাহা অতিমান্য্য নিষাধ হইয়াছিলেন। অঙ্গ-ইতিহাস কংগ্রেস কমিটিতে কাউন্সিল প্রবেশের বিলম্ব হোয় প্রস্তাবই উপস্থাপিত হয় নাই। কেবল বিদ্রোহ ও কোকন্থ কংগ্রেস অসহযোগী প্রস্তাব পাণ হইয়াছিল।

আহমেদাবাদের কমিটি অধিবেশনে গোপীনাথ সাহা সম্পর্কিত প্রস্তাবটিতে বেশবন্ধ বাহায়া দিয়াছিলেন যাঁ, কিন্তু স্বাভাব্যদের সহিত এই প্রস্তাবের কোন সংঘর্ষ ছিল না। পতিভবীও বেশবন্ধ সহিত ভোট প্রদান করেন নাই, আবার অনেক পরিবর্তন বিবর্তীও (No Changer) প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়াছিলেন। বেশবন্ধ বলিতেন, “মহাত্মার প্রস্তাব ও ভাষ্য-কুলত: কোন পার্থক্য ছিল না। তিনি গোপীনাথের আশ্বাস-সর্বের প্রশংসা করিয়াছেন, আদর্শও করিয়াছি। তিনিও তাঁহার কার্য বিপদ চ্যুতিত মনে করেন, আদর্শও তাই করি। তিনি নিতপন্থ, অসহযোগের পক্ষপাতী, আদর্শও তাই।”

বঙ্গবর্ত: সিদ্ধান্তঃ —

- (1) Denounces and dissociates itself and nonviolence.
- (2) Adheres to nonviolence.
- (3) Appreciates sacrifice though misguided.
- (4) Deeply sensible of love of country of Gopinath however misguided.

(২) Condemns this and such political murders.

(3) Such acts are inconsistent with nonviolent policy of the congress and retard progress.

শেখবন্ধু মহাপ্রজ্ঞানের পর মহাত্মা অনেকবার বলিয়াছেন—  
“গোপীনাথ সাহা সম্পর্কিত প্রত্যাহার সংঘে আমাদের বিখ্যাত প্রেসিডেন্ট কলস দাঁড়।”

অতঃপর ১৯১০ খ্রিষ্টাব্দে কলিকাতা ও দার্জিলিং কংগ্রেসে অসুযোগিত বহুটি কর্তৃপক্ষীয় বর্তমান অবস্থার বেগে প্রবেশা ফিরা অগ্রবাহক কবিবার ভক্ত মহাত্মা স্বয়ং প্রবেশ পশ্চিমবঙ্গ করেন। হিন্দু-মুসলমানের অসম্প্রীতি বৈধি তিনি একই দৃষ্ট চটাই-হিসেন যে, অসম্প্রীতি হইবার হুতের অনেক পরিবর্তন হয়।

এক সময়ে এমন সব ঘটনা আসিয়া গড়ে যে, মহাত্মাও ও সেন্দেবন্ধু কীভাবে শেষ করিয়া একবারে অব্যাহতিপিত হইয়া গেলেন, অসম্প্রীতি সে সময়ে পরে দিব্যকন কল্পিত হইল।

দিল্লী, দার্জিলিং, লক্ষী, এলাহাবাদ, বরেন্দপুর ও কোহাট প্রকৃতি স্থানে বিবিধ সোমসদায় হয়। এই সেক্টর ও পূর্ববর্তী কয়েকদিনের ব্যাপারে ৪০০০ লোক গ্রাহ্য আঁহত হয়। এই কোহাটে ব্যাপারে হাবিব কাহার এই সংঘে আসোজনায়ে মহাত্মার ভ্রম মৌলানা সৌকর আলী দত বেন না এক বর্ষীহত হইয়া মহাত্মাও এবার অনমন হত আঁহত কয়েক। পূর্বেই দিল্লীতে, শেখবন্ধু আবেকবের সোমসোপ মিটারায় ২৪শে সেপ্টেম্বর কলিকাতা হইতে দিল্লী ব্যাজ করেন। ২৬শে সেপ্টেম্বর বৈকালে মহাত্মাও প্রাণিার সোমসদায় করেন, শেখবন্ধুও আসেন। শেখবন্ধু মহাত্মার সৌখ্য ও ভ্যাগের হুঁটি বৈধি এক অভিভূত হইসেন যে, অসুযোগিত মরম বসিতে লাগিলেন—আঁহ Gold-

\* The A. I. C. C. regrets the murder of Mr. Eamuel Day by Gopinath Shaha and offers its condolences to the deceased's family and although deeply sensible of the love, however misguided, of the country, prompting the murder the A. I. C. C. strongly condemns this and all such political murders are emphatically of opinion that all such acts are inconsistent with the nonviolent policy if the Congress is of opinion that such acts retard the progress towards Swaraj and interfere with the preparation of Civil Disobedience which in its opinion of A. I. C. C. is capable of evoking the purest sacrifice but which can only be offered in a perfectly pure atmosphere.

goldএর এই theটাই মহাত্মা মহাত্মাও দুপদগে প্রতিভাত বৈধিহু—

“Man wants but little here below.”

এখানে Unity Conference হয় ২৬শে সেপ্টেম্বর হইতে ২৮। অক্টোবর, হিন্দু-মুসলমানের মিলন সংঘে বহন আঁহত অদিক, চট্টোখ আভায পান বহন মহাত্মাও অনমন হত কয়েক। ২৮। অক্টোবর শেখবন্ধু এই সময়ে গণবিধানে আঁহিয়াহিসেন এবং কৃত্রিম মিনাংবের সন্নিবর্তিত থাকেন। সেখানে হইতে তিনি বাসন্তী বৈধি, অপর্য্য বৈধি ও মি: শ্রুতীর বাহ লুচ মিলনার বহন হইয়া যান।

মহাত্মাও, হাবিব আভবল খাঁ, লালো লালপুত্র প্রভ প্রকৃতি কয়জনকে মিয়া একটি পকয়েত গঠিত হয় এবং প্রত্যেক বর্ষ এক মরভাবের প্রতি বাহাতে প্রভ্য প্রকৃতি হয়, তাই হিহ হয়।

(১) প্রত্যেকবর্ষ প্রকৃতি প্রভ্য বাসন্তী বাসন্তি, কোন বর্ষেই বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উপর কোনরূপ অপর্য্য প্রকৃতি হইবে না।

(২) বর্ষস্থান মাত্রই পরিহ: কোন বর্ষস্থান অপর্য্য কল্পিত চট্টো কয় হইবে না এবং বর্ষস্থান আভ্যাত হইলে সকলেই উভা বহন কয় কর্তব্য হইবে।

হিন্দুতা বেন কখনও আলা না করে যে, কোনরূপ বলপ্রয়োগ, মহাপ্রতিহি ও প্রভ্য, আইন বা আবেগের অসোপে সোমক্যা বহ কয় হইবে। সেল পশ্চিমবঙ্গের সম্প্রীতি ও একোই কয় লহব। ইহাতে এমন হইবে না যে কোন মরভাব সোপ পাইবে। আঁহা বৈধানে পূর্ক গোহক্যা ৩৮ মাই, সেখানে কখনও হইবে কোন বিশ্ভাব হইলে পকয়েত মৌলানা কথিব।

মসজিদের নিকটে কোর কথিব: কোনরূপ আঁহি, দখলদি বহ কয় হইবে না। কোনরূপ বাহ বা মসজিদও কোর কথিব। বহ কয় হইবে না। শ্রুতীর নিহ নিহ ব্যক্তি মসজিদ বা অত সাধাব্দ স্থান (বহি হিন্দু পূজাশাল না হয়) হইতে গাবিবে।

ইচ্ছাকৃত বৈ কোন বর্ষে লীকিত হইতে পারে বা অত লীক্য দিত পারে। কিং হল, বস, বা প্রোভেন ঘায়া কয় হইবে না। বর্ষস্থান প্রভ্য প্রকৃতি ভাবে হইবে। ১৮ বৎসরের নীচেৎ হেলেনিসক শিতাভাব্য লম্বিত ব্যক্তি বর্ষীহত কয় হইবে না। মরভাবত কোনরূপ উত্তেজিত কথিব না।

শেখবন্ধু বহন মিলনার একই বিজ্ঞান কথিবহিসেন, তখন বহন আসিল ২৪শে অক্টোবর কলিকাতায় আঁহ পতাবিক ব্যক্তিগে খানভজ্ঞান হইয়াছে আঁহ শ্রুত প্রভ্যচট্ট বহ, সত্যোম্মত মিত, অনিলবহন হাব প্রভ্য প্রাধ ১০ জন ব্যাভাংলেন বিশিষ্ট









হীরেন—হাথা কোথায়—না না ব্যর্থ করবে কে—  
আপনাকে কথা দিয়েছি—আপনো না, এ কি হ'তে  
পারে।

লীলা—আপনি বহৎ, দক্ষন—কথার খোলাপ কি  
করতে পারেন—বহু—দাঁড়িয়ে রইলেন যে—

হীরেন—এই যে, এই যে, বসুধি বসুধি, বাস্তব হবেন  
না, আপনি বহু—

লীলা—এই যে—তারপর কাল বা উপকার আমার  
করেছেন হীরেন বাবু—উঃ! চাকলাদার—

হীরেন—কি আর উপকার সেবি—বার বার ঐ কথা  
বলে আমার লক্ষ্য সেবেন না—

লীলা—উপকার করেছেন, বসুধেই যোগ—আমার  
ইচ্ছা কর্ত্তে—আপনাকে—

হীরেন—আমাকে না তাড়িয়ে আর থাকবেন না  
সেখি—একশো বার বসুধি কোন উপকারই করিনি—

লীলা—বিলম্ব—আপনি সেখি ছবিনয়ী—আপনার  
নাম হীরেন না হয়ে বিনয় হলেই ভাল হ'ত। হাঁ),  
সেহন হীরেন বাবু,—আপনার হীরেন নামটা আমাঃ  
পছন্দ হয় না—তার চেয়ে বিনয় চেয়ে ভাল—আমি  
আপনাকে বিনয় বাবু বলে ডাকব—আপনার কি কোন  
আপত্তি আছে?

হীরেন—আপত্তি—আপনি বলেন কি সোহাদিনী  
সেবি—আপনার ইচ্ছার উপর আপত্তি?—আপনার যা  
ইচ্ছা হয় তাই বলে ডাকবেন—আপনার হুঁসে সব  
কথাই মিষ্টি শোনার—বিনয় ছেড়ে যদি বরকবাণে বলে  
ডাকেন, তাও আমার ভাল লাগবে।

লীলা—ও বা! তাই নাকি?—এ যে নতুন কথা শুন্নি  
—আমি জনৈতাম আমার একেবারে আগুন—কেনল  
শুড়িয়ে বাঁধার জন্তে আমারে হুঁসি—আপনার এ সব  
বাড়াবাড়ি—বন-হাথা, কথা—সত্যি আমার হ'লান কুটিল  
—দুর্ভেদ—লজ্জার বৃত্ত ভাল—মিষ্টি আমার কোন খানটায়  
—শোবেন নি,—আমাদের উল্লসনুই বলে গাল দেয়—  
লতি) আমার আগুন—আগিয়ে যাবি—

হীরেন—আহুন, আহুন, abot—এ কথা শোনাও  
পাপ—কে বলে এ সব কথা—কে সে—abot—abot is

be—আপনারা হচ্ছেন বরার প্রেত দলী—কমনীয়,  
কমনীয়—কি বলবে অনির্জনীয় সুভার-বসন হিমাত্রি—  
একেবারে জমটে-বীর: বরক—এক কথার রেজিষ্ট্রারের  
—হা সেবেন একেবারে ঈতল—হিম—ঠাণ্ডা—

লীলা—হা), একেবারে ডাক্তার ব্যবস্থা—যে রকম  
compliment দিচ্ছেন, কোলাপ হবার আশাও—এত  
বাড়িয়ে বলবেন না বিনয় বাবু—আমরা অতি ছোট—  
আপনারেই নাকি আমারে ছোট করে রেখেছেন—  
আপনারেই ধর্ম আমারে নীচ করে সেবেন—আপনারেই  
নিত্য-কর্ণপদ্যিত আমারে বতখানি নীচ রাখে নাহাতে  
পারেন তার জন্তে চেষ্টার একটুও ত্রুটি করেন নি—  
কাজেই আপনাকে বীকার করতেই হবে—যে, আমার  
অতি ভুল জীব।

হীরেন—না না, ভুল ন'ন—অতি উচ্চ, ছোট, নন বড়  
—বড়—big—high যে গাই বলুক, আমি বীকার করতে  
যা না—হাতের পাড়ি না।

লীলা—কিন্তু শান্ত যে বলে যেহেঁরা ভূগমণি কুন্ত—  
তারে কোন voice নেই—তারা পরানীন—তারেই  
কোন বস্তু অস্তিত্ব নেই—এ সব কি তা হলে কাজে?—

হীরেন—বাক্যে, বাক্যে,—একেবারে বাক্যে—এর কোন  
মূল্য নেই—এ সব অর্থহীন প্রলাপ—কি বলবো—এ সব  
হ'ল একটা বাক্য অবিচার—বীতংস অন্ত্যচার—অসমত  
অচার—যোর অনাচার—

লীলা—পাণ্ডা—কুশের আচার—হাঃ হাঃ হাঃ—  
হীরেন—আপনি হাসছেন—কিন্তু এ সব আমি মানি  
না—মানবো না—মানতে চাই না সোহাদিনী সেবি—  
আমি বিব্রোহী—

লীলা—বেশ, বেশ, আমি খুব খুশী হলাম বিনয়  
বাবু।—আপনার বিবেক হয় নি নিষ্ঠুর—আপনার বিবেকে  
আমি এই সব কথা নিয়ে পড় ছাপাব—তখন কি  
অভিলাষ করতে পারবেন না—

হীরেন—নিষ্ঠুর প্রতিবাদ করবো না—কিন্তু সেবি—  
আপনি ঠেকে সেলেন, আমি কোটেই বিবে করবো না—  
লীলা—ও বা স্বেচ্ছা—বিবে করবেন না কি বহু—

হীরা—বলবার কি আছে—বিরে কথা আবার  
চলবে না—

লীলা—কেন বলুন যে—

হীরা—কেন নেই—simply করবে না বিরে।—

লীলা—ও না, দীর্ঘ নিশ্বাস পড়ছে যে—তা অবন  
অনেকেরই বিরের নামে দীর্ঘ নিশ্বাস পড়ে থাকে—  
আবার তারা বিরের করে দিনরাত।—যাক একদিনের,  
আলাপে আপনাত সবে অনেক কথাই হলে—নিশ্চয়  
তাৎপন্ন মেয়েটা কি নিশ্বাস—কেন—তা—

হীরা—না না সেকি কথা—কিছুই তাহিনি, আপনাত  
সবে এই সব করার এত আনন্দ হ'ল—আপনি কি বিষ্টি  
কথা বলেন সোহাগিনী যে—

লীলা—আবার compliments আরম্ভ হ'ল—আপাততঃ  
এই সব বন্ধ করুন দিনরাত। এই সব আলোচনার অনেক  
সময় পাওয়া যাবে—আপনাত বিরের বাধা যা আছে  
সে সব কথা পরেও শোনা যেতে পারে। উপস্থিত—  
আপনাকে একটু জলযোগ—এবং তৎক্ষণ সন্মোদিত—

হীরা—ইহা ইহা : জলে গেলি—আপনাত গান—  
ভুলে হব—

লীলা—না না, আবার নয়—আপনাত। শুনেছি—না  
না, আপনাকে যেবে বোধ হচ্ছে আপনি বুঝ ভাল গান  
সাইতে পারেন—আপনাকেই গান শোনাতে হবে।

হীরা—আপনাকে গান শোনাও এ গোপ্যতা  
আবার কোথায় দেবি—আপনি বরং গান, আমি শ্রোতা  
হই—

লীলা—অর্থাৎ আপনি গাইবেন না—না না সে হবে  
না, আগে আপনাকেই সাইতে হবে—উঠুন, অরগানে  
বহন—

হীরা—নেহাতই বহন হাড়বেন না তবে এই গাধার  
চাকারটা—

লীলা—সে আমি বুঝবো, আপনি গান, আমি ততক্ষণ  
চা-ট করে ফেলি—উঠুন—(হীরা অরগানে বসিয়া  
গাহিল)

কোন অজানা বস্তু আছে

মনটাকে জোর পড়ছে।

বিলম্ব যদি না হয় তবে  
আপনি কেনে হবি মায়া।

এই বস্তুটির বোঝা—যে  
কি দিয়ে তুমি পাবি শোনা  
পরশনি আছে কি তোর  
শ্রেণের স্ত্রী আছে জানা,  
নাই বা পেলি ছবির ধনে  
ভালোবেগেই আপন হনে  
ভুলবি ছবি মরণ পণে

শ্রেণের পুত্রের এই তো দারা।

লীলা—চরৎকার হীরা—না না বিনয়বানু, এমন  
বয়স—পানে কেউ দিতে পারে—আবার বয়স ছিল না—  
চরৎকার—

হীরা—এত প্রশংসা পাবার বোধ্য আমি নই ;  
আপনাত সব বাড়াবাড়ি সোহাগিনী বেবি।—

লীলা—না না, সত্যি বাড়াবাড়ি নয়, আপনাত গান  
অতি চরৎকার—

হীরা—কিছু নয়—এ, আপনাত বাক্য কথা। যিহে  
কথার সময় নষ্ট করে কাজ নেই, এইবার আপনি গান—

লীলা—কিন্তু আমি কি গাইবো, এর পর আবার গান,  
একবারে যাবে না—

হীরা—এই কথা বলে ডাকি দিনে চলে না বেবি,  
আপনাকে গাইতেই হবে—

লীলা—আপনি আবার উপকারী বন্ধু, আবার  
আপনাত অসুখের রানতেই হবে কিন্তু আবার গান  
আপনাত নিশ্চয়ই ভাল লাগবে না—

হীরা—ভাল লাগবে আর নাই লাগবে—আপনি গান  
তো—

লীলা—হাড়বেন না বহন ভবন গাইছি, তার আগে  
আপনি ততক্ষণ অরগোপটা দেবে নিব—

হীরা—আজ্ঞা—তা নিচ্ছি—আপনি গান—

(লীলা অর্গানে বসিয়া গান বসিল) হীরা চারের শেরালাহ  
চুইত বিল—

তোমার আবার মিলন।

আজকে রাতে জোঁড়নাতে  
যুব শ্রেণের আপন।

চোখের হাসি তোমার চোখে

আমার চোখে ভল

কায়ো-হাসির বেশা-বেশি

উত্তল হৃদয় ভল,

তোমার নুকে সোহাগ-সুখে

শান্ত হবে মন ।

উপরে চাঁদ নীচেতে ফুল

বহিছে ঘরিন ঝর

গড় বিধানে খেন আনুহনে

বিলন-শীতিকা পায় ।

হৃদয়-দগিত জয়ে তুমি গো

এ কি পুলক-শিহরণ ।

তোমার আমার বিলন ।

লীলা—ও কি চা যে ছুড়িয়ে গেল—হীরেনবাবু—

হীরেন—না ঠিক আছে—

লীলা—হাঃ হাঃ হাঃ । ঐ ভল চা-চা এক চুপকে খেয়ে

কেলুগেন—আগনি কি ?

হীরেন—না না—বেশি—আগনের গান শুনে  
শুনে—

লীলা—বুঝি—আগনার দানবকে এত বাড়িতে  
পারেন—

( নেপথ্যে দরজায় দাক্তা দিবার শব্দ )

হীরেন—ও কি, বাইরে বোধ হয় কে ফটা নাড়য়ে—

বিকাপ—দরজা খোল—

লীলা—(সতকে) এ্যাঃ ! কি হবে—আমার খাবী—কি  
হবে ।—এ সময় তো আমায় কথা নয়—কি হবে  
হীরেনবাবু—

হীরেনবাবু—এ্যাঃ—এ্যাঃ—এ্যাঃ—মানে তিনি কি—  
যদি—

লীলা—যদি কি—অপরিসিত পুরুষের সঙ্গে দিগ্নালা  
আলাপ—মানে পুরুষ বাছুরের সঙ্গে বেশা—মানে—

হীরেন—ভবে কি হবে—সোহাগিনী বেশি—

লীলা—তাই তো কি হবে বলুন তো—

বিকাপ—দরজা খোল—

হীরেন—আমি কিছু আমি না—আগনিই আমার  
ভেঙে—

লীলা—হ্যাঁ—সত্যিই তো, আমি আপনাকে ভেঙে  
এনেছি—আগনি আমার পথে উপকাঠী বন্ধ—অপনাকে

সম্মান দেখাবার জন্যে যদি ভেঙেই এনে থাকি—সোহাগী  
কি ? আমার মনে তো কোন পাশ নেই—তবে আর তার

কি ? না হয় একটু বকা-বকি করবেন—সে আমার  
অভ্যাস আছে—কিন্তু আমার খাবী আমার একটু

ভগ্নাশ্রুতি—মানে আগনি যদি—আবার—

হীরেন—তাইতো—না, না—এ্যাঃ ! যদি নাক-খোর—  
কি পুলিশ—এ্যাঃ—

বিকাপ—দরজা খোল—

লীলা—না, আর দেবী নয় । যা হয় একটা কিছু  
করতেই হবে—তা এক কাজ করুন, আগনি শ্বৈগমি

কোথাক সুকিমে গড়ুন হীরেনবাবু—

হীরেন—হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন

বলুন তো—কোথায় কোথায়—

লীলা—তাই তো । কোথায়—

বিকাপ—দরজা খোল না—

লীলা—বাই—সুকিমে গড়ুন হীরেনবাবু—সুকান,  
ইঙ্গুর সুকান—এই আলমারীর পেছনে—না না, ঐ

টেলির নীচে—না না ঐ পর্দার আড়ালে—না না ঐ  
ধোপার ঘোড়ের নীচে—ঠিক হয়েছে, যির হাত থাকবে,

নড়বেন না বেন ।—

হীরেন—না না—বাইরে থেকে আমার দেখা যাঃ  
না তো—

লীলা—না না—

বিকাপ—দরজা খোল না—কতক্ষণ সত্যিই থাকবে—

লীলা—বাই গো—আঃ ঘোরাটাও ঠিক এই সময়  
বাইরে গেছে—বাহি—

( লীলা বাহিরে গেল ও একটু পরেই—বিকাপের  
সহিত প্রবেশ করিল )

লীলা সে কি, তুমি কি পাগল হলে না কি ?

বিকাপ—পাগল হইনি নিশ্চয়—কোথায় গেল—  
একবার আমার সঙ্গে যে দেখা হওয়া দরকার—

লীলা—মানে—এখন করুন সত্যিই তুমি পাগল হবে  
যাবে—

দেখ, আমার চরিত্রের উপর তোমার এমন সৎকে  
—কখন উচিত নয়—তুমি জানী, বুদ্ধিমান—আমার এই

পাত বহুর সেখে আসুহ—হঠাৎ কোথাও কিছু নেই—ঐ  
বাত্তিক তোমার কি করে যে হ'ল তেবে পাই না।—  
এতদিন যর কবেও কি আমারে চিন্তে পার নি।—

বিকাপ—যুব পেয়েছি—পারব না আর—তোমাদের  
হাড়ে হাড়ে চিনেছি—নষ্ট যেহেতু বাক্যবিশ্রাসে এমনই  
পটু বটে—এখন সত্যি করে বল যেমি—তোমার Lover  
—শ্রীমানসী কোথায় গেছেন—

লীলা—উঃ! অসুস্থ—ছিঃ! তুমি কি ?—

বিকাপ—আমি কিছুই নই, বাহুব—আমল বাহুব।—  
নাহুতই এই রকম করে থাকে—এতে আশ্চর্য্য হবার  
কিছুই নেই। এখন বল তো কোথায় গেল—কোথায়  
টাকে লুকোলে—

লীলা—কোথায় আমার লুকোনা—আজ! বেশ,  
বিশ্বাস না হয়—এই ত একটুখানি বাড়ী—খুঁজে এসো।—  
একটা আঁত বাহুবকে তো আর আঁতলে গেরো দিহে  
রাখতে পারি না—আর যরও ভাবি না যে অসুস্থ করে  
রেখেছি।—যে তো তেবে এই বাড়ীতেই থাকবে।—যাও  
খুঁজে এসো—একতলা—দোতলা সব।—কিন্তু যদি না  
পাও আর কখনও—দীর্ঘনে—আমায় সন্বেহ করতে  
পারবে না। তোমার সব ভাল—কিন্তু এই যা দেখে—  
ছি ছি—আমার ঘেরা ঘরে গেল।—এত ভেবেবেছি—  
হর, প্রেতিন:-দি—এক, দুকটি-দি—ছই, পাশ্চি—তিন,  
গুপ, চার, হেফা—পাঁচ, তারপর—৬

বিকাপ—থাক থাক যবেই—যেই নামের প্রয়োজন  
নেই, এদের লুকাইকেই জানা আছে—

লীলা—বানে—উঃ! তোমার কি ছোট মন—

বিকাপ—হঁ, ছোট মন তো বটেই—তোমরা সব  
উজ্জবনা—দিনে হুঁপরে স্বামীঃ অলসকালে পর পুস্তকের  
সঙ্গে আঁজা দিতে একটু নাত্র বাবে না—তোমরা—

লীলা—আজ্ঞা হুঁমি, বাড়ী Search কর, এখন—আর  
একমিনিট ঘেরা নয় যদি না পাও আমি নহা অনর্থ  
বাধাব, সলসকে যর যোগে—তোমার এই গুণের কথা  
সর্বত্র প্রচার করে দিহে—নামার বাড়ী চলে যাব—

বিকাপ—কিন্তু যদি পাই খুঁজে—তাকে—তাহলে  
তোমার চালাকী ব্যর করে যিছি—এই তো বাড়ী, কোথায়

আর তাকে লুকিয়ে রাখতে পারবে—এখনি খুঁজে আনিছি  
তাকে—যেমি, তোমার সন্তীর্ণতার বড়াই কোথাও থাকে।  
আগে খুঁজে পাই—তারপর—তোমার—

লীলা—আমার কি করবে—খড়ি ঘরে ব্যর করে বেবে  
তো—খাড় কেন, তুমি যদি মাথা কামিহেও বিহার করে  
নাও, আমি একটুও হুঃখিত হব না—আমো, খুঁজে  
আনো, এখনি আনতে হবে—

বিকাপ—আজ্ঞা বাড়ি,—তুমি এইখানে গাড়াও, আমি  
আসুছি—

লীলা—আমি আছি—ভর করি না তোমার—যাও—  
এখনই যাও—

বিকাপ—আজ্ঞা দেখছি—(প্রস্থান)

লীলা—হীরেনবাবু সাধবানে থাকুন—তর নেই—  
আপনাকে খুঁজে ব্যর করতে পারবে না নিশ্চই—

হীরেন—কিন্তু মন যে বড় হয়ে ব্যর—আর পারছি না।

লীলা—একটু বৈধাঃ ঘরে থাকুন—মর এত সহজে বড়  
হবার নয়—আর একটু—এখনি বিদায় করছি—চুপ—চুপ,  
এই আসছেন। (বিকাপের প্রবেশ)

বিকাপ—না কোথাও গেলান না—(বগত) তাইতো  
সত্যিই কি মূল করলাম না কি—হীরেন কি তেবে এ  
বাড়ীতে আসেনি—(প্রকাশে)—সত্য কি তেবে—

লীলা—না না, মিথ্যা বিধো, আমার ঘরে বাহুব  
আছে—আমি নষ্টচিহ্না, আমার মুখ দেখো না—আমার  
দুঃ করে যাও।

বিকাপ—আহা, রূপ কর কেন ?

লীলা—না, রূপ করবে কেন ? আমার রাগেরও  
হেতর নেই, আর অহুরাপেও কাছ নেই—আমি আজই  
চলুন নামার বাড়ী। যে স্বামী আমারে বিশ্বাস করে না—  
তার বাড়ীতে তাইই অপ্রজ্ঞার অর ষেতে আর চাই না—  
আমার বাপ কর আমি আজই যাব—ছি ছি—

বিকাপ—বেধ, যুকে দেখ আমি সত্যি বলছি, এই  
নারী, স্বামীনতকে এখনও চান, চোখে ষেখতে পারিনি।  
তাই—

লীলা—তাই আমার উপর এই অত্যাচার। অতঃপর

হ.ল তোমার ঘূর্ণের উপর তোমার Divorce করে চলে  
যেতো কোনকালে—আমি বলে তাই এতদিন মরে আমি,  
এতদিন নেহাঁত হিন্দু রেহে—তোমার ভালও যদি—  
তাই, তুলোয় থাক ওলব কথা—আমি এখন যাব—এবনি—  
বিকাপ—না না তাগ করো না

লীলা—না না আমি থাকবো না—থাকবো না—  
কিছুতেই থাকবো না—

বিকাপ—আজ্ঞা আর একটা দিন—আর একটা দিন  
থাবে—কাল তোমার—

লীলা—আজ্ঞা,—আর একদিন—বেশ কালই যাব—  
তুমি কালই আমার বলবে যে তুমি আর কখনও আমার  
সঙ্গে করবে না—আর যদি না বল তবে আর তোমার  
কোন কথা শুন্বে না—কোন বাধা মানবো না আমি,  
Tari ভেঁকে বহাণ Station-এ হাজির হব।—

বিকাপ—আজ্ঞা বেশ, তা তখন তুমি বেগ—কিন্তু তার  
আগে অনেক কিছুই ঘটতে পারে—তোমার হরতো  
আমার এই ধারণার বলে সত্যখিনি সত্য আছে তার একটা  
এমগণ্ড করে দিতে পারি—

লীলা—যখন পারবে কথা বলো—এখন আমাকেই এই  
আচরণের জন্যে তোমার লজ্জা হওয়া উচিত—আমরা  
হলে—

বিকাপ—তোমরা হলে যা হতো তা—শেনখার এখন  
আমার সময় নেই, আমি এখনই যাব -

লীলা—মানে—তাহলে এখন বাড়ী আগবার কি  
দরকার ছিল—ওঃ বুকেছি—কি পানী মন তোমার—  
আমার ভয় হচ্ছে—তুমি হরতো কোনদিন সত্যিই পাগল  
হয়ে যাবে -

বিকাপ—আজ্ঞা সে তখন বোকা যাবে, আমি চললাম।

লীলা—এস—আসবে কখন—

বিকাপ—১০টার আগে নয়—(প্রস্থান)

লীলা—হীরেনথানু ঘেরিয়ে আসুন—

হীরেন—আঃ—বাঁচলাম—

লীলা—চন্দ্রেন তো আমার খান্না কখন—

হীরেন—চন্দ্রেন তো—উঃ কি ভয়ানক মোক—  
বিশ্বাস্তা স্ট্রীকে সঙ্গে—কত কষ্ট—সেই এই  
জগৎ তো আমি বিব্রাণী—আমার প্রাণে—

লীলা—আহা, আপনাকে বরখি এগে আছে—কি  
করবে বহুন, আমার অসুখ—

হীরেন—অসুখের বেহালা বলে চলে না সোহাদিনী  
দেখী, আপনিও বিব্রাণ করুন, যান, পালান—শিকলী  
কেটে ফেলুন।

লীলা—আজ্ঞা সে তখন দেখা যাবে—বিতোহ—  
শিকলি কাটা—যাও পাখি উড়ে—এলব আজ আর কিছু  
ভাল লাগছে না—

হীরেন—আহা দেখী আমারও নয়, আমারও কিছু  
ভাল লাগছে না—

লীলা—একি আপনি যে আর কেঁমে ফেলছেন হীরেন—  
যাও—থাকগে ওলব কথা, চলুন বেড়িয়ে আসি—

হীরেন—চলুন, তাই ভাল—একটু Fresh air—

লীলা—আজ্ঞা আপনাকে শুধু তুমিই কষ্ট বেওয়া হল—  
কাল আমার আসবেন, তর নেই—কাল আর এই রকম  
কিছু বটা সম্ভব নয়। কখন আসছেন—

হীরেন—বলুন কখন—

লীলা—যদি বলি বেলা দুটো—

হীরেন—বেলা দুটো কি বলছেন, যদি বলেন রাত  
দুটোর আসতে হবে, আমি ঠিক হাজির হব—আপনার  
কাছে আগা—এ তো—

লীলা—আবার Applepie—বাহুন বাহুন—কাল  
বেলা দুটোর সময় আসবেন কি—

হীরেন—শিখর আসবে দেখী, শিখর—শিখর—

লীলা—এখন চলুন, কাল আবার আপনার গান  
শুনবো চলুন—

লীলা—চলুন—

(উভয়ের প্রস্থান)





## प्रतिज्ञावाचक धातु

শ্রী বুদ্ধ বজ্র মন্ত্র

( ५८ )

অন্যদিকের দূরে বিখ্যাত লেখক ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক।  
 তিনি বেশীদিন বিশ্বব্যাংকে যোগ দেন। তিনি আদ্য-মধ্য-  
 পশ্চিম ভাগে গিয়ে, দু'তিন মাসের মধ্যেই তিনি বিশ্বব্যাংকের  
 অধ্যাপক মনোনীত হয়ে আসেন। গুরুত্বপূর্ণ—সংস্কৃত সাহিত্য  
 ব্যাখ্যায় অধ্যাপকের এক কক্ষেই তিনি এসেছেন অধ্যাপক। তিনি  
 এবং ইংরেজী সাহিত্যের বিশেষত ইংরেজী কবিতার প্রায় শতাব্দী  
 মাত্র অধ্যাপক। বিশ্বব্যাংকে যোগ দেওয়ার মাস দুইক  
 মধ্যে বিশ্বব্যাংকের অধ্যাপক ইংরেজী কবিতার উপরে তাঁর  
 একটি বিশেষ গবেষণাপত্র সংগ্রহ করণ, তাঁকে তৎক্ষণাৎ উপস্থিত  
 কৃত্য করেছেন। তাই যার সোপানে তিনি বহু বৎসরের এমন  
 অধ্যাপক।

[illegible][illegible]

কালো হুঃম মথের মাঝে লাবা বা উত্তিমথোই লেগেছে—সব সমাজে এইটুকু আলখালু ভাবে থাকে। কিন্তু এর কোনটাই মথোই ডাঃ হাথের নিজস্ব বিশেষত্ব নয়; পড়ে না। চোখ দুটো ডাঃ ক'র লক্ষ্য ক'রে দেখেই—অসামান্য দুটো চোখ দেখে যা স্বাক্ষর করতেই হবে। ক্রোধে যখন পড়ান, যখন পুস্তক-চন্দ্রমাখা কীটের মতো ক্রোধেই অঙ্গল দুটো চোখ যেন অগ্নি—অগ্নি কেন লক্ষ্যেই যোগ্যের মস্তক হতে দেহটিকে চেপে থাকে, একতরফা অগ্নি নিশ্চয় ক'রে বসতে পারি। কিন্তু এটুকু লক্ষ্য ক'রেই যে দেহটো চোখ দুটো অসামান্য একাক্ষা আত্ম-সম্মতি, গান-কিত্তি, —বাইরে চপড়ের সঙ্গে তাই যেন কোনও যোগই নেই, কালের মুখে থেকে যেন চেপেই যেনে না, ক্রোধের ছাড়া-ছাড়া যেন ক্রোধে তার যেন কোনও লক্ষ্যই নাই। এতদিন—এ-দিনের কথা কোনও যেনই কুল নয়—তিনি ক্রোধে Wordsworth-এর কবিতা পড়লে। বিখ্যাত কবিতা Solitary Reaper পড়তে পড়তে তাই দুটো লাইন বাধে বাধে পড়তে লাগলেন—  
কিছু কবিতাটির বিষয় কোনও মন্তব্য না ক'রে যৌবনোন্মত্তের 'কুক-কলি' কবিতাটির নিজস্ব মনেই আঙ্গোশোভা আবৃত্তি ক'রে গেলেন। সেই সময় তাঁর চোখে যেন একটা জ্যোতি দেখেছিলো, আত্ম-পুণ্যত্ব কোনও মাঝেই চোখে তা যেনি—যেমনও না যেন হয় কখনও। কবিতা পড়তে পড়তে সমস্ত ছন্দগান সেই জ্যোতিতে যেন ক্রিয়ামিত হ'য়ে উঠেছিল স্বাভাবিকত্বের ভিত্তি—অথচ হ'য়ে চেপেছিলো আত্ম। কিন্তু এসব মাঝেও শুধু এই চোখ দুটির মধ্যে কুক-কলি ডাঃ হাথকে পাওয়া যাবে না। ব্যক্তিগত আত্ম-এমন জ্যোতি ডাঃ হাথের কথা ভাবি। ডাঃ হাথকে পাওয়া যায় তাঁর সমস্ত ক্রোধে সমস্ত মিলিয়ে, তাঁর চেপে যেনে মথো, তাঁর মথো, তাঁর মথো। সমস্ত ক্রোধে একটা পরিপূর্ণ সামন্তত্বের মধ্য দিয়ে একাক্ষ পাঠ ডাঃ হাথের ব্যক্তিগত অঙ্গল মথো। তাঁর গলায় স্বতঃ তাই ব্যক্তিগতই উপাখ্য—যাটা যেনেই নয়, অথচ গলায় স্বতঃ মথো একটা ডাঃ আছে, একটা আকর্ষণ আছে। কবিতা পড়বার এখন মাঝে ক্রোধে উল্লসিত ক্রোধে ক্রোধে। তাঁর কবিতা পাঠ বন্ধ সেগে, দেহটুকু সেই ক্রোধে ক্রোধে ক্রোধে বহন—এটা আত্ম বাধে বাধে লক্ষ্য ক'রে।

ড বাহ বিশ্ববিজ্ঞান যোগ দেওয়া পর—যাহ একটা বিদ্য  
নিতে কর্তৃপক্ষের মধ্যে একই চাক্ষুসে পুষ্টি হয়েছিল—যাহ  
পাশাপাশি জন্মছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরা তত ইংল্যান্ড  
অন্তর্যমণি সাংগীত পোষক, কিশা পলা বহু কোটি বা চাপকনি  
এই ধর্মের একটা কিছু পরে কলোনে আসতেন। কিন্তু ডাঃ  
বাহ এল যোগ দিলেন—পরিচয় পছন্দে হুঁত, বহুধর্ম পড়া  
এক পদ্যের চেয়ে। তবে হুঁতের তাকে এই পোষক ছাড়া  
কিন্তু কেউই নাহি,—কন ঠিক জানি না—অন্যভাবেও কয়ে-  
ছিলো, কিন্তু তিনি বাতী জন্ম নি। কিন্তু এটা লক্ষ্য করে-  
ছিলো—সব সময়েই পরিচয় পছন্দে, বহুধর্ম পোষক, এইটুকু  
মহলা কাগজ কামা পরতে ডাঃ বাহকে কখনও বেখনি। বহুধর্ম  
মহিমা যে এমন সম্মত হয়ে প্রকাশ হত, এই পূর্বে কুঁচি—যা  
বাহ হত ইংল্যান্ড পোষক পরিচিত মিঃ লরকাংকে দেখে মন  
একটা সজ্জিত হয়েছিল, বহুধর্ম বিজ্ঞে তাঁর হুঁতকে মন  
হয়েছিল বিভব।

আগেই বলেছি, রাণে পড়াতে পড়াতে ডাঃ বাহ ছাত্র-  
ছাত্রীদের সুখের দিকে মন চাইতেনই না, নিজের ভাবে বিভোর  
হয়ে পড়িয়ে যেতেন। তাঁর পড়াবার সময় তাকে কোনও বস্তু  
এক করে কিশা অল্প কোনও বস্তুই বাধ্য পুষ্টি করে ছাত্রের  
মনে মন সজ্জিত হ'ত, এমনই একটা আত্ম সমাহিত বল ছিল  
তাঁর পড়াবার মধ্যে। কারণ সুখের দিকে চেয়ে কখনও বিশেষ-  
ভাবে কথা বলেন নি, তাই কোনও ছাত্র-ছাত্রীকেই তিনি বোঝ-  
হয় ভিন্তেন না। রাণে বাগ্যের সময় ছাত্রদের মধ্যে সাধনে  
এক চুপ ক'রে বীড়্যতেন, আনন্দের মাঝা নীচু ক'রে তাঁর সঙ্গে  
রাণে যেতাম—একটা কথাও বলতেন না।

একদিনের একটা ব্যাপারে তবু যে বিস্মিত হয়েছিলো তা  
নয়, মনটাকে আবার মন এলোটা-পালোটা করে ছিল। ব্যাপারটা  
বটল জোখের দুটো গিট পরেই। ছাত্রদের মধ্যে ডাঃ বাহকে  
নিজে প্রাইম আলোচনা হ'ত এবং সকলেই তাঁর প্রতি সজ্জিত যে  
তাঁর বিশেষ গুরু হ'তে উঠেছিল, একথা কাহাও অজানা ছিল  
না। কিন্তু সেই সজ্জিত যে শেষ পর্যন্ত প্রবেশ পথিত হ'তে পারে  
একবার আবার আশে চক নি। ব্যাপারটা বলি।

সেকালিকা মিঃ ব'লে একটা ছাত্রী আবারের সঙ্গে গড়ে  
এক মেয়েটিকে আবার জালি লাগে। কামলা একতায়  
মেয়েটী—সুখের মধ্যে একটা মিঃ বাহুগা আছে এক সেটা  
বোঝে হয় তাঁর মনোভাবেরই প্রতীক। অল্প অল্প  
মেয়েদের মধ্যে এই মেয়েটির সঙ্গে আবার ঘনিষ্ঠতাও

হয়েই যেত। আন একটা মেয়ে ছিল—মন মনোহর—এক  
এ মেয়েটিকে আবার একবারেই ভাল লাগত না। চমকিত  
কবার থাকে বলে "দুর্ভাগ্য ক'লিগ"—এ মেয়েটি তাই। অন্যরকম  
কথা বলে, সুখের কোনও লাগান নাহি, এমন কি অন্যের এবং  
অন্যের কথায়ও কোনও লাগে নাহি, তাই মনোভাব পথিত হয়েই।  
মেয়েটি মার্কি বেক-লিগার ব'ল সম্পর্কে কি বস্তুই হ'ত, হো  
বিক্রমের হাটবেই ওয়ে মনোহর যে হমন এমন নয়।  
ডাঃ বাহের প্রতি আবার সবসময় অপরূপ কিছু এই মেয়েটি  
আবারের সেই পথিত মনোভাব নিয়ে মনোহর বস্তু পথিত  
মাকে মাকে অল্প মনোভাবের ঠিকই সজ্জিত হ'ত।  
সকলেই জানে এর কথাই কোনও ব'ল নেই, তাই সকলেই  
হলে ওর কথা উড়ার মেন, কেউই পারে মনোহর। একবার  
একটা ইংল্যান্ড ক'লিগ মিঃ মিঃ মেন আবার মনোহর—

Oh Dr Roy! with charm divine  
And beaming eyes, you are fine,  
We the girls the pupils here  
How we adore you. Our dear I  
You come in class do you not see  
How all the girls tremble with glee  
Some turn purple some crimson turn  
Life's sweet lesson from you they learn.

সব মেয়েকে মিঃ মিঃ কিছু কিছু গিয়েছে। আবারের মনে যে  
হুঁত পাঠ্য নিজেই তা এই—

"Beautiful Bula with head so high  
Conceals her agony in an humble sigh"

সবটা মনে বলেছিলো "আমি কি ক'লিগ হ'য়ে—এক  
এই ভাল নেই—"

বলেন—"তোমার মনোভাব হুঁত তাগে দুটো ব'ল  
বাহ হত অল্প বীড়্যতামের লাগে না—আমি ত ভাগ্য।"

প্রকাশ্যে—"আমার—agony! কিসে? ক'লিগ?" বলেন  
"নিজেই মনকে বাতাই করে দেখে—ক'লিগ হ'য়ে ক'লিগ ক'লিগ  
নয়।"

ব'ল, যেদিনের কথা বলছিলেন ক'লিগ মনোহর মন তিন  
টা পরে সেদিন অবসর সময়ে আনন্দের, মেয়ে, আনন্দের মন  
পাশে বসেছি, হুঁত মনোহর পথিত ভাবে বলেন—"ক'লিগ এটা  
মিঃ সত্য আনন্দের বস্তু।"

সবাই চাইল মনোহর মন মন মন। এটা চুপ করে  
যেতে মনোহর বলেন—"বলো কি বলো না—তাঁর চাই।"

যেহেতু মধ্য ভেট ভেট জোর করে মনোমতকে বহু বল—বলভেই হবে।

অনেক বেন বিবেচনা করে দেবপঙ্খাজ মনোমত বল, “তা বলেই ফেলি। কল্লুকে মধ্য তিনিখটা লখার হয়ে মণ্ডাই ভাল—লুকে দুই ভাল নয়। হস্ত লম্বাই ফিলে পথার্ষ কললে একটা কিছু উপায় হয়ে যেতে পারে।”

একটা যের বললে, “তিনিখটা হেটে গিয়ে কথটা বলেই ফেলনা।”

মনোমত বললে, “কথটা হচ্ছে—আমাদের শেকালিকা দিল ডাঃ বাবের প্রেমে পড়ে পাগল হয়েছে। এখন উপায় কি বল?”

শেকালিকা এক কোণে বলে একটা বই পড়ছিল, এতকণ কথার খোদে বেরানি। হঠাৎ তার মাঝে ও-বকম কথার অস্বাভাবিক হয়ে গেল মনোমতের বিচ্ছেদ এবং আমতাকে সকলে চাইলার শেকালিকার দুখের পানে। সত্যিই শেকালিকার দুখানা একেবারে লাগ হয়ে উঠেছে।

একটু বিকৃতভাবে শেকালিকা বলল, “কি ব্যক্তি কথ্য বক্তৃতা কথ্যাতাপ একেবারে কোনও লাগাম নেই।”

মনোমত সবে সবে বলল, “কি? ব্যক্তি কথ্য। দুই বলতে ভাল দুই ডাঃ বাবের প্রেমে পড়িলি। বল, তাই বল, সেবি একবার সকলের সাননে।”

শেকালিকা সে-কথার কোনও জবাব না করে দুখ নীচু করে বইয়ের মধ্যে মনোনিবেশ করার চেষ্টা করত লাগলো।

মনোমত বলল, “ব্যক্তি কথ্য। তাহলে সব কথ্য যের বলে?”

শেকালিকা ঝগ বলল, “আমি তোমার সঙ্গে কোনও কথ্য বলতে বাজী নই।”

কি ভেবে জানি না মনোমত একটু চুপ করে গেল। দেবেদা কিন্তু নাড়োবাক্য, মনোমতকে দিয়ে বলে পোনার তত বিশেষ পেডাপিড়ি ব্রহ্ম করল—বেন লম্বাই মনোমত যত একটা উপায়ে লম্বা আবিষ্কার করেছে। কৌতুকল আদ্যবৎ যে একেবারে বহনি তা নয়। তবে আমি মনোমতকে ছিরে বসায় গলে দিলাম না।

মনোমত, “তা তাকে লম্বাই দিলাম তব না ও-বে বক্তাই করে যে জীঘামে দিচ্ছে কথ্য বলে না—কল্লু সেবি একবার আদ্য কথ্য দিখো না সত্যি।”

শেকালিকার বাবাব এক লম্বানী তত আছেন। তিনি মাঝে মাঝে শেকালিকাকে বাজিতে আসেন। শেকালিকাকে তিনি কেবল একটা লম্বা দিচ্ছেন—দ্বিহে কথ্য মধ্য—শেলেও বলবে না, এইটেই আশাততঃ তোমার জীবনের তত ডাক। শেকালিকা এই সব কথ্য ভাবিয়ে আদ্যবৎ কাছে যোগে এক প্রাপণ দেই। কথ্য ব্যক্তি ও-বে এই দ্বিহে কথ্য না বলি তত কোনও দিক দিয়ে ভাল না হয়—এটা আদ্যবৎ জানি। দেবেদা কেউ ভেট এ নিয়ে শেকালিকাকে মাঝে মাঝে একটু আদ্য বিস্তপও যে না করে এমন নয়।

মনোমত কথ্য হ’ল একটা মেরে শেকালিকাকে প্রেরণ করল। কিন্তু শেকালিকা—“আমি তোমার সঙ্গে এ নিয়ে কোনও আশোচনা করত চাই না”—এই বলে এমন পণ্ডী হয়ে বইয়ের মধ্যে মনোনিবেশ করল যে দেবেদা দেখানো আর প্রবিশ্য হবে না কল্লু আদ্যবৎ মনোমতকেই দিয়ে বলল।

মনোমত বলল, “আশাততঃ আর কিছু বলব না। আমি শুধু শেকালিকাকে মুক্ত করে দিচ্ছি তাই যে মনোমত কল্লুর সঙ্গে লম্বানী বিশেষ প্রবিশ্য নয়—তাই আশাততঃ উঠেই বসলাম। পার হস্ত সব কথ্যই বলতে বাধ্য হয়।”

কথ্য আর একলা না। শেকালিকা ও মনোমতের মধ্যে আত্মীয়তা আছে, তাই কল্লুরের বাইরে বাজীতেও ওদের দেখাতনা হয়—বুঝলাম কিছু একটা কল্লুর হেলে হ’লম্বা মধ্য। তাই মনোমত শেকালিকাকে একটু লম্বা দেওয়ার জন্যই কথ্য: দেবেদা মধ্য বলেছে। কল্লুর মনে হল, কথ্যটা সম্পূর্ণ মিথ্যা—শেকালিকাকে লম্বা কথ্য জন্তই মনোমতের এই মনোমত অতিবোধ। দ্বি: দ্বি: কি অত্যাচার।

পথতী প্রাণের সময় হওয়াতে একেবারে দেবেদার জন্ত পথচার কাছে এসে পড়লেন—দেবেদা একে একে উঠে দ্বিরের বাইরে গেল। আদ্য ও মনোমত কাছে গিয়ে শিখর দিয়ে চেয়ে বসি শেকালিকা তার সেই কোণটিতে চুপ করে বইয়ের দিকে চেয়ে বসেই আছে, প্রাণে বাওয়ার জন্ত উঠেপড়তে পড়তে নি। কিরে গিয়ে শেকালিকার কাছে গিয়ে শুভালায়, “কি? প্রাণে বাবে না?”

কথ্য কথ্য না গিয়ে চুপ করে বসেই উঠল।  
আদ্য শুভালায়, “কি আশা?”

এ-কি: শেকালিকার চোখ দিয়ে জল পড়িয়ে পড়ছে।  
তাত্তাত্তি দ্বিরের কাছে এসে প্রেক্ষাগৃহে বসলাম, “আমরা প্রাণে বাবে না।”  
[ কল্লুর:

# সাম্প্রদায়িকতা

গণপরিষদের অধিবেশন সমূহে শাসনতান্ত্রিক

সম্পর্কিত আলোচনা:

১০ শে জুলাই গণপরিষদে বৃক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী একটি মস্মীন কোর্ট গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই আদালত বৃক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ সম্পর্কিত এত দূর কমিটির সুসাহিত্য অনুযায়ী গঠিত হইবে।

উপলব্ধি অকলের শাসন পরিচালনার জন্য ব্যবস্থা ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করিয়া শাসন সংক্রান্ত একটি দ্বারা গণপরিষদে প্রস্তাব হইলে ৩০শে জুলাই পরিষদ তাহা গ্রহণ করে। তি কি ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে, তাহা উপলব্ধি অকল সাক-কমিটির কাজ শেষ হইবার পর বিবেচনা করিয়া দেখা হইবে বলিয়া জানা হয়।

তার এন্ গোপালস্বামী আয়েকার রাষ্ট্রপতির বৃক্ত-রাষ্ট্রের আইনতন্ত্রের রাতে অপর্যায়কে কমা করিবার ক্ষমতার জন্য একটি সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপন করেন, ৩১ শে জুলাই গণপরিষদ উহাতে সম্মত হইয়াছেন। কোনো গণতন্ত্রের প্রাণকণ্ড সম্পর্কে কমা করিবার যেরূপ ক্ষমতা আছে, রাষ্ট্রপতিরকে সেইরূপ ক্ষমতা দিবার জন্য প্রিন্সিপল পয়নব আয়েকারের সংশোধন প্রস্তাবটিও পরিষদ কর্তৃক গৃহীত হয়। মূল ধারাটি এইরূপ, যথা: 'কৌজদারী আদালত কর্তৃক প্রদত্ত দণ্ড হ্রাস করা বা কমা করা' ক্ষমতা; রাষ্ট্রপতির থাকিবে। কিন্তু আইন প্রণয়ন করিয়া এই ক্ষমতা অন্তর্ভুক্ত কর্তৃপক্ষকে দেওয়া চলিবে।'—এই ধারা সম্পর্কে তার গোপালস্বামী আয়েকার নিয়োক্ত সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপন করেন, যথা:

কৌজদারী আদালত কর্তৃক প্রদত্ত নিয়োক্ত দণ্ড কমা করিবার অধিকার রাষ্ট্রপতিরকে দেওয়া হইবে। যথা: (১) যে সকল ক্ষেত্রে বৃক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের আইন প্রণয়নের অধিকার বহিরাগত, অথচ সংশ্লিষ্ট ইউনিট আইন সভার তাহা নাই, সে সকল ক্ষেত্রে বৃক্তরাষ্ট্রের আইনের বিচারে অগ্রস্তি অপরাধ। এবং (২) সাময়িক আদালতের বিচার-

যোগ্য দণ্ড প্রকার অপরাধ: বৃক্তরাষ্ট্রের আইনের বলে পূর্বোক্ত ক্ষমতা অন্তর্ভুক্ত কর্তৃপক্ষের হস্তেও অর্পণ করা চলিবে। কিন্তু এই দণ্ড থাকিলে যে, সাময়িক আদালত কর্তৃক প্রদত্ত দণ্ড হ্রাস নতুন করা বা হ্রাস করার যে অধিকার বৃক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের অধিকারবাহক বহিরাগত, তাহার কোনো ব্যাঘাত ঘটবে না।

তার আরও কিছুকিছু আভাস বলেন. দেশীয় রাজ্য-গুলি কতকগুলি বিশদ বৃক্তরাষ্ট্রের হস্তে অর্পণ করিবেন এবং সে সকল বিষয়ে তাহাদের সাংসদোন্ময়ের অবসান ঘটবে। মার্কিন বৃক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন ট্রেট অনেক বিষয়ে মার্কিনোন্মত্ত ক্ষমতার অধিকারী—কিন্তু বৃক্তরাষ্ট্রের বিশেষ তত্ত্ব নহে। বৃক্তরাষ্ট্রের বসস্থ্য প্রত্যেক নাগরিক বৃক্তরাষ্ট্রের আইন মানি চলিতে বাধ্য। বৃক্তরাষ্ট্রের গণতন্ত্রের ও প্রত্যেক নাগরিকের মধ্যে প্রত্যেক সম্পর্ক হইয়াছে। বৃক্তরাষ্ট্রের আইনতন্ত্র কমা হইলে বৃক্তরাষ্ট্রের মার্কিনায়ক নিষ্কর্তৃক অপর্যায়কে কমা করিতে পারেন।

২০শে আগস্ট গণপরিষদে বৃক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতা কমিটির রিপোর্ট পুনরায় আদ্রস্ত হয়। অগ্রসী কৌজদারী আদালত বৃক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতা: সংরক্ষণের পক্ষে দৃঢ় যুক্তি প্রদর্শন করেন। তা: রাষ্ট্রতন্ত্র প্রদান সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। প্রিন্সিপলস: যতঃ—কেন্দ্রকে এমন দনন্ত ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে যাহা: স্বাভাবিকভাবে প্রদেয়-নবুহেরই থাকা উচিত। এইরূপ আভাস বলেন, এইরূপ শাসনতন্ত্রের মততা ছই তাগে বিচলিত করা যায়, যথা: (১) বৃক্তরাষ্ট্রের আর্থিক ব্যবস্থা সম্পর্কে এবং বৃক্তরাষ্ট্রের প্রদেয়-নবুহের মধ্যে কর নির্ধারণের বটন ব্যবস্থা, (২) বৃক্তরাষ্ট্রের বিবরণগুলির সঙ্গে আরও কতকগুলি বিশদ যোগ করিয়া প্রায়শিক আইন সভার ক্ষমতাও হস্তক্ষেপ করা।

বৃক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনামূলক গণতন্ত্রের পক্ষে প্রথমোক্ত বিচলিত পুথি তুলিল, এ সম্পর্কে কোনোই সন্দেহ নাই। এ সম্পর্কে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির সহিত অগ্রসর হওয়া কর্তব্য। সর্বদাই মনে রাখিতে হইবে যে, ১৯

শিক্ষণের একেবারে দুইটি হইলেও ব্যক্তিগতভাবে কাছাকাছি উপর অথবা কোনো যৌগ প্রতিষ্ঠানের উপরই বর চাপানো হইতেছে এবং বর শিক্ষারূপে কছাড়া শীক্ষা-বহু। দ্বিতীয়তঃ বেশের শিষ্ট, বাসিন্দা এবং কৃষি সম্পর্কিত অর্থনীতি পরামর্শের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত যে, এক ক্ষেত্রে বর বাহ্যিক প্রভাব অল্প ক্ষেত্রেও প্রতিফলিত হয়।

হাইস্কুল স্কুলের বেঞ্চে বসার এ প্রায়শাসনীয় মুখাবলি প্রবেশগুলিকে অধিকতর কনজাভানের সুপারিশ করেন, অবৈতনিক ও ব্যবসায়িক শিক্ষা, উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা, বাহ্যিক রক্ষার ব্যবস্থা, শোকেস বাহ্যিক উন্নতি, এই দেশের লোককে তাহাদের গড় পরমায়ু পশি বা সাইক্লিস বহনর অপেক্ষা আরও কিছুদিন বেশী বাঁচিতে দেওয়া, উপযুক্ত বাসগৃহের ব্যবস্থা এবং আরও অনেক কাজ প্রাদেশিক পরামর্শেই দায়িত্ব। প্রায় প্রায়শাসনীয় কৃষি রাজস্ব, আবগারী ওষু, কৃষি ও বর প্রকৃতি সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা করেন, ভবিষ্যৎ, বাজী, শোভাবাজী, ব্যবসা, বৃত্তি, চাকুরী, জল ও নৌকা, বিজ্ঞাপন, বিদ্যাব্যবহার ও ব্যবহার বিলাস ভ্রম, আদর্শ প্রদান, জুয়া-খেলা বোড়োডে ইত্যাদি বিষয়ের উপর বর বাহ্যিক বিষয় আলোচনা করিয়া প্রায়শাসনীয় বলেন যে, এগুলি হইতে বিশেষ আয়ের সম্ভাবনা নাই এবং জুয়াখেলা প্রকৃতি মনস্ক বহু করিয়া দিবার কথা চিন্তা করিতেছেন।

২৫শে আগষ্ট পরিষদের অধিবেশনে মুক্তব্রতী কছাড়া করিটি সম্পর্কে আলোচনা আরম্ভ হইলে বিনা আলোচনার বিপরীত হয় যে, পরমাত্রা, কুটনৈতিক, কনসাল এবং বাসিন্দা প্রতিনিধি, জাতিপুত্র প্রতিষ্ঠান এবং আনবিক শক্তি প্রকৃতি করেকটি দক: মুক্তরাষ্ট্র তালিকারই সংরক্ষিত থাকিবে।

দক্ষার বসন্ত তাই প্যাটেল বৌলিক অধিকার সম্পর্কিত উপযুক্ত কমিটির সভাপতিরূপে রাষ্ট্র পরিচালনার অল্প করেকটি মূল নীতি সংরক্ষিত একটি অতিরিক্ত রিপোর্ট লিখিল করিয়াছেন বলিয়া ২৮শে আগষ্ট পরিষদে আলোচিত হয়। মূল রাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে বলা হয় যে—  
(১) রিপোর্টের এট অংশে রাষ্ট্র পরিচালনার লক্ষ্য আদর্শক মূলনীতি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই নীতিগুলি

আইনের আওতে না বাসিন্দা ও প্রায়শাসনের সঙ্গে এগুলি অত্যাবশ্যক এবং এই নীতিগুলি অনুসরণ করিয়া আইন রচনা করা রাষ্ট্রের কছাড়া হইবে। (২) সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সুবিচারের ভিত্তিতে একটি সমান ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিয়া রাষ্ট্রকে সমগ্র জাতির কল্যাণ সাধনে যথাসাধ্য সহায়ন হইতে হইবে। (৩) রাষ্ট্রকে বিশেষভাবে নিরাসিত উদ্বেগগুলি শিষ্ট করিতে হইবে, যথা—(ক) পুরুষ ও নারী নির্বিশেষে প্রত্যেক নাগরিকের যথোপযুক্ত জীবিকার অধিকার, (খ) বনোৎপাদন ব্যবস্থার মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ একপক্ষে করিতে হইবে বাহ্যিক বস্তুর সমগ্র সমাজে সমগ্রগত কল্যাণ হইতে পারে; (গ) সাধারণের ক্ষতি করিয়া আবশ্যক পণ্য প্রথমে মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ বাহ্যিক করেকজন ব্যক্তি বিশেষের হাতে কেন্দ্রীভূত হইতে না পারে, তজ্জন অথবা প্রতিযোগিতা বহু করা, (ঘ) পুরুষ ও নারী নির্বিশেষে সমান কাজের তত্ত্ব সমান অধিকার গ্রহণ ও সমান পারিশ্রমিক প্রদান, (ঙ) পুরুষ ও নারী নির্বিশেষে কর্মীদের শক্তি ও বাহ্যিক এবং বালক বালিকাদের সৌকর্য্যার্থে বাহ্যিক অপব্যয় না হয় এবং নাগরিকের বাহ্যিক অভাবে তাড়ানার বয়স ও শক্তির অনুপযুক্ত কার্য করিতে বাধ্য না হয়, তাহার ব্যবস্থা, (চ) শিষ্ট ও সুকবের শক্তির অজ্ঞান সুযোগ বাহ্যিক কেহ গ্রহণ করিতে না পারে এবং তাহাদের নৈতিক ও বাস্তব উন্নতির প্রতি লক্ষ্য রাখা। (ছ) আর্থিক সমৃদ্ধি অগ্রসারে রাষ্ট্রনাগরিকদের জীবিকার অল্প কাজের অধিকার এবং বেকার, বৃদ্ধ, পীড়িত অক্ষম ব্যক্তিদের সমগ্র সংখ্যা পূর্বের সংখ্যার চেয়ে দশগুণ বেশী হইবে।

এক সংশোধন প্রস্তাবের বিরোধিতা এসবে মি: অনন্ত পরমম আরেকবার পৃথক ও মুক্তনির্বাচন সম্পর্কে বলেন যে, স্বাধীনতা অর্জনের তত্ত্ব ১৮৫৭ সালে যে যিহু ও মুদল-মান একযোগে সংগ্রাম করিয়াছিল, তাহাঙ্গিরের মধ্যে বিভেদ স্থির উদ্বেগে ইংরেজ পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার স্থিতি করিয়াছিল, মি: আরেকবার বৈধরিক রাষ্ট্র গঠনকরে অজ্ঞাত সম্ভাব্যের সহিত যোগ দিবার অল্প মুদলমানদের মিতট আনুগ্রহিক আবেদন করেন। পণ্ডিত পর বলেন যে, পৃথক নির্বাচন প্রথার মুদলমানেরা নির্বাচিত হইলে

রাষ্ট্রের সনদ। সম্পর্কে তাহাদের কথা বিশেষ ফলপ্রসূত্ব  
হইবে না। এমন কি মি: ভিক্টোর প্রায় বদিগাহেন যে,  
পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থাও আসন সংরক্ষণ ব্যাধি সংখ্যালঘু-  
দের স্বার্থ সংরক্ষিত হয় না এবং ইহার ফলেই পাকিস্তানের  
দুর্ভাগ্য হইয়াছে। মুসলমানেরা যদি বৈধনিক রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠার  
শুভলাভিত হন, তবে দেশের অপরাধের অধিবাসী হইতে  
নিজেদের পৃথক রাখিলে তাহাদের পক্ষেই মারাত্মক  
হইবে।—সর্দার প্যাটেল বলেন যে, পাকিস্তানের দাবী  
মানিয়া লইবার সময় অত্যন্ত ইচ্ছা ব্যর্থতা করা গিয়াছিল যে  
অবশিষ্ট ভারতে এক জাতিই হইবে এবং ছই জাতির নীতি  
গ্রহণের অস্ত্র এখানে কোনো চেষ্টা হইবে না।

সংখ্যালঘু সম্মান্য সম্পর্কে যে প্রশ্নাবলী কমিটি গঠিত  
হইয়াছিল, সেই কমিটি গত ২৬শে আগষ্ট পরিষদে ৩টি  
রিপোর্ট দাখিল করেন। উক্ত রিপোর্টে পৃথক নির্বাচনের  
বিলোপ গ্রহণ, বৌধ নির্বাচনের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় ও  
প্রাদেশিক আইন সভার সমস্ত নির্বাচন, যে সকল সম্মান্য  
সংখ্যালঘু সম্মান্য বসিয়া বীজত, জনসংখ্যার অধুনাতে  
একবে দশ বংশের অস্ত্র বিভিন্ন আইন সভার তাহাদের  
অস্ত্র আসন সংরক্ষণ, দশ বংশের অস্ত্র এ্যাংলো-  
ইতিহাস সম্মান্যের নিমিত্ত রক্ষা কংচের ব্যবস্থা,  
এক ব্যাহার উপর বিচার-বিভাগের কোনো হাত থাকিবে  
না, সেইরূপ কতকগুলি নীতি প্রচায়ে বৌধিক  
অধিকারের অস্ত্রভুক্ত করার কথা বলা হইয়াছে।  
যোচাযুক্তি রাজনৈতিক রক্ষাকবচ সম্পর্কেই রিপোর্টে  
আলোচনা করা হইয়াছে এবং উহাতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি  
হইয়াছে :

- (১) আইন-সভার প্রতিনিধি, বৌধ বনাম স্বতন্ত্র  
নির্বাচন ব্যবস্থা; বিশেষ সুযোগ সুবিধা।
- (২) বহুসভার সংখ্যালঘু সম্মান্যের অস্ত্র আসন  
সংরক্ষণ।
- (৩) সরকারী চাকুরীতে সংখ্যালঘু সম্মান্যের অস্ত্র  
আসন সংরক্ষণ।
- (৪) সংখ্যালঘু সম্মান্যের অধিকার রক্ষার অস্ত্র  
সরকারী ব্যবস্থা।
- সর্দার প্যাটেল বলেন, সংখ্যালঘু সম্মান্য সাব-কমিটি

ও সংখ্যালঘু সম্মান্য প্রশ্নাবলী কমিটিতে সুখ্যপ্রসূত্ব  
আলোচনা করিয়াই আবদা প্রস্তাবগুলি রচনা করিয়াছি।  
দেশীয় ভাষা বাদ দিয়া তাহাও তেজিনিয়নে  
ব্যাহারের জনগণের শ্রুতকর হ-এর কয়—‘ক’ শ্রেণীর,  
‘হ-এর বেনী অথচ ১২-এর বেনী নহে—‘খ’ শ্রেণী,  
শ্রুতকর ১১-এর বেনী—‘গ’ শ্রেণী। তিনিটি শ্রেণীকে  
এই-ভাবে ভাগ করা হইয়াছে—

- |                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| ‘ক’ শ্রেণী                | ‘খ’ শ্রেণী          |
| ১। এ্যাংলো ইতিহাস।        | ৪। ভারতীয় মুসলমান। |
| ২। পানী।                  | ৫। শিব।             |
| ৩। আসন সমস্ত-ভূমির উপভোগ। |                     |
| ‘গ’ শ্রেণী                |                     |
| ৬। মুসলমান।               |                     |
| ৭। তপসিনী সম্মান্য।       |                     |

২৬শে আগষ্ট গণপরিষদের আসন সংরক্ষণ নীতি  
সম্পর্কিত প্রস্তাব লইয়া আলোচনা হয়। সংরক্ষিত  
আসনে সংখ্যালঘু সম্মান্যের কোনো ব্যক্তি নির্বাচিত  
হইবার অস্ত্র নিক সম্মান্যের একটি সর্বনিম্নসংখ্যক ভোট  
সংগ্রহ করিতে হইবে—এইরূপ কোনো ব্যবস্থা থাকিবে  
না; এই ব্যাধি সম্পর্কে বিতর্ক হয়।

২৭শে আগষ্টের অধিবেশনে ভারতের শাসনভায়ে  
বন্দুকা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার অস্ত্র একটি কমিটি নিযুক্ত  
হয়। এই কমিটি বন্দুকাটিকে সংশোধন করিয়া উহা  
পরিষদের বিবেচনার্থ পেশ করিবে। কমিটি নিম্নোক্ত  
পাঁচটি প্রশ্নের সুপারিশ করিয়াছেন—

- (১) গণপরিষদ আইন সভারূপে কাণ্ড করিতে  
পারিবে।
- (২) আইন-সভা হিসাবে কাণ্ড করিবার কালে  
ব্যাসিন্দাব ব্যবস্থাপরিষদের কার্যধারা অক্ষুণ্ণ হইবে।
- (৩) গণপরিষদের প্রেসিডেন্টের আদেশ-ক্রমে  
ব্যবস্থাপরিষদের কার্যনীতির প্রয়োজনীয় সংশোধন  
করিয়া লইতে হইবে।
- (৪) শাসনভার প্রণয়নকারী প্রতিষ্ঠান ও আইন-  
সভা হিসাবে গণপরিষদের কার্য স্বতন্ত্র অধিবেশন  
চলিবে।

সঙ্গে আশ্বিনের দিকে যে দায়িত্ব আদিয়া পড়িল, তাহা আশ্বিনের উপলক্ষি করিতে হইবে।... প্রতি-বর্ষ-নির্ধিষ্টভাবে এই রাষ্ট্রের প্রতি আত্মপূজ্যতাপন্ন প্রত্যেক নাগরিকের শান্তি, স্বাধীনতা ও সম্মান বজায় রাখা হইবে। এই কর্তব্য সম্পাদনকরে আশ্বিনকে আশ্বিনের দায়িত্ব সম্পূর্ণ উপলক্ষি করিতে হইবে। এই রাষ্ট্রের প্রত্যেক নগরস্বামী ও শিল্পক তাহার কর্তব্য পালন করিবার জন্য সচেষ্ট হইতে হইবে তাহাদের এই কথা মানিয়া নইতে হইবে যে, রাষ্ট্র তাহার জন্য এবং যে রাষ্ট্রের জন্য।... সত্যতা এবং দেবাই আশ্বিনের গভীরমন্ডলের আশ্বিন। সাধারণ মাহুকের অবস্থার উন্নতি বিধানের জন্য আশ্বিন সর্বপ্রথমে চেষ্টা করিব। সাধারণতঃ প্রতি আশ্বিনের মনোভাব নিম্নে বিহার হারাই প্রকাশিত হইয়াছে।"

### ভারতের পক্ষে পাকিস্তান বিদেশ

গত ২০শে আগষ্ট ভারতের স্বাধীনতা-দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে ভারতের জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের এক সভার বক্তৃতা প্রসঙ্গে প্রাথমিক মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট মিঃ আক্কা শিরাই বলেন—'ভারতীয় ডেমনিস্ট্রেশনের মুসলমানদের নিকট পাকিস্তান হুজুর বা আক্কাগাদিয়ার দ্বারা বিদেশ। হুজুর সাহাবার জন্য পাকিস্তানের দিকে চাহিয়া থাক। তাহাদের পক্ষে নিরর্থক।' তিনি এই বলিয়া যশা প্রকাশ করেন যে, উক্ত রাষ্ট্রই ভার-নিষ্ঠার সহিত সংখ্যাগুরুদের প্রতি কর্তব্য পালন করিবে।

### বাংলার সীমা নির্ধারণ

কলিকাতা গেজেটের এক অতিরিক্ত সংখ্যার নিম্ন-লিখিত জেলাস্বর্গ পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের অঙ্গভুক্ত থাকিবে বলিয়া প্রকাশিত হয়। যথা—(১) কলিকাতা সহর; (২) হাওড়া; (৩) হুগলী; (৪) বর্ধমান; (৫) বীরভূম; (৬) মেদিনীপুর; (৭) বাঁকুড়া; (৮) বগুড়া; (৯) নবাবী; (১০) মুর্শাবাদ; (১১) বালসহ; (১২) পশ্চিম দিনাজপুর; (১৩) জলপাইগুড়ি ও (১৪) হাতিয়া। (এলপাইগুড়িকে বর্ত্ত করা হইয়াছে)।

সীমানা-নির্ধারণ কবিশের চেয়ারম্যান মিঃ হ্যাট-ক্লিকের সিদ্ধান্তাবধারী এইরূপ ঘোষণা করা হয়। বাকী

সম্পূর্ণ (দেশীয় রাজ্য) রাণে। পূর্ববঙ্গের অন্তর্গত। যথা—হুগলী, বড়দা, রাজসাহী, পাবনা, নদীয়া। (খতিত) যশোহর, খুলনা, বাখরগঞ্জ, কলিকাতা, নোয়াখালী, ত্রিপুরা, ঢাকা, মহম্মদিয়া, চট্টগ্রাম, পার্শ্বচট্টগ্রাম।

সীমানা-নির্ধারণ-কবিশের চেয়ারম্যানের সিদ্ধান্ত অনুসারে পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান ও অমুসলমান জনসংখ্যার হিসাব নিয়ে বেওয়া হইল। এই হিসাবে পার্শ্বচট্টগ্রামও বরা হইয়াছে। কলিকাতা ইণ্ডিয়ান ট্যাঙ্কিং কোম্পানী ইন্সটিটিউটের কয়েকজন কর্মীর সহযোগিতায় কংগ্রেস-উপদেষ্টা। সীমানা-নির্ধারণ-কবিশের সম্পাদক তালিকাটি প্রণয়ন করিয়াছেন।

পশ্চিমবঙ্গ, পূর্ববঙ্গ, মোট, পশ্চিমবঙ্গ শতকরা, পূর্ববঙ্গ শতকরা মুসলমান—

৪০.১২.০

অ-মুসলমান—

১৪২০৪২০ ১৪০.৭৪২৮

মোট—

২১২৪৪০১ ৪০.১১২০১ ৮.০৮২২৪ ৮৪.১৪ ৮৪.৮৮

মোট আয়তন—

২৮.০০ ৪৪৪.২ ৭৭৪২ ৮৪.২ ৮৮.৮

প্রতিবর্ষীয়

লোক সংখ্যার পক্ষে ৭৪৮

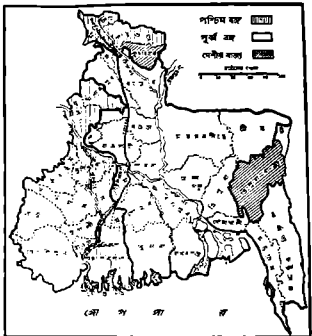
সিদ্ধান্তাবধারী পশ্চিমবঙ্গের তাগে মোট আয়তনের

শতকরা ৮৪.২০ তাগ জমি ও মোট জনসংখ্যার শতকরা ৮৪.১৪ জন লোক পড়িয়াছে। সে ক্ষেত্রে পূর্ববঙ্গের তাগে যথাক্রমে শতকরা ৮৪.৮০ তাগ জমি ও শতকরা ৮৪.৮৮ জন লোক পড়িয়াছে। মোট মুসলমান জনসংখ্যার শতকরা ১৮.০৮ জন পশ্চিমবঙ্গে শতকরা ৮৪.২৪ জন পূর্ববঙ্গে থাকিবে। মোট অ-মুসলমান জনসংখ্যার শতকরা ৮৮.২২ জন পশ্চিমবঙ্গে ও শতকরা ৮১.৭৮ জনকে পূর্ববঙ্গে থাকিতে হইবে। পশ্চিমবঙ্গের লোকসংখ্যার সাম্প্রদায়িক অনুপাত এইরূপ: মুসলমান—২৪.০১% অমুসলমান—৭৪.৯৯%। পূর্ববঙ্গের অনুপাত এইরূপ: মুসলমান—৭০.৮০% অমুসলমান—২৯.১৯%

মুসলিম ও পার্শ্বচট্টগ্রামকে পূর্ববঙ্গীয় পাকিস্তান ডেমনিস্ট্রেশনের সঙ্গে যুক্ত করার অমুসলমান ব্যক্তিদের

নয়। হইতে আন্দোলন উঠিয়াছে। এমন কি গণ-হইবে। উক্ত সম্মেলনে উত্তর পক্ষের সম্মতিক্রমে পরিষদের বাংলার সমস্তগণ নীমানির্ধারণ-কমিশনের প্রাচলিক-বাটোয়ারার কোনরূপ বদ-বদল করা সম্ভব

নীমানির্ধারণ সম্পর্কে বিবেচনা করেন। তাঁহারা এই মত প্রকাশ করেন যে, ইচ্ছাতে বিচার্য বিবাদের মীতি লঙ্ঘন করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বিপুল হিংস্রসংখ্যাবিক্রম জিলা জলপাইগুড়িকে বিতক্ত করা শুধু অস্বাভাবিক হইয়াছে। পতকরা ২৮ জন অধুসলমান সহ পার্শ্বচ্যুতগ্ৰামকে পার্শ্বস্থানে অর্পণ করার সকলেরই বিমুগ্ধ হইয়াছেন। জনমতের চাপে পড়িয়া রাত ক্রিষ্ণ-বাটোয়ারা সম্পর্কে পুনর্বিবেচনা-প্রচেষ্টার ভারতীয় মুক্তরাষ্ট্র-মন্ত্রিসভা এক সাব-কমিটি গঠন করিয়াছেন। পণ্ডিত অণুহরলাল নেহেরু, সর্দার বলদেব সিংহ, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, ডাঃ রায়েন্ড্র প্রসাদ, ডাঃ স্ত্রীনা-প্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও ডাঃ আবদুসসব্বর এই সাব-কমিটির সদস্য মনোনীত হইয়াছেন। উক্ত সাব-কমিটি একটি নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হইলে ভারতীয় মুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তান—এই উভয় ভৌগোলিক-বিশিষ্ট প্রতি-নিবিদের একটি সম্মেলনের অঙ্গ জ্ঞেয়া করা হইবে।



কিনা, তৎসম্পর্কে অভিমত প্রকাশ ও আলোচনা হইবে।

বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে খাদ্যসম্পদ :

চাউলের মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি

পূর্বে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে অনবরতই চাউলের মূল্যবৃদ্ধির সংবাদ আবারের মতের আসিয়া পৌছিতেছে। বঙ্গোপসাগরে ইতিমধ্যেই চাউলের দর বনপ্রতি ৫০ টাকাও উর্দ্ধে উঠিয়াছে। করিমপুর, নোয়াখালি, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, ত্রিপুরার বিজাফট, ঢাকা প্রভৃতি অঞ্চলেও চাউলের সাধারণ বনপ্রতি দর ৪০।৫০ টাকা করিয়া। দিনমজুর ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অনেকেরই—বাংলাদেশের বৈদেশিক ও সাম্প্রতিক সরকারের অল্প বাতাব্যের উপর নির্ভর করিতে ছব, তাহাদের দুর্ভোগই বিশেষভাবে চরম নীচায় উঠিয়াছে।

পূর্ববঙ্গ সমস্তবৈশিষ্ট্যের এক প্রেসনোটে যোগ্য করা হইয়াছে যে, পূর্ববঙ্গের বৈদেশিক সহরে বেশক-প্রমা

প্রবর্তিত আছে, সেই দর সহরে ১২ই সেপ্টেম্বর হইতে সকল গম-বাহারকারীকে তাহাদের প্রাণা সমগ্র বেশনই গম লইতে হইবে, এবং অরোক্তকিনশপক তাহাদের বেশনের অর্ধেক চাউল ও অর্ধেক গমলাভ ত্রা লইতে হইবে। কিন্তু কোন রকম বর্জন-বাংলাই প্রয়োজনহত হইতেছে বলিয়া এ পথান্ত আশাঃ বংর পাই নাই।

শুধু চাউলেরই মূল্যবৃদ্ধি নয়, সঙ্গে সঙ্গে অল্পান্ত সর্ববিধ খাদ্যপ্রব্যেরও মূল্য অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিগত ১৩৫০ সালের দ্বিতীকের প্রারম্ভেও তিলে তিলে এইভাবে মূল্য বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ হয় এবং অন্নবিশেষের মধ্যেই ব্যাপক দ্বিতীক সমগ্র বাংলাদেশ পুনরানে পণ্ডিত হয়। বর্ন্তবানও যে তাবে খাদ্যপ্রব্য-সমূহের মূল্য দিনদিন অস্বাভাবিকভাবে বাড়িয়া চলিয়াছে, তাহাতে



স্বভাবতঃই ১৩৪০-এর বৎসরের আশঙ্কা মনে ভাগে। বেশনি ব্যবস্থাও ক্রমেই ভাঙিয়া পড়িতেছে। এ সম্বন্ধে এখনও পর্যন্ত সতর্কবৈট কোমো কাঙ্ক্ষাকরী ব্যবস্থা করিয়া উন্নীত পাবেন নাই। পণ্ডিত অওহরলাল নেহেরু গত ৭ই সেপ্টেম্বরের বেতার-বক্তৃত্যেও ইহাই বিশেষভাবে পরিদৃষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। এমতাবস্থায় জনসাধারণের উত্তম্বুদ্ধির ও সহযোগিতার উপরেই সর্বসাধারণের জীবন-কল্যাণ নির্ভর করিতেছে। বেশনি ব্যবস্থা ক্রমে ভাঙিয়া পড়িলেও বাহিরে এখনও ব্রাহ্ম্যার্কেটের বাবস। পূর্ণভাবেই চলিতেছে। এই ত্রাণকারবারী ব্যবসায়ীদের সাহায্য করিতে না পারা পর্যন্ত উপস্থিত এই খণ্ড-সমস্যার কোনো সমাধান নাই। আবার আজ দেশের প্রতিটি ব্যক্তির মস্ত প্রতিটি ব্যক্তিকে সাহায্যসাধনের প্রতিজ্ঞাতে দাঁড়াইবার মত অল্পোৎসাহ জানাইতে হইবে। জনসাধারণ একালে অগ্রণী না হইলে, যে মহাসঙ্কটমুহুর্তে আজ আমাদের সকলের সম্মুখে উপস্থিত, তাহা হইতে কাহারও বাঁচিবার কোনো পথ থাকিবে না। চটগ্রামের বন্যজীবের সাহায্যে এবং বিভিন্ন উপকৃত অকলে সাহায্যের মত পদ্ধতি-সমূহও পূর্ণভাবে বাস্তবায়ন প্রচেষ্টার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এমিকে পদ্ধতিবন্ধের অবস্থাতে প্রায় চট্রম সঙ্কটে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এখনও যদি জনসাধারণ এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্বক টহর আত সমাধানে অগ্রণী না হন, তবে যে সমগ্র বাংলায় আবার ১৩৪০-এর মত-সহোৎসব আরম্ভ হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

পাঞ্জাবের দাঙ্গা ও কলিকাতার প্রতিক্রিয়া :

মহাত্মা গান্ধীর অনশন

দেশ-বিভাগের কলে পূর্ণ পাঞ্জাব ও পশ্চিম পাঞ্জাবের উত্তর সম্ভারের মধ্যে যে আকস্মিক দাঙ্গার সৃষ্টি হয়, গত আগস্টের পেশাবেনি তাহা দ্যাপস এবং বিরাট আকার ধারণ করে। সাহোরে যুক্ত বৈশ্বক-পরিষদের বৈঠকে ঘিরীকৃত হয় যে, ১১শে আগস্ট মহাত্মা হইতে পাঞ্জাব-সীমান্তবাহিনীকে ভাঙিয়া দেওয়া হইবে। ইহার পর হইতে উক্ত বাহিনীর নিয়ন্ত্রণাধীন অকলগুলির তার পরস্পর-ভাবে ব ব ভোবিনিয়নের উপর ভক্ত হইবে।

একখানি সরকারী ইন্ডাহারে সাহোরে লাট ভবনে যুক্ত বৈশ্বক-পরিষদের এক করী বৈঠকেও কথা উল্লিখিত হয়। ভারতীয় যুক্তযাঙ্ক ও পাকিস্তান ভোবিনিয়নের উত্তর সতর্কর কেন্দ্রেও বৈঠকে উপস্থিত থাকেন। যুক্ত বৈশ্বক-পরিষদের দ্বারা সতাপতি লর্ড হুই মাইট-হ্যাটেন সতাপতির আসন গ্রহণ করেন। বিশেষভাবে শিরাগকোট ও ওম্বা-ওয়ালায় সাম্প্রায়িক দাঙ্গার ভীততরে প্রতি দাঙ্গা করিয়া পণ্ডিত অওহরলাল নেহেরু, সিং দিয়াকং আলী পান, সর্কার বলদেব সিং এবং আকুর সব দিয়ার সঙ্কটভাবে বিভিন্ন অকল পরিদর্শন করিয়া দাঙ্গা নিবৃত্তির চেষ্টা করেন। পশ্চিম পাঞ্জাব হইতে সংখ্যালঘু সম্ভারের নয়নাগীরের অপসারণের মত সাময়িক ও অসাময়িক বিভাগের যে দৃষ্ট ব্যবস্থান সম্মিলেণ করা হয়, তাহা সাময়িক কর্তৃপক্ষের হাতে দেওয়া হয়। কলিকাতার বেলেঘাটা বক্তিতে বাঁকাগলে পাঞ্জাবের এই ক্ষেত্রসীলার মহাত্মা গান্ধী অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পড়েন এবং সেখানে সাইরা পত্রপ্রচার করে বন্যস্থির করেন।

ইতিমধ্যে ১১ সেপ্টেম্বর কতিপয় অবস্থালী হুই লোকের প্রোচোনার কলিকাতার পাঞ্জাবের প্রতিক্রিয়া মত হয়। ইহার পূর্ণরারে এককল দৃষ্ট লোক মহাত্মাগীকে আঘাত করিতে উত্তর হয়। কিছু ঘটন-চক্রে মহাত্মাগীর অসংলি ও পুণিণ কমিশনারের উপস্থিতিতে মহাত্মাগী ও তাঁহার পার্শ্ববর্তক দাঙ্গা পান। কলিকাতার সুবহার এই সাম্প্রায়িক দাঙ্গার প্রতি দাঙ্গা করিয়া ১১ সেপ্টেম্বর রাতি ৮ ঘটিকা হইতে মহাত্মাগী অনশন-মত গ্রহণ করেন। তিনি বলেন : "পাঞ্জাব হইতে আবার নিকট করী আস্তান আসিয়াছে, কিন্তু কলিকাতার যে শান্তি দাঙ্গা বাঁধিয়া উঠিতেছিল, তাহা ভাঙিয়া পিরাছে বলিয়া যেন হইতেছে—এমতাবস্থায় কোমু মুখে আনি পাঞ্জাব সাইতে পারি ? যে মত আবার নিকট প্রতাবৎ অব্যর্থ বলিয়া যেন হইয়াছে—তাহা হইল অনশন। আমার মুখের কথা বাহা করিতে পারে না—আমার অনশন তাহা করিতে পারে। এই অনশন যদি কলিকাতার হাঙ্গামাকারীদের অন্তর শূর্ণ করিতে পারে—এই মতই আনি অনশন আরম্ভ করিলাম।"

পশ্চিম বঙ্গের গভর্নর লর্ড গোপালচন্দ্রী বলেন, “পারম্পরিক সৌহার্দ্য ও সকলের মনে নুতন করিয়া যে নিরাপত্তা-বোধ কিরিয়া আদিয়াছিল, বাহার ফলে গত ১৬ দিনে কলিকাতা সহর অন্ধর ও শান্তিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল. সোমবারের (১লা সেপ্টেম্বর) হত্যাকাণ্ড ও মহাসম্মেলন ধরনের দার-ধরের ফলে তাহা যেন অশ্রুের মতো ঢেঁকির নিমিত্তে কোথায় উড়িয়া গেল। শান্তি সবিস্মার বিমল আনন্দের ফলে আবার বেধা দিয়াছে নির্ভর হত্যাকাণ্ড। নুতন স্বাধীন ভারতবর্ষের নাগরিকদের ইহাতে লক্ষ্য রাখা কাটা গেল।”

পশ্চিম বঙ্গের প্রধানমন্ত্রী ডাঃ ঐয়্যুররাজ বোম্ব এক সাংবাদিক বৈঠকে ঘোষণা করেন : “আমরা যে-আইনী কার্যকলাপ সম্পর্কে ইতিপূর্বেই সর্বসাধারণকে বিশেষ ভাবে সাবধান করিয়া দিয়াছি—আর কোনো সাবধান-বাণী আমরা উচ্চারণ করিতে চাই না। কেবলমাত্র পুলিশ বা মিলিটারীর সাহায্যে শান্তিরক্ষা সম্ভবপর নয়—যে-আইনী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে জনমতকে জাগ্রত করিয়া তুলিতে হইবে। আমি আশা করি, সাবাদপত্র-গুলিও শান্তিরক্ষা বিষয়ে গভর্মেন্টের সহিত সহযোগিতা করিবে।”

মিঃ সুরাবর্মা হিন্দু-মুসলমান—উত্তর সম্প্রদায়ের নিকট শান্তি প্রতিষ্ঠার আবেদন করিয়া পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন সহস্রাব্দ লীগ-সংস্ক্রেটারীদের নিকট এই বর্ণে তার প্রেরণ করেন যে, কলিকাতার এই দাঙ্গার পিছনে বাহিরের অবস্থানী ব্যক্তিদের কারসাজি রহিয়াছে, অতএব ইহাযাত্রা পূর্বক যেন প্রত্যাবর্তিত না হয়।

মহাসম্মেলনকে অনুশমনত্বের জন্য অহরোহ জানানো হইলে তিনি বলেন : “সাম্প্রতিক অবস্থা কিহিঃ আদিলেই অনুশমন তত্ত্ব করিব, তাহার পূর্বে নয়।” অতঃপর আচার্য্য কৃপালনী, ডাঃ ভাণ্ডার্সার সুধোপাধ্যায়, ঐক্যমত সভাপতি বহু-ঐক্য বিভিন্ন নেতার আবেদন এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও জনসাধারণের উল্লেখ্যে সহরের সমস্ত শান্তি-বহিষ্কৃত বাহির হয়। “তাইয়ে তাইয়ে লড়বো না,” “দাঙ্গাবাজী করবো না,” “গাভীজীকে বাচাতে হবে” প্রভৃতি ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস বুথিত হইয়া ওঠে।

৪ঠা সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরা মহাসম্মেলনের নিকট তাহারের বিভিন্ন যন্ত্রস্ত্র সমর্পণ করে এবং নেতাগণ বিভিন্ন এলাকার শান্তিরক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া মহাসম্মেলনকে কলিকাতার শান্তি অন্ধুর রাখার প্রতিশ্রুতি দেন। অতঃপর রাত্রি ১০টা ১৫ মিনিটেই সহর মহাসম্মেলনী অনুশমন তত্ত্ব করেন। গত ১ই সেপ্টেম্বর (রবিবার) সকলে পাত্রাবের উদ্দেশ্যে মহাসম্মেলনী দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করেন সমস্তকালে শান্তি-সেনাবাহিনীর অস্ত্র অস্ত্রনিষ্কাশন জানাইয়া মহাসম্মেলনী তাহাৎ যাত্রার পূর্বে বলেন : “শান্তিরক্ষার জন্য দায়িত্ব এবং সকলের উপর বস্ত্রিয়ায়। এই গোঃমত শান্তিরক্ষাঃ জন্য প্রতিটি পুরুষ ও নারী স্তুতঃ তত্ত্ব প্রস্তুত থাকিবেন বলিয়াই আশা করি।” “ভরবারি বাহার অস্ত্র তাহাঃ পক্ষে দত্ততা মূল্য। ও ঐনিকোচিত আচরণ আবস্তক, প্রেম বাহার একমাত্র অস্ত্র তাহার পক্ষে উহা আরও বেশী আবস্তক। অস্ত্র চাইতেই নির্দেশ পাওয়া যায়। ভরবারির সাহায্যে বলপূর্বক প্রতিষ্ঠিত শান্তি উত্তরের মধ্যে আরও গভীর বিস্তারের সূত্র করে। শান্তি-মিশনের জন্য বাহার প্রাণ দিয়াছেন, তাহাঃ বীর।”

এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়—মিঃ আর্চ কংক্রেলকম্বী শতীন্দ্রনাথ মিত্র ও স্বতীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম। উভয়েই শান্তি-সংগঠনকারী হইয়া ও তাহা ধারা আহিত হন এবং ইদপতালে প্রাণ ত্যাগ করেন। বহু প্রচেষ্টার সোতাযাত্রা লইয়া বাহির হইয়া কলিকাতার রাজপথে একশো দিবানোকে তাহাদের এই আকস্মিকভাবে আক্রান্ত হওয়ার বাণাংরে সহজেই ওতপদের চরিত্র জনসাধারণের নিকট প্রকাশ হইয়া পড়ে। এই ভাওয়া যে-সম্প্রদায়েরই লোক হউক না কেন—ইহাদের মূলোচ্ছেদ করিবার জন্য আমরা পশ্চিম বঙ্গ গণশেখটেক অহরোহ জানাই। শতীন্দ্রনাথ মিত্র ও স্বতীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি আমরা সমবেদনা জ্ঞাপন করি।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় সমস্তা সম্পর্কে

কে : “মিঃ স্ ও পণ্ডিত জঃহরলাল নেহেরু

দক্ষিণ আফ্রিকার ইউনিয়ন গভর্মেন্টের নিকট প্রার্থনা আত্মীয়রা গত সুবীর্ষ বৎসর বাৎসর যেভাবে

অবিচার ও নির্বাসন ভোগ করিয়া আসিতেছেন, তাহাও পরিচয় পাঠকদের অবগিত নাই। মহাত্মা গান্ধীর প্রথম সভাপ্রার্থনায় বহু বার ইহাওই উল্লিখিত। দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়েরা নিজেদের জাতি অধিকার সংগ্রহে ইউনিয়ন গভর্নমেন্টের নিকট বহুবার বহুভাবে আবেদন করিয়াছেন, কিন্তু সর্বপ্রকার আবেদন নিষেধনই ঘটিয়াছে, এবং বাধ্য হইয়া তাহারা সভাপ্রার্থনায় অংশ গ্রহণ করেন। কিন্তু 'স্টাটুস গভর্নমেন্ট' এত বড় ক্ষমতা গভর্নমেন্ট যে, সভাপ্রার্থীদের দাবী স্বীকার করিয়া সেইসব পরিবর্তে তাহাদের বিরুদ্ধে আরও অবিকল সহন-নীতি প্রয়োগ করাই প্রায়সত্ত্ব বলিয়া বিবেচনা করেন। বর্তমান গণতান্ত্রিক পৃথিবীতে এই সহন-নীতিকে স্বীকার করা অসম্ভব, তাহা ভিন্ন হইতে পারে।

গত ৮ই ডিসেম্বর বিশ্বরাষ্ট্র-সম্মেলন (U. N. O.) এক সাধারণ অধিবেশনে বলা হয়—'The treatment of the Indians in South Africa Union should be in conformity with international obligations under agreements between two Governments and the relevant provisions of the United Nations Charter'. (অর্থ—'দক্ষিণ আফ্রিকার ইউনিয়ন গভর্নমেন্ট ও ইতিহাস গভর্নমেন্টের মধ্যে যে চুক্তি আছে এবং সম্মিলিত জাতিসংঘের রচিত মনে যে বিধান বিদ্যমান, তদনুসারেই ভারতীয়দের প্রতি ইউনিয়ন গভর্নমেন্টের আচরণ নিরূপিত হওয়া উচিত।') —কিন্তু ইউনিয়ন গভর্নমেন্ট তাহা মানিলে কী কর্তব্য বলিয়া মনে করিলেন না। সম্মতি দক্ষিণ আফ্রিকার ইউনিয়ন গভর্নমেন্টের প্রধান মন্ত্রী কিন্তু মার্শাল 'স্টাটুস' এবং ভারতীয় মুক্তরাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর মধ্যে যে পত্র-বিনিময় হইয়াছে, তাহা হইতেও স্পষ্টই বুঝা যায় যে, অল্পসংখ্যক সম্পর্ক 'স্টাটুস' গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে আগ্রহও নাই। ইতিপূর্বে যে 'স্টাটুস'কে অগ্রাহ্য করিয়া পণ্ডিতজী লেখেন যে, ইউ, এন, ও'র প্রস্তাব মতো সীমাই যেন ইউনিয়ন গভর্নমেন্ট ভারতীয়দের প্রতি সুবিচার করেন। উত্তরে জেনারেল

'স্টাটুস' বাহ' দিখায়েছেন, তাহা তবু বিশ্বাস্যই নয়, ইতিমধ্যে উদ্ধৃত্যপূর্ণ। এই প্রসঙ্গে আলোচনার কিছু কিছু সারাংশ এখানে উদ্ধৃত করিলাম।

পণ্ডিতজীর প্রাথমিক পত্রের উত্তরে জে: 'স্টাটুস' প্রসঙ্গতঃ লেখেন: 'অল্পসংখ্যক বিশেষভাবে অল্পসংখ্যক বহিঃ, ইউনিয়ন এবং ভারতের পার্শ্বের সীমাই এই দুই সরকারের মধ্যে সম্পর্ক বহুদূর করা প্রয়োজন। ইউনিয়ন হাই কমিশনারকে পুনরায় প্রেরণ করিতে ভারত সরকারের অসম্মতি জ্ঞাপনের সংবাদ ভারত ও ইউনিয়নের সম্পর্কের কতিপয় সাধন করিয়াছে। দক্ষিণ আফ্রিকা ভারতীয় সংগ্রেহ ইতিমধ্যেই ভারত সরকারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া হাই কমিশনারকে পুনরায় প্রেরণ করিবার জন্য অগ্রহণে জ্ঞানাইয়াছেন। তাহারা ইউনিয়ন সরকারকে বিশেষভাবে অগ্রহণে জ্ঞানান যে, ইউনিয়ন সরকার যেন ভারত সরকারের প্রস্তাবাদানের কারণে প্রতিশোধ গ্রহণে ক্ষম হইয়া উঠেন এবং হাই কমিশনারের পুনরাগমনের জন্য অগ্রহণে জ্ঞানান। ইউনিয়ন সরকার এই বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দেন এবং সেইজন্য আবার আবার একবার দাবী করিতেছি যে, হাই কমিশনারকে আবার পাঠান হউক।—ভারত সরকার দক্ষিণ আফ্রিকার সহিত বানিজ্য-সম্পর্ক স্থির করিয়াছে এবং এক তরফা তাপন প্রদান করিয়া দক্ষিণ আফ্রিকা ও ব্রহ্মাচার প্রবাসী ভারতীয়দের পার্শ্বের বিশেষ দানি করিয়াছে। ইউনিয়ন সরকার এ সম্পর্কে অস্বাভাবিকের হস্তক্ষেপের দাবী করিতে পারিতেছেন, কিন্তু বিশেষ বৈধতার সহিত তাহা না করিয়া ভারতবর্ষকে বৃষ্টি কখনওয়েল্যে অস্বত্ব কর্তৃক একটু বহু রাষ্ট্ররূপে পণ্য করিয়া আসিয়াছেন। আশা করি যে, আশা করি যে, প্রতিষ্ঠিত বহুদূর আশ্রয়। ভারতীয় হাই কমিশনারকে পুনরায় প্রেরণের জন্যও আমি অগ্রহণে জ্ঞানাইতেছি। আশা করি, এ সম্পর্কে আপনি বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া দেখিবেন।'

উত্তরে প্রসঙ্গক্রমে পণ্ডিতজী লেখেন: 'আমাদের পত্র রাষ্ট্র সম্মেলনের সাধারণ পরিষদের গৃহীত প্রস্তাবকে কার্যকরী করার জন্য ইউনিয়ন সরকারকে অগ্রহণে জ্ঞানাইয়াছিলাম।—আপনি ভারতীয় হাই কমিশনারকে

গ্রেপের কথা দিয়ারাছেন, কিন্তু এ পর্যন্ত কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় নাই যে, রাষ্ট্র-সংলগ্নের প্রস্তাব অনুযায়ী ইউনিয়ন সরকার কাক করিবে। আশাবাদের অতিমত এই যে, আলোচনা চালানিবার মতো একটি সর্বসম্মত তিষ্ঠি খুঁজিয়া পাওয়া না গেলে হাই কমিশনার গ্রেপ করিয়া কিছু কল হইবে না। আলোচনার তিষ্ঠি কি হইবে, সে সম্পর্কে প্রথমতঃ একমত হওয়া প্রয়োজন। 'ভারত সরকার' এখনও এই মত মৃদুভাবে পোষণ করেন যে, একমাত্র রাষ্ট্রসংলগ্নের প্রস্তাবের তিষ্ঠিতেই আলোচনা চলিতে পারে, ইউনিয়ন সরকার যদি সম্মিলিত রাষ্ট্র-সংলগ্নের প্রস্তাবকে আলোচনার তিষ্ঠিরূপে গ্রহণ করেন, তবে ভারত সরকারও তাঁহাদের হাই কমিশনারকে গ্রহণ করিতে সম্মত আছেন।

উত্তরে সেনারেল স্মিট্‌স্‌ বাহা দিয়ারাছেন, তাহা এপ্রিধানযোগ্য।—‘ছুইটি সরকারের মধ্যে আলোচনার জন্য রাষ্ট্র-সংলগ্নের প্রস্তাবকে তিষ্ঠিরূপে গ্রহণ করা হউক—ইহাই আপনাদের দাবী। অর্থাৎ ইহার দ্বারা আপনি এই কথাই বলিতে চাহিয়াছেন যে, ইউনিয়ন সরকার অত্যাধিক সময়ের চুক্তি এবং উত্তর রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি ভঙ্গ করিয়াছে, ইহাই তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইবে। কোনোমতে বিতর্কমূলক বিষয়ে এতদূর কোন কথা স্বীকার করিতে ইউনিয়ন সরকার প্রস্তুত নহে। ইউনিয়ন সরকার কোনো চুক্তি ভঙ্গ করে নাই বা অত্যাধিক সময় উপেক্ষা করে নাই।’

ইহার পর আর কোনো প্রশ্ন থাকিতে পারে না। পণ্ডিত জগদ্বলালও উত্তরে এই কথারই উল্লেখ করিয়াছেন যে, সবচেয়ে সমাধানের কোনো পথই আবহিষ্ট নাই। বর্তমানে আফ্রিকার হাই কমিশনার পাঠাইবার কিছুমাত্র শার্ককতা নাই বিবেচনা করিয়াই পণ্ডিতজী যে: স্মিট্‌স্‌কে অস্বত্ব পত্র দেন। কিন্তু এই সম্পর্কে ইউনিয়ন সভাপ্রবক্তার মনোভাব যে কিরূপ অস্বত্ব বাধ্যতার প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে, তাহা উপরোক্ত পত্রাংশগুলি হইতে অনুসারণ অনায়াসে উপলব্ধি করিতে পারিবে। কিছুদিন পূর্বে বিভাগস্বত্ব পণ্ডিত স্মিট্‌স্‌কে সর্বপ্রথম-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া অনেকখানি

কৃতকার্যতার পথে আসিয়াছিলেন। সংঘর্ষের সময়ই প্রতিষ্ঠানের নিকট অস্বত্বভানের ফলে দেখা যায়—বিশ্ব রাষ্ট্র-সংলগ্নের সাধারণ অবস্থাপন (U. N. O.) যখন ইউনিয়ন সভাপ্রবক্তে ভারতীয় সভ্যতার বিষয় উপস্থাপিত হয়, তখনই অবস্থা অস্ববিধাজনক দৃষ্টিতে ইউনিয়ন সভাপ্রবক্তার পক্ষ হইতে বাণীরাটিকে আত্মসম্মতিক আদালতে পাঠাইয়া কিছুকালেক ভ্রম দ্বারা চাপা দিবার চেষ্টা হইয়াছিল। কিছু উক্ত প্রস্তাব ৩১-১২-১৯৪৬ চোটে প্রস্তাভ্যক্ত হয়। ভারতের নিম্নোক্তক স্থান প্রস্তাবটি বখারীতে কোটে দেওয়া হয় এবং ৩১-১২-১৯৪৬ কোটে তাহা গৃহীত হয়।’

এত আলোচনা ও তর্ক-বিতর্কের পর শেষ পর্যন্ত যে প্রস্তাব গৃহীত হইল, এবং ইউনিয়ন সভাপ্রবক্তাকে দায়: করার নির্দেশ দেওয়া হইল, তাহা উপেক্ষা করিবার মতো এত বড় ভুলের সাহায্যে: স্মিট্‌স্‌ কোথা হইতে পাইলেন, বিশ্ব রাষ্ট্রসংলগ্নের (U. N. O.) নিকটই আর আদালত এই প্রশ্ন করিতেছি।

দিল্লীর হাজামা : মহাত্মা গান্ধীর বিবৃতি ও

পণ্ডিত জগদ্বলাল নেতৃত্বের বৈতর্য-বক্তৃতা

পাকিস্তানের সাম্প্রতিক হাজামা কতকটা প্রশংসিত হইয়া আসিতে না আসিতেই দিল্লীতে তাহার সংকল্পন দেখা দিয়াছে। ১ই সেপ্টেম্বরের এক ইস্তাহারে প্রকাশ—মন্ত্রিসভার অকর্মী কথিটি এবং অবস্থাপন দিল্লীতে আইন ও পৃথল্য রক্ষা এবং সাহায্যবান সম্প্রদায়ের কার্যের যোগাযোগ-স্বাক্ষর সেনাভিভাগ, পুলিশ বিভাগ, বেলাসমিক শাসন-বিভাগ ও বেসরকারী সেবা-প্রদান-সমূহের প্রতিনিবি লইয়া একটি কথিটি গঠনের নির্দেশ দিয়াছেন। এই কথিটি ‘দিল্লী কথিটি’ নামে অভিহিত হইবে এবং ইহার প্রতিনিবি প্রচার মন্ত্রিসভার চক্রবর্তী কথিটির নিকট বাধ্যতামূলক রিপোর্ট করিবেন।

গত ১০ই সেপ্টেম্বর বুধবার মহাত্মা গান্ধী দিল্লী সহরে প্রায় ৪০ মাইল পরিভ্রমণ করেন। দিল্লীর অবস্থা পরিদর্শন করিয়া এক বিবৃতিপ্রদানে তিনি বলেন: ‘দিল্লীবাসী প্রকৃতিস্থ না হওয়া পর্যন্ত আমি দিল্লী ত্যাগি কোনো মতেই পাকিস্তানে যাইব না। উত্তেজিত অবস্থা





“ସା ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ନାତୁରୂପେନ ନାମ୍ନିତା—”

“छद्मीत्वं धान्यरूपासि प्राणिनां प्राणवायिनी”



পঞ্চদশ বর্ষ

শারদীয়া সংখ্যা : কাঙ্ক্ষিক-১৩৫৪

{ ১ম বঙ্গ-৫ম সংখ্যা

## “বন্দে মাতরম্”

সুখলাল সূর্য্যলাল মল্লিকশীতলাল

গজকামলা : মাতরম্ ।

কল-কল্যাণ-পুষ্করিণীম

দলকুম্ভমিষ্ট-কন্দল-ভিনীম্

স্বাধীনী : কন্দলভাষিনীম্,

সুখলাল বরদা : মাতরম্ ।

সপ্তকোটিকর্ক-কল-কল-নিমাদকরাসে,

বিশ্বকোটিকুটুভ-কর-কর-বালে,

স্বলা কেন না এত বলে ।

বহুবলধারিণীঃ ননানি তারিণীম্

রিপুদলধারিণীঃ দাতরম্ ।

তুনি বিজা তুনি বর্ষ,

তুনি স্বনি তুনি বর্ষ,

বং হি প্রাণাঃ শরীরে ।

বাহতে তুনি ম' শক্তি,

দলরে তুনি ম' ভক্তি,

তোষাষি প্রতিনা গজি দলিরে দলিরে ।

বং হি দুর্গা দলগ্রহণধারিণী

কবলা কন্দল-দলবিহারিণী

বাণী বিজাধারিণী ননানি বাঃ

ননানি কন্দলাঃ স্বলাঃ অতুগাম,

সুখলাল সূর্য্যলাল মাতরম্

বন্দে মাতরম্

ভানলাঃ সললাঃ সুখিলাঃ কুমিতাম্

দলরে ভরুণিঃ মাতরম্ ।”

# বাঙ্গালী ঐতিহাসিক উপন্যাস

হিরেশচন্দ্র প্রসাদ ঘোষ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের “স্বাভাবিক অধ্যাপক” অর্থাৎ বাঙ্গালী বিদ্যাপের প্রধান—ডক্টর শ্রীকৃষ্ণ বসোপাধ্যায় গত বৈশাখ মাসের ‘বঙ্গপ্রবী’ পত্রিকায় “ঐতিহাসিক ও সামাজিক উপন্যাসের উদ্ভব” নামক যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালী সাহিত্যাহারীদের বিশেষ আশোচ্য। সেই প্রবন্ধটিতে তিনি ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত—কুদেব দুখোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক উপন্যাসকে বাঙ্গালী ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রথম দৃষ্টান্ত বলিয়া খ্রীষ্টকাল কনক বসোপাধ্যায়ের প্রকাশিত নত প্রথম কথ্য বহিষ্যতের রচনার উপনীত হইয়াছেন এবং বঙ্গের লাইব্রেরীর প্রাচ্যালিকা হইতে ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৮২-৮৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কর বৎসরে প্রকাশিত কথ্যনি বাঙ্গালী ঐতিহাসিক উপন্যাসের নামোল্লেখ করিয়াছেন। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৮২-৮৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রকাশিত যে সকল পুস্তকের নামোল্লেখ তিনি করিয়াছেন, সে সকলের মধ্যে তাঁহার মতে, লেখকগণ “ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার বার্ষ প্রয়াসের ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে।”

ইংরেজ লেখক এমরী ম্যাকে বঙ্কলাটের অচলিত দিল্লী দরবারের কথা বলিয়াছেন—পর্যাপ্তাহারপুট রাজকর্ণ-চাঙ্গীরা ও মুদাসল সামন্ত-রাজ্যের শাহকরা দরবারে উপস্থিত ছিলেন—কিন্তু যে চীনাদিগের নিকট অহিফেন বিক্রয়ের লালচ চাকার ও সে ক্রমকে প্রদত্ত রাজস্বের দরবারের বাচ-নির্জাহ হইয়াছিল, সেই অহিফেন সেবন-কর্মজিত চীনকে ও দ্রুতি-পীড়িত ক্রমকে তিনি তথায় দেখিতে পাননি নাই। তেমনই এই প্রবন্ধে প্রতাপচন্দ্র ঘোষের ‘বঙ্গবিপ্লব-পর্যায়ের’ ও বহেশচন্দ্র মল্লের ‘বঙ্গ-বিপ্লব’, ‘নাথী কথন’, ‘ঐক্য-প্রভাত’, ‘জীবনগীতা’ উপন্যাস চতুর্দশের উল্লেখ নাই।

তারতবর্ষের ইতিহাসের পঞ্চবৎসরের প্রধান ঘটনাগুলি অবলম্বন করিয়া বহেশচন্দ্র তাঁহার উপন্যাসচতুষ্টয় রচনা করার এগুলি ‘পতাবর্ষ’ নামে পরিচিত হিল। বহেশচন্দ্রের ‘বঙ্গবিপ্লব’ বহেশচন্দ্রের ‘চন্দ্রশেখরের’

সমসাময়িক। বহেশচন্দ্র তাঁহার ‘বাঙ্গালী সাহিত্য’ পুস্তকে লিখিয়াছেন—

১৮৭২ খৃষ্টাব্দে যখন ‘বঙ্গদর্শন’ প্রকাশ আরম্ভ হয়, সেই সনকে বহেশচন্দ্র আমাকে আমায় মাতৃভাষায় রচনা করিতে বলেন। ঘটনাক্রমে বহেশচন্দ্রের সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁহার আভ্যন্তরীণ পরিচয় পাওয়া যায়—সেই ক্ষণ আমি আশা করি, ঘটনাটি বিস্তৃত করিলে পাঠকগণ আমাকে কমা করিবেন। চাকরীতে তাঁহার ২০ বৎসর পূর্ববর্তী আমার পিতা যখন চাকরী হইতে বিদায় গ্রহণের কলন করিতেছিলেন, তখন বহেশচন্দ্র ডেপুটী-কলেটের চাকরীতে প্রবেশ করেন। উত্তরে অনেক সময় একই জিয়ার চাকরী করিয়াছিলেন। বহেশচন্দ্র আমার পিতৃদেবকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন এবং ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে যখন চাকরী বাপারে কর্তব্য-পালনকালে তাঁহার মৃত্যু হয়, তখন বহেশচন্দ্র—শ্রদ্ধের বন্ধনের বিধানে লোক থেকে হুৎ প্রকাশ করে সেইরূপ হুৎ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি আমার কলাপকামী ছিলেন এবং তাঁহার অপেক্ষা ১০ বৎসর অধিক আমার মাতৃভাষায় সেবার নিয়ুক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ‘বঙ্গদর্শন’ সম্বন্ধে আলোচনা-প্রসঙ্গে আমি যখন তাঁহার উপন্যাসে দৃষ্ট চরিত্রগুলির প্রশংসা করিতেছিলাম, তখন সেই প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক আমাকে বলেন, ‘তুমি যদি বাঙ্গালী সাহিত্যের এত আদর কর, তবে সেই সাহিত্যের সেবা কর না কেন?’ আমি বিষয় প্রকাশ করিয়া বলি, ‘আমি বাঙ্গালী লিখি। আমি কখনও বাঙ্গালী লিখি নাই—বাঙ্গালী রচনা-পদ্ধতি আমি না।’ তিনি তাহাতে বলেন, ‘রচনা-পদ্ধতির কথা বলিও না। তোমার মত শিক্ষিত ব্যক্তি যে পদ্ধতিতে লিখিবে, তাহাই বাঙ্গালী-রচনা-পদ্ধতি হইবে; অবশিষ্ট বাহ্য প্রাকৃতি তোমার তোমার মাজিত মনোভাবের দ্বারা সম্পন্ন হইবে।’ সেই দিন বা অত্র কোন দিন তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন, ‘ইংরেজী রচনার কুমি কখনও দ্বারী বন: অর্জন করিতে পারিবে না। তোমার পিতৃবা গোবিন্দচন্দ্র ও শশীচন্দ্র এবং বহুসংখ্যক



ঐতিহাসিকের সমস্ত হিন্দু কলেজে সঙ্গীতশিক্ষা শিখিত হাজার-  
দিকের মধ্যে ছিলেন; গোবিন্দচন্দ্র ও শশীচন্দ্রের ইংরেজী  
রচনা কখনও কাঁচিৎ লাভ করিয়া নাই। কিন্তু বহুদিন  
বাংলা ভাষা বাক্যের যত্নবশত বাংলা কবিতা ততদিন  
আদৃত হইবে। তাঁহার এই কথা আমাকে বিশেষতঃ  
প্রভাবিত করে এবং ঐ বর্ণনাকথনের বৎসর পরে  
১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে আমার প্রথম বাংলা পুস্তক 'বঙ্গবিজ্ঞান'  
প্রকাশিত হয়। বহন উহা অল্প মাসিকপত্রে প্রকাশিত  
হইতেন, তখন বঙ্গবিজ্ঞানের 'চন্দ্রশেখর' 'বঙ্গবর্নন'  
প্রকাশিত হইতেন। তিনি অন্ত্যস্ত বহুসংখ্যক  
আমাকে আমার বহন সম্বন্ধে এক পত্র লিখিয়াছিলেন  
এবং একবার ব্যক্তিগতভাবে লিখিয়াছিলেন—'আমি  
রচনার বহু চরিত্র সমাবেশ করিতেছি, আমার মত প্রবণ  
লেখকের পক্ষে তোমার মত বালকের নিকট পরাভূত  
হওয়া ভাল'।

রমেশচন্দ্রের এক দৃষ্টিভঙ্গির বর্জমানের মহারাষ্ট্র-  
বিজ্ঞান বিজ্ঞান বাঙালি বর্ণনাছিলেন, রমেশচন্দ্রের  
উপভাষা-পাঠ তাঁহাকে ভারতবর্ষের ইতিহাসের  
তথ্যগোষ্ঠীতে প্রেরিত করিয়াছিল।

যে সময় বঙ্গবিজ্ঞান ও রমেশচন্দ্র ঐতিহাসিকের উপভাষা  
রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহার পূর্বে ইংরেজের চৌহাট  
ভারতবর্ষের ইতিহাস-সম্বন্ধীয় কথানি পুস্তক প্রকাশিত  
হইয়াছে। সে সকলের মধ্যে বঙ্গবিজ্ঞান

(১) 'চন্দ্রশেখর' বিজ্ঞানসম্মেলনের সভাপতি  
নামক পাঠ্য ভাষার রচিত গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদের এবং  
(২) 'রাজসিংহের' পরিবর্তিত সংস্করণের  
'বিজ্ঞানসম্মেলন' মূল্য লিখিত মোগল-সাম্রাজ্যের বিবরণের  
কল্পিত সংস্করণের, উভয়ের বাস্তবতার ও অর্থের প্রেরণ  
উল্লেখ করিয়াছেন।

সময়ের সভাপতি ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে রচিত হইলেও  
১৭৮২ খৃষ্টাব্দের পূর্বে ইংরেজীতে অনূদিত হয় নাই।  
কলিকাতার অনুবাদ প্রকাশিত হইলে কংগ্রেস মাত্র  
পুস্তক প্রচারিত হয়—অংশিতভাবে বিলাতে প্রেরিত হইলে  
পরে আবার নষ্ট হওয়ার নষ্ট হয়। সেই অল্প বঙ্গবিজ্ঞান  
ইহার দৃষ্টান্তের কথা বলিয়াছেন।

মহাবীর কুল বহনর মধ্যস্থত অনুবাদ বহুদিন হয় নাই।  
কল্পিত সংস্করণের প্রথম প্রকাশ ১৭৭৪ বা ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে  
হয়। আমার উহার যে ইংরেজী অনুবাদ সংগ্রহ করিতে  
পারিয়াছি, তাঁহার প্রকাশকাল ১৭৭২ খৃষ্টাব্দ।

অন্য গ্রন্থের প্রকাশকাল ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দ—উভয়ের  
প্রথম ১৮২২ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। এই সময়ের  
মধ্যে ভারতবর্ষের ইতিহাস-সম্বন্ধীয় আরও কথানি কুল-  
বান পুস্তক প্রকাশিত হয়। সে সকলের মধ্যে বঙ্গবিজ্ঞানের  
উল্লেখ করা বাইতেছে—

- (১) রাস্তাইন কুল আইন-আকবরীর ইংরেজী  
অনুবাদ (১৭৮০ খৃষ্টাব্দ)
- (২) জ্যাক্স ও কুল রাস্তাইনদের ইতিহাস (১৮২৬  
খৃষ্টাব্দ)
- (৩) কেরিয়ার পারসি ভাষায় লিখিত বিবরণের কৌ-  
কুল ইংরেজী অনুবাদ।
- (৪) ফেরিয়ার লিখিত প্রবন্ধ কুল ইংরেজী  
অনুবাদ (১৭৭৪ খৃষ্টাব্দ)
- (৫) ম্যালকমের মধ্যভারতের ও মালবার ইতিহাস  
(১৮২০ খৃষ্টাব্দ)
- (৬) টুরট কুল বাঙ্গালার ইতিহাস (১৮১০ খৃষ্টাব্দ)
- (৭) এলফিনষ্টোনের ভারতবর্ষের ইতিহাস (১৮৪১  
খৃষ্টাব্দ)
- (৮) ভদ্রন সম্পাদিত ইলিফটের ইতিহাস-সংগ্রহ  
(১৮৬৭ খৃষ্টাব্দ)
- (৯) বেলীর গুজরাটের ইতিহাস।

এই সকল গ্রন্থ হইতে বঙ্গবিজ্ঞানের অনুবাদ করিয়া,  
রমেশচন্দ্র তাঁহার উপভাষা-চতুর্ভুজের উপকরণ সংগ্রহ  
করিয়াছিলেন।

দুই কারণে বাঙ্গালার ইতিহাসের উপকরণের অভাব  
ছিল—

(১) দিল্লী বহন ভারতের রাজধানী, তখন রাজ-  
নতির সত্তরকালে দিল্লীতেই হইত—যত বড়ময় বহন  
তথ্য হইত, তখনই খুদ-বিজ্ঞান পদিকরনাও তথ্য  
হইত। বাঙ্গালার বহন—বিশেষ, বাঙ্গালার বহন দিল্লীর  
সম্পূর্ণ বহন হয় নাই। রাজনীতিকক্ষেত্রে লিখিত ইতিহাসে  
বহন বাঙ্গালার বিবরণ বিশেষ বর্ণনাবোধের স্থান পায় নাই।

(১) 'ভক্তিসংগ্রহ' প্রথম বলেন, রাজা, রাজগুরু, সেনাপতি, বৃদ্ধ এই সকল ইতিহাসের উপকরণ নহে—শেষের জনগণই ইতিহাসের প্রকৃত উপকরণ—বর্ননার বিষয়। কিন্তু এই সভা বিশেষে বীজন্ত হইয়াছে। সেই জন্য বাঙ্গালার ইতিহাসের বাহারা প্রকৃত উপকরণ, তাহা—বিশেষ পরিচয় আমরা প্রাপ্তই পাই। কেবল কোন কোন প্রেক্ষক, বিশেষ কবি, টীকাভিগণের সময়ে জনগণের আচরণ-ব্যবহার, ব্যবসায় এবং গুণতির পরিচয় বলা করিয়া দিয়াছেন। আরতন্ত্র ও কবিত্বজন্য তাঁহাদের কবিতার নৈসর্গিক-সহকারে যে সকলের উল্লেখ করিয়া দিয়াছেন এবং চোঁটা করিলে সেই সকল হইতে আবশ্যিক উপকরণের স্বতন্ত্রাংশ প্রস্তুত করা যায়। গুরুপ্রসাদ সেন মহাশয় কবিত্বগণের 'চোঁটা' হইতে ব্রাহ্মী খোঁড়ান শতাব্দীর বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর সম্বন্ধ অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়া ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে 'কলিকাতা রিভিউ' পত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন।

বহিঃসঙ্গ বলিয়াছেন—“বহুতর ভেদ নহে, বহুতর কোন কার্যেরই কল্পনা নহে, অতএব বহুতর প্রকৃত কীর্তি বর্ণনে প্রয়োজন নাই। এই বিবীত মানসিক ভাব ও দেহভক্তি-অবজ্ঞাতির ইতিহাস না থাকার কারণ।” আবার বাঙ্গালার জল-বাঁহা কাগজ বা ভালপত্র অধিকতর প্রকার অক্ষুণ্ণ নহে। এই সকল কারণে বাঙ্গালার ইতিহাস অতি অল্পকালেই কিম্বদন্তিতে পরিণত হইয়া বিস্তৃত ন্যাক করিয়াছে। ঐহারা সেই ইতিহাসের উপকরণ উদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছেন, তাহারা আমাদিগের প্রভাতাজ্ঞান। 'বঙ্গবিদ্য-পত্রিকা'র লেখক তাঁহাদের অতীত।

বহিঃসঙ্গের 'দুর্দর্শনশিল্পী' ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে 'অধ্যাপক কাউন্সিল 'দ্যাকবিলাল ম্যাগাজিন' পত্র বাঙ্গালার একমাত্র ঐতিহাসিক উপকরণ নাম দিয়া তাহার আলোচনা করেন। তিনি তাহাতে বলিয়াছিলেন, ত্রিখাকারী সমালোচকগণ যে বলিয়া থাকেন, কলিকাতার যে শিক্ষা প্রদত্ত হয় তাহাতে কেবল পত্রিকার অজীর্ণ শিক্ষার পরিচয় প্রদানকারী বস্তু হয়—সেই শিক্ষার দিক্টি ব্যক্তি 'books in obadders' এই পুস্তক ও অল্প কয়খনি পুস্তক পৌঁছন নতর অসংখ্য প্রতিপন্ন করে।

'বঙ্গবিদ্য-পত্রিকা' প্রথমভাগ প্রকাশিত হইলেই ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে 'কলিকাতা রিভিউ' পত্র তাহার ১৪ খণ্ড-ব্যাপী সমালোচনা এক স্বতন্ত্র প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হয়। লেখক যে ইংরেজ তাহা প্রবন্ধ পাঠ করিলে বুঝিতে বিমূঢ় হয় না। কেননা, তিনি "বাংলান" ব্যঙ্গ্য করিয়া অসংখ্য করিয়াছেন।

সমালোচক বলেন, কেবল প্রাচীন প্রাচ্য ভাষার নহে, পরন্তু প্রাচীন ও আধুনিকের প্রকাশিত গ্রন্থের আলোচনা 'কলিকাতা রিভিউ' পত্রের প্রবন্ধকবিশেষ উল্লেখের অতীত ছিল। কিন্তু পত্র প্রবন্ধকবিশেষ যদি সেরূপ কোন পুস্তক আলোচিত না হইত। বাক্য, তবে তাহার প্রকাশ কারণ—সেখান পুস্তকের অভাব ব্যতীত আর কিছুই নহে। কলিকাতার বাসিন্দা, বহাভারত, বিদ্যাবল্লভ প্রভৃতি পুরাতন পুস্তকের পুনর্মুদ্রণ হইয়াছে; কিন্তু মৌলিক রচনা প্রায় বিলাস-পাঠ্য পুস্তক বা ছাত্র ছাত্র পুস্তিকার নিবন্ধ। সেই জন্যই 'বঙ্গবিদ্য-পত্রিকা' নামক ৬ খণ্ড খৃষ্টাব্দালী পুস্তকের প্রকাশ বাঙ্গালার উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ইহার পূর্বে রাজা ২ বা ৩ খনি বাঙ্গালী উপকরণ প্রকাশিত হইয়াছে—'টেকটাই টাকুরের' 'আলালের ঘরের দুলাল' এবং বহিঃসঙ্গ চট্টোপাধ্যায়ের 'দুর্দর্শনশিল্পী' ও 'কপাল-কুণ্ডলা'। 'টেকটাই' কবিতাপালী লেখক, কিন্তু তাহার ভাষা দুর্গল—ভাষা ভাবের সহিত সঙ্গতি রাখা করিতে পারে না—বহিঃসঙ্গের ভাষা যাক্ষিত, ওষ্প্রকাশোপ-যোগী—তাঁহার রচনা-পদ্ধতি মনোরম। বহিঃসঙ্গ বাঙ্গালার প্রধান উপকরণিক। কিন্তু উল্লেখিত পুস্তকত্রয়ও আকারে ক্ষুদ্র—ইংরেজী উপকরণের আকারে নহে। সেই-জন্যই বাঙ্গালার বহুভাষার 'বঙ্গবিদ্য-পত্রিকা' উপকরণের প্রকাশ আমদের বিষয়। সমালোচক পুস্তকের আখ্যান-বস্তুর পরিচয় দিয়া পুস্তকের কয়টি স্থানের অসংখ্য করিয়া লেখকের বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়াছেন—

(১) বেহালার ও নিকটবর্তী গ্রামের বর্ণনা

(২) প্রাচ্যভি

(৩) বাঙ্গালী ভাষার বর্ণনা

(৪) বহুভাষার সম্বন্ধ-পুস্তক

(৪) প্রেমালোচন বর্ণনা

(৫) প্রেমভীরু চিত্র

সমালোচক গ্রন্থকারের বর্ণনা চীনা চিত্রকরের বর্ণনার সহিত তুলিত করিয়াছেন এবং গ্রন্থের ৩য় ও ৪র্থ অধ্যায়ের মধ্যে করিয়াছেন।

‘বঙ্গাবিগ-পরাক্রম’ যে প্রকাশকালে ও তাহার পরে আবহলাভ করিয়াছিল, তাহার অনেক প্রমাণ আছে। প্রবীজনাথও তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। ১০১৪ খ্রীঃাব্দে উহার পুনঃপ্রকাশ-এসঙ্গে প্রকাশক ‘বঙ্গবাসী’ পত্রের অধিকাংশী তাহার নিবেদনে লিখিয়াছিলেন :—

“প্রায় আটত্রিশ বৎসর পূর্বে ‘বঙ্গাবিগ-পরাক্রম’ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তৎকালে ও পরবর্তী সময়ে এই গ্রন্থ বিক্রম সমাপ্ত হইয়াছিল এবং আজিও এই গ্রন্থ সাহিত্য-সমাজে বিক্রম উজ্জ্বল অবস্থায় করিয়া আছে, তাহা সকলেই অবগত আছেন। যথো ‘বঙ্গাবিগ-পরাক্রম’ নিঃশেষ হইয়াছিল; অনেকে একবার ইচ্ছা লক্ষ্যে ও ঐ গ্রন্থ কিনিতে পান নাই। সংশ্লিষ্ট গ্রন্থকারের সম্মতিসহ আমরা ঐ গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিলাম। বঙ্গ-ভাষার এই অমূল্য গ্রন্থ পুনঃ প্রকাশিত হইল”— ইত্যাদি—

গ্রন্থের প্রথম বৎ প্রকাশিত হইবার পরেই ‘কলিকাতা ত্রিভুজ’ পত্র উহার সমালোচনা প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকায় গ্রন্থকার লিখিয়াছিলেন :

“এই গ্রন্থের প্রথম বৎ প্রকাশিত হইবার পর কয়েকজন ক্ষুদ্রবুদ্ধি কায়স্থকলিতক মহাশয়েরা পুস্তক প্রস্তোপাদিত্যের চরিত্রের সম্বন্ধে কষ্ট হইয়া গ্রন্থকারকে লিখিয়াছিলেন। তাহারায় বলেন যে, প্রস্তোপাদিত্যের চরিত্র প্রকৃত এত কল্পিত ছিল না; গ্রন্থকার প্রস্তোপাদিত্যকে কল্পনা করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। আমার ‘কলিকাতা ত্রিভুজ’ লেখক বঙ্গাবিগ-পরাক্রমের সমালোচনায় অপরাধের বোধ্যমহত্বের মধ্যে বলেন যে, প্রস্তোপাদিত্য একজন সাধারণ কর্মচার ছিলেন। তাহাকে দ্বিতীয় সম্রাটের সহিত বুদ্ধ করাইয়া উজ্জ্বল দেওয়া অসম্ভব হইয়াছে ও ইতিহাসের বিপরীত বর্ণন হইয়াছে।”

“গ্রন্থের আদিতে ‘অত্রাপ্যাদ্যবতীর্ণিত্রাসং পুস্তকং’ বসিয়া গ্রন্থ পঠনা করায়, উল্লিখিত সোপানোপায়ের উত্তর দেওয়া প্রয়োজন; কিন্তু গ্রন্থকার বাবেই এই ভুলটাই যে, ‘সাক্ষী’ নামক দ্বিতীয় তাহারায় অপরাধ—একজন গ্রন্থের শেষে নোটের ভুলে কতিপয় ঐতিহাসিক পুস্তক হইতে কোন কোন অংশ উদ্ধৃত করা গেল।”

উদ্ধৃত প্রমাণগুলি ‘এসিয়াটিক সোসাইটির’ অফিসে উত্তর ভেনসু ওয়াইজ প্রদত্ত বাঙ্গালার কুইজিদিগের বিবরণ (১৮৭৪ পৃঃ) ও তাহার পরবর্তী প্রবন্ধ (১৮৭৪ পৃঃ) এবং দ্বিতীয়-কৃত মুকরবনের বিবরণ (১৮৭৪ পৃঃ) ও তৃতীয় মুকরবন সত্যের প্রবন্ধ (১৮৮৮ পৃঃ) ব্যতীত পর্তুগীজদিগের লিখিত বিবরণ ও কয়েক আঙ্গিকানোই ইতিহাস। ১৮৪২ খ্রীঃাব্দে বেনিনে প্রকাশিত ‘কিত্তোন-বঙ্গাবিগ-চরিত্র’ হইতেও একাংশে উদ্ধৃত হইয়াছিল।

পরে গ্রন্থকার বলেন :—

“হাওয়া বঙ্গাবিগ পরাক্রমোদ্ভূত পঠনা অমূলক বসিয়া পরিহার করিয়াছিলেন, তাহারিগের বঙ্গদেশে ও প্রবিন্দ্যাদ্যাদি পাঠকবর্গের তর্পণোচ্চর ‘কিত্তোন-বঙ্গাবিগ’ নামক পুস্তক বুল সংকৃত গ্রন্থ হইতে বঙ্গাবিগ বিবরণ কতিপয় পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল। অশ্লিষ্ট কয়েকখানি পুস্তক হস্তাপ্য পুস্তক ও এসিয়াটিক সোসাইটির অমূল্য হইতে কতিপয় পংক্তি উদ্ধৃত হইল।

ইহাতে আপাততঃ প্রবিন্দ্যাদ্যাদিগণের মধ্যে বঙ্গাবিগ প্রস্তোপাদিত্য রাহের জীবন-বৃত্তান্ত কতক ভাষ্যক হইবে। ইতিহাসটি নিত্যক অমূলক নহে—এরপদ দুর্গের তথ্যবোধে অংশের প্রায় ২০ বৎসর পূর্বের ‘কটোপ্রাক’ হইতে কয়েকখানি চিত্র দেওয়া গেল।”

এই চিত্রগুলি যেমন বহুল্পা, তেমনই আবার গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগের প্রথমে প্রদত্ত বাঙ্গালার মানচিত্র বিশেষ মূল্যবান। এই মানচিত্র ১৮২২ খ্রীঃাব্দের ভানভেন ভবের ওলন্দাজী পুস্তক মানচিত্র হইতে লঙ্ঘিত।

ভূমিকায় আরও লিখিত হইয়াছে :

“ইতিহাস বিজ্ঞানকারে লিখিত কতিপয় হইতে আনীত একটি লৌহলিপিগ্রন্থের প্রস্তোপাদিত্য দেওয়া গেল। ০০০ আইন আকরী গ্রন্থ হইতে দ্বিতীয়ের কয়েকটি বাঙালি

যথা: কবিতা, গল্প, অধ্যয়ন, আনন্দিকাত্মক প্রকৃতি ভিন্ন দিগা  
বর্ণনার 'কাহ' পূরণ করিয়াছে। • • •  
এই নৈসর্গিক বিষয় খাড়া বর্ণনা করা হইয়াছে ও যে  
শব্দ আশ্রিত দৃষ্টিকোণে প্রথা বর্ণিত আছে, তাহা সমগ্রই  
সম্পূর্ণ, এমন প্রমাণ বিচারে এ স্থান নহে।"

ইহীজ্ঞাষ যে এই গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহা  
তিনি বলিয়াছেন। তবে তাহার রচিত উপন্যাস 'বো-  
ঠাছুরাণীর হাট' যে উপকরণ লইয়া রচিত হইয়াছিল,

তাহা তিনি ১৮০১ খ্রিষ্টাব্দে "ঐশ্বর্যপুরে হাণ্ডা" নামক  
বন্দে রচিত 'গ্রাম প্রতাপাদিত্য-চরিত্র' হইতে লইয়া-  
ছিলেন—যে কথাই সত্য।

খালা তাহার রচিত ঐতিহাসিক উপন্যাসের মধ্যে  
'বলাধিপ-পরাকট' একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া  
আছে।

এই প্রসঙ্গে ১২৭৬ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত কালীচন্দ্র  
শাহীজী প্রণীত 'বোদিনারা' উপন্যাসেরও উল্লেখ করা যায়।

## টুকটাকি

### ঐক্যশায়র বন্দু

বন্দু কখন এসেছে কি জানি, কিছু পড়ে না ত' যেন,

তবু অকাল হ'ল তরে যেন, কথা পাতা জুড়ে যেন;

যেব যেন, আর, বেলা গড়ে যায়, এ ঘাটে অকস্মে তেল,

ছিন্ন পাতার বেলা না জাগাই, বুক হোক তবে বেলা।

যেন বলে, না, যেনে অনেক হ'ল;

পাতার বাসতে কী হলনা আছে, আঁধি তাই হলল।

তাই

জিগ্মিষি ভটি পাতার পরে

জপার যতো লিখিত-কথা করে;

নীল পক্ষ্মে নুতন টাকের তিখি

যেন তাহার হাছির হাওয়া দূতি।

উকরে আর সারা হালের মাঝি

আকাশ পায়ে কোথায় বেড়ে পাতি,

কিচিকিচি নীচে নদীর বেলা

জুড়িয়ে কোথায় চলে এক।

যেবার বল হঠাৎ গেল ছাড়া,

যায় বিশেষে বাজিতে একতারা;

পাতল-বনে কুসুমের খোঁজে খোঁজে

যৌহাতি চকু ছুঁই বোকে।

সোণার গলা বোকের বেন কু,

ভল্লের প্রোতে বাসছে মল্লমল্ল;

জ্বল কোথায় অনেক হাটল হু

এই কথাটি মাঝে করণ করে।

তিন

পুত পড়ে হাত, হাতা মেঘের আঁঠুনা,

তাই যিরে বজ্রকাল বোনা।

তুমি আছো তাই বুঝি এত ভাল লাগে,

সত্য সত্যেও তুমি জানে।

গোহুলি-আকাশে পড়তোলা কণ্ঠি তাম,

তোমাকেই যেন বুঁজে বুঁজে হ'ল দাড়া;

নিশীথের মূল বলে, তোমায় আঁধি ভ্রি,

অন্ধকারে তাকার স্মৃতি-নির্ভরিত্ব।

বজ্রল-কাননে বাহু ফেলে ছ'ল ছ'ল,

কী যে বেলা, কী কথা বলে বায়ো দাস।

জলের তলায় কী কথা আছে তুমিতে চাই,

প্রোত বলে, না, বিব না তুমিতে বিব না;

আকাশে আকাশে যে আকাশে, খণ্ডে দিব না।

এমন করিয়া পুত রঙের বিছাতিছি ছাড়াবেলা

চলে বুঝি সারা বেলা।



জগদীশ দত্ত

তাঃ স্ৰষ্টাৰ অধিকাৰী বাস্য লোক, বাস্য চিকিৎসক, যেমন তাঁৰ যোগলক্ষ্যজ্ঞান, তেমনি তাঁৰ চাতুৰ্য, তাঁৰ উপৰ নিষ্টমুখে কথা বলা তাঁৰ এমনই স্বভাবগত কচি যে, মাছুস ভুল না হইয়া পড়ে। এই ভয়ের জন্যই যোগাঙ্কৰ ব্যক্তি তাঁহাকে শয্যাপাৰ্শ্বে বসিলেই বাগ-দ্বন্দ্বাব তিত্বেরও ধানিক আৰাম অচুতব কৰে। তবে, ভিজিট তাঁৰ চাৰ তাঁকা, গোচ পাকিয়েই এবং তাঁক পড়িয়েই তিনি ভিজিট বাড়াইয়া ভল কবিয়েছেন।

কিছু তাঁহাকে আনন্দের স্বৰ্গক্ষেত্রে ছুটি কহিয়া পূৰ্ণে তাঁৰ বড়ো মোকের সেই কৃত কেষে আবিহুত হইবার হেতুটা আনানো চাই।

পূনৰ্জন্ম সোদেব বাবা জনমেজয় সোন একদিন লক্ষ্যৰ পর হঠাৎ শয্যাগ্রহণ কবিলেন। সেদিন অকস্মত্ তৃতীয়া—অত্যন্ত শুভ দিন। কয়েক ঘানে তাঁৰ চত হালখাতাব নিরুদ্রণ ছিল। টানটানিৰ সংসারে ধাৰ-কৰ্জ হইয়া—চাত পাতিয়া নগব না যোক, কাপড়ের মোকানে, বাসনের মোকানে, গহনার মোকানে চহই। লাল বস্ত্রের পেট-কাৰ্জে ছাপানো নিরুদ্রণ পাইয়া জনমেজয় বা দেবিয়া কৃত্যৰ হইয়া গেলেন না, খাতাব বাঁকৰ পহিন্যের উন্নব কালো কাপি দিয়া হস্তাক্ষরে কৰা ছিল সেইদিকে ধানিক চাহিয়া থাকিয়া তিনি একটি দীৰ্ঘনিঃশ্বাস চালিয়া গেলেন। কিছু হালখাতাব নিরুদ্রণ পাইলে নিরুদ্রণ বক:

কহিয়েই চাইবে, তাঁৰ নগেন এই যে, মোকানে উপস্থিত হইয়া জগদীশবিশোধকর কিছু দিতেই চাইবে—ইহাট পছতি, এবং হেননাংবের সামাজিক ধর্মোৎপত্তি বর্ণনা। সুতরাং পূৰ্ণিৰ ভিত্তর চাইতে সিন্ধী তাঁকা—পুৰিও একটা অংশ—ভূমি।

দোকানে বসিয়া বিত্তর সন্দোপ মুখে কহিলেন কানে শুনিলেন, হাসিলেন ও অবশেষে কিছু ভলযোগ্য কহিলেন—এবং লক্ষ্যাব পর গৃহে ফিরিয়া শয্যাগ্রহণের পূৰ্ণে ক্লান্তভাবে বসিলেন,—শরীৰটা ভাল লাগছে না, আমি ওলাম। যারে কিছু খাব না। জনমেজয় বা স্ত্রী বাসলক্ষী বিজ্ঞাসা কবিলেন,—একটু হুং?

‘উহু’ বলিয়া জনমেজয় সিদ্ধা লবন কবিলেন। “শরীর ভাল নেই” বলিয়া শয্যাগ্রহণ জনমেজয়ের আশ প্রথম নয়। অসুস্থ নাহুবেব বড়ো অকস্মাত্ বিজ্ঞানে গিয়া শুটয়া পড়িতে তিনি যেমন অত্যন্ত, “ভাল মাতি” বলিয়া শব্দকন্ঠে উঠিয়া পড়িতেও তিনি তেমনট প্রবৃত্ত।

কাছেই আছে এই অকস্মত্ তৃতীয়ার লক্ষ্যাব, তিনি শয্যা-গ্রহণ কবিলে বাস্ত হইবার কারণ কেব দেখিলেন না।

কিছু পূৰ্ণের অসুস্থ চাৰ বড়ো তাঁৰ আশঙ্কায় অসুস্থ! কামনিক শু নহই, অসুস্থতাও নয়—লক্ষ্যাবল: তাহা

জানা গেল এবং জানিখামাত্র নিঃশব্দে হইতে হইল। দেখা গেল, অরে তিনি বেহীন হইয়া আছেন।

চিকিৎসার জন্য ব্যক্ততার সচিৎ ভাব হইল কবিরাজ মহাপরকে। ব্যাধী বড়ই শাস্ত, সর্দাগ্রে মনে পড়িল কবিরাজ মহাপরকেই—কারণ, তিনি সজ্ঞ। পরকারী ভিনিষ সজ্ঞার বেধানে পাওয়া যায়, সর্দাগ্রে সেইদিকে বোঝানোই বাহ্যদের পক্ষে সম্ভব, জননেত্রর সাপোর্টী তাহাদেই একজন। একটি টাকা হাতে দিলেই কবিরাজ সন্তুষ্ট হইবেন; অর্থাৎ ভাস্করির জাঁক আর চাকটিকার তুলনার তাহাকে বাটী করিয়া কুরিয়া নোকে তাহাকে একটাকাত্তেই সন্তুষ্ট হইতে দিখা দিয়াছে। ভিজিট এবং তখনকার মতো বেওয়া ওৎখের বৃন্দা, এই দুইয়ের আবদ্ব একটি টাকাই তাহার প্রাণ।

কিন্তু তা'ই বলিয়া, অর্থাৎ সজ্ঞা এবং অর্থেই সন্তুষ্ট হইতে বাধ্য বলিয়া মহীতোষ কবিরাজ বিজ্ঞ কন্ম নন। তাহাকে ভাস্ক হইলে তিনি আশ্বিনেন; সাদা কাপড় লাগানো ছাত্রটা চালে টাটাইয়া তিনি রোগীর কাছে গেলেন এবং রোগীর নাকী পরীক্ষা করিয়া বলিলেন,— বাতজ পক্ষাঘাত। কঠিন রোগ। এখন প্রথম অর রয়েছে। এই অর ছাড়া পাওয়ার সময় সাবধান। সাদু-মস্তলী নিজির হয়ে এসেছে। ঔষধ আনি দিচ্ছি— ভর কটিলেও কটতে পারে এ ব্যাধী।—বলিয়া বহুক্ষণ চিন্তার পর জটিলিত ঔষধ দিয়া এবং ভিজিট ও ঔষধের সূচী বাবদ একটি টাকা লইয়া তিনি নিরাপত্তা নিঃশব্দে প্রস্থান করিলেন।

গলে বাড়িয়া ঔষধ খোপীর নুখে চেপেয়া হইল—রোগী তাহা গলাধঃকরণ করিলেন, কিন্তু কবিরাজের উক্তি যে অসত্য নয়, আশা যে তিনি বেন নাই, তাহা সহজেই উপলব্ধি করিয়া জননেত্ররের আশনার লোকভঙ্গি কত যে ভর পাইল তাহা বলিবার নয়।

চলল চল পুনর্জন্ম বলিল,—হা, ভাস্কর ভাকি ?

হা বলিলেন, এই ত, কোবনেজ সেবে গেল। একটা

দিন দেখছি নে ?

—হা' বলো তা'ই করি—

—আমি বলি, দেখ, একটা দিন। কোবরেন্জী ওষু

ত' একবাহেই যিথো নয়। ভাস্করয়ের বে বয়স চের।— বলিয়া রাষ্ট্রদ্রোহী নিজেদের অগ্রদূত অধ্বাটা অত্যন্ত ভীতভাবে অস্থির করিয়া সজ্ঞাহীন স্বাধীন দিকে চাছিলেন। চক্ষু নিশ্পলক হইয়া রহিল—অন্তঃপর বক্তব্য আর কিছু আছে বলিয়া তাঁর মনে হইল না।

কিন্তু ব্যয়বল ভাস্করকেই ভাবিতে হইল।

বহায়ে জননেত্রর চোখ খুলিলেন, সচেতন দৃষ্টিতে সকলের মুখের দিকে তাকালেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, ওষু দিচ্ছ না কি ?

গৃহিণীর মুখের দিকে তাকাইয়া তিনি প্রশ্ন করিলেন, অথবা বিলেন গৃহিণীই—বাধা নাড়িয়া তিনি জানাইলেন, ঔষধ বেওয়া হইতেছে।

জননেত্রর বলিলেন,— আর দিও না। হরিনাম শুনাও — বলিয়া কিলের জন্ত বেন উৎসুক হইয়া তিনি একমুঠে চাহিয়া রহিলেন। পুনর্জন্ম কাঁদিয়া বাহির হইয়া গেল, রাজলক্ষী আঁচলে চোখ মুছিলেন।

জননেত্রর আহার চক্ষু মুদ্রিত করিলেন, বলিলেন— আহার শিরেরে বসে' কে রে—

—আমি

—অনলা ?

—হ্যা, বাবা।

—আর পাখা করিসুনে। হরিনাম শেনো। অমলা পাখা বড় করিয়া তার মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

রাজলক্ষী জিজ্ঞাসা করিলেন,—এখন কেমন বোধ করছ ?

জননেত্ররের জিজ্ঞাসা কি কোনো অর লাড়া দিল না— এরটি তিনি তদনিতই পান নাই বোধ হয়।

কিন্তু এই অপরিণত সময়ে জননেত্ররকে হরিনাম কেহ শুনাইল না। পুনর্জন্ম খরচের কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া হুটাত ভাস্করয়ের উদ্দেশে দৌড়াইয়া বাহির হইয়া গেল। মাঝে বলিয়া গেল,—ভাস্কর আন্তে চল্গায, হা।

তখন বেলা সাত্বে বায়েটা।

হুটাত ভাস্করয়ের পৌক পাশিলেও এবং টাক পড়িলেও অসুবিধা-অসুখি কিছুই হয় নাই, কারণ, দাঁত পড়েও নাই, নড়েও নাই। সেই সুযোগে জনৈক বদাত

রোগীর প্রথম উপচৌকন কচি পাঠাটির মাংস অত্যন্ত  
দিশ্রদ্ধায়ে তিনি খাইয়েছেন। খাইয়া খানিক আগে তিনি  
উপরে উঠিয়াছেন; তার পর চিৎ হইয়া শুইয়াছেন;  
তারপর তান প'শে কিরিয়া সটকা টানিয়া টানিয়া  
কলিকটিতে আর কিছুই রাখেন নাই—শেষ করিয়াছেন;  
তারপর সটকাটি নানাইয়া রাখিয়াছেন। এইবার বা  
পাশে কিরিবেন—মিস্ত্রাকর্ষণ শব্দ হইয়াছে, এমন সময়  
পুনর্জন্মর ভাষে তাঁর চিত্ত বিকল হইল—

বসিলেন,—কে?

—আমি পুনর্জন্ম। একবার শুধু, ভাঙাবোঁ।

পুনর্জন্মর কণ্ঠস্বরে যেন প্রগতি ক্ষণিত হইল।

—যাই—বলিয়া সূচান জ্ঞানদায় হাসিলেন

বসিলেন,—কি বলব?

—খাবার ভাদী অম্বথ।, আমুন একবার।

বিশ্ব সূচাদের অভিজ্ঞতা বহুদা-খাপ।

বসিলেন,—ভগ্ন মোটেই পড়েনি?

—কোথেকে ম'শরকে এনেছিল। তিনি ওখু  
দিচ্ছেন।

—তবে আর কি। তাই দাও গিয়ে আপাততঃ।  
আমি ঠিক সাড়ে তিনটেই খাব। একেবারে কঠিন কিছু  
ত' নয়।

পুনর্জন্ম বোধ হয় ভুল বুঝিল, কিন্তু তার মনে হইল,  
সূচান যেন বলিতে চান, যেমন কঠিন কিছু হইবে  
কবিতাও প্রকৃতি বিজিবিম্বি ব্যাপার না করিয়া একেবারে  
প্রথমেই সে তাঁহারই কাছে আসিবে।...পুনর্জন্মর  
একটু অভিনয় অঙ্গিল—কথা কহিল না। বিপদ  
তার নিষেধই বলিয়া তার মনে হইল, অস্বাভাব্য  
এবং জীবনদাতা চিকিৎসকদের কর্তব্য রোগার্থের  
আলোনে সেই দিকে এবং তখনই অতর লইয়া আয়ুর্হায্য  
মস্তা ছোট।...

কিন্তু সূচান বীরে অহে বলিতে লাগিলেন,—এই নাড়  
গেয়ে উঠল।; আর, রোগে গোদে বড় ঘুরেছি আজ।  
কিছু তেরো না, তোমার বাবাকে আমি মরতে দেব  
না। বলিয়া সূচান হাসিয়া উঠিলেন; বসিলেন,—নাতে  
তিনটেই ঠিক দাও।

—গাড়ী আনি?

—না, না...

পুনর্জন্ম পুনরায় কাতবোজি করিল; বসিল,—সারে  
দিনের আগেই যদি যেতে পারেন তবে বড় উপকার  
হয়। তিনি বেশী হায়ে আছেন, সব পূর্ব।

সূচানে তেমন দিষ্টরূপে বসিলেন,—খাব, খাব, তাই  
খাব। সব দেখব গিয়ে। আবারও ত' গরজ আছে।  
—বলিয়া তিনি পুনরায় ব'সি চাঙ্গিলেন।



হঠাৎ কবিমাঝ রোয়ি নাজীপবীকা করিয়া বসিলেন—

পুনর্জন্ম অত্যন্ত নিতেন্দ হইয়া কিরিয়া আসিল।

বৌগিকে কবিগ্রাজী উদয়ই দেওতা হইল—এবং  
বেঝিতে বেঝিতে সূচানের 'সাড়ে তিনটে' কখন বাড়িয়া  
গেল।

পুনর্জন্ম আবার ছুটিল; দেখিল সূচান দিবা যদি  
গায়ে তাঁর সুলবগিচার বেড়ার মাঝে লাড়াইয়া আছেন—  
শোভা নিরীক্ষণ করিতেছেন; পুনর্জন্মর আবির্ভাবে সূচান  
বাগিচার দিক হইতে প্রস্তুত চক্ হুটি তাহার দিকে  
কিরাইলেন, বসিলেন,—আমি তৈরী হে। বসো একটু।  
চা-টা খেয়ে নিই। খাবে এদ কাপ?

—আজ্ঞে না।

—আমি খেতে নিই। হু' মিনিট। চলো বলি গিয়ে—বলিয়া স্ত্রীচাঁদ বেড়ার ধার হইতে পুনর্জন্মকে লইয়া আসিয়া চোচায়ে বসাইলেন, বলিলেন—চা তৈরী হু'ছে। এল বন্দে'। চা-টা না খেয়ে বেকলে আবার বনে ছু, কপী টুই সব মিথো—এমনি খাপচটা লাগে। আর, খাব-ভার হাতের চা আমি কিছুতেই খেতে পারিনি, বনে ছু, ট্রিক বহু নিয়ে তৈরী কর: হু ন:। এনেছিদু? রাখ।

চুত। টেবিলের উপর চায়ের কাপ এবং জলখাবারের ডিন্ স্নাওয়া দিল—স্ত্রীচাঁদ কাঁচাপোলা ভাঙিয়া মুখে দিলেন—

পুনর্জন্মক বনে হইতে লাগিল: ইহলোক আর পৃথলোকের মাকথানে একটা অনিচ্ছিরি থানে, বহু অত্যাচারে তাহারা ছুতরা বলিয়া আছে। সে নিকিতে অশক্ত। ছিটীর ব্যক্তিটি একটি মাদেনর প্রেতাশ্বাস হুতা যেন অভিশাপবৃত্ত হইতে অনন্ত্যন্ত স্ত্রীচাঁদ অজ্ঞাতের আত্মবন্ধ্যা বলিয়াছে—অর্থাৎ নিম্নে নিকিতা নিকপা, এবং আহারকৃত স্ত্রীচাঁদকে তার বীতবল বনে হইতে লাগিল।

তা' হোক, স্ত্রীচাঁদের তাহাতে কতিয়দি নাই। সহজে পরিণাম হইবে বলিয়া স্ত্রীচাঁদ কাঁচাপোলায় প্রতিটি প্রাণ ব্রিথবায় চিবায়া তার সবগুলি শেষ করিলেন, তারপর হু দুইয়া ফেলিয়া চায়ের কাপ তুলিয়া লইলেন, এবং কতখানি সে গলাথকাবি দিলেন তাহার ইচ্ছা নাই। ছোট ছোট চুচু মিথ: দিয়া আছে আছে চা-পান চলিতে লাগিল—এবং পুনর্জন্মক বনে হইতে লাগিল, এখানে সময় চলিতেছে না, চা-পান তাই শেষ হইবে না—ভূমিকে তার পিতা মুবু—সময় ব্যক্তি হইতেছে।

কিন্তু অসম্ভব কল্পনা করিলে চলিবে কেন? স্ত্রীচাঁদের চা-পান চিরকাল বহিয়া চলিল না—এক সময় শেষ দিক্তই হইল।

স্ত্রীচাঁদ উঠিয়া গাড়াইলেন, বলিলেন—একটুখানি এক। বল, আমি চট্ করে বাড়ির ভিত্তি' খেয়ে কাপড় বন্দে' আনাটা পরে আসি। অত্যাচার তা' তেমনই দেখে

বেকতে হু'বে—বলিয়া হাসিতে হাসিতে তিনি উঠানে নামিলেন—

পুনর্জন্মক বলিল,—বে আছে।

স্ত্রীচাঁদ অতঃপরে অস্ত্র হইতেই পুনর্জন্ম উঠিয়া গাড়াইল—হুতা যেন সে চিট্কাইয়া উঠিল। সময়কে এত দীর্ঘ, বাহুকে এমন অসহ, আর নিতকে এমন খিণ্ড আগে কখনও তার মনে হয় নাই—সহিষ্ণুতার পরীক্ষার টানে টানে গির-ব্রিথ হইতে হইতে তার তৃণাই মনে হইতে লাগিল, এই যন্ত্রণার প্রতি চিরজীবী হইয়া রহিল, এবং এই অবহেলার প্রতিশোধ লইতেই হইবে।

পুনর্জন্মক শুভ হইয়া একই স্থানে থালি গাড়াইয়া রহিল।

“এখনো টের য়েদ আছে”—বলিতে বলিতে স্ত্রীচাঁদ বাহিরে আসিলেন—কাপড় বদলাইয়া এবং ভায়া পরিয়া অর্থাৎ অত্যাচার লাগিয়া তিনি এবার সত্যই বাহির হইলেন।। যেহা তখন সাড়ে তিনটের পর প্রায় পাঁচটা।

পরে পরিচিত বহু লোককে কুলশব্দার্থা দিতে দিতে, এবং বহু লোকের নিকট হইতে কুলশব্দার্থা লইতে নইতে স্ত্রীচাঁদ পুনর্জন্মক সমস্তব্যাহারে রোগী জনমেজয়ের কাছে আসিয়া পৌছিলেন, কারন, পথের শেষ তথা আলাপের শেষ এক সময় অনিবার্য্যভাবেই আসে।

স্ত্রীচাঁদ জ্ঞান ও বিজ্ঞান একত্র করিয়া রোগ পরীক্ষা করিলেন, আশা দিলেন, চার টাকা ভিজিট লাগিলেন এবং চারখানা ব্যবস্থাপত্র লিখিলেন।

বহু ভাস্কর্য এই স্ত্রীচাঁদ অধিকাৰী।

প্রতিদায় তিনখানা হিলাবে দাম দিয়া তিন শিশিতে আঠাঠো দাগ ঠেং আনিয়া পুনর্জন্মক পিতাকে প্রায় সবটাই সেবন করাইয়াছে দুই দিনে, সূক্ষ্মে মালিশ করিবার মস্ত যে ঠেংবের ব্যবস্থা স্ত্রীচাঁদ করিয়াছিলেন তাহাও বখসাখা মালিশ করা হইয়াছে—এবং সন্তবত: তাহাই ফলে সেদিন সকালবেলা দেখা গেল, রোগীর অবস্থার উন্নতি হইয়াছে—একবারে, অসাড় নিম্মীকতা তেমন নাই—হু-চারিটি কথা কহিতেছেন, এমন কি, কিছুটা পথ্য এবং ফলের রস পান করিলেন। কিন্তু তার গায়ে উত্তাপ কবে নাই, কমিলেও খুব অল্পই কমিয়াছে বলিয়া রাজলক্ষীর মনে হইল।



কিন্তু সৰুট উপস্থিত হইল ভোবের দিকে। বাকসম্মতির আভাসের অবশিষ্ট ছিল না—দুঃখ ক্রমশঃ নাইয়া তিনি স্বামীর অবস্থা সত্য করিতেছিলেন, তব্বে তব্বে তাঁর পায়ে হাত দিয়া যাকে যাকে পরীক্ষা করিতেছিলেন, ঠাণ্ডা না গরম। ভোবের দিকে একবার তাঁর পায়ে হাত দিয়া বাকসম্মতি চ্যুতিয়া উঠিলেন, ঘন হইল, পা ঠাণ্ডা। পায়ে হাত দিয়া চেষ্টা কর।

হাসি তখন পোনে চাবটে—  
ঐশ্বের হাশি প্রত্যন্ত হইতে বিলম্ব  
নাই।

পুনর্জন্মকে মা শুইতে পাঠাইয়া-  
ছিলেন—ভাড়াভাড়ি তাহাকে  
ডাকিয়া তুলিলেন। পা ঠাণ্ডা  
কিন্তু সে উচ্চস্থানে সূচাবের  
কাছে ছুটিগ।

একবার সূচাবের সাক্ষ্যে আনন্দ।  
পাইয়াছি, এইবার বিতরণবার  
পাইব—কিন্তু বিলম্ব আছে।

সূচাবের বাড়ীটা একটু ঘুরে।  
পুনর্জন্ম ঘোড়াইয়া ঘরন সেখানে  
পৌছিল, তখন উবার আলোক  
ছুটিগাছে, কিন্তু স্বাকার করিতে  
হইবে, সূচাব তখন ঘুমাইয়া  
নাই—এত ভোবেরই তাঁর নিভ্রান্ত  
হইয়াছে। তিনি এখিকেও ঘুর সাবধানী আর নিষ্ঠাবান।

এক ডাকেই সাতা দিয়া সূচাব বিতরণ শব্দ প্রবো  
হইতে আনিতে চাহিলেন,—কে ?  
—আমি পুনর্জন্ম। ভাড়াবাবু, সীগুণির একবার আহ্ন  
তাঁ বাবার অবস্থা ভাল বোধ হচ্ছে না। পা ঘন ঠাণ্ডা  
ঘন হ'ল।—বলিয়া পুনর্জন্ম হাঁপাইতে লাগিল—

সূচাব আনন্দের আগিলেন, বলিলেন,—ওনামা,  
চলো বাড়ি। ঘুবে একটু অল দিয়েই যাক্, চলো।  
ভোমত ত' হয়ে এল। আশ্বিনী অস্তর লাল গুণ্ডে  
ছ'বার নাও গিরে। তা করতেই আমি পৌছে যাব।

গোড়াইয়া পাড়াইয়া ন্যাসাধনা করার সময় পুনর্জন্ম  
নাই, 'বে আছে' বলিয়া সে চলিয়া আসিল।

কিন্তু লাল হস্তের উপরে বোণীর অবস্থার ঘটিল না,  
একই ভাবে বহিল—

উদারাই বৃষ্টি করিয়া গরম জল বোতলে পুরিয়া তাঁর  
হাতে পায়ে দৌক দিতে লাগিল। এমনই 'করিয়া'  
উৎকর্ষ। প্রভব: আর প্রতীকার হিতের দিয়া আশ্বিনী-  
হাসনে কাটিল।—সূচাবের কখন হইয়াছে তার ঠিক নাই।  
ঘুবে একটু অল দিতে 'ত' এত বিলম্ব হইবার কথা নয়!



বাকসম্মতি আভাসের অবশিষ্ট ছিল না।

পুনর্জন্মকে তার মা আবার পাঠাইলেন।

এবার সূচাব অস্ত্রপূরে নাই, বেরা গেল, এবং তিনি  
'দিশপেন্সারী কর্ম' আলো করিয়া বসিয়া আছেন। এমন  
সময় সূচাবের পরিবেশে পুনর্জন্ম আগে কখনো তাঁহাকে  
দেখে নাই। সূচাব বুতে নাহুৎ, ঘর আলো করিয়া  
তিনি বলিয়া থাকিলেও তাঁর নিজের কী প্রি থাকে সম্ভব নয়,  
তা' আছে তাঁর মাতনীর, এবং তাহাকেই কোলে করিয়া  
সূচাব বলিয়া আছেন বলিয়া, পুনর্জন্ম অগ্রতব করিল, সেই  
কর্তাই ঘর আলোকিত হইয়াছে।

ঘুত দাড়র কোলে এলাইয়া পড়িয়া নানান আলো  
করিতেছে—

পুনর্জন্ম বাহির বরজার দাঁড়াইতেই সূচাদে সহস্র ব্যঞ্জ  
হইয়া উঠিলেন, ব'ললেন—এই উঠেছি, দায়া। এই মেয়েটা  
কত যে বাকে গম করছে তার ঠিক নেই—কিন্তুতেই অল্প  
হেঁচো' নারবে না—বলিয়া সূচাদ বাকি হাসিলেন। তাহার  
বকশ তাঁহাকে অবিকল্পে উজ্জল দেখাইল। তারপর  
বুকের দিকে মুখ নাখাইয়া তিনি সাত্ত্বনয়ে বলিলেন,—  
নাথো, পুতু, লক্ষী বিদিত। কত কথো তেঁও আগছে  
সেখো না! এত এত টাকা আনব; সব প্রোমাথ  
সেব; আর আত্মর কিনে আনব; আর, সেই বাতাল  
পুতুলটা! মনে আছে ত? তারি দিকে কেমন খাত  
নেড়ে' নেড়ে' সে বাতালের বতো করে। প্রোমাথ তেঁও  
নিশ্চয় কিনে আনব; বত মাইই হোক।

পুতু কান পাতিয়া আর নিরীহভাবে প্রতিজ্ঞা  
প্রকৃতি তুলিল, কিন্তু জবাব দিল খিত্রাঘীর বতো,  
বলিল,—নাথব না! তোমার লকে ধাখে, আত্মর কিনে  
সেই সোকায়ে বসে খাব আর পুতুল আমি নিজে কিনব।

জটিল হস্তান হইয়া বলিলেন,—সেখানে হে, অতুল  
আমার মেয়েটার! তুমি খাত, সেক দাত গে। আমি  
উঠেছি।

সূচাদের যুগের কথা শেষ না হইতেই পুনর্জন্ম  
আম্বানোদ্যত হইল।

—কেমন?

যা বলিলেন,—তেরনি। একবার চোখ খোলেন; বসলেন, ভাল আছি। ডাক্তার আসতে?

—হ্যাঁ।

কিন্তু কই ডাক্তার? আরো তিন কোয়ার্টার গেল—  
তারপরে দেবদত্তকে পুনর্জন্ম ছুটাইয়া দিল—সে বয়স  
শাইল এবং আনিল যে ডাক্তারবাবু বাহির হইয়াছেন।

ডাক্তারবাবু বাহির হইয়াছেন তুমি এবং অবিলম্বেই  
আগিতে পারেন মনে হইলেও আর তেরী করা চলিল  
না—বুকের বিদগ্ধ সর্গমাশ কত ক্রত আর কত  
অনিবার্য হইয়া উঠিতে পারে তাহা উপরই জানেন...

দ্বিতীয় অবলম্বন কবিতা—

পুনর্জন্ম কবিতার কাছে গিয়া অপরাধীর বতো  
দাঁড়াইল—প্রৌর্জামাশত: তার সঙ্গীত তখন বর বর কবিতা

কাণিতেছে। কবিতাজ নির্জীবনে পুনর্জন্মের কবাণ্ডিল  
তুলিলেন, তারপর ক্রতঙ্গী করিলেন, এবং তারপর  
বলিলেন,—শেষ স্তম্ভের আবার দিয়ে আর কি কাজ  
বাক্য? বৌটা টাকার আর গুণধাম ডাক্তারকেই ডাকো,  
যেখো, যদি সে পারে।

কবিতাজ মহাশয় কথা বলেন বৌটা। পুর্কোক্ত  
উজ্জীর পর না বামিয়াই তিনি বলিতে লাগিলেন,—  
আহুর্কেনকে জুজ করেই ছায়ে বায়ে গেলো। অদিক্ত  
বাক্য আর ঔষধ জোমাদের বন:পুত হ'ল না—হ'ল  
দিয়ে বিলিতী বিব! তবে, এই বড়ি দিচ্ছি—একটি  
টাকো দাম। হামটা নগদ চাই।—বলিয়া কাণ্ডে হুড়িয়া  
তিনি বড়ি তিনটি পুনর্জন্মের হাতে দিলেন।

নগদ দায়ে কবিতাজ বাক্য অম্বলারে একতর ঔষধ,  
অর্থাৎ তিনটি বটিকা, পইয়া পুনর্জন্ম চলিয়া আনিল;  
কিন্তু তার পরধ্যাতো জানিলেন, আশা নাই।

দেবদত্ত বয়স আনিয়াছিল, সূচাদ ডাক্তার প্রভা  
হইয়াছেন। প্রভা তিনি হইয়াছিলেন—কথাটা মিথ্যা  
নয়। নাতনী বুকে অকষ্ট করিয়া এবং কাঁদাইয়াই  
তিনি বাহির হইয়াছেন...

ডাক্তার সূচাদে অবিকারা কেবলমাত্র পেশাদার  
ডাক্তার ন'—তিনি জনসাধারণের পরম ব্রহ্ম ও  
অকৃষি বন্ধ এবং অকণ্ট হিতৈষী; তার উপর তিনি  
সদাশান্তি; তার উপর তিনি গৃহস্থ এবং তার উপরেও  
তিনি পরিকল্পিত ত্রস্তোক; এবং তারও উপরে তিনি  
সর্বদাই অকাতরচিত্ত।

তিনি অকাতরচিত্তে বাহির হইয়াছেন—লক্ষ্য রেপীর  
গৃহ; কিন্তু পথে ঘেঁষা হইল পীতবাস পোদারের লক্ষ্য।  
পীতবাসের এলিড এবং "বিভক্ত চৌকিহাটা চাউলের  
মোকান" আছে—সূচাদের দেখা পাইতেই পীতবাস  
সদ্বয়ে প্রণাম করিয়া একবারে বিগলিত হইয়া গেল।  
বলিল,—সোকায়ে একটু পায়ের বুসো পড়বে না,  
ডাক্তারবাবু! উত্তর দিহি পুরাণো চাল এসেছে।  
আপনার নাম করে' হ'লতা সরিয়ে রেখেছি। অনেক  
খন্দেরকে কিরিয়ে দিহেতি; বলি, ডাক্তার বাবুকে না  
জিয়ে ছাড়িছেন।

তাল বটে ত' ?

শীতবাস মধ্যে আরত, এবং তার চোখ বিষয়ে বিধারিত হইল; বলিল,—আপনার সঙ্গে তর্ক? নিষেধ বুঝে কি আর বদন, ডাক্তারবাবু? বোকানবাদের কথা ধাঁড়াক করুনো। দয়া করে! সতর্ক দেখবেন চণ্ডন।

—দরকার ত ছিল হে। চলো, দেখি গে। বলিয়া সূচান শীতবাসের সঙ্গে অগ্রসর হইয়া তার দোকানে গিয়া উঠিলেন এবং শীতবাসের অঙ্গুরোধে ক্ষুভা বৃদ্ধি হইলেন।

শীতবাস পোদার তার চালের ত্রণ-ওণে ঘেঁষে বিশেষরূপে হইয়া চাঁপ খেবাইন—চাঁপ মিহি এবং সুভাসন বটে; সূচান পছন্দ করিলেন; তারপর ঘর লটখায়ে কথাবি হইল তাহা কুছ; শীতবাস বন প্রতি হুঁশোনে কমেই রাজী হইল, এবং কতি বীকারের কারণও সে প্রকাশ করিল; বলিল,—ভেতই দিনান, ডাক্তারবাবু। ডাক্তারকে হাতে রাখতে হবে ত'! আপনার হাতেই আছি। বলিয়া শীতবাস বস্ত্র হইয়া হাসিতে লাগিল; বলিল—আমারই লোক পেঁছে দিয়ে আসবে।

চাউল ক্রয়ের ব্যাপারটা হুকাইয়া সূচান উঠিলেন; উঠিতে তিনি উত্তত হইয়াছেন, কিন্তু সময়েই তাঁর চোখে পড়িল রামকমলভাগারী—কুর, নন্দ, আরনা-চিকনী প্রভৃতির হাতবান লইয়া সে রাজা দিয়া চলিয়াছে।

সূচানের বা হাত আপনি উঠিয়া গন্তস্থল লক্ষ এবং ধর্ষন করিল; তিনি অসুস্থ করিলেন যে, বাড়ি বাড়ি যাচ্ছে।

শীতবাস তা' দেখিল—

আগ্রসর ডাক্তারবাবুকে স্থলতে চাউল বিক্রয় করা ছাড়া অন্য উপায়েও সে চুষি করিতে চাহে; কাজেই প্রয়োজনের বেশী চীংকার করিয়া সে রামকমলকে ডাকিয়া দিল; এবং রামকমল প্রয়োজনের বেশী বস্ত্র লইয়া সমগ্র ডাক্তারবাবুর উদ্ভূত অঙ্গ বোচন করিয়া দিল—ভাঙা সে সমস্ত নিল অনেকটা। কুরে বসে নান আর বাড়িতে বসে জল দিবার দরকার ছিল না।

অতঃপর বিত্ত চৌকি ছাটা চাউলের দোকানে

সূচানের আর না বসিলেও চলিত—তাঁর নিষেধ কাছ পের হইয়াছে; কিন্তু শুদিককার হস্তিগাধন নতুনদার আর ঘাই হোক অসুস্থ নহে। ভাঙাচুরা নিকটেই শীতবাসের দোকানে বসিয়া আছেন তিনি পুনরায় কৃতজ্ঞতা জানাইতে সে সিকি বহিল রাজা ছুটিয়া আসিল—

হ'রসাবনের জানতা লোকনাথের কট্টন হইয়াছিল। লোকনাথ কলিকাতার যাবে;



সূচান এখন কলিকাতায় বেঁচে আসিলে—

অদ্বিগাছিল কলিকাতাতেই; কিন্তু কলিকাতার ডাক্তার-গুলি এমন অর্ধাঙ্গীণ যে, হোপটা কি তাহা চিনিতেই পারে নাই—চিকিৎসার প্রকৃত হওয়া ত' হুয়ের কথা। অথচ—হস্তিগাধন রাগ করিয়া বলে—‘পেটুলান’ পরায় সবুই আছে।

সূচানের প্রতি হস্তিগাধনের পূর্ণ হইতেই শুধা অপেক্ষ, বিকাশ অগাধ। হস্তিগাধন জানাইয়ের বাপ-মায়ের নিষেধে কর্পাস না করিয়া এমন কি জন্মের প্রতি রূপ

হাক্কা প্রয়োগ করিয়াই, আত্মাইকে এখানে আনিয়া মুঠাদের হাতে সমর্পণ করিল। বলা বাহুল্য, মুঠাদ তাহার মুহুরতঃ করিয়াছেন এবং কলিকাতার বাবতীর পেন্টেলান-পর্য্যন্ত চিকিৎসকের দ্বারা চুগ-ক্যালি পেনশন করিয়া দিয়াছেন, অর্থাৎ লোকনাথ সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়া গত পত্রখণ্ডে অগ্রসর করিয়াছেন।

কাজেই হরিশাধন দিকি মাইল দূরত্ব লোডাইয়া আনিয়া মুঠাদের পদখলি মাধ্যম দ্বারা; কিন্তু মুঠাদের পায়ের আঁদৌ ধূলা না থাকায় হরিশাধনের চুল ধূলা লাগিল না।

মুঠাদ এক্ষণে কঠোর জ্ঞানিতে চাহিলেন,—আত্মাই কেমন আছে?

হরিশাধন গনগন হইয়াই আনিয়াছিল—অধিকতর গননয় হইয়া বলিল,—ভাল আছে, ডাক্তারহাযু। তাগে) আপনাতঃ হাতে দিরে ছিলাম—যেহেটির নীখা-সিঁপুহ বজার থাকল

হরিশাধনকে বিচলিত দেখিয়া মুঠাদ বলিলেন,— সে কথা ব্য'ত—ব্রোপের হুল ছিল পেটে, মাধ্যম নয়। পেটের রোগের চিকিৎসার আদ্যবের আয়ুর্কেন্দ্র খুব দক্ষন। —বলিয়া তিনি আয়ুর্কেন্দ্র এবং অ্যালোপ্যাথিকে মিশ্রিত আর অংশদান করিয়া এখন অনেক সারগর্ভ বৈজ্ঞানিক কথা বলিলেন যে, পীতবাস, রানকহল এবং হরিশাধন প্রকৃতি একটা অজ্ঞাত ভিনিসের অদ্বুত কথতার পরিচয় পাইয়া ভক্তিত হইয়া গেল।

তারপর মুঠাদ বলিলেন,—আজ্ঞা, উঠি এখন; সঙ্গীর বাড়ী যেতে হবে, একটু ভাড়া আছে।

পীতবাস বলিল,—ও, তবে ত' উঠেই হয়। কিন্তু আপনাকে ছাড়তে ইচ্ছে হয় না।

পীতবাসের এই কথায় সঙ্কট হইয়া মুঠাদ একটু হাসিলেন; জাহরণ পাতোখান পূর্ণক রঙনা হইলেন।

যানিক্ এদিকেই পূর্ণকবিত্ত এবং প্রতিক্রান্ত আত্মরৈর মোকান। মুঠাদ সেই মোকানে গাঁড়াইলেন; একবার আত্মরৈর হাতে লইয়া আত্মরৈর জুপের ভিতর হইতে সম্বরণে একটা আত্মরৈর তুলিয়া লইয়া তিনি মুখগুরুরে বিবেচন করিলেন, উহা নিষ্ঠ কিবা টক, কিবা কথার তাহা

টিক্ ঠায়ের করিতে না পারায় আর একটি বাস্তব লইয়া তাহারও একটি চাবিয়া দেখিলেন—বিষ্ট লাগিল—আত্মরৈর সেই বাস্তব তিনি সম্বন্ধসম্পূর্ণক জ্ঞান করিলেন—মোকানীর চিত্তাকুল প্রেমের উত্তরে তিনি আনাইলেন, আত্মরৈর প্রয়োজন হইয়াছে বাটহি কোনো রোগীর জ্ঞান যথ, আত্মরৈর বাস্তব আনিবেন বলিয়া নাতনী প্রকৃকে যে তিনি অতিক্রান্ত দ্বিত্য আনিরাছেন! জ্ঞতবাং আত্মরৈর লইতেছেন।

আত্মরৈর কেনা হইল—মুঠাদের বাজারের কাণ্ড শেষ হইল। সেই আত্মরৈর বাস্তব হাতে করিয়া এবং আশায়ের বহু মোকের নবীরগত মুখ-সুবিহার তদ্রাস লইতে লইতে বহন মুঠাদ পূর্ণকহুর বাবাকে দেখিতে পূর্ণকহুরের বাড়ীর সম্বন্ধবর্তী হইলেন, তখন বেলা এগারোটা।

মুঠাদের লাল রঙের ঝববে এবং কবিগাজের বটিকা, কবি-নিষ্ঠিত গনক বটিকা কল হয় নাই। কাজেই মুঠাদ বহন জনসমাজকে দেখিতে আনিলেন, তখন বহিরগনে বীণ কাটিয়া আর নড়ি পাকাইয়া বাচা প্রস্তত্তের কর্ণা) ক্রতবেগে এবং অগ্রঃপুর্বে জ্ঞানন নিরবজ্জিহবাবে চলিতেছে—

মুঠাদ বখলিয়া গাঁড়াইলেন—

পূর্ণকহুর তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া বিব্রতভাবে অগ্রসর হইয়া গেল। মুঠাদ বিব্রতভাবে তাঁর কর্ণা করিলেন; বলিলেন,—হট্টবে বনেই যে-সব ব্যাপার একটা চূড়ান্ত নিমেষের অতীতক্ অস্বাভাব্য গাণ্ড হইতেই আছে, বহুই তার মধ্যে সব চাইতে অস্বাভাব্য—তা' 'ত' জানে। আজ্ঞা, এখন আসি।—বলিয়া বহন নির্জিকারভাবে আনিয়া-ছিলেন টিক্ জেমসি নির্জিকার অবস্থায় তিনি প্রস্থান করিলেন।

মুঠাদের ঐ কথার এবং তাঁর বাস্তবায় তদী দেখিয়া পূর্ণকহুর চোখে বেনী করিয়া জল আসিল; তার মনে হইল, সবাই বা' জানে তাহারই কৃত্রিম পুনরুজ্জি করিয়া লোকটা যেন বাস্তব দিয়া গেল।

শিতার বহুর পর তাঁর শ্রাচ্ছ হেলেকে করিতেই হইবে। পূর্ণকহুর নিষ্ঠ্রাচ্ছের আয়োজন এবং শ্রাচ্ছোপলক্ষে শ্রাচ্ছ এবং জাতি ও বহু তোজনরও

আয়োজন করিয়াছে। আয়োজন প্রচুর—বড়তর সেড শো লোক। তাহাতেই তাহাকে জ্ঞান করিতে হইল।

নিমন্ত্রিতের কৰ্ম প্রত্যন্ত হইয়াছে—সেবকৃতক লক্ষ দিয়া ব্রাহ্মণের দায়িত্ব নিমন্ত্রণ প্রেরিতও হইল :

পুনর্জন্ম সোমের শিত্তশ্রাদ্ধোপলক্ষ্যে বাজ্ঞন ভোজন করানো হইবে; আপনার নিমন্ত্রণ রহিল; লাডে নটায় তোজ, দয়া করিয়া—ইত্যাদি।

বলা বাহুল্য, ডাক্তার স্ট্যান অধিকারীকে আজ্ঞান করা হইয়াছে; পতিভিত্তি বাক্তি, ব্রাহ্মণ এবং দানীর বিশিষ্ট বাক্তি দিগবে নিমন্ত্রণ তার প্রাপ্য।

লাডে নটায় তোজ—

লাডে নটায় কি গরমের দিনে বেশী রাজি? তা' নয়। কিন্তু তার বেশী দেহী হইলে আছত সন্ধানবর্ণ বিরক্ত হইতে পারেন; তাহাও বিরক্ত হইলে বিধম লক্ষ্যের কারণ হইবে। পুনর্জন্ম তাই তাড়াতাড়ি কঠিনে। নিমন্ত্রিতগণ শুভাগমন করিয়া বসিবার স্থান এবং আপনেনব অভাবে পাছে ষাড়াইয়া থাকেন—এই তর সে সন্ধ্যা না লাগিতেই বৈঠকখানা খাড়িয়া মুছিয়া পরিষ্কার করিল। তাবপর যেতেতে লম্বা-চওড়া সতরকি এবং তার উপর লম্বা-চওড়া চাবির বিছাইয়া দিল এবং তার উপর কয়েকটা তাকিয়া বালিশ রাখিয়া দিল—আলততরে গা ছাড়িয়া দিয়া নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গ আহার উপভোগ করিবেন, কারণ, নিমন্ত্রিত অতিথি নারায়ণকৃত্য পূজা।

লাডে নটায় বাজিতে এখনও ঢের দেহী—পুনর্জন্মব দেহালগড়িতে এখন রাজি লাভটা পর্য্যাপ্ত।

এইবার আপোষ ব্যাখ্যা—

চায়া-আনা মুহুরৎ টেবিল ল্যাম্পটা আলিয়া দিয়া পুনর্জন্ম নিঃশাপ ফেলিয়া বাঁচিল—অনেক আপোষে এদিক-কার বন্দোবস্তটা সমাধা হইয়াছে।

এখন মুচি-ভরকারীর দিক্ একবার তদারক করা দরকার তাহা সেই উদ্দেশ্যে দ্বয়ের বাহির হইতে চৌকাঠের বাহিরে পা বিরাই পুনর্জন্ম চরৎকৃত হইয়া গেল : ডাক্তার স্ট্যান অধিকারী তার সেই নাত-লীটির হাত ধরিয়া লক্ষ্যেই ষাড়াইয়া আছেন—মুচি খুব সোয়া—খুব বেশ লাগিয়া। আনিয়াছে। দেখিয়াই পুনর্জন্ম অকস্মাৎ চীৎকার করিয়া যেন লক্ষ্যে বিকৃত হনের লাগরে কাঁপাইয়া গড়িল, অর্থাৎ বলিল,—আহুন, আহুন! খুঁকী, কেমন-আত?

খুঁকী কথা কহিল না—

পুনর্জন্মই পুনর্জন্ম বলিল,—ভেতরে এসে বসুন, ডাক্তারবাবু। আত কি সোভাগ্য আমার।

অতিথির অর্ধ সন্ধানকৃত্য সহিত চায়া স্ট্যান সোভাগ্যের কথাও প্রতিবাদ করিলেন; বলিলেন,—সোভাগ্য কি হে! এ যে কর্তব্যের ঠান—বদা নিতেই হবে। পরস্পরের ডাকে যে শৌকিকতা বন্ধ না করে তাকে কি অসামাজিক বলা হবে না? কর্তব্যের দায়ই হচ্ছে সবার উপর অনিবার্য।

কি যে সবার উপর অনিবার্য নয়—তাহা ধারণা করিতে না পারিয়াও পুনর্জন্ম কৃত্য হইয়া বলিল,—আছে হ্যাঁ।

স্ট্যান বলিলেন,—তব্রনোঁকর নেহয়র আর অনো-লভের লখন, একই বকম—হাজির আবার হ'তেই হ'বে। না আসাটাই অস্বাভাবিক। একটু আপোষে এসো। এগেই নেহাৎ খেতে বসো ভাল বেখার না। দেহী আছে বুজি?

পুনর্জন্ম বলিল,—অমই। ওহে, পাখা যে একখানা, ব্রাহ্মণের হাঁকোর কলকে দে, আর ভেতর থেকে পান নিয়ে আর এক ভিন্।



# মহামায়ার মহালীলা

শ্রীমতীসমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথমদি মহামায়াঃ দুর্গাঃ দুর্গতিনাশিনীম্ ।

মহামায়ার মহালীলা। এই ভগবৎপ্রণক লম্বা ভাণ্ডার লীলা। তিনিই ভাণ্ডার সহিত লীলা করিতেছেন। তিন তির রূপে, তির তির কৃতিত্ব। তিনি বিশ্বরূপা, বিশ্ব-বাণিনী বিজ্ঞেশ্বরী।

নবমস্তে জগৎবাণিনিকে বিশ্বরূপে

নবমস্তে ভগবত্মিনি ত্রাহি দুর্গে ।

এই যে ঐশ্বরিক কাল ভারতে—বিশেষতঃ বাক্সার হস্তাভাও ও জংল স্বৰ্গ চমিত্তে, ইহাও তাহা হই লীলা। তিনিই নিহতা, তিনিই নিহত; তিনিই নক, তিনিই মিত্র। বিশ্বের বিশ্ব বটে। কিন্তু অধিদানের হেতু নাই। একটু অভিনিবেশ সহকারে তিত্তা করিলে বহুলা বুদ্ধিতে পাণ্ডা যায়। প্রত্যেক নরনারী ও জীব-জন্তুর কিছু না কিছু নক্তি আছে। নক্তিও প্রাণহৃদয়ী তাহার সন্মর্ষ। এই নক্তির উৎস প্রাণ। প্রাণকে সাধন দ্বারা উচ্চে (মুগ্ধ) রাপিতে পারিলে দুহুতর থাকে না।

প্রাণো হি ভগবান্নানঃ প্রাণো বিক্ঃ পিতামহঃ ।

প্রাণেন বাহ্যতে লোকঃ সৰ্গঃ প্রাণময়ঃ জগৎ ।

প্রাণই ভগবান; নক্তি ভগবতী। এইহেতু আশ্রয় নক্তিপুত্র। এই জগতে সকলেই বিভিন্নরূপে বিভিন্ন সক্তিৰ পুত্র ও উপাসনা করে। ভগবান্ ও ভগবতী—অভেদ, এক। অভেদ কেবল আমাদের মনে ও থাকে।

দৈবের কোন রূপ নাই। তিনি নিরাকার চৈতন্য-রূপ। তাহার কোন বিশিষ্ট রূপ থাকিতে পারে না। কারণ, তিনি সকলের। লোকবাহকেরই রূতি ও ভাব বিতর। এক রূপ সকলের আতি উৎপাদন করিতে পারে না। তিনি নিরাকার। স্তবগায় বাহার যে রূপে তাহাকে স্তবনা করিতে ভাল লাগে, সে সেইরূপে তাহার ধ্যান-ধারণা করে।

জগতে যেমন অনন্ত জীব, তাহার রূপ ও ভেদনি অনন্ত। অর্থাৎ প্রতিরূপে তিনিই বিরাজিত। তিনি

এই সচরাচর বিষয়পে একটু। এই বিশ্ব তাহার প্রতীক। ইহার প্রতি অণু পরমাণুতে তিনি অবস্থিত। এই নিমিত্ত,—

সৰ্গতঃশাখিপারশ্বঃ সৰ্গতোহক্শিপিয়োমুখম্ ।

সৰ্গতঃ স্তম্ভিমলোকে সৰ্গনাকৃত্য তিত্তিতি ।

সৰ্গোস্ত্রিগুণাভাসঃ সৰ্গোস্ত্রিবিবর্জিতম্ ।

অশক্তং সৰ্গজুজ্জৈব দিত্তং তৎপাতোকৃ চ—পুত্রা ।

তিনি সৰ্গজ ইত্থন-বিশিষ্ট, সৰ্গজ চক্ষু, মস্তক ও মুখ বিশিষ্ট, সৰ্গজ শ্রবণেন্দ্রিয় বিশিষ্ট হইয়া, লোকে সৰ্গস্থান বাণিয়া অবস্থান করিতেছেন। তিনি ইন্দ্রিয় ও ভগ পরমাণুর আভাস-বিশিষ্ট, অথচ সৰ্গোস্ত্রি বিবর্জিত; শরশূত্র অথচ সকলের আশ্রয়ভূত; সর্বাদি ভগ্নরহিত অথচ সর্বাদি ভগ্নের পালক। তিনি—

সৰ্গজ প্রভুত্বাশ্রয়ঃ সৰ্গজ্য পরমঃ সুহৎ ।

সকলের প্রভু, সকলের নিরুজা এবং সকলের মহৎ মরণ। তিনি—

সর্গাননবিত্তোজীবঃ সৰ্গজুতত্বাশ্রয়ঃ ।

সৰ্গবাণী স ভগবান্ভূতশ্রয়ঃ সৰ্গগতঃ শিখঃ ।

এই নিমিত্ত, লোকে বলে,—যজ্ঞ জীব, তজ্ঞ শিব। উপনিষদের আছে,—

একো দেবঃ সৰ্গজুতেষু গুণঃ

সৰ্গবাণী সৰ্গজুতাত্মায়া।

কর্মাধাকঃ সৰ্গজুতাবিশাসঃ

সাকী চেতা কেবলো নিবর্ণকঃ ।

সেই একই দেবতা সৰ্গবাণী এবং সৰ্গজুতে বিষয়-মান। শাস্ত বলিতেছেন,—

চিস্রত্যাগিত্যেত নিবলতান্ময়সিগঃ ।

সাধকানাং হিতার্থার ব্রহ্মণো রূপকমনাঃ ।

ব্রহ্মণঃ এখানে কস্তির দত্ত। তিনি নিজেই রূপ ধরেছেন। স্ব স্ব রূতি অস্থায়ী কেহ শিব, কেহ বিষ্ণু, কেহ কৃষ্ণ, কেহ দুর্গা, কেহ কালী, কেহ রাধা—এংবিধ বহুরূপে তাহাকে বহুভাবে অর্জনা করে। আনন্দের মন তাহাকে কোন বিশিষ্ট রূপে ধ্যান-ধারণা করি, তখন তিনি

সেই রূপ ধারণ করিয়া লাকার করেন। হুতরাং তিনি যেমন নিভাকার, তেমনই লাকার। ইহাতে কোন বিঘ্ন নাই। সর্গপত্নিবানু ঈশ্বর তত্ত্বাবহা পূর্ণগার্ভ তির তির রূপ ধারণ করিতেছেন।

গীতার তগবানু শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—

যো যো বাং বাং ততঃ ততঃ ব্রহ্মার্কীভূমিচ্ছতি।

তত ওভাচনাং শ্রদ্ধাং ভাস্যেব বিবদাম্যহং।

যে যে ভক্ত দেবতারূপে যে যে মূর্তিকে শ্রদ্ধা সহকারে অর্চনা করে, আমি সেই সেই ব্যক্তির সেই সেই মূর্তিতে একট দেকতার প্রতি দৃঢ় শ্রদ্ধা বিধান করি। অন্তর বলিয়াছেন,—

যে যথা বাঃ প্রপত্তয়ে তাংভৈব ওভাম্যহং।

তিনি এক এবং অদ্বিতীয়। কিন্তু অসংখ্য মানবগণ তাঁহার নিত্য সর্বোত্তম গুণ বস্তুর জ্ঞানিতে পারে না। হুতরাং, যে যে-রূপেই তাঁহাকে ভজনা করুক না, তিনি সকলের পূজা গ্রহণ করেন। এই ঈশ্বর কোথার অবস্থান করেন? গীতার তগবানু শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদয়েষু সর্বত্রিভিঃ।

নান্যত্র সর্বভূতানি যত্রাচ্চানি মায়ায়া।

ঈশ্বর মায়া দ্বারা সকল ভূতকে যত্রে আবৃতের দ্বারা এবং কড়াইয়া সকল ভূতের হৃদয়েশে অবস্থিতি করেন। যিনি শক্তি, যিনি প্রাণ,—তিনিই ঈশ্বর। প্রত্যেক জীবের প্রকৃতি অথবা নিরুত্তির তাঁহারই প্রেরণা। তিনি যেভাবে বাহার হৃদয়ে অবস্থিত আছেন, সে সেইভাবে প্রকৃতি-পরিচয় হয়। সাধুর হৃদয়ে তিনি সংপ্রকৃতি, অসাধুর হৃদয়ে তিনি অসং প্রকৃতি। এই নিমিত্তই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধোদ্যে বলিয়াছিলেন,—

জানামি বর্ষং ন চ মে প্রকৃতি-

র্জানাম্যাবর্ষং ন চ মে নিরুত্তিঃ।

যথা হৃদীকেশ! হুনি! হুতেন

যথা নিরুত্তোহস্মি তথা কুরোমি।

যত্ন ও পদার্থেই কি ক্ষমতা নহে।

অহং যত্র ভগবানু যত্রী-সব যোদ্যো ন বিজতে।

তৎকর, কিন্তু ইহা দুর্ব্বলের উক্তি। এই অসীম হৃদয়প্রাণ প্রতি লক্ষ্য করিয়া, ঈশ্বরপ্রেরিত যীশুগুণ

বলিয়াছেন, পাশকে ধরা কর, পাশীকে ধরা করিও না। কারণ, সে দুর্ব্বল, কণার পাশ। তিনি উনপঞ্চাশৎবার একজন যোদ্ধাকে কথা করিয়াছিলেন। অশ্বকালে, লক্ষ, রত্ন ও ভব-ভণের ভারতমাহুগারে যে যেরূপ প্রকৃতি লাভ করে, সে সেই বতাবের বশীভূত হইয়া কর্ষ করে। অত্যাগ-যোগ্য যাতীত প্রকৃতিকে অতিক্রম করা দুর্ব্বল। প্রকৃতে: ক্রিয়মাণানি ভূতৈঃ কণানি সর্গজঃ।

অহঙ্কারবিন্দুস্বা স্বার্থবাসিত্তি হুততে।—গীতা।

কর্ষ লবণ প্রকৃতির গুণ, স্বার্থ ইন্দ্రిয়গণ দ্বারা দর্শিতোত্তাবে নিশাচিত হয়। অহঙ্কারে বিকৃত-ভিত্তি ব্যক্তি “আমি কর্তা” মনে করে। জানী ব্যক্তিও প্রকৃতির প্রত্যাব-বৃত্ত নহেন।

সদৃশ চেইতে বস্তা: প্রকৃতেজানবানপি।

প্রকৃতি ব্যক্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি।—গীতা

জানবানও বীর প্রকৃতির অধস্তন কর্ষ করে।

প্রাণিগণ প্রকৃতির অধস্তন করে। অতএব ইন্দ্రిয়-নিগ্রহ কি করিবে? কিন্তু, জানী ও অজানীর মধ্যে প্রভেদ এই যে, জানী আত্ম-সংগমে লক্ষ্য,—অজানী ইন্দ্రిয়-নিগ্রহে অসমর্থ, সে বিপুল দাপ। প্রকৃতি যেমন আনামিগকে প্রকৃতি দ্বিহাঃ; ঈশ্বর তেমনই আনামিগকে নিরুত্তির উপায়-বস্তুর,—বুদ্ধি ও বিবেক প্রদান করিয়াছেন। নাহকের দুইটি ভাব,—সেব ও মহত্ব,—

যৌ ভূতলগৌ লোকেশমিনু দৈব আহর এব চ।—গীতা

দৈবী-লক্ষ্য বোন্ধের এবং আত্মবী-লক্ষ্য বন্ধনের বেষ্ট। এই সেবামহৎ-বৃত্ত সেহের অত্যাগের যেমন, বহি-র্গগতেও তেমন চলিতেছে। সত্ত্বগুণের লালনে সেবভাব এবং রজ ও তম গুণের প্রসারে আহরভাব। বুদ্ধি ও বিবেকের সাহায্যে অত্যাগযোগ্যতায় আদর প্রকৃতির প্রসার হইতে নিরুত্তির আশ্রয় লাভ করিতে পারি। ইহা আরাগ-সাধ্য, সম্ভব নাই। আদর এই প্রায়ের অধিকারী; এই নিমিত্ত, প্রকৃতি ও প্রকৃতির বশীভূত হইয়া কর্ষ করিলেও, ঈশ্বর আনানের পাশ-পুণ্যের নিমিত্ত বানী নহেন।

নাহতে কতচিত্তং পাশং ন চৈব হুতন্তং বিহুঃ।

অজানেনানুতঃ জ্ঞানঃ তেন দৃষ্টি ভূতঃ।—গীতা।

অজ্ঞানে আচ্ছন্ন বলিয়া আমরা ইতিহাসভূত হইয়া পড়ি। ইতিহাস-ভাটনার কর্ণে লিপ্ত হইয়া আমরা পাপ অর্জন করি। কর্ণের ফল অবশ্যভাবী, সুতরাং হুঃখরেশ ভোগ করি। সংকর্ষের ফল শুভ; অসংকর্ষের ফল অশুভ। সংসারার্থে লিপ্ত হইলেই কিছু কিছু পাপ অনিবার্য। কিছু প্রকৃতির ভাটনার আমরা অনেক নিবার্য পাপও করিয়া থাকি, এবং তাহার ক্ষুদ্র ভোগ করি। পাপের পর শিচ্ছিল, এই নির্দিষ্ট অবিকালে লোক উত্তরোত্তর অধোগতি লাভ করে। পরিণামে পৃথিবী পাপে পূর্ণ হয়। ফলে,—

বনঃ ঘনং হি ধর্মশ্য স্মানির্ভবতি ভারত।

অতুখাননধর্মশ্য তদাত্মানং দৃশ্যাম্যহং।

পরিত্রাণায় সাধুনাম্ বিনাশায় চ হৃদভ্যাস।

ধর্মদোষোপনার্থং সততমিহ যুগ্ম যুগ্মে।—গীতা।

ধর্ম শব্দের অর্থ অত্যন্ত বাপক। ধর্ম বিবিধ ও বিভিন্ন। যেমন আধ্যাত্মিক ধর্ম,—প্রাকৃতিক ধর্ম। আধ্যাত্মিক ধর্মে যেমন সাধুসুত স্নেহকার নিমিত্ত, চূর্ণর্ম নানের জন্য এবং ভায় ও নীতি-নিষ্ঠা সংস্থাপনের উদ্দেশ্যে বিনাশ; প্রাকৃতিক ধর্মেও তেমনই দৃষ্টি ও দ্বিতি বিধানের নিমিত্ত ক্ষাসের প্রয়োজন। এই ভগতে কিছুই ভিন্নত্বাতী নহে, সকলই বিনাশনীয়। এইহেতু ইহার আখ্যা চাইরাহে "প্রশংক"। ভগতে যদি নিরবধির দৃষ্টি চমিত এবং গোন কিছুই বিনাশ না ঘটত, ক্রমাগত ভস্মই ঘটত, ভূত্বা না থাকিত, তাহা হইলে, এই সনীর পৃথিবীতে স্বাবর-অবশ্যের স্থান সন্ধান হইত না;—জীবনকালের উপযুক্ত আরাধ্য সৃষ্টিত না। সুতরাং, দৃষ্টির সহিত নাপ অপরিসীম। লোক সংস্থানের নিমিত্ত, জীবনযাত্রা নির্মাণের জন্য, দৃষ্টির সহিত বিনাশের ব্যবস্থা। বুদ্ধ-ব্রহ্ম তাহার নিমিত্ত রাজ। প্রকৃতি বিনাশনীয়। বাত্যা, বন্যা, ভূকম্প-খাবানল, বাদ্-বানল প্রভৃতি তাহার উপায়। প্রাকৃতিক বিনাশ বহন বিধাতার উদ্দেশ্যে অল্পকাল নহে, তখন আত্মিক বিনাশ সংগঠিত হয়। ইহাই বিবিধবিধিত বিধান। পৃথিবীর সর্জন, বিভিন্ন স্রবণে, বিভিন্ন অংশে এই লীলা চলিতেছে। এই হেতু এই পর্যায়ক্রমে দৃষ্টি-বিত্ত-বিবাহের নাম লীলা।

এই লীলার উদ্দেশ্যে বিধাতার সিদ্ধান্ত। তিনিই প্রকৃতি ও পুরুষতত্ত্ব এই লীলা করিতেছেন।

ভাবতবর্ষেও গত বহুতর বৎসর এই লীলা চলিতেছে। ১০৪১ সালের ভীষণ বন্যা-প্রাণ, ১০৪০ সালে দ্বৈতিক ও ১০৪১ সালের মহামারী, ১০৪২ সালের ভ্রবা-মূল্যায়ন বৃদ্ধি এবং বহু-দ্বৈতিক, ১০৪০ ও বর্তমান ১০৪৪ সালের হত্যাকাণ্ড, অমিকাগু-জাগতিক ও সূর্যকণ্ড এবং বাতুভূমির অক্ষয় এই লীলার অতিব্যক্তি। এ লীলার শেষ নাই। তারতের আকাশে নমির পূর্ববৃষ্টি বর্তমান। এ বৎসরও সর্জন না হউক, হানে হানে, শতহানি, খাতাতাব, মহামারী, বন্যা, বাত্যা ও ভূমিকম্প ঘটবে। দাঙ্গা-হাঙ্গামা নিত্য ঘটনা। গত বৎসর মহামারী আসিয়াছিলেন নৌকার, পৃথিবীকে জলমগ্নতা করিয়া, গিরাছিলেন ঘোটকে, হস্তদেহের ব্যবস্থা করিয়া। এ বৎসর মহামারী আসিতেছেন ঘোটকে, এবং বাইবেন দোলায়, অর্থাৎ মড়কের দৃষ্টি করিয়া। কতদিনে তারতের ভাগ্যাকাশে শুভগ্রহের উদয় হইবে, এবং হিংসা-যেধের পরিবর্তে শান্ত ও যৈয়ী সংস্থাপিত হইবে, তাহা মহামারীই জানেন। তিনি অযতন-ঘটন পটায়নী, কিছু মনঃসংহী। অধম সত্যানের প্রতি জননীর ভায় তাহার অজ্ঞান বক্ষণ। তিনি যেখন কঠোর, তেমনি কোমল। তাহার হাতে যেখন বজ্র, তুণাণ, তেমনি বর ও অচর। শরণাগতের তিনি শ্রেষ্ঠ শরণ।

আমরা তাহার পূজা-অর্চনা ও জব-জতি করি তাহাকে তুষ্ট করিয়া ইষ্ট ও সিদ্ধি লাভ করিবার নিমিত্ত, অর্থাৎ আমাদের সাংসারিক কামনা-বাগনা পূরণ কবিবার উদ্দেশ্যে। আমরা গৃহী, সুতরাং কামনা-বাগনা আমাদের স্বভাব-জলত। ঐহারা নিত্যমতাবে রাজ্য তাহাকে লাভ করিবার নিমিত্ত আরাধনা করেন, তাহারা তাহাকে লাভ করিয়া মুক্তি ও যৌক লাভ করেন। রাজ্য স্রবণ তাহার অর্চনা করিয়া হস্তারাজ্য লাভ করিয়াছিলেন, আর বৈজ্ঞান্য সমাধি মুক্তিসাভ্য করিয়াছিলেন। তিনি সর্বাঙ্গীণ্ড এতাদিনী কিং তাহার তুণালাভের যোগ্যতা অর্জন করিতে হইবে। এই যোগ্যতা অর্জন করিতে হস্ততি ও সাধনার প্রয়োজন। সাধনা ব্যাধি মুক্তি অর্জন করিলে সিদ্ধিসাভ্য খটে। পূজার দ্বা উদ্দেশ্য চিত্তচর্চ। অকপটে অভয়



অনিষ্ট চিন্তা না কৰিয়া, নিজের শক্তি ও সাধৰ্ম্মাভুযাৰী  
অতীষ্ট কাননা কৰিলে সিদ্ধি লাভ হয়। বনভানৱী  
হইলেনও, বহানামা তোমাদের কষ্টভুক্ত নহেন এবং  
কাহাকেও অস্তায় কিংবা অসম্মত কিছু দিতে পাবেন না।  
তিনি নিৰপেক্ষ। তাহার বাহা বৰ্ণাৰ্ণ্য প্রাপ্য, তাহাট  
তাহাকে প্রধান করেন; বেকাভুযাৰী কাহাকেও অধিক  
কাহাকেও কম দিতে পাবেন না। সকলেই স্ব-ব  
কৰ্ম্মাভুযাৰী ফল প্রাপ্ত হয়। তাহার বিচাৰের তৌল-  
সত্ত্বের ভাবেকল্প বৰ্ণে প্রতিষ্ঠিত এবং তাহার দুটো পাল-  
ভায় ও নিষ্ঠায় বিলুত। অতএব বিতুষ্ট চিত্তে অকলট  
ভাবে সম্মত আৰ্হনা আনাইলে এবং তদুপযোগী সাধনা  
কৰিলে, সিদ্ধি অবগ্ৰজ্ঞাৰ। তিনি বাহাৰম্মতক। বন  
তিনি আমাদের কোন আন্তরিক বাহা পূৰণ করেন না,  
তখন নিশ্চিত সিদ্ধান্ত কৰিতে হইবে, আমাদের কৰ্ম্ম ও  
বৰ্ণে কোনও ক্রটি আছে। তাহার বিচাৰের কোন ক্রটি  
নাই। নিরীহের নিধন ও নিৰ্ধাতন এবং দুৰ্ভক্তগাৱী  
জন্মও তাহার বিচাৰ-বিজ্ঞাটোৰ ফল নহে। স্ব-ব বুদ্ধি ও

কিৰেকাভুযাৰী বৰ্ণ ও বৰ্ণ সাধনের ফল। বাহাকে  
আমরা বলি প্রায়ত্ব বা প্রোক্তন।

অনিষ্টবিষ্টে মিত্রক জিহবং কৰ্ণকঃ কলম্। ঈতা

সকান বাক্তিৰ্ণের কৰ্ণের তিন প্রকাৰ ফল,—ইষ্ট,  
অনিষ্ট ও মিত্র। তত কৰ্ণের ফলে,—সুখ, শান্তি ও স্বৰ্ণ,  
অন্তত কৰ্ণের ফলে ওষ, দুৰ্দ্বা ও নরক এবং মিত্রকৰ্ণের  
ফলে সুখ ও দুঃখের সংমিশ্রণ। আমরা যে কখন সুখ  
এবং কখন দুঃখ পাই, তাহার কাৰণ আমরা: স্ফোর-বাহ্য  
নিৰ্জাহাৰ্ণ্যভাৱ এবং আৱ্য উত্তর প্রকাৰ কৰ্ম্ম কৰিতে  
বাধ্য হই। আমাদেরই কৰ্ম্মফলের তিন্ন তিন্ন অৱস্থায়  
তিন্ন তিন্ন ক্ষেত্রে মহানামা পূৰ্ণত বহৱাজী, অতৱাজী ও  
সংহাৱজী। সংহাৱও মুক্তিৰ নিমিত্ত। পরমাপত্ত  
হইলেই সুখ, শান্তি ও মুক্তি সুনিশ্চিত। মহানামাৰ ইহাই  
মহালীলা।

পরমাপত্তবীনাশপরিজ্ঞাপনগাহণে।

সৰ্গভাৱিহরে বেধি নাৱাৱণি নৱোহন্ত তে।

বেথিলায়—অকস্মাৎ কালের প্রোত সিন্ধত ব্যাপিগা প্রবলবেগে দুৰ্ভিত্তে—আমি ডোলায়  
চড়িয়া ভাগিয়া বাইতেছি। বেথিলায়—দমস্ত, অক্ল অকস্মাৎ, বাত্যাৱিষ্টত তৱসমূল সেই  
প্রোত—মধ্যে উচ্ছল নকস্ৰণ উল্ল হইতেছে, নিৰ্বিত্তে, আশাৰ উঠিতেছে। আমি নিতান্ত  
একা—একা বলিয়া ভয় কৰিতে লাগিল—নিতান্ত একা—বাক্‌হীন—‘মা! মা!’ বলিয়া  
ভাঙিতেছি। আমি এই কালসমুদ্রে বাত্‌সল্যানে আশিৱাছি। কোথা মা? কই আশাৰ মা?  
এ যোৰ কালসমুদ্রে কোথায় তুমি?

সুদমা স্বপীত বাজে কৰ্ণক, পৰিপূৰ্ণ হইল—কিৎগুলে প্রোতাকপোৱনৰং সোৱিতোচ্ছল  
আলোক বিকীৰ্ণ হইল—স্নিগ্ধ মন পবন হইল—সেই তৱসমূল জলগাণিৰ উপবে, হৃৎপ্রোত  
বেথিলায়—স্ববৰ্ণমিত্তা এই পশুৱীৰ নাৱণীয়া প্রোতমা। ফলে হালিত্তে, তামিত্তে, আলোক  
বিকীৰ্ণ কৰিতেছে।

এ বৃত্তি আম বেথিৰ না, কাল বেথিৰ না কিছ একদিন বেথিৰ—সেইৰ দ্বিপ্ৰুতা নানা-  
প্রোতপ্রোতানী পক্ষৱিধি বীৰোৱণীবিহাৱি শব্দে পশুী ভাৱাৱণী, বামে বিভা-বিজ্ঞানবাৱিধী  
সৱত্ৰী, দক্ষ বলৱণী কাৰ্খিক, কাৰ্খিকিৱিধী পৰণ।

—বক্তব্য

# এই তো জীবন

অধ্যাপক ত্রিভাণ্ডার সান্যাল



এই তো জীবন,—  
 এক প্রান্তে ভক্ত বার—আর প্রান্তে হীড়ারে মরণ !  
 কে তুমি তবও বৃদ্ধ, কিসের লাগিয়া  
 দুদিন থাকিয়া যেবা কোথা যেতা যাই হারায়ে ?  
 তে তুমি জানিতে চাও—এ দৃষ্টির গোপন ব্যর্থতা—  
 অতঃপর কথা ?  
 অণু হস্তে অশীতল ওগো শশীকান্দিনী,  
 আপনারে নাহি তুমি জানো একতিল !  
 হাত,  
 কে কহিবে এ বিবর্ত রহস্ত তোমার ?  
 নির্ভিকার জটীর মতন  
 শেষ চাহি, জীবনের এই প্রহসন,—  
 আর সারাবেলা  
 সর্বনাশা ভাঙ্গাপড়া বেলা !  
 ইচ্ছা ?—সে যে পো কহু কহেনাচো কথা !  
 মুখ এ দৃষ্টির নীরবতা  
 তাতে নিতি রেখেছে আবারি'  
 দুঃ দুঃ বরি' !  
 কেন তবে রথা আত্মলতা—  
 আর চকলতা ?  
 কেহ নাহি জানে  
 লক্ষকোটি দৌর অগতির মস্তথানে  
 কেবা আমি  
 কেবা তুমি ?  
 যে শুনিবে জন্মন তোমার ?  
 কার কাছে কর হাছাকার ?  
 আরোপিয়া স্বকপোদ-কল্পিত বহিষা—  
 নাহি দার সীমা,  
 এ জীবনে তাহা তুমি হৃদয় মহান !  
 এর অতঃপর  
 গায় বাতা মহানন্দে  
 নানাদৃশে,—  
 তারা যে দাস্তব !

কল্পনার রত্নিন ফাহুব  
 যদিও উড়ার গুহা—  
 উচ্চতম ভাবলোকে বসি' আশ্চর্য্যহারা,  
 পঙ্কজের পঙ্কজতলে  
 গলে গলে  
 অহোর-আনন্দসুখ ভাবের ডানিছে !  
 তবে কেন মিছে  
 চিরকাল  
 শূন্যগর্ভ বাক্যজাল  
 রচি' শুধু সখতনে আশ্বাশ্বকনা ?  
 হুঃখশোক, মেহের দ্রুগা  
 যত কিছু নির্যাতনতার—  
 কিছু হ'তে একতিল নাহিক নিস্তার !  
 এই তো জীবন,  
 প্রেমে যেথা কৃত্যুতার ভাগে অলঙ্কণ !  
 যেখার যৌবন,—  
 কণ-শীতলান,—যেন নিশীথ-স্বপন !  
 যেথা ক্লাস্ত ভ্রমের এতটুকু নাহিক বিশ্রাম,—  
 নাহি তৃপ্তি—নাহিক আরাম !  
 অথ ?—সে তো বাতা-বহীতিকা !  
 বাহুবের তপ্ততালে দীপ্ত অরটীকা  
 হুঃখ-দেবতার—  
 ছল-ভরা দার ব্যবহার ;  
 যে আলো প্রজ্বল করি' হাতে নরদলবার মতন,  
 তার পরে মুহূর্তেই করে পলায়ন  
 নরন বাহিরা—  
 মন অকুসিয়া ;  
 যে শুধু কেবল  
 অবিরল  
 এক হুঃখ হ'তে দার আর হুঃখে নিরা—  
 অনাগত যিবনের তরে আশানিয়া।  
 এই তো জীবন,—  
 যারে শুধু পরিচাল্য করিছে মরণ !



—ইন্ডিয়ান নাথ পাবলিশার্স—

অহরকে দেখলে ছুঁব হুঁব' অভাবের সত্যিনাম।  
বিনরাত তার নিশ্বাস কেসবার সময় নেই।  
যত করে কিছুতেই যেন আর কুলোয় না। রাক্ষসের মত  
সংসারটা যেন হা করেই আছে, যত পাও পেট  
কখনই।

পেজারী জগৎ! উদ্বিগ্ন অস্ত খাটতে খাটতে বিপাকের  
হুঁচকি যায়। কি করে যে সংসারের অভাব অনটন  
বুড়িয়ে আবার বজ্রলতার মুখ দেখবে ভেবে পার না।  
হুঁচকি শব্দ জিনিসপত্রের যা দাম ছিল এখন তার চেয়ে  
চতুর্গুণ বেড়েছে, অথচ হুঁচকি বজ্র যে অতিরিক্ত নাহিনাট  
পেতো তা গেছে বন্ধ হয়ে, হুঁচকি বেয়েছে বসে। কাজেই  
বাজুতি আদ্য কিছু না করলে সংসার চলে কি করে?  
অহরকে তাই অনেক রকম উদ্ধৃতিই অবলম্বন করতে হয়।

তোরবেলা উঠে আগে মানটা পেয়ে নিয়ে বাকারে  
চলে যায়। তারপর বাজারটা ফেলে বেবে ভাতাকান্ড  
যদিলিয়ে কালঘণ্টের ছোট্ট একটা ব্যাগ হাতে করে

'হোমিওপ্যাথিক' ভাড়াটা করবে বেগের। এক আনার  
এক বোড়া শুধু। ব্যাগ অকলে ছোটখার ভাতা করে  
প্রাতে এক হাতবাচিকিৎসালয় গুলে দিয়েছে  
দাঁড়াবানেক ভাকারী করবার পর অহর সোজা চলে যায়  
নারকেলভান্ডার ছেলে পড়াতে। ছুঁটো ছেলেকে পড়িয়ে  
সেখানেই সকালের পাওয়াটা পেয়ে নেয়। বেলোবস্তি  
এ এইভাবেই নিজে করে নিয়েছে সময় বাঁচাবার ভাঙে।  
একবেলা 'বাগ' ও 'পাচটাকা' নাহিনা পাও সেখানে।  
অফিস পর্যন্ত বাসভাড়া দিয়েও কিছু বাঁচো। আবার  
অফিসের ছুটির পর একঘণ্টা করে একটা জুতার শোকান  
'করসুপন্ডেন্ট ক্লাব'এর কাল করে সকালপর বাগবাঁচাবে  
যার পুলিশবাহুর বড় মেয়েকে হুঁচকি ও হিট পড়াতে  
পুলিশবাহু অহরকেই ডিপার্টমেন্টে কাল করেন, বৃহৎ  
লোক, তিনটা বিবাহযোগ্য বড়, কিছু কাকেরই দিয়ে  
দিতে পারেননি। তিন জনেই ফলে পড়ে। বড়টা সাবনের  
বছরে ম্যাটিক সেবে কিছু এবারে ইংরাজী ও হিটতে

ফেলু করছে বলে হেডমিস্ট্রেস প্রথমটা ক্রাশে তুলতে চাননি ; তারপর পুলিন্দাখু নিজে কুলে দিয়ে বাটার রেখে ভাল ক'রে পড়াবেন আশা দেওয়াতে তবে প্রবেশন দিয়েছেন। তাই পুলিন্দাখুর অগ্রগোথে নাক্স আউটাকার জ্বর এই টুইশানীটা করে। কি করবে সে। কুড় ভক্তলোক যদি তার হাতটা ধরে বলেন যে, আমার অবস্থার কিছুই ত তোমার জানতে থাকী নেই, তুমি যদি একটু চাঃ ক'রে মেরটাকে অন্ততঃ একটা পাশ করিরে হাত ত, ওব একটা ভাল জায়গায় দিয়ে হয়ে যাব ; তা হ'লে সহকর্মীর সে অনুগ্রহে প্রস্তাভ্যান করা কি সহজ ব্যাপার। তবুও জ্বর যথোপযুক্ত বিনয়ের সঙ্গে বলতো, আমার বা অবস্থা তাও আপনি সবই জানেন, তা না হ'লে আপনার কাছ থেকে হাত পেতে এ টাকাটাও আবার নেওয়া উচিত নয়। পুলিন্দাখু এতে বেন আতো সজ্জিত হয়ে পড়তেন। বলতেন, ওকে নেওয়া হলো না, ও তোমার গাড়ী ত্যাগী ব্যবস্থার সাধ্যমত কিছু দিবেছি তাই।

কি যে বলেন! বলে জ্বর আরো সজ্জিত হতে।

দু'পুথবালাও অগ্নি থেকে জলবার নাম ক'রে বঁটাধামেকের ভয়ে রোজই জ্বর সবে পড়তো। এ অগ্নি, সে অগ্নি, ওপর নীচ ক'রে সে ইন্সিরোরেলের কাজ করতো। গোটা তিন চার কোম্পানীর একতলী সে বেনানীতে নিয়ে বেবেছিল। যখন যেটা কাজে লাগে। তাই কাউকে সিগারেট বাইরে, কাউকে পান বাইরে, কান্নর সঙ্গে বা ছুঁতে। অরীল ইয়াকী দিয়ে সে রোজই তার জীবন-নীবার ভাগাবাটা জীয়ে রাখতো।

কিন্তু এত করেও মাসে দু'শো টাকা আয় জ্বর করতে পারে না। প্রতিমাসেই কিছু না কিছু ব্যয়বাকী পড়ে যায়। মার্জেন্টে অগ্নিসের কোম্পানী—যদিও বি.এ, পাশ, তবুও মশ বন্দর চাকরী ক'রে এখনো একশো মশটাকা পূর্ণ হয় নি।

ক্রাশ বেহটাকে বিদ্যানায় এগিরে দিতে দিতে এক একদিন জ্বরের মনে দ্বিভার আসে, এত ক'রেও সংসার চালাবার মত টাকা সে উপার্জন করতে পারে না। তাঁর লেখাপড়া শিখ লাভ কি হলো, ভাল করে পাশ ক'রে ভাল অগ্নিসে চাকুরি করতে চুঁকে কি কল হলো, অথচ জীবনের শ্রেষ্ঠ মশটা বন্দর কেটে.এল। পাঁচটা ছেলেনেজে নিয়ে

কলকাতায় এই জ্বর কোম্পানীপাড়ার জ্বর গলির মধ্যে আলোবাতাসহীন দু'খানা ভাড়া ঘরে একতানে তার বিন কেটে গেল। চাকরীর পদোন্নতি হ'লো, বাইনে বাড়লো কিন্তু সেই দু'খান ঘর ছেড়ে তার চেয়েও ভালো ঘরে আর যাওয়া সম্ভব হলো না। প্রত্যেক বছরই জ্বর মনে করে সামনের বছর একটা ভালো বাড়ী দেখে উঠে যাবে, কিন্তু ভালবাড়ীর ভাল ভাড়া শুনে সে প্রতিবারেই শিহিরে আসে।

জ্বর আর ভাবতে পারে না। তার মাথা বেন উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস সে বুকের মধ্যে চেপে নেয়। তার চোখের সামনে ভেসে উঠে ছাত্র-জীবনের কথা। কুল কলেজে তার ভাল ছেলে বলে কত খ্যাতি, সকলের বিশ্বাস ছিল একদিন সে লেখাপড়া শিখে কত বড়লোক হবে। ভালভাবে সে বি, এ, পাশও করেছিল কিন্তু হঠাৎ বাবা মারা যাওয়ার আর পড়া সম্ভব হলো না, বাপের অগ্নিসেই চাকুরীতে ঢুকে পড়তে হলো।

ইংরেজী ও ইতিহাসে জ্বরের বরাবরই ছিল খুব জ্ঞান, কত বেডেল, কত আইক পেয়েছে সে কুলে ও কলেজে। সে-সব কথা মনে পড়ে আবার একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়লো। জ্বর ভাবে—অথচ তার সেই সব লেখাপড়ার সঙ্গে অগ্নিসের লেখাপড়ার কি পার্থক্য। তবু 'লেখার' বইয়ে বলে বলে দিনের পর দিন যোগ দিয়ে যাও।

এমনি এলোমেলো কহুজ্জির অনেক হাত পর্যন্ত তার চোখে ঘুস আসে না। কলেজের বিকে জ্বর দুখিরে পড়ে।

মদিনা ঘুস সাথটা দিয়ে বলে উঠে, কখন বাজারে যাবে—ভরটা, এখনো ঘুসডো যে বড়ো আজ—তার পর বেদার উঠে আবার ওপর কাল কাড়বে।

মরীচটা অত্যন্ত হাসকা ঠেকে, বিদ্যানা জেড়ে কিছুতে বেন আর উঠতে ইচ্ছা করে না, আবার পাশ দিয়ে গোধ জ্বর।

কতবেয়ে ডির এসে তাকে, বাহু ওঠানো শীপুদির কখন পাউলটি আনবে—বজ্র বিধে পেয়েছে যে। -

এইবার জ্বরমত ক'রে উঠে বলে জ্বর। মেবটা রগড়াক্তে রগড়াক্তে বেয়েকে বলে, এই বাজি মাশি

এখনি, ততক্ষণ যার কাছ থেকে দুটো নমুনা  
 চেয়ে নাও গে। মলিনা বাগ্ম্যেরে ধোয়ার মধ্যে  
 বলে পাখা দিয়ে উল্লসন ব্যস্ত কহতে কহতে আপন  
 মনেই গজ গজ করছিল। এমন কহণা আমার  
 চোখপূর্বে কেট কোনদিন যেখনি পোনেনি বাবা।  
 হাতের নড়া হিঁড়ে গেল বাতাস কহতে কহতে, তবুও  
 এখনো একটু আশ্রয় নেবা গেল না। এই আপবেদন যখন  
 যে কবে উঠবে জানি না। আচ্ছা, বেহে বেহে শুধা এই সব  
 জিনিস কোথার পাঠ? ভাল দেবে ত এখন কীকর যে কাব  
 সাধি। মুখে দেয়, তেল দেবে তার দুর্গন্ধে ভূত শাশা,  
 কহল। বেবে তা অগবে না।

চিহ্ন বাগ্ম্যেরে এসে বললে, বা, বাবা আমার লজ্জকণ  
 নিতে বললে। মলিনার বৈজ্ঞানিক একেই গরম হতেছিল, তার  
 ওপর যেন বাক্য নিশ্চয় কহলে চিহ্ন, তাই উত্তেজিতভাবে  
 বলে উঠলো, বাবার আর কি, বিদ্যানার তরে গড়ে  
 হুকুম হয়েই খালাস! আমি এইবার রোজগার করতে  
 বেরোই, তখন তিনি যা করুন করবেন তাই হবে।

অহর চেঁচিয়ে বললে, কেন? এই শু তিনদিন হগনি  
 কোথাটার পাউণ্ড এনেছি। মলিনা বলে, তা হলে আমি  
 খেয়েছি।

আমি কি তাই বলছি।

আবার কি করে বলবে? বলতে বলতে উত্তেজনার  
 মলিনার কর্ণের কাঁপতে থাকে। কোথাটার পাউণ্ড তিনি  
 কতটুকু তা বুঝি জানো—আর তোমার পাউণ্ড হেলেনের  
 তিনদিন হবে খেয়েছে—তাও বুঝি জানো—আবার তার  
 পর বুঝি হিসাব চাইছে—হিঃ! আমি তবু সবসময় হেলেন-  
 'সেয়েগোলাকে' মারধোর করি' বলে, তিনদিন চলে।  
 আর অম্বরের দুখ দিয়ে কথা খেয়োর না। হাতের নাকনটা  
 হাতে নিয়ে বাথরুমের দিকে যেতে যেতে ভাবে,  
 মসোড়ের সঙ্গে তার লম্বটো যেন কেবল টাকে। রোজগার  
 করবার একটা বেসিনের মত। শু খাওয়াতে পরাতে  
 হবে স্ত্রী-পুত্র-কতাদেব। একদিন বসে থাকলে গলে  
 না। কেউ জনবে না। তার স্ত্রীও বুঝবে না তার  
 মনের কথা, তবে সে কাকে বলবে? মলিনার ওপর তার  
 রীতিবৃত্ত রাগ হয়, অতিমান হয়।

কিন্তু একটু পরে আবার মলিনার দিকে তাকালেও  
 তার মনে কষ্ট হয়। এ কি সেই মলিনা! যিরে কাক  
 করে, হাঁদুনার কাক ত'রে, হেলেনেরেবের পরিচর্য।  
 করে, পরিভ্রান্ত, তত্ত্বাবধা, পুষ্টিকর বাস্তব অভাবে কল্প ও  
 ঈর্ষ্যের! এ কি সেই মলিনা! তার নোবে আর তার  
 এই অবস্থা! তহর আর তাগতে পারে না। অথচ একদিন  
 এই মলিনা ভগ্নে লাকণে যাবো আনন্দে বলল করতে।



সহর চেঁচিয়ে আর—কন? এই তো তিনদিন তরনি কোথাটার  
 পাউণ্ড এনেছি। মলিনা বঃ—তাকলে আমি খেয়েছি।

যেন ভাস্ত্র নালের তরা নদী প্রবহ ঘূর্ণের আলোর  
 কাঁপছে। এখন সে যেন গলে গড়িয়েছে। বাংলা  
 দেশের নদীগুলোর মতই বোঝ করি তার অবস্থা।  
 জল নেই, শু শুষ্কীপনার ঠাণ্ডা। এমন কি, বিশ্বাস  
 করা শক্ত যে, একদিন এই নদীর এত বিরুদ্ধ ছিল।

মলিনার সঙ্গে তার বিবাহের কাহিনী সেও বিচিত্র।  
 মলিনার একমাত্র কাননা ছিল তার সখী হলে শিক্ষিত,  
 হবে বিদ্বান! পাশাপাশি বাড়িতে গুণ্য বাক্যতো, অহরকে  
 দিনরাত লেখাপড়ার ভূবে থাকতে বেঁচে যেজায় সে তার  
 গলায় ঘিরেছিল থালা। একটা দীর্ঘনিশ্বাস অহরের মুকট  
 নিশ্চেষ্ট করে যেন খেরির এলো। সে অহরের হয়ে

অপদ্রুত! সংসারের প্রতিদিনের ভাল-ভাতের মধ্যে সব চাপা পড়ে গিয়েছে। আটের স্থান এই প্রাত্যহিক জীবন-সংগ্রামের মধ্যে বৃদ্ধি নেই। নিজের এই মানসিক পরিবর্তনের কথা ভেবে এক এক সময় চরম নিজেই অবাক হয়ে যায়। সে যে কোন কালে লেখাপড়া শিখেছিল আর যেন তাকে বেরলে আর মনেই হয় না। নিম্নতম স্তরের কেরানীর সঙ্গে তার আর কোন প্রভেদ নেই! তবু অর্থ উপার্জন করাই যেন এখন তার একমাত্র জীবনের কার্য! তা যেভাবেই হোক, সেখানে কোন নীতি, কোন ধর্ম, কোন মানসিক উৎকর্ষ, কোন বিকাশীকরণ স্থান নেই। কঠিনতম জীবন সংগ্রামের যেন এক রকম, এক পূজা! তাদের মনের চেহারা বৃদ্ধি সব এক।

অতীতের সেই সব কখনা-হঠাৎ দিনগুলির কথা তাববার ও বুঝবার তার আর অবকাশ নেই। গিড়নের নিকে তাকালে তার মনে হয়—যেন আর কোন লোকের জীবনেও আলোখা বহুবুর থেকে দেখেছে। কতক ভাবে, মাত্র দশটা বছরে এই সংসার!

কিন্তু মজুরের পরিপ্রবেশও একটা শীমা আছে। তাই একদিন হঠাৎ জহরের শরীর একেবারে ভেঙে পড়লো। অক্লিদের ডাক্তার বুক পিঠ পরীক্ষা করে বললে, বিশ্রাম নিতে এবং কল, চর্চ, মাগন প্রকৃতি ভাল ভাল পুষ্টিকর তিনিস বেতে। অতিরিক্ত পরিপ্রবেশ জীবনী-কিনন ক্ষয় হচ্ছে অত্যধিক। এগনি সাবধান না হ'লে ক্ষয়রোগ আক্রমণ করতে পারে শীর্ণগির।

করোয়! কথাটা উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে যেন জহরের বুকটা কেঁপে ওঠে! ভেলেমেয়েদের দুখগুলি আগে যেন চোপের সাবনে এসে দাঁড়ায়। তাদের তা হ'লে কি হবে? কে তাদের দেখবে। কোন সংস্থানই ত সে তাদের ভর্তুকি করে রেখে যেতে পারলে না। মাত্র দু'হাতার টাকার জীবনবীয়া আছে একটা। কিন্তু তাতে কি হবে। পাঁচ ডেলেরেই—জীবন আর মলিনার জীবন?

তিতাতিকে অত্যধিক ডুগিয়ে নের জহর। দশটা তার ভারী বাধ্য হয়ে গিয়েছিল। অক্লি থেকে ছুটি

নিরে, সমস্ত কাজ বন্ধ করে বাড়ীতে বসে বিশ্রাম নিলে খাবে কি—চলবে কি করে। আর নদীর যে তার ভেতরে তেতরে অত্যন্ত দূর্বল হয়ে পড়েছে—তাও বেশ অসুস্থ করতে পারে।

কি হবে। ক'দিন ধরে কেবল সেই কথাই চিন্তা করে। মলিনা তার গলার হারটা বাড়ীওয়ারীর দ্বায় কাছে বন্ধ দিয়ে টাকা এনে অহরকে দিয়ে বললে, কালই চলো আমরা বাইরে চলে যাই—কাছাকাছি কোন একটা শ্রমোক্তর স্থানে। বাড়ীওয়া বিবি কল্লিলেন—শিল্পতলা নাকি খুব ভাল আরণ্য, তার তথাপতির এই রকম হয়েছিল, ওখানে গিয়ে সেয়ে গিয়েছিল।

বেশ তাই চলো। বলে পরের দিনই তারা শিল্প তলার রওনা হলো। আরগাটা জহরের ভারী ভালো লাগল। চারিদিকে পাহাড়-ঘেরা গাছপালা, ফাঁকা মাঠ, বাগান-বাগিচা। অথচ সভ্যতার কোন চিহ্ন নেই। গাড়ী ঘোড়ার ঠেলাঠেলি নেই—বোটেরে ঘুরো নেই, লীচের রাস্তা নেই। বেশ লাগল জহরের, জ্বলর নরম ও ঠান্ডা আরগাটা। ফুল, লতার পাতার, গাছে-বাটে বরষার, নদীতে একেবারে অগমল করছে।

ঠেপন থেকে নেমে ডান দিকের রাস্তাটি দিয়ে এগিয়ে গিয়ে একটা বড় দীঘিতে মাল পল্লভুল ছুটে সরেছে দেখলে। সেখান থেকে আরো কয়েক গজ এগিয়ে যেতে একটা লাগার বোঝান। তার পস্তার দু'খানা ঘর-ভাঙার-ধারে ভাড়া বেহার বসে ছিল। ঘর দু'খানা একেবারে বোঝানের মতলয়। জহর পনেরো টাকার ঘর দু'খানা গড়া নিলে। সর্গ হলো তার বোঝান থেকে সব সওয়া নিতে হবে। হাতের কাছে সব পেয়ে বসে জহর বেঁচে গেল।

সকাল বিকাল জহর ছেলেমেয়েদের নিয়ে বেড়াতে বেরোয়। মলিনাও যায়। কলকাতায় সেই গলি থেকে এসে সে যেন বৃষ্টি পেয়েছে এখানে। ওই ঘুরে পাহাড়ের চূড়ার চূড়ার তার মন ছুটে ছুটে চলে।

ছেলেমেয়ে ওলো ইতিমধ্যেই কোন পাহাড়টার কি নাম চিনে কেলেছে। চিহ্ন শব্দ চলতে চলতে একটা ভাড়া পাহাড়ে বসে থেকে মলিনাকে

করে—বলো যেবি না, ওটা কি পাহাড়। মদিনার বন শুখন বৃষ্টি তার-সোখাঘো ছুঁব গেছে। তাই বিরক্তিতরা কঠে-বলে, হুপ কর হুঁবও যদি একটু শান্তিতে চলবার উপায় আছে। কেবল বছর বছর।

—এম্ম, হ্যাঁ—জানেন—না। আমি বলবো বড়দি ওটা কি পাহাড়? ওটা হলো লাটু পাহাড়। এই বলে বড় ছেলেরা যিদির কাছে তার জানের পৌরবট্টই আদায় করে নিয়ে সবে সবে দিঘিকে একটা পাহাড়-সেখির প্রশ্ন করে, ওটা কেন পাহাড়, বল দিকিনি?

দিকি বলে, ওটা চেষ্টা পাহাড়।

হুঁ। ওটা হলো নীলাবরণ।

আহা! ওটা বৃষ্টি নীলাবরণ। আজ্ঞা বাবাকে জিজ্ঞেস করছি। বলতে বলতে তারা শিহিরে আসে।

অহর ও মদিনা ততক্ষণ একটা বাগানের কটকে বসে পড়েছিল। অনেকটা পথ আজ হাঁটা হয়েছিল। তাদের সঙ্গে ছিল সর্বকনিষ্ঠ গুরু ছুঁটা। আজ বখন তারা হোয়ার তখনো লাটুপাহাড়ের দিকটার আকাশ লাল হয়নি। জোরের আকাশ-বে এক মুহুর তা এইখানে এসে প্রথম উপলব্ধি করলে অহর। কলকাতার তাজা-বাড়ীতে অহরকার গল্পের-মতো তার জীবনের অবিকার দিনট কেটেছে। তাই নিঃশ্বাসের সঙ্গে এখানে জোরের হাওয়ায় সে বেন একটা জীবনীশক্তি বুকের মধ্যে টেনে নেয়—বেশ বুকে-পাহাড়।

ছেলেদেরওলা ছুটে এসে পাহাড়ের নাবটা বখন অহরকে জিজ্ঞেস করছিল তখন একটা ছেলে সেই বাগানের মধ্যে কতকগুলো বড় বড় গোলাপ বেগুতে গেয়ে খোলা পেটটার মধ্যে দিয়ে ছুটে তেতরে গিয়ে দেখন একটা ছল তুলেছে, সঙ্গেসঙ্গে অহরও তার পেছনে পেছনে চীৎকার করতে করতে গিয়ে কানটা বরে গালে একটা চেষ্টা মেয়ে বললে—হায়াবজা, কতদিন বাগন করেছি যে গোখকে জিজ্ঞেস না করে কখনো কারো কাছে হাত দিখিনি।

ছেলেটা বাড়ী নীচু করে কি একটা অস্বাভাবিক বাজিল এখন সবার-পিছনে দিক থেকে একজন লোক বলে উঠলো, চিঃঃ ছেলেবাত্ত একটা ছল তুলেছে তার জন্তে কি

হাতে আছে? বলতে বলতে লোকটা আরো কাছে এগিয়ে এসে বললে, আরে এ যে অহর। তার মুখের দিকে নিশ্চয় দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে অহর বলে উঠলো, পথের তুই?



বা বা! ইহাওকি কবিস না ..... একটু তদ্বিষয় কবেছি.....

হ্যাঁ, আমি। চিনতে পারছিনা না?

কি করে চিনবে? তোরা খালি পা, বাগি পা, হাতে খুরপী, সারা বেছে বাজিমাথা। এই অবস্থায় তো তোকে দেখা কখনো সম্ভব ছিল না।

হো হো করে গগণে গ্রাণখোলা বসিষ্ট হাসি মেলে

উঠলো। তারপর হালি ধামডেই বললে, তুই এখানে কি বনে করে ?

অহর বললে, তেজে। আর তুই ?

আবার ঘোঁষা করে ছেলে উঠে গণেশ বললে, বেশে বুঝতে পারছিস না—এই বাগানের মালি !

বা-বা এইদারকি করিস না। বলে অহর আবার প্রশ্ন করলে, মতি! বলনা কি করিস এখানে ? গণেশ বললে, একটু জমজমা করেছি, তাই নিষেই থাকি। ভোমাদের মত অশিশের বাবু নই আমি, একেবারে চাষা বঁকে যলে।

গণেশ অহরের সঙ্গে এক কলমেই বহাঘর পড়েছিল। অহর যখন সন্ধানের সঙ্গে বি,এ, পাশ করে, ও তখন ফেলু ক'রে সেখাপড়া একেবারে ছেড়ে দিয়ে গছের খেঁচে চলে যায়। কোথায় বাগ, কেম যায়, তা কেউ জানতো না। তারপর এই দেখা দীর্ঘ মশবৎসর পরে।

অহর তাই মলিনাকে ডেকে গণেশের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিলে।

পরশুর সৌজন্যনিমিত্তের পর গণেশ অহরকে বললে—আজ আমার বাজী থেকে খেবে দেবে একেবারে সন্তোষবলায় তোরা সাগর যাবি, তারপর কাল সকালে আমি ছুঁটো লোক পাঠিয়ে দেবো, তারা রোদের সব জিনিষপত্র এখানে নিয়ে আসবে। তার পর মতদিন না তোরা শরীর বেশ ভালভাবে নিয়ে ততদিন তোরা আমার কাছে থাকবি।

সে কি ! না-না—তা হয় না তাই—বসতে বসতে কতজন্টার অহরের কণ্ঠ বেন অচিন্তিত হয়ে পড়লো। মলিনাও সেইসঙ্গে যোগ দিয়ে বললে, এতগুলো প্রাণি, আজকাল রেশনের বিন—না—না—সে—চর না—গণেশ-বাবু।

কেন হয় না ? বলে গণেশ একটা দমক দিলে। তারপর কণ্ঠঘটা একটু নরম ক'রে বললে, যদি বাকি আমি বেশনের দার বাকি না—তাহলে ত আপত্তি নেই ? তারপর অহরের বিবে কিয়ে বললে, জা ছাড়া, আমাকে এইভাবে পরীক্ষা প্রতিপর করলেও আমি রীতিমত অপমান বনে করি। বলে ঘোঁষা করে ছেলে উঠলো।

এইবার অহর পুনঃ প্রবেশ করে পড়লো। বললে না-না, তার ভয়ে নয়।

গণেশ দুখটা খাশালতব গাছের করতে করতে তার মুখের কথাটা কেড়ে নিয়ে বললে, মনে করেছিল যে, এ চাষাশাল ক'রে খাচি, আমাদের এত জনকে খাওয়াবার খরচ পাঁচ কোথায় ? অহর বললে, গণেশ, তুই সেই বকম একজুঁরে আছিস দেখছি। মুখলে মলিনা, ওর মাঝার যেটা চুকবে তম্মা কিছু নহেখব এলেও যেটা কেউ আর খাড়াতে পারবে না। গণেশ তখনো নিজের ভিত্তিতেই হুঁকি ছিল। তাই বলে উঠলো, এইবারে এই চাষার বাজীঘরগুলো একটু দেখবি চলে।

হিঃ। গণেশবাবু, আপনি কেবল কেবল নিজেকে যদি চাষা চাষা বলেন তাহ'লে কিছু এখনি আনরা চলে যাবে—বলে অহরযোগতরা হয়ে মলিনা তার মুখের দিকে চোখ তুলে তাকালো।

দেখুন না, রাব হয় না ? অহরকে ভালদলে বলে কলেকে নেন নেন দেখতার মত পুঙ্খ করতুম। ওর কাছ থেকে কত পড়া ভেনে নিয়েছি, ওর 'নেট' খুঁজ ক'রে বলতে গেলে যেটুকু সেখাপড়া নিষেছি। আজ মশ বছর পরে তাকে কাছে পেয়েছি, তা ছুঁটো চাপের জাত-ডাল খাওয়াবো, তাঁতেও সম্মেহ। আরে আমি না হয় চাকরী করি না, তা বলে—

আজ্ঞা—আজ্ঞা, হয়েচে, এমন চল তোর বাপান যেখি পে—। বলতে বলতে অহর এগিয়ে গেল। গণেশ তাদের নিয়ে বাগানের মধ্যে ঢুকলো। প্রকাণ্ড বাগান, চারিদিকে পাঁচাল দিয়ে ঘেরা, একদিকে সারি সারি কেবল আমের গাছ। তার পাশেই একটা মুরগীর নিগাট খোঁয়াড়। নানা রঙের সতেজ মোরগ-মুরগী খাড় নিরিয়ে তাদের দিকে তাকাতে লাগল। একপাশে তরিতরকারীর ক্ষেত—কপি, কড়াইগুটি, গাজর, বিট টোনাটো প্রভৃতি ঈদের হয়েক রকম ফসল তাতে ফলে রয়েছে। আশেপাশে ক্ষেতের মধ্যে কয়েকজন গাঁওতাল-বন্ধুই কাম করছে। বড় শনিবাধোনা কুয়া থেকে 'লাঠার সাহায্যে' মল তুলে কেউ বা গাছে গাছে দিচ্ছে।

আর একদারপার দিগে অহর তত্বিত হয়ে খেলু।



এত পেনে গাছ এক আয়নার সে কখনো দেখেনি। আর কি অপূর্ণ সূত! বেঁটে বেঁটে ছোট গাছগুলোতে অল্প পেনে ধরে রয়েছে, ছোট বড় নানা আকৃতির। তাদের কোন কোনটা লাউয়ের মত। এত বড় পেনে পাতে হয়ে থাকতে অহর কখনো দেখেনি।

মলিনা বললে, আচ্ছা গণেশবাবু, এত বড় পেনে ওইটুকু লক খোঁটা কি ক'রে থাকে, ভিড়ে পড়ে যায় না!

গণেশ একটু হেসে বললে, এইটুকুই ত প্রকৃতির রহস্য!

অহর ভিজেল করলে, এত পেনে তুই কি কবিসু?

গণেশ বললে, ওঠাই ত আমার লক্ষ্য। এক ছাফার গাছ আছে, লাব বহুরের সংসার-বরঙ এই পেনে থেকেই চলে যায়। তাছাড়া ঘুরকী আছে পাঁচশো—তারায় পড়ে বছরে বাছা বেঘ চারটে ক'রে। মানে হুঁহাকার। কাজেই ও হুঁহাকার টাকাত বহুরে বাঁধা আর। এও ওপরে একশো লাগড় বোঝাই আরের গাছ রয়েছে, তা থেকেও বছরে ছাফার টাকা বেশ আসে।

একটু চুপ ক'রে থেকে অহর বললে, হান জমিটনি কিছু কবেছিল?

গণেশ বললে, খুব সামান্য, মানে বড়টুকু আমার প্রয়োজন। মাত্র কুড়ি বিঘে জমি।

কত হান হয়?

সব বছর সমান হয় না। তবে গড়গড়তা দাঁড়ায় বিশেষিছু চার মণ করে অর্থাৎ বছরে আশী মণ হান। ও থেকে চাল পাই প্রায় পঁচাত্তর মণ।

অহর একটা দীর্ঘনিশ্বাস গোপন করে নির্বী ভিজেল করলে—কতদিন হলো তুই এখানে এসেছিসু?

গণেশ বললে, এই ভিলেজের আট বছর পূর্ণ হবে।

বোটে আট বছর। তার মধ্যে এত ক'রে কেসেছিসু?

আরে তখন এখানকার জমির কি দার ছিল। একশো টাকার ছিল বিঘে। তাও আমাদের মাপের ভিন গুণ অর্থাৎ এক বিঘার দার মিলে ভিন বিঘা পাওয়া যেতো। আমি হাওয়া বদলাতে এসে হঠাৎ হুঁশো টাকা খরচ ক'রে হুঁবিঘে জমি কিনি তারপর পেনে ও ঘুরকীর চাষ শুরু করে দেই। তারপর সেখতে সেখতে আজ এই

অবস্থায় এসে পৌঁছেছি। এই বলে একটু থেমে সে আবার বললে, এখনো ত তুই আমার সব বেশি নি, আগে দেখ, তারপর বলিস কি করেছিসু! আশ্চর্যসংসার তার খুব একটু বেন উদ্ভল হয়ে উঠলো।

কিন্তু এই পর্যায় দেখেই অহরের মাথা কিছুক্ষণ করছিল। তার প্রশ্নকটা অজবিক দু'বিঘে বেনার জন্ত প্রশ্ন করলে, গণেশ, তোর ছেলে ঘেঁরে ক'টা?

গণেশ প্রশ্নমতী একটু চুপ ক'রে রইল, তারপর একটু হেসে বললে সে কথা থাক, ভিজেল ক'রে আর কেন লক্ষ্য দিচ্ছ তাই!

কেন এতে লক্ষ্যার কি আছে!

গণেশ এইবার খাটটা নীচু ক'রে বললে, পাঁচটা বেঁধে।

অহর চমক উঠলো। পাঁচটা বেঁধে!

গণেশ লক্ষ লক্ষ বললে, তবে ওদের বিয়ের অজ্ঞে আমি ভাবি না তাই। পাঁচ জনের নামে পাঁচটা জমল কিনে বেখেছি। তাতে শাল, সেগুন আর মহারার গাছ না আছে তা থেকেই এক একটা বেঘে বেশ ভাল ভাবেই পার হয়ে যাবে। এক একটা মহা গাছ এ বেশে এক একটা সম্পত্তি! এ বেশে মহা থেকে গড় হয়, মর হয়, গরুর খাট হয়—তাই এই মহাগুলো অনেক নামে বিক্রী হয়। আট টাকা মণ পর্যন্ত বিক্রী করেছিসু গত বছর। আর এক একটা গাছে কম থেকে মণ বারো মণ পর্যন্ত মহা প্রাপ্তি বছর হয়। তাই'লে একটা গাছের আর বেখেই দু'বতে পারিসু ওই জমল থেকে কত আর?

এই সব আলোচনা করতে করতে ওরা একবারে গণেশের বাড়ীতে এসে হাজির হলো। বিনোদিত উত্তর উঁচু টালী সেওয়া বাতলো। মাঝখানে হল-ঘর, চারিপাশে ছোট ছোট শোবার ঘর। প্রত্যেকটা ঘর এমন কঠিনমত ভাবে সাজানো যে, সেবে অহর ও মলিনা হুঁতনেই গুপ্তিত! একটা ঘরে শুধু তালো 'তালে' বই, ইংরাজী বাংলা 'অসংক' 'অন্তি পরিচ্ছন্ন' ভাবে এটা সাজানো। চুকলেই লক্ষ্যে যেন মাথা নত হয়ে আসে, বেনে, হয় যেন কোন বিভ্রান্তিরেই চুকছে। আর একটা ঘরে হার-মোনিয়র, সেতার, প্রায়োফোন, ভাল ভাল সব ববীজ্ঞনাধের

গানের বেকর্ড, সমস্ত বসন্তা কার্ণেটে ঘোড়া। আর একটা ঘরে শুধু শিকারের আয়োজন বন্ধু, টোটা, বাক্স, বন্ধ, বর্ষা, ভীত-বন্ধু প্রভৃতি। বাঘের চামড়া, হরিণের হৃৎ, হরিণের সিং, হুন্সের ঘোড়া চামড়াটা একটা দেওরালে ঝাঙানো।

এই সব দেখতে দেখতে গণেশ ভরহকে বললে তুই থিলা কর—মাত্র তিনশে! টাকা নিয়ে আমি এই বাগলায় প্রথম নাবি। আর একটা পরদাও আমাকে কেউ কোনদিন দেয় নি। তা কিছু কবেই সব সেই তিনশে! টাকা হলেন থেকে।

ভরহের তান হুটো ঘেন আলা করতে থাকে। লেখা পড়া নিয়ে সে এতদিনে কি করেছে—সেই কথাটাই প্রতিদ্বন্দ্বিতা বেন তাকে অগ্নি করিয়ে দেয়।

আর মসিনা? তার বুঝে শু আর বাক্যসুপ্তি হচ্ছিল না। কলনার সে যেমন দাবীকে পছন্দ করতে গণেশের মতো সে যেন সব গুণগুলোই দেখতে পেল। তাই ভরহের ব্যর্থ জীবনের কথাটাই বোঝে কবি তখন তার মনকে আত্মকৃত্য করে রেখেছিল।

বেতে বসে, আয়োজনের আভাস দেখে ভরহ ও মসিনা আরো বিস্মিত হলো! পৃথকত প্রসারিত থেকে লুপ্ত করে, পৃথকত দি, ক্ষীণ, সন্দেশ, রসোপোষা পর্যন্ত। গণেশ হাসতে হাসতে বললে, তিনটে বহিষ ও পাঁচটা গাইগত তার। মোট দুই হর প্রতিদিন বনসের।

ভরহের মনে সন্তোষ এইবার উৎসাহের তাৎপর্য দিল। এই আলোব অভ্যাস, এই বাস্তবের প্রাচুর্য ও এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে রাজার মত যে বাণ করতে তাকে বেবে তার মত কোণার টিরা হওয়া সুই স্বাভাবিক। শুধু মুখেই সে তাৎপর্য গোপন করবার জন্য ক্ষীণের বাজিতে হুঁক মিতে মিতে সে প্রশ্ন করলে, হ্যাঁ গণেশ, তুই বিরোটা করেছিল কোবার বসিনা না ত?

সহ্যা গণেশের উৎসাহবোধ মুখটা বেন ব্রান হয়ে গেল।

ভরহ বললে, কি ব্যাপার?

সে থাক তাই, তুমি কি হবে।

ভরহ বললে, যদি আশঙ্কিত বা গোপনীয় কিছু ব্যাপার থাকে তা হ'লে থাক, তুমি চাই না।

সঙ্গে সঙ্গে গণেশের চোখ দুটো বন্দ, ক'রে এসে উঠলো। সে বললে, আশঙ্কিত আমার কিছুই নেই, বরং আছে তোমাদের।

কি রকম?

হ্যাঁ, গোমরাই অর্থাৎ লেখাপড়া জানা বাবুটাই একদিন আমার হাতে কেউ কস্তাহান করতে চাননি। যত বিয়ের সন্ধন হয়, সব ভেঙে যায় পাঁচ চাকরী করে না বলে। পাঁচ খে চাপবাস, ব্যবসা-বাণিজ্য করে তাতে নাকি নিকিত লোকদের জানাই বলে পরিচয় বেওয়া চলে না। কাজেই পাত্রী পাওয়া গেল না—

ভরহ অবৈধ্য হয়ে ওঠে তখনে তখনে। বলে তার পর?

গণেশ বলে, তার পর আর কি? আবারও মনে একটা ঘেরা হয়ে গেল, মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলুম বিয়ে করব না বলে।

এইভাবে বহন দিন কাটতে তখন হঠাৎ একদিন একটি মেয়ের সঙ্গে দেখা হলো একটি নির্জন বাটে। আরো দু'একদিন তাকে সেইখানে বেড়াতে দেখেছিলুম। তার মত সুবত্ত ও সুশ্রী মেয়েকে একা ওইভাবে বেড়াতে দেখে একদিন বহন তাকে বললুম তোমার মত মেয়ের পক্ষে এ কাজটা ঠিক হচ্ছে না, তখন সে খা বললে, তা তুমি আমার খুব দিবে আর কথা বোল না। আমি শুদ্ধিত হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে রইলুম। মেয়েটা বললে, ভাঙার বলেছে তার নাকি টিবি হয়েছে। তাই তার না-খাণ তাকে এখানে রেখে গেছেন বুড়ো ঠাকুরার ভরসায়। বুড়ো ঠাকুরার পারে বাত, তিনি বেশী চলা-ফেরা করতে পারেন না, অথচ ভাঙার তাকে রোগ ঠাকা হাওয়ায় খুব বেড়াতে খলচে, তাই সে একাই বেড়ায়। তার ছোঁয়াতে ভোগ বলে কেউ করে তার কাছে থাকতে চায় না, এখানে বেশী টাকা দিয়ে একটা কি রেখেছে, সে তার সেবাশ্রম করে বাত।

ভরহ বললে, তার পর?

গণেশ বললে, মেয়েটির কথা শুনে আমার মনে বড় দুঃখ হলো! শেষে একদিন মেয়েটা আমার কাছে কেঁপে কেঁপে বললে তারা সকলে আমার ত্যাগই করেছে—

আমি বলে বাবো—এ ভার্য্য সবাই বলে দিয়েছে। তখন থেকে আমি একটু একটু করে তার সেবার ভার নিজেই হাতে তুলে নিলুম। সেই পুরাতন বাড়ীটা থেকে তাকে সরিয়ে এনে নতুন একটা চালাঘর নিজে তৈরী করে দিয়ে নিজেই শুকানাবাসনে তার রাতরা-বাওরা, গুহ-পথের ব্যথা করতে লাগলুম। রোগ তাকে সঙ্গে করে নিয়ে বেড়াতে যেতুম—তোহেঁও সন্ধ্যায়। আমার গরুর বাটী ছাড়া নিজে হাতে করে তাকে পৌছে দিয়ে আসতুম।

আমিও। এক বছর পরে যোগ বলে কোনওদিন তার বেহে পাওয়া গেল না। বড় বড় ডাক্তারকে দিয়ে তার রক্ত পরীক্ষা করানুম, তার্য্য বললে, কোন রোগ নেই, সম্পূর্ণ স্বস্থ।

এই পর্য্যন্ত বলে দাঁড়াও গণেশ চূপ করে বেতেই অহর বলে উঠলো, তার পর কি হলো? মলিনাও কাছে বসে ছিল, তার বুখ-চোখ বেনে আগ্রহে ফেটে পড়ছিল। সেও বললে, তারপর কি হলো? বলুন না গণেশবাবু?

গণেশের স্ত্রী তখন অহরের পায়ে বসেছিল। নিজে সহসা কিরে গাড়ির কিং করে একটু হেসে বললে, কি আর হচ্ছে, গণেশবাবুর গলায় সে মালা দিলে।

অহর সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো, সত্যি?

মলিনা বললে, বলুন না গণেশবাবু, কি দি বা বললেন সত্যি?

গণেশ বললে, ঠ্যা সত্যি, তবে অত সহজে ব্যাপারটা হয়নি। অর্থাৎ অমুখ স্বখন ভাল হয়ে গেল, তখন তার খাপ-খা তাকে নিয়ে খাবার জেতে এলেন কিন্তু মেয়ে বেকে কাঁদলো। বললে, কিছুতেই বাবো না। যে আমার প্রাণ বাঁচিয়েছে এ প্রাণ তাকেই বেবো। কি নাটকীয় ব্যাপার? না? বলতে বলতে হো-হো-হো-হো করে প্রাণ খোলা হাসিতে গণেশ সেই ঘর বেনে আসিয়ে দিলে।

আজ্ঞা আর রহস্ত করতে হবে না। বলতে বলতে গণেশের স্ত্রী ঐকপনে সে স্থান ত্যাগ করলে। গণেশ আরো ছোঁয়ে হেসে উঠলো। অহর সেই সরল উদার ও বলিষ্ঠ শাখবটীর দিকে স্তম্ভভরে চেয়ে তখন কত কথা ভাবতে লাগল।

মলিনাও স্বস্থ। সেও বেনে কোন পতীর চিন্তায় মগ্ন! অকস্মাৎ সচেতন হয়ে গণেশ বললে, এই হলো চাষার কাছিনী, তুমি কি? এবার তোদেরটা শুনি বল।

তার্য্য কোন উত্তর না দিয়ে তেমন চূপ করে বসে ইইল। হো হো করে হেসে উঠে গণেশ আবার রক্ত করলে, তোদের হলো কি রে?

তারের তেমন নিরন্তর সেবে আবার সে হেসে-মাছবের মত প্রাণখোলা হাসি হেসে উঠলো।

## আমড়ার আবদার

ঐকুন্দরঞ্জন মল্লিক

যোরা বনশ্রুতি আদি ভরকিরে  
আছে আঁচি, আছে চামড়া—  
আম চেয়ে বল কি সে যোরা বীন?  
বক সেপের আমড়া।  
আবের মার দুইটা আবেল,  
যোনের আখর ডিনটা,  
কল-কাজের গাঝা না চট্টা  
বিকলেই বাবে বিনটা।  
বললেই চেয়ে কল বসলো কি?  
নাট না সন্ধ্যা ঘিট,  
আঁচি আর কঁাকা মাটির যোবেই  
হয়ে বাবো উৎকট।

চুত-মুন্দের গান গাহ কবি,  
শিক শেষ তার স্বভাব,  
আবেল চেয়ে যে আমড়ার সাথে  
অবিক পৌষা লভার।  
না খাঙ্ক ভগ, বন উন-মুণ  
না খাঙ্কক মধু পৌরত,  
টকে টকে বলে কয়েক কবি  
যোগাই সেপের গৌরব।  
আমড়ার চোঁকা বার্গে খেলত  
পাকের না বান ভাঙ্গত  
কিন্তু পাকের কৌশলের ভক্ত  
নাঞ্চ নাচারে আমতে।

## সাঁওতালদের ভগবৎকল্পনা



শ্রীচক্ৰপাল মুখোপাধ্যায়

সাঁওতালদের বিশ্বাস ধর্ম—এ পৃথিবী তুমি তবোঁতা'লেন ঠাকুর  
তাহারই অস্তিত্ব কেবলমাত্র তুলনা—আমাদের  
সাধারণ পুস্তকের মত "fairies"—প্রায় নিরুপস্থিত।  
বেলাতেই হ্রস্বমুণ্ডিত প্রসূত সাঁওতাল-ভাষিতবিশিষ্ট মনে করেন  
যে, একশ একটি নিউন এবং কল্পনা ও চাতিত মানসিক স্তরের  
পক্ষে স্থানান্তরিত নহে। অস্বভাব প্রবাসধানে অস্বাভাবিক  
সাঁওতালকে এ লব্ধে 'তত্ত্বাবধান' করিবার, কিন্তু এই আবিষ্কার  
সবকে তাড়াতাড়ি কোন সঙ্গী বাধ্য আছে কিনা বৃত্তি উদ্ভূত  
পারি নাই। অস্বস্তি সেখানে "ঠাকুর জিউ" "বহম" নামে  
আখ্যাত এবং আদিমাবৃত্তি তাহারই এই নামের অধিষ্ঠিত করে।  
মৃত্যু প্রাণের বৃত্তি প্রবান মনোবাস্তবিক আখ্যাত বস্তুসমূহ  
তাড়াতাড়ি মতে "বহম" এ পৃথিবীর অস্তিত্ব। অস্বভাব তাহার পূজা  
এই কিনা জানিতে পারিলে, তিনি বলেন, প্রত্যেক সাঁওতাল  
বিশ্বাসের সমস্ত "বহম"কে পৃথিবীর জল উৎসর্গ করা হয়। কেত  
কেত বস্তুসমূহ, "বহম" জগৎকে তুলনামূলক মত "একোবাঁচীতম",  
জাগ্রাত অস্বস্তি প্রায় সকলকে শিথিল সাঁওতাল। বাকী সকলকে  
"বহম" কেবলমাত্র কোন জল বস্তুসমূহকে পারিল না, অস্বস্তি কিনা  
প্রায় কল্পিত বস্তুসমূহ হইয়া তাহারই বস্তুসমূহ। এ বিধে বস্তু  
সলীলভাবে প্রবণ কণা বস্তু, তবুই প্রায়ই জটিল হইয়া ওঠে,  
কারণ হিন্দু-প্রভাবাধিত সাঁওতালগণ "বহম"-এর প্রায় আখ্যাত  
তুলনামূলক বাধ্য আখ্যাত করে ও বৃত্তিমূলক তাড়াতাড়ি বাঁচবলেন  
"পত"-এর বৃত্তিমূলক লেখ। তবে অস্বভাবের একটা বিশ্বাস  
কুটিল ওঠে—সাধারণ সাঁওতালগণ বহম বা ঠাকুর জিউ মত

বস্তু একটা বাধ্য আখ্যাত না। বৈদ্যবিশ্ব জীবনের প্রত্যেক  
তিনি অনেক উচ্চ, শব্দ বস্তুসমূহ—এই ভাল বাধ্যবস্তু। সাধারণ  
পুস্তকের মত মাজকাব, সাতের পাঁচ নাই।

প্রায় তাহাটী বীজাল মতের করেন যে, "ঠাকুর" বলিয়া একটা  
হিন্দু নাম সাঁওতালদের আদি বিশ্বাসের অস্বীকৃত কিনা। তাহার  
মতে এই সঙ্গীতমূলক বৃত্তিমূলক উৎস জল প্রবান ও আদি শ্রেষ্ঠতা  
কল্পনা পৃথিবী হুগের ভাষায় মতের প্রবণতাধীন মতের  
প্রতিষ্ঠা। অর্থাৎ "কালচার কন্ট্রোল" কল—হিন্দু সত্যতার  
পাশাপাশি থাকিয়া।

আগে অনেক আছেন, বীজাল সাঁওতালী বৃত্তি-আখ্যাতের  
"ঠাকুর জিউ" (নাথাকুরে "ঠাকুর" বা ঠাকুর বাধ্য) বা "বহম"  
(নাথাকুরে "বহম") সিংহোলারই অস্ত নাম বলিয়া মনে  
করেন। এই "সিংহোলার" সাঁওতালদের বৃত্তিমূলক। তাহার  
পূজা হয় প্রতি বস্তু বস্তুও পূজা। এখন, ইদনি "ঠাকুর জিউ"  
কল্পনার অস্ত নাম কিনা, এই প্রশ্নটি বস্তুই আসিয়া পড়ে।  
এই প্রশ্নকে সঙ্গীত ভাষাতারী বৃত্তি বা কোল-বোঙ্গা সঙ্গীতের  
ধিকে আখ্যাতের বৃত্তি আখ্যাত হয়। বৃত্তিমূলক হে, কোল-বোঙ্গা  
ইহাও ভাষাতে ভাষায় করা বলে, তাহারই মধ্যে "সবল  
বোঙ্গার উপরে কিন্তু একজন পূজা বোঙ্গা, প্রবান কেবল বা  
পূজাবস্তু আছেন, Singi-Bonga "সিঙি-বোঙ্গা," Sin-Bonga"  
"সিঙি-বোঙ্গা" বা Sing-Bonga "সিঙি-বোঙ্গা" ইহাকে আখ্যাত-  
ভাষা-ভাষার ভাষায় সাঁওতালগণ করেন করেন "ঠাকুর  
বাধ্য" বলিয়াও অভিহিত করে। (কোল জাতি সংস্কৃতি,

শ্রীকৃষ্ণ নন্দীকৃত্যাব চর্যাপাখ্যায়, বিধ-ভাবটী পত্রিকা, ৪ম বর্ষ, ২৪ দফা, ১০ পৃষ্ঠা)।

এ সম্বন্ধে নানানরূপ উপাচয় দেখিয়া যাহ, তত্ত্বাব্যে বীরভূত ও পাণ্ডবী কুটুম্বাব্যে কণা উল্লেখ করা যাইক। কণীর পথও চন্দ্র যাহ উভার "The Bhairava" গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "লিখিয়াছেন। অথবা ভগবান এই পৃথিবী সৃষ্টি করিলেন এবং যাহা যাহার চক্ষে উপস্থিত হইয়াছে তাহা লিখিলেন"। (বীরভূতের মতে সৃষ্টিতত্ত্ব, পৃ ৩০৭, অনুবাদ)। পাণ্ডবী কুটুম্বাব্যে বর্ণনায় বর্ণিত—ইনি বলিয়াছেন, —The paunis, unlike their more Primitive neighbours and congeners—the Juangs, have arrived at the conception of a purely beneficent Supreme deity called Dharan Deota, the great sun-god, the giver of light and life (page ২০৪, the Hill Bhuiyas of Orissa, S. C. Roy.)

এ পর্যন্ত আখ্যা বাগ্য উদ্ধৃত করিয়ায় তাগা হইতে পরিচয় যোকা যায় যে, "লিখ" যোগ্য" মনে যে করিয়া আছে তাগা কুটুম্বা, বীরভূত ও অজ্ঞাত কোল বা মুণ্ডা-গোষ্ঠীর মধ্যে "বহন," "ভগবান," ঠাকুর প্রভৃতি ধারণার নামান্তর মাত্র। কিন্তু শ্রীগোবিন্দেব সম্বন্ধে এই বিশেষণ অসঙ্গত লক্ষণীয় যে, পরমাত্মব্রহ্মা ঠাকুরজিউ-ব নামের প্রাণাংশাংশি আর একটি "লিখিয়াছেন" করিয়া তাগাব্যেব মধ্যে ভগ্নবিদ্যুৎ। ইনিই সেই সূর্য্যদেব, প্রাচীন পত্রিকায় (শ্রীগোবিন্দ পূরণ ও স্মৃতিকথা অনুসারে) আশ্রিত শ্রীগোবিন্দা যাহার বর্ণনা পান "লিখিয়াছেন।" এ বিশেষণে কেউনেউয় বিদ্যাবাদী যেভাবেও ক্ষেত্রসম্বন্ধ, লিখিত, ১৭৭০-১১ সালে শ্রীগোবিন্দ গুরু কৌশল্যান বর্ণিত, "গুরুকো-বন নামে-চাণ্ডালকো যেজাকৃ কণা" হইতে "বহন ও সেওয়া" (বর্গও দেখ) অর্থাৎ "ঠাকুর" বর্ণিত নিবন্ধ হইতে একটি অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি :—

"আমিকালে শ্রীগোবিন্দেব দেব-দেবতা কিছু ছিল না। পালিয়ে আসিতে আসিতে এ লং এন্ড পেয়েছে। পথে লিখিয়াছেন "লিখিয়াছেন"। অর্থাৎ সূর্য্যদেবেব নামাংশ পেয়েছে। প্রাচীনকালে কেবল এক ঈশ্বরকেই বিবাহ করত। উপবেশ্য পেরে ক্রমে ক্রমে তাগা ঠাকুরকে কুলেতে; এমন কেবল নামটি মাত্র অবশিষ্ট কণাও। আমিকালে অনেক নীচও কুলে পেছে, কেবল বেড়োয়া কণাও ও মুন্সীবেব কণার নামটা থাকে মনে মনে মনে মনে। আমিকালে অনেককে মনে মনে, "সূর্য্যদেবই আমাদের ঠাকুর, কেন না সূর্য ও বর্ষের অনুভবের সঙ্গে সঙ্গে সূর্য্যদেব আমাদের সৃষ্টিকর্তা হইবেন। কিন্তু প্রাচীনকালে কিংবা তাগাবৎ গুরু

এখনো বলে থাকে, "না, ঈশ্বর ঠিক নয়; পরদেবের একজন নিজের কাছেই; চর্য্যদেব ঠিক বোঝা যায় না, কিন্তু তিনি সব দেখতে পান। পৃথিবী, যোয, যাহন, প্রাণী, পাখী, পল্লীপিকা, মাগ, বিজা, যাক, ঠাকুর, মুন্সী, যাহ চান, যাহা, যাহা, তত্ত্বা যাহতীয় পথটি তিনি নিজে সৃষ্টি করিয়াছেন, সব পালন করছেন এবং ছোট বড় সকলকে পালন করছেন। তিনি যাহ এককালে সৃষ্টি করিয়া ও সংরক্ষণ। উপবেশ্য কিংবা মাগুয়েব খেলে সৃষ্টিও তাই নাই, সত্যও তাই নাই। পরদেবের সব মাগ যাক সৃষ্টি করিয়াছেন, সৃষ্টি দেব না হওয়া পর্যন্ত কালও দিনও তাই পায় না। এখনো আমরা সেই ভাবেই থাকি, বর্ণা শ্রীকৃষ্ণ আমরা সেইভাবে ঠাকুরের কাছে ভাল হই পাই।"

সূর্য্য দেবতা শ্রীগোবিন্দেব প্রধান উপাস্য দেবতা, তাঁহার রূপায় ভোগ্য হয়, সন্ধ্যা হয়, যৌত হয়, বৃষ্টি হয়; এতদ্ব্যতীত নামে বর্ণিতও কোটাই দেওয়া হয়। তিনি পুত্র, চান এবং স্ত্রী; আর আকাশের তাগা এতদ্ব্যতীত।

আমিকালে অনেকের ভুল করে যেমন সূর্য্যদেবকে পরদেব বলে, তেমন অজ্ঞাত উপবেশ্যকে ঠাকুর বলে উপাসনা করেন।" (শ্রীগোবিন্দী কথা, পৃ: ১৫২-৫৩, অনুবাদ শ্রীকৃষ্ণ জৈমিনী)।

ভারতীয় যে কোন বর্ণ-সংক্রান্ত সংস্থার পঞ্চাশাঙ্গের কথিত হইলে একই অংশে উপাস্য পাণ্ডব যাহ যে, নামান্তরে বিভিন্ন করিয়া করিয়া বা নামে দেব-কৌশলে বা আদিবাসীদের 'গোবা' ভূপে বিদ্যমান। ঐতিহাসিক ও স্মৃতিবিশিষ্ট এই তত্ত্বায় প্রবেশ করিয়া সূর্য্য বিজ্ঞে, "কালচর্য কল্যাণী" এর সন্নিবেশ বিজ্ঞে, নব নব ভগ্নাত্মেব ইতিহাসে এই মণা-বিনোদ উপর আলোকপাত করেন। জানা যখন বিচিত্র ইষ্টায় যেদি, ভারতীয় সভ্যতার এক অপূর্ণ সময়। এই তত্ত্ব-বিবর্তনের ইতিহাসে বেশা হাইবে আদিবাসীরা প্রাগ্-ঐতিহাসিক যুগ হইতে একটা বিশিষ্ট ভূমি ধরা বহন করিয়া চলিয়াছে, তাগাব সঙ্গে ভারতীয় চিন্তা-সভ্যতার ক্রমাগত আশ্রয়-প্রদান চলিয়াছে। "ঠাকুরজিউ-ত" "লিখ-যোগ্য"র নামান্তর কিনা, ঈশ্বর নিয়মকর্তার থাক। লভ্য—প্রাণবন্ত বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি সৃষ্টি ভাবাবিক। আমাদের উদ্বেগ—পাঠকের কাছে বিশ্ব রত্ন সমাধান, বর্ণ-সংক্রান্ত সংস্থার শ্রীগোবিন্দেব অবগতের আলোচনা করা। এই প্রসঙ্গে তাগাবৎ 'ঠাকুর জিউ'র বহনায় আমরা এমন একটি বিশেষণের সাক্ষ্য পাইলাম, তাগাব উদ্বেগে যে কোন ভাষণে প্রণতি ভাষাতে পান।

উপস্থানে একটি কথা রচনা আবৃত্ত্য হইবে না। সুতরাং  
এখানে কালে একটি দিকিৎ সীতালসে বৃক লেখককে ঐ  
কথিয়াছিলেন, “আমাদের সত্যকথের কোন বর্ণ আছে কি ?  
এ ত’ ভূত-প্রেরণ পুত্র।” আমি প্রেরণ বিমিত হই নাই।  
কথন, ভিজ্ঞাপ্ত বৃক-বৃগুভের অজ্ঞাত আবিধানী, অমুনা টাকের  
শিক্ষিত। তাহার অম্বা প্রতিকৃতি দেখিলান আমাকে, ঐশ্বর  
কথিয়া উনকিৎ পতালীক, জিরোজিকানিক, দ্বীপ মিশনারী-  
পরিবৃত্ত—“ইং-বঙ্গলসে”। সীতালসে ভূত ভাইনে বৈশ্য  
কবে, বোনা (অপবিত্র) পুত্রাই তাহার একমাত্র বই—  
অর্থাৎ আবিধানীকে যে কোন সংস্কৃতি বা সত্যতা আছে,  
তাঁহাি অতীতের কথা যেখানে স্বাভাবিক, সেই পৃথিব্যের  
যে বৃকভীর স্বাভাবিক কৃতি সমস্ত হীনমস্ততার মনস্তত্ব বোনা

কটিন মতে। বামসোহন, কেশব, বামভূক, বিবেকানন্দের  
কল্যাণে অমৃত্যুপ মনোভাব চইতে আশ্বাই লত-মুক্ত। এ  
প্রাণে আশ্বা সীতালসেও পঞ্চমধ্যমতুল্য “ঠাকুর জিউ”  
কথা মিথিয়াছি ও লতা করিয়াছি এ জাতির যতে তিনি বিব-  
প্রাট, পালনকর্তা ও ভাষা। তিনি সর্বপ্রধান বৈব-কল্পনা,  
ইংরেজ, ঐশ্বর এ বন-অগতের মানবল্য জীবার কাছে নিজেদের  
যাচার কথা নিবেদন করে ও সত্যাপ্রেরণ সন্ধান পায়। এতপ  
একটি কল্পনা বৈবকান সত্য-সত্যের মাছের উপযোগী এবং  
সীতালসেও হত সমস্ত মুক্তা জাতির সংস্কৃতির আলোচনা  
কথিলেও এই সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়। \*

\* লক্ষীন্দ্র—ঐহুত প্রনীতিসুখায় চৌপাধ্যায়, কোল জাতির  
সংস্কৃতি, বিব-ভালতী পরিকা, ৫ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা।

## জাগরণী

### ঐশ্রভাত বনু

দিগন্তে ওঠে মুক্তির রবি, রক্তে যে দোলা লাগে,

অনঙ্গপুত্রে এলো যে জোরার, বৌবন আজ আগে।

পত ব্রহ্মের জীর্ণ শিকল একদিনে আজ হরেছে বিকল,

জীবনের গান ওঠে চারিতিতে, আজি নব-অঙ্গুরাগে।

বন্ধন-বীন প্রথম প্রগাতে ভোম্বাঘের বোরা নহি,  
বায়া চলে গেছে বৃহা-কটিন মুক্তির পথ ব্রি।  
আগন বৃকের রক্ত ঢালিয়া মা'র দেউপের প্রৌণ মালিনা  
ভোম্বা হরেক্ত অবিনবর অমর হয়ে ব্রি।

ভিন হতা ঐ জাতীয় নিশান উজ্জ্বল গগনে ওড়ে,

নতুন দিনের আলোর বা কিছু পুরাতন বাক্য করে।

ভাঙনের পাশা শেষ হ'ল ব্রি, নব-সৃষ্টির পথ লব ব্রি

এ-অগ্নিহুতী হুগিব আবার হুগে ও কললে করে।

“ওই-জাতি” হব মুক্তে মিলাবে অমর তবিস্মৃতে

সেই আশা লয়ে এ-প্রগাতে মোরা নামিব কর্পপথে।

গায়া-মুক্তি-বৈবীষ্য বাদি বদ্ধ করিয়ে এই হানাহানি,

নূতন স্বর্গ সাগরি যে আজ অনঙ্গমন-ব্রহ্মে।



তর-তীর

শিল্পী—সুশ্রুত মল্লিক

## ঘাতক

### যতীন বেদন্ত

এক

চুপুর ঘাতের খবরটা খেয়ে গেল যেটি যেটা সহরে পড়ত থেকে। বাবানের শেষ প্রান্তে ঘূর্ণের পাঁচালি ট্রেস দিয়ে ঝাঁড়িয়ে একজন যুবক। ফাগুনী অকিলের কি যেন ভাবছে ভয়ঙ্কর করে। অস্বাভাবিক বই কি! শৈশবের অস্বাভাবিক জীবনে লম্বা কোথায় ভয়ঙ্কর। তা হ'লেও পানিপার্থিকতা ছিল অস্বাভাবিক।

শোন সেপের পবিত্রের নীল মাফানের নীচে ধাঁড়িয়ে দে ডাকিয়ে ছিল মন্ডরের দিকে আর টপেবে খোলাঘের আলোয় বেলা নীচের একে বৈকি ঘাওয়া প্রথম উপভাষাটির দিকে। আর একটু পরে এসে ফুলে ঢাকা কথামালেবুর বাধাটোতে ট্রেস নিয়ে প'খানের-কিট নীচে ও বেখতে পেরো নেভা সহর যেন আলব ডিমা। কথায় নিষ্কণ তাঁ' পাহাড়টার পায়ে ধরে ঘুরন্ত উত্তরে বাতাসের হাত খেতে বাঁচোবে মজা। 'আব গ্রিক এই পাহাড়টার পরেই চৈতী হচ্ছে নগরের ঘূর্ণ। পিছন কিবালেই চোখে পড়বে নগর—যেন কুতাপকে ঘিরে চকচক একটা ভগালি ফের।

Batza-on El Verdugo'র মতো।

আলো গ্রিকের শব্দে ঘূর্ণের ভাবনাগুলো দিয়ে। নাও-ঘরের ছায়াচিত্র আনন্দ, খোঁজার প্রথ আর অকিলের ও তারের বুড়া-পল্লীরেব কল-কাকালী ড্রেসে আসতে যুবকের কানে। তালপশ আঁতে আঁতে মিলে থাকে দুই সাপেরেব অস্বস্তি তরল-জমির সঙ্গে। বাড়ি যেন তারে ঈতল হাত বুদিয়ে ঘুর করে নিজে ওর শিবিরে তাপগ্রহিত পর্বতের গ্রানি। ও যেন অবসান কথায় বাবানের পুণ্ডি গাছ আর ফুলের তীর মধুর খেতে প্রবর্তিত ঈতল বাতাসে।

যেটা ঘূর্ণের নালিক ছিলেন একজন স্পেনীয় অভিবাস্ত। ঘূর্ণের ভিতরই বাস করেন তিনি পবিত্র নিয়ে। সমস্ত লজাটাই তাকে লক্ষ্য করছে এই পবিত্রাবের বড় ঘেরে—বেশ খানিকটা তেজস্কর নিয়ে। হঠাৎ বা সেই স্প্যানীশ ঘেরের চট্টল চাইনিই মাথা ঘুরিয়ে নিজেই এই ফাগুনী যুবকের। নিঃশব্দে হাঙ্গা প্রবর্তী। ভাই-বোনে ওয়া পাঁচটি। তা' হ'লেও শিল্পীরেব মাফু'ইসের বিপাক সম্পত্তির কথা বিবেচনা। কথল ওর ঘেরের ঘোঁড়ুট্টা হবে নিষ্কণই বেশ বড় বড়ের। কিন্তু কি বাস বাসে তারে তাকে। হাঙ্গা হচ্ছে শোনের সব চাইতে উগ্র অভিবাস্তের আধুর ঘেরে। আর সে কিনা ফাগুনী বেপের এক ঘুরীও হলে। তা'হাঙ্গা ওয়া গুণা করে ফাগুনীমাজকেই।

মাফু'ইস নালিক চোরা কংকন লম্বা কানিনায়েব পক্ষে শৈলক সংগ্রহ করত। তাই ভিতরক পাঠিয়েছেন প্রবেশে পাননকর্তা। নেওয়া তার 'পর লক্ষ্য রাখতে। এই তো সেদিন খবর পাঠিয়েছেন মার্গাল দী—ইয়েহেব নালিক শিল্পীরেব এসে মাফুরে তীরে। আর মাফু'ইস নালিক আলোচনা চালাচ্ছেন এ সবতে লঙ্কনের দার-সভার সঙ্গে। স্প্যানিয়ার্ডা' মাফুরে বহন করে নিজেই ভিতর-আব তার সৈন্যের। তা' হ'লেও তাকে কিন্তু বেশ লজা'র ঘুরী রাখতে হয়েছে চার দিকে। এই তো একটু আগেও সে ছায়ে ঝাঁড়িয়ে লক্ষ্য করছিল সত্যটিকে। কোথায় কোন চিহ্ন নেই পঙ্কগায়েব। লক্ষ্যেই বেশ শান্ত রয়েছে। মাফু'ইস নিজেও বেশ ভাল ব্যবহারই করেছে তার সাথে। ভিক্টর ভেবে পার না 'তবু কেন প্রধান সেমাপতি উবিব হচ্ছেন।

ঘুরুট্টা পরেই কিছু সে উত্তর করে উঠলো। চট্টাই জাং খোলা হলো অনেকগুলি আলো অস্বস্তি সহরে। আর অস্বস্তি সেটেক্ষমল জোঝানোয়। তা হ'লেও মাফু' ডোয়েই তো সে মাফুরে নিজেই নিখিট লম্বা পথে আলো বহন করত। খাঁটি-গুলি দিকে তাকিয়ে সে শান্ত খেতে গেল—তার শিল্পক পাণ্ডিত্যে। পেরনেটগুলি ককুমহানি। নগরের বৃক্ক কিছু খাৎ নিষ্কণতা।

তোবার কোন চিন্তা নেই উৎসব আরোহণের। অথচ তিন আটন  
অমৃত করা হয়েছে। তার ঘনে পড়লো, সে আশ্রয় কবেছিল  
তার অকিঞ্চিৎকর নগরও বুঝে পরাধীন বিচে। তারাত তেঁও তৈ  
কোন বিশেষটি দিয়ে গেল না। না, কেমন যেন হস্ততম্ব হয়ে  
উঠেছে বালাঘটা।

আরও উত্তমজ্ঞান পূর্বকোলের ভাঁক দিয়ে সে বেগে নেমে  
চললো পাঠাড়ে গা বেয়ে—সবচেয়ে প্রবেশদ্বারের উৎসব।  
চটাই কিত্ত খামচে হলো তাকে। বাগানের কতকর পথের  
পথে সে যেন গুমেতে গেল পাথর “বদ।” ছোঁলোকেব- পাথর  
পথের মতট দূর। মাঝে ফিহিয়ে কিত্ত কিছুই বেগতে গেল না  
সে। সন্তোষ অত্যাশ্চর্য আশোর দুর্ভিক্ষের জন্ত তার চোখে গেল  
যেঁবে। কিত্ত পর দুর্ভিক্ষে যে দূর তার চোখে পড়ল তাকে  
সে ভাঁকি হয়ে গেল। পাগল হয়ে গেল নাকি সে। চাঁদের  
আলোর তিস্ত হয়ে উঠেছে উজ্জ্বলিত। সেই আলোর সে  
পথিকার বেগতে গেলো অনেকগুলি আরাগের পাল। বুঝে,  
অনেক বুঝে কিত্ত দূরত্ব হঠাৎ নির্মিত। বিহাং বেলে গেল  
তার সমস্ত পতীরের মধ্যে। বিহাংকে বোকাতে চাইলে তার কুটী-  
বিহন হঠাৎ। চটাই করল সে কে যেন তাকে তাগে—চাঁপা  
কর্ণ পলায়। সজ্জিত হয়ে সে তাকালো হোলোকে কর্কর  
দিকে। আঙে আঙে বেহিয়ে এল একটু শৈশবিক বৃত্তি।  
ভিত্তি তাকে আশ্রয় কবেছিল তার সঙ্গে ঘুরে আসতে।

“আপনি কি সেনাপতি?”

“হ্যাঁ, কেন?”

“হস্তভাগ্য হল ললে বুঝে বেড়ায়ে নীচে। আপনায়  
আশ্রয়নয় আমি আমার পরায়েষণে বিশেষটি দিতে এসেছি।”  
“বলতে থাকো।”

“তর্প থেকে একটা সোবকে আমি অগ্রসর করি। একটা  
আলো নিয়ে এট বাজারট আদর্শিল সে। আলো দেখেই  
আমার লক্ষ্য হলো—নিম্বর ওয় মতলব রাখার। পিতৃ পিতৃ  
এসে দেখলো অসংখ্য নগল জটো করা রঙের এক জায়গার।  
আর একটু নাথিলে আশ্রয়িত বেগতে পারেন।”

নিম্বর মদীরে বুক হঠাৎ জেগে উঠলো আর্দ্র কোলাহল।  
এক কলক আলো এসে পড়লো বুক সেনাপতির মুখে উপর।  
পর দুর্ভিক্ষে মাঝার তলি লেগে হস্তভাগ্য শৈশবিক লুটেরে পড়লো  
পাথরের গা বেয়ে। অত্বে আঙন আলো উঠলো বাট বাট করে।  
নাচ-অবহ পান-বাসনা গেল বেয়ে। সন্তোষ বেগে প্রোথ  
হেয়ে হস্ত হলো কামান-পর্জন।

টু টু করে যান বরুণে বুক অকিঞ্চিৎকর কপাল দিয়ে।  
মূল করে সে ফেলে এসেছে তার তববারি। নিঃসংশয়ে তার লব  
শৈলটই এতকবে নিহত হয়েছ। একটু শব্দই তাঁরে এসে নাথবে  
ইচ্ছে লৈল। বেঁচে থাকলে তাকে চট্ট হয়ে অসম্মানিত।  
সে শব্দ বেগতে গেল তাকে কোটি মার্শাল করা হচ্ছে। দুর্ভিক্ষের  
জন্ত সে বেগে মিল নীচের উপত্যকার স্তম্ভিত। তারপর প্রোথ  
হলো লাফিয়ে পড়বার জন্য। দিক সেই দুর্ভিক্ষে রাখা এসে বলা  
তার চাত।

“পালাও, পলাও”—চাঁপা উত্তমজ্ঞান সে বললো “মাঝার  
চাঁপা আলোকে চোমায় মাঝরে। একটু নেমে গেলেই দেখতে  
পাথে পাঠাড়ের নীচে জুয়ানোর ঘোড়া বাঁধা আছে। বাও বাও,  
আর বেরী করে না”—সে তাকে ঠেলে মিল লামনের দিকে।  
অস্তিত্ত বুক কিত্তকণ তাকিয়ে হঠাৎ তার দিকে। কিত্ত বাঁচে  
হলে সত্যিই আর বেরী করা গেল না। তাড়াহাতি সে এগিয়ে  
চললো পাঠাড়ের গা বেয়ে। পাথর থেকে পাথর সে লাফিয়ে  
চললো। সবচেয়ে সারসীও ত্যাগ করতে পারে না প্রাণের ঘাটা—  
বাঁচবার ত্যাগ। সেখন থেকে সে গুমেতে গেল জাণে ডাকছে তার  
ভাইবের—তাকে অসুখণ করবার জন্ত। সে শব্দ গুমেতে গেল  
তত্যাচারীরে পাথর পদ। বাব বাব তলি বেহিয়ে গেল তার  
দু কণের পাশ দিয়ে। অবশেষে সে এসে পৌঁছল পাঠাড়ের  
নীচে। হ্যাঁ, সত্যিই ত একটা ঘোড়া বেগে দেখানে। বেরী না  
ক’রে ভিত্তি লাফিয়ে উঠলো তার পিঠে। তার পর তাকে লুটেরে  
মিল বিভাগগতিতে।

হুই

ঘটী কয়েক পূর্বে। ভিত্তি এসে উপস্থিত হলো প্রাণ  
সেনাপতির পিহিয়ে। মিলি তখন থেকে অসংখ্য সঙ্গতসীরে  
নিহে।

“আমার বীর্য আপনায় চাতে সমর্পণ করছি”—উৎসাহ-  
ভরে বলে উঠলো বেগায় সেনাপতি—যেন ওয় মতলব পলি,  
গেছে নিঃশব্দিত হয়ে। অবশেষে একটা চোমবে বলে গ’তে  
সে প্রাণ সেনাপতিক কানালো তার নিহাংকণ ব্যর্থভাবে  
কাহিনী।

ভয়ানক স্মার্তি নিয়ে জেনারেল শুক্লেন তার বিবরণ।  
অবশেষে স্বতন্ত্র ভর ক’রে বললেন—“কৃপার পাত্র হুই।  
তোমাকে লাকী করা বার না—স্মার্তিবীরের অপধারের জন্ত।  
মার্শালের অমত না হলে হুই মুক্তি পাবে।”



যেহা হুখক কিছু কিংবদন্তি ভাঙ্গা পেল না এ কথাই। কলম  
কঠে লেখলো—“সিদ্ধান্ত, যখন ভাববেন তখন?”

“তখন? তখন তোমার ভক্তি করতে হবেই”—উপাসীন-  
তাই উত্তর কলমের জেনাবেল। তারপর পক্ষীয় ক’রে বললেন,  
“সে যা হোক তখন লেখা যাবে। এখন আরও বিস্তার কোন কথা  
না। এখন আমি চাই শুধু প্রতিশোধ। এই অসহ্য ‘স্যানিটারি-  
কলোকে আমি এমন পিকা শেষ যে ওয়া ভীষ্মের মূলবে না।”

এক ঘটনা পূর্ব। একটা সমগ্র হাতিমী এগিয়ে চলছে।  
অস্বাভাবী, পদাতিক, কামানের লাবি চলছে তো চলছেই।  
সকলের আগে ফোহেন—জেনাবেল আর ভিক্টর। সৈন্যদের বলা  
মধ্যেই তাদের সর্বোত্তম অগ্রগতি কথা। ওয়া বাগে ফুলছে। অস্বস্ত  
হকম ভাড়াভাড়া কুটির এল যেটার শব্দ। চলার পথে প্রাথমিক  
শব্দ প্রায় ধ্বংস ক’রে হত্যা করা হলো—প্রত্যেক বন্দ  
যান্ত্রিক।

যেহাও শীঘ্রই দেখা পেল ইংরেজ কামানগুলি তখনও  
ফাল্গুনে দুই সমুদ্রে। না-জানা কোন কারণে তখনও এসে  
পৌঁছতে পারেনি তাঁরা। শুধু তরেকখানা কামানবাতি তাতাক  
মোলা ছুঁতে খেঁচে এগিয়ে এসে। প্রতিজ্ঞিত সাগরে বকিত  
অসহ্য মেঘের অধিগামীরা দুই কণা পুকেই পড়লো ঘেঁষাও  
হয়ে। লাক্ষণের পেরে পেরে লবায় কলসী আত্মসমর্পণ। লবার  
জনেই জেনাবেলের সীমান্তীন নিউনতার কথা। হঠাৎ বা  
পুষ্টিয়েই যেমন সমগ্র লক্ষ্যবর্তক, না তরতা হত্যা করবন  
প্রত্যেক নাপতিককে। স্পষ্টক এ বিশব থেকে বীচাবার শুভ  
একে একে এসে বলা মিল কলসী সৈন্যদের সত্যিকারে  
হত্যাকারী।

জেনাবেল হুজুম করলেন যেহাওঁর মাছুঁরিসু শ্রেক আঘাত  
ক’রে তুতা পল্লভ লবায়কে ক’রে আনতে হবে তাঁর কাছে।  
চলিল কটোর মধ্যে পেরে ক’রে দিতে হবে প্রত্যেকের পাঠিকার  
জাহান্না। আঘ তাইই জাহিন তিগারে আটক থাকবে শেগর  
কড় বড় বনৌ।

জাহপার সৈন্যদের নিগাপ্তার সব বকম বাহবা ক’রে,—যে  
কোনও অস্বাভাবিক রকম তালেমক প্রস্তুত থাকতে হ’লে বিজ্ঞান  
বেশে তিনি চুকে পড়লেন গুপ্তের মধ্যে। সিসানীক-পরিবারের  
সকলের দুই বড় ক’রে বন্দী ক’রে বাধা হলো নাচ-কর। বাটী  
বললো কড়া পাঠার।

পরপর বাহাখার বসলো স্মরণ-সত্য, কি ক’রে বাধা কেঁচা  
হাথ ইংরেজদের অবতরণ। মার্শাল নী-ব কাছে বিদ্যে হুত

পাঠিয়ে যাবটা কথা হলো উপকূল বাহর কামনে বদায়ার।  
তারপর জেনাবেলেদ নজর পড়লো বন্দীদের উপর। কলসী  
সৈন্যদের হত্যার অপর্যবে যে দুপ’ লম ‘স্যানিটারি’ বলা  
নির্ভেদিল, তাইবৎকে কেটে ফেলা হঠেই তখন শুভমট। নাচ-  
করের বন্দীদের জন্য জেনাবেল তরুম গিলেন বহাযক ঠৈরী করতে।  
সঙ্গে সঙ্গে সবর বেগটা হলো যাতককে।

তিন

হুপুদের খাওয়া-পাওয়া শেষ হলেই। বিজ্ঞানের অবসরে ভিতর  
লেখা করলেন বন্দীদের সঙ্গে। ঈশ্বর সে কিংবদন্তি এল জেনাবেলের  
কাছে।

“আমি এসেছি একটা অসুস্থর তিকাক করতে।” লস্কোভের  
সে জাহান্না।

“তোমাকে অসুস্থর করতে হবে!”—বিকিরে উঠলেন  
জেনাবেল। তাঁর কঠে কটোর বিস্তার।

“গোপন্যতা খুবই কঠিন, তাই। মাছুঁরিসু কালীকান ঠৈরী  
হ’তে যেন অসুস্থর করে পাঠিয়েছেন—যেন তাঁর পরিবারের  
মেজবের পুরে বলা বেবানে: হত। ‘পরিষদে লুকব’ লবার  
প্রস্তুত থাকবে মাঝ দিতে।”

“তাই হবে”—নিশ্চয় তাইবৎ করতে করলেন জেনাবেল।

“তার একটা অসুস্থর কামিয়েছেন তিনি। লবার সমগ্র  
কালের যেন শেষ বহাযুমান করত। সেওয়া দুই, আর বাধনগুলি  
মূলে বেওয়া হত। তাঁরা প্রতিজ্ঞিত বেহেছেন, পালাবার চেষ্টা  
ক’রেন না।”

“বেশ, তারও অসুস্থর তিগারে।” ভিত

হাকতে লব তাইবৎ প্রতিজ্ঞিত বকায় কড়।”

“আরও একটা আবেগন কামিয়েছেন দুই মাছুঁরিসু। তাঁর  
কনিষ্ঠপুত্রের জীবনের বিনিময়ে তিনি তাঁর বাহতীর বদসাম্পদ  
আপনাকে দিতে প্রস্তুত।”

“বটে, তাই নাকি,”—চীৎকার করে উঠলেন জেনাবেল,—  
“তার সমগ্র সম্পত্তিই বাজেয়াপ্ত হয়ে গেছে। বাধা জেনাবেলের  
মাঝে।” হুজুরের নিশ্চয়তা। আন্তে আন্তে জেনাবেলের কলম  
ছুটে উঠলো কয়েকটি বিস্তারের কথা। আপন মনেই তিনি  
বলতে লাগলেন “তাঁদের প্রাণিত অসুস্থরকে চেয়েও বেশী সিন  
আমি প্রস্তুত। মাছুঁরিসুদের শেষ অসুস্থরের অর্থ আমি মুক্তকি।  
বিষায্যাকততার পাঠির জীবন্ত সাক্ষী হয়ে যেন তার একম  
হবে থাক—আমার আপত্তি নেই।”

অসিপর ভিত্তির বিদক তাকিরে বললেন, “দুশলে হোদুগ,

মাকু'ইসকে গিবে বলো—তাঁরা হেঁদেবের মধ্যে যে কেউ খাতকের কাজ করতে বাতী হয়ে, তাকে তার জীবন আর এমনশান্তি হুট-ই ফিরিয়ে দেওয়া হবে।—বাম, বাম। আর কোনও কথা তখনই চাই না ওদের সবচে'।

গতির বাধার প্রস্তাব :

অকিঞ্চিৎকায় সব বলে গেছে খোলে। অতঃপরিত তু'ভিত্তিঃ। অনেক সন্ধ্যাকালের পর সে চললো মাঠঘরের দিকে। বাটীর থেকে সে ওনতে গেল গর্জিত সিঁধানীচ-পরিধায়ে লীধাসের নদ। বিস্তারবে সে তাকিয়ে হইলো সেই স্বাভাবিক সুস্তম্ব দিকে। মনে পড়লো কাল এই সময়ের কথা। অকৃত্রিম অকৃত্রিত নৃত্যসীতে চাপ-মাত্রে কাল ঘরা এই স্বরকে অব্যবহিত আমনোজ্ঞান, তাইই আবার আত্ম তত্ববালে অপেক্ষা করছে জগতের দুহা। কতটুকুই না আর সময়। ওসে তত্বও বাধাগুলি একে একে গুটিয়ে পড়বে খাতকের শান্তি বজায় আনাতে। তাবতেও শিউরে উঠলো ভিত্তিঃ।

নিষ্কল প্রতীকায়ও সত্যসুদৃষ্টি বোধ করছে তালেক পত্রের মধ্যে। ভিত্তিক আশ্রিতে লেখ তালেক চোখে চুটে উঠলো অশ্রুধিম্বা। সে এসে হঠাৎ মিল বন্দনের নৃত্য করতে। নিজেই সে মূল লি দ্রাব্যের বৈধন্য। দ্রাব্য গোল—অকৃত্রিম বৈধন্যের জালি। ভিত্তিরে তাই স্পন্দ করলো দ্রাব্যের বাত। স্প্যানীল মেয়ের কালো চুল আর সতীর চোখের দ্বারা তাকে নৃত্য করছে। “নাথল কিছুর করছে?” জান হেসে ভিজেন করলো দ্রাব্য। লীধাস কেনলো ভিত্তিঃ। নিষ্কল সে গাড়িতে বসল দ্রাব্য আর তার ভাটিতে দিক তাকিয়ে। বড় হেঁদেব বতল স্থিতি। বেটে আর অনেকটা বেন বৈদ্যাক্ষ: বৎসব চেতনা। চোখে মুখে উজ্জ্বল গর্জ। কিন্তু সব কিছু মিলে কেন্দ্র বেন একটা বৈশিষ্ট্য রয়েছে ওর। যেত রেলে কিসিগ—বড় কৃষ্ণ বৎস—সেপতে অনেকটা দ্রাব্যের বত। ছোট হেঁদে খাট বহুরের দ্বারা ছেলের চেতনার প্রকাশ পাচ্ছে বৈদ্যাক্ষের নৃত্য। দ্রাব্য চলে মাকু'ইসকে মনে হচ্ছে নাথিলের দ্বিধা বতই মসীমান। হতান ব'ল ভিত্তিঃ। না, বেশে কেউই দ্রাব্য বেন না তেনাথেলের কথা। তাইলেও একবার চোঁকা করতে হবে। দ্রাব্যকে সে চুলি চুলি জানালো বৈদ্যাক্ষের সন্তোষ কথা। বিস্তারের তবল হয়ে গেল স্প্যানীল মেয়ের মেহে।

কিন্তু সে শুধু দুহুর্ন্তের তত। পরম্পরই নিজেই লংঘন করে নিরে সে কিংবদন্তি হয়ে বসলো—তার বাধার পায়ের কাছে।

“দ্রাব্য, জ্ঞানাত্মক প্রতিজ্ঞা করতে বলুন যে, সে আপনাদের আশ্রয় পালন করবে। তাইইই আদ্যাত্ম সত্যই খুঁচী হবে।”

মাকু'ইস-পতীর মনে তেজা মিল কীধ আদ্য, কিন্তু দ্রাব্যের কাজ থেকে সত্য জানতে গেলে তিনি হয়ে পড়লেন দুর্ভিক্ষ। জ্ঞানাত্মক নৃত্যের পেছের সব। নিষ্কল আত্মকালে সে হুটকট করতে বসে নিজেই মত। সমস্ত প্রতীকায়ও বিস্তার করে মিল ভিত্তিঃ। শুধু নিজে ওঠলো বন পাঠ্যের দিকে।

আন্তে আন্তে উঠে ওঠলেন লিগানীকোর মাকু'ইস। পতীর কঠোর জাকলেন “জ্ঞানাত্মক।” দ্রাব্য নীচ করে হইলো জ্ঞানাত্মক। না, সে পাঠ্যের না। এক্ষিত গিবে দ্রাব্য বললো—তার হুটী পড়ে। হুটীতে গিবে জড়িয়ে হবে চুই খেলো তার চোখে। আত্মকালে শুধু বললো “জ্ঞানাত্মক, লক্ষ্যটি, তুমি তো জানো তোমার জাতে সত্য আদ্যাত্মক জানবে। খাতকের হাতের দ্বারা স্পন্দ থেকে, শুধু তুমিই পাথর দ্বারা বন্ধ করতে। লক্ষ্যটি, তুমি বন্ধ করতে না।” অলপ দুর্ভিক্ষে সে চাইলো ভিত্তিঃ দিকে। বেন সে জ্ঞানাত্মক মনে জড়িয়ে জুড়ে চাইছে কবী-বৈধন্য।

“তুমি তার পেলে আদ্যাত্মক জাতকীর বণে যে নিষ্কল হয়ে বার গলে”—কারণ অতঃপর জানালো কিসিগ।

চতুর্থী দ্রাব্য উঠে ওঠলো লাকিঃ। সবাই সবে গেল জ্ঞানাত্মক কাছ থেকে। নৃত্য শিশা এসে গাড়িয়েছেন বিস্তারী পুস্তক লক্ষ্যের।

“জ্ঞানাত্মক, আদি আশ্রয় কবহি”—প্রশ্নাত্মক দ্রাব্যের মধ্যে মাকু'ইস জানালেন তাঁর অজ্ঞান।

তবু কোন উত্তর এসে না জ্ঞানাত্মক কাছ থেকে। আন্তে আন্তে নরকাত্ম হলেন নৃত্য মিনতিঃ ভক্তীতে। দ্রাব্য, কিসিগ, মাকু'ইস একে একে সবাই অশ্রুধিম্বা করলো তাঁর গুস্তাঃ। করকোডে তারা তাকে অশ্রুধিম্বা জানালো চিরমিত্রঃ গাত থেকে তাদের পরিচালক বন্ধ। করতে। তবুও নিষ্কল হইলো জ্ঞানাত্মক।

“তুমি না একজন স্প্যানীলার্ড! কোথায় তোমার সে দ্রাব্য? তুমি কি নরকাত্ম করে বাধতে চাও আদ্যাত্ম? কি আদ্যাত্ম আন্তে তোমার নিজেব জীবন আর নিজেব কঠোর কথা জাবদ্য? সত্যই কি ও আদ্যাত্ম জ্বলে?” দ্রাব্য দিকে তাকিয়ে গর্জিয়ে উঠলো মাকু'ইস।

“ও দ্রাব্য হবে, দ্রাব্য হবে, আদি বলহি”—দ্রাব্য দ্বিধিত করে কবীগুলি দেখিয়ে এসে দ্রাব্যের দ্বিধ থেকে।

তিনি লক্ষ্য করছেন জ্ঞানোন্মত্ত কপালের স্বয়ং কৃত্য। না তিনি, লক্ষ্যেই কৃত্যে পাশ্চলেন সজ্ঞানের মনোভাব।

হিতীয় মধ্যে মাণিক্যইহা যাকে জড়িয়ে হবে কাঁচকে, আর সে জড় তাকে তির্য্যাক করে তাই ছোট তাই ম্যাক্‌য়েল। ঠিক সেই মুহূর্তে আর চুকলো সূর্যের পুরাবাসিত।

ভিত্তির আর সহ ভরতে পারছে না এই মধ্যাহ্নিক বৃত্ত। জ্ঞানীর উপশেষ কি একটা সংকেত করে সে ছুটে বেগিতে গেল ঘর থেকে। শেষ চেষ্টা করে দেখবে যদি কিছু করা যায়।

### পাঁচ

ভোর না হতেই ডেকে আনা হয়েছে একশ' জন প্রধান মাণিক্যকে লিঙ্গানীল-পরিধায়েই হস্তা প্রত্যাক করতে। তাঁদেরকে করতে দেওয়া হয়েছে সূর্যের বাধাখার। নীচে জনতার মধ্যে পাণ্ডিত্য করা হচ্ছে সৈন্তগণ। তাদের মাথা উপর বুলছে মাস্টার্সের ভূতাত্ত্বিক বৃত্তসংক্রান্ত—এই একটু আগে বাবে ভাঁসী হওয়া হয়েছে। একটু হয়ে হাড়িকাঠের পরে তখনই করতে খজ্ঞাখানা। পাশেই কাঁড়িয়ে রয়েছে বাতর, কি মানি হঠোতা য় শেষ পর্যন্ত অস্বীকারই করে বসে জ্ঞানো। পতীর নিস্তব্ধতা মধ্যে মাকে মাকে শোনা যাচ্ছে লজ্জায়ে বৃত্ত পঙ্কজ, আর ভোজনবস্ত অক্লিষায়েই উভয়সিধ পক্ষ।

সকলের সূচী পড়লো সূর্যের বিকে। নীচসকলকে বেঁধে আঁকছেন মাস্টার্সের পরিচালনা। বৃত্তার মুখে কাঁড়িয়ে কোথ পেলো ভাগ এই অবিখ্যাত বৈদ্য। প্রত্যেকের মুখে ফুটে উঠেছে পতীর প্রণতি। কেবল একজনই যেন কেমন উদ্ভ্রাণ্ড, অবগত। পুণ্যহিতের কাঁবে ভর দিয়ে সে আসছে। তাকেই ওই বেঁচে থাকতে হবে তার অভিশপ্ত জীবন নিয়ে। হ্যা, জ্ঞানোই কবে থাকবে কাচ। আন্তে আন্তে তাকে এগিয়ে এল ব্যাকুনির কাছে। পুণ্যহিতের নির্দিষ্ট এক এক সগাই বললো নতজানু হয়ে। বাতর কে যেন বললো জ্ঞানোকে চুপ চুপ। হঠোতা বা উপশেষ লিল তার কান লম্বকে। হ্যা, ওগা শ্যামিনারী, ওদের ভয় নেই।

সকলের আগে লাফিয়ে উঠলো জ্ঞানো। ভাইয়ের পাশে গিয়ে অমূল্য জানালো “জ্ঞানো, বাগ কবে না ভাই আমার জীকতাও লজ। বলা করে আশাকেই প্রথমে স্ত্রী দাও।”

ভিত্তির এল ভূতের ভূতের। জ্ঞানো পলা বেগেই হাড়িকাঠে মতজ্ঞাই হয়ে। যেন মিনতি জানাচ্ছে খলখলানাকে নেমে আসতে। জড়িত ভিত্তির টলতে টলতে এগিয়ে এল তার পাশে।

হাণাতে হাণাতে সে বললো “আমার বিয়ে করার সূচী জ্ঞানোকে তোমার স্ত্রী দিচ্ছেন জ্ঞানো।” শ্যামিনীসু যেরে কিবে তাকালো কালী অক্লিষায়ে বিকে। গার্কিত সে সূচীতে প্রকাশ পেল তবুই অবজ্ঞা।

“জ্ঞানো, আর দেখি কেন ভাই।” আবার সে মিনতি জানালো ভাইয়ের কাছে।...ভিত্তিরের পায়ে কাঁছে লুটিক পড়লো তার ছির শির।

বিদ্যায় বেলেপেল মাস্টার্স-পতীর বেগে। লম্বত পরীয়ে হাণালো আকষণ। আন্ত কষ্টে লম্বত হাণালেন নিষেধে।

ছোট মাস্টার্সের মাথা বেগেই হাড়িকাঠে। জিজ্ঞেস করছে লম্বকে, “এইখানে তে? ঠিক হয়েছে...নেমে এল বসল। কাঁচতে কাঁচতে এগিয়ে এল মাস্টার্সের।

“কাঁচিল, নো বো।” সূচী খেতে মাঝে জ্ঞানোন্মত্ত কৃত্যনা। “ভাবছি তোমার কথা। কি করে যে তুমি বাচবে এর পর।” ছোট্ট পড়লো মিনতি বক্ত হাড়িকাঠের হাণালে।

এবার আন্তে আন্তে এগিয়ে এল মাস্টার্সের মৌলুখী। একবার তাকালেন হাড়িকাঠের বিকে—লাল হয়ে পড়ে—ভাই সজ্ঞানের ওক্টে। তারপর লজ জনতার বিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন পতীর কঠে, “শোন শোনবাসিল, আমি আশীর্বাদ করছি আমার পুত্রকে। এমন থেকে সেই স'ল তোমাদের মাস্টার্স।

ভাবপন্থাভূতের বিকে দিয়ে বললেন, “ভয় কতো না মাস্টার্স, আশাত কখনো...তুমি নিখোঁদ।”...প্রেরিত সজ্ঞানের মক্ত বক্তিত হ'ল শোনের মাসি।

পুণ্যহিতের কাঁবে ভর দিয়ে এগিয়ে আসছেন মাস্টার্স-পতী। লম্বের শিহিরে গেল জ্ঞানো। হাত থেকে বসল পড়ল বলে। আঁহিত পত্তর মত ও হাণাকে। আরও এগিয়ে এলো মাস্টার্স-পতী। জ্ঞানোন্মত্ত কৃত্য লম্ব থেকে বেগিয়ে এলো মধ্যভৌ আশীর্বাদ “এ-ব আমার মা, এইই স্তব্ধত্ব পুই হয়েছে আমার পরীয়ে।” ভিত্তির জনতা উঠলো কোলাহল করে। বৃত্ত থেকে ভেলে এল পানোন্ত অক্লিষায়েই অষ্টসিধ পক্ষ। মা লম্বছেন তাঁর সজ্ঞানের সত্ত্ব সাতল থেকে নিষেধিত হয়ে। আর ও পারবে না। এক লাফে তিনি উঠে পড়লেন বাগালার গেলিয়ার উপর। পরক্ষণেই তাঁরিয়ে পড়লেন নীচের পতীর উপরভৌ অষ্টসিধ সজ্ঞানের জনতা উঠলো কোলাহল করে। মাজিতে লুটিক পড়লো জ্ঞানোন্মত্ত কৃত্য বেগে।

# কালীনাথের দুর্গোৎসব

ঐশ্বর্যময় সুখোপাধ্যায়

ঘোড়া কারবার করিও এবার ঘোষেঘেব কালীনাথ

হাওয়ার তিরিশ দুনাথ। পাইয়া কয়েকে বান্ধ-ভাত।

শরী তাহার বলে—“এইবার দাও নেকশেন্স-চুড়ি।”

“দেটে বাড়ীখানা—কর বালখানা—কহিল তাহার খুড়ী।

জোঠা বলে—“তালো! বোসেদের তালো জমিগুলো নাও কিনে।”

হেলে বলে—“বাবা! ব্যাংকে জমাও, বাঁচা বাঁবে দুখিনে।”

কিছু না করিও মনে মনে কালী ভাণ্ডে—

“এই টাকা দিয়ে দুর্গোৎসব ক’বছর করা যাবে।”



মতি ও নরেশ দেব উপদেশ—“টাকাটা বাটাও মনে।”

“ভাবিতেছি তাই করিব মশাই”—কালী করে চোখ মুদে।

কহিল গিরিশ—“তা’ যদি করিস, কিছু গুণ নেবো আছি।”

মুখো মাঝে কর—“বাবাজি, তোমার ডেকেছে ভোমার মালী।”

হলধর শেষে কর বৃদ্ধ হেসে—“গোন কালীনাথ ভাই,

সেবো লিখে পাক, ন-পাচেক টাকা আহারে বেগুটা চাই।”

শোনে কানে, আর মনে মনে কালী হাসে।

অজ্ঞারে তার দুর্গাপূজার পূজা ছবিটি আসে।

আখিন মাসে মঘস্তর লেগে গেল সব ঠাই।

পথে ঘাটে লোক কত যে মরিল হিসাব তাহার নাই।

দুখিতের দল হইলো পাগল, ছুটি অন্নের ভরে

করে ছুটাছুটি, তবু এক দুই—না পার কাহারো ঘরে।

কালী মনে ভাবে—“বেবস্তা পূজার এই ত সময় বেশে।

অহম্মু লামো ‘নারায়ণ’ খুঁকিছে ভিখারী বেশে।”

পূজা-বেদী কালী পাতিল আপন বুকে।

মত পুঁজি ছিল, সব চেলে দিল নিরস্ত্রের মুখে।



## একটা বিস্মৃত স্বপ্ন

শ্রীচন্দ্রনাথ দেবী

সুপ্রিয়া! আগলিল অফিসে ট্রামে করবে—আর আনমনে তাকিয়ে ছিল চলমান জনপ্রবাহের দিকে, মনের একান্ত গোপনে কত কথা আনিগোণা করছে। সব বংব সুপ্রিয়ার নিষেধই জানা নেই। ট্রাম ধানছে টপকে, লোক ওঠা-নামা করছে, সেদিকে তার খেয়াল নেই, মনটা যেন তার উদাস হয়ে আছে। দাপট করতে আর ভালো লাগছে না, হীনতা চাষিবিদে, বা সে করতে চায় তা সে করতে পার না। বিবাহের কাল, বিবাহেরা নিম্ন—আত্মহিততার কোনো দাম নেই এখানে। যে কালে সে হাত দিয়েছে—সে কালেই তার মনের স্বপ্ন মনেই রয়ে গেছে কিংবা বাস্তব জগতের নিষ্ঠুর আঘাতে সে স্বপ্ন গেছে কতবার, যন্ত্রের কবচ সে শুধু দুখ সুখিয়ে কেঁদেছে। মেয়েদের এ ছাড়া আর করবার কিই বা আছে। নিষেধ তার ভারী অসহায় মনে হয়। মেয়েদের স্বাধীনতা ছরণের জড়, মেয়েদের সব কাজে বাধা দেবার জড় কত মনোহর নিষেধের কত শৃঙ্খলার দৃষ্টি, কত জুহুতি, কত সোঁৎসাহগোনা। তার মনের মধ্যে যে বিজ্রোহিত্বি বসে তপজা করছে, এইবার তুমি তার তপজা তপ হয়। এক একবার তার মনে হয়, সব কিছু ভেঙ্গে চুরে শেষ করে দি। কিয় পায়ে কই? সুপ্রিয়া হাসলো আপন মনে। বাগলে মেয়ে নাহয় তো, ভয় আর গীকতা পদে পদে।

আলবার সময় নায়েব সঙ্গে রংগারগি হলো। বাস্তবের মনের মধ্যে সাপের চেয়েও ভয়ঙ্কর জীব আছে, তার ভীত বিষ আছে—আজ যেন তা সুপ্রিয়া জমাগ করে দিলে—অথচ এই না তাকে পালন করার জ্ঞান কত না ভ্যাগ স্বীকার করেছেন। নিষেধ ভক্তে নিষেধ কাঁড়েই সুপ্রিয়া অপরাধী হলো। 'কি সবকাই বা ছিল এই অবেজুক বলছেন? সুপ্রিয়া ভাবছে যা সে চাইতে চাইতো না, ভাণ্ডা তাকে সেই দিকেই টেনে নিয়ে গেলো—এই ভক্তই কি সে এত কষ্ট করেছিল? কোথায় সেই স্বপ্ন তার নতুন জীবনে? চরতো সে মেয়েদের জন্মে কিছু করে যেতে পারতো—তাকে স্বপ্নীয়া বলে তুলবার জন্ম সে পৃথিবীকে কিছু নিয়ে গেছে পারতো,—কিছু হলো কই?

মনে পড়ে—বিপুল বিলাস আর প্রাচুর্যের মধ্যে সে নাহয় হরেছিল, তার পর সেই ডোউবেলার রত্নীন দিনগুলো—এক এক করে কতগুলো দিন কেটে বহুর পরিণত হয়েছে তার পর? ট্রামটা খেমেছে, লোক ওঠা—নামা করছে।

ও বা সব বৌবাড়ার? ভালপোদী আর কতক? ১ আনমনে সুপ্রিয়া ভেবে চলেছে। তাইপদ—বাবা যখন বিদায় নিলেন। যেন মনে পড়ে সুপ্রিয়ার স্মরণে

সংসার তেজে চুরে—একাকার হয়ে গেলো। দাদাগিও একেবারে হতভাগা, সেই যে কপড়া করে চলে গেলো, আর সে কিরলোই না।

তাদের সেই সাজীটা এখনও মনে হলে সুপ্রিয়ায় মন কেমন করে। নিজের হাতে সে সব সাজিয়েছিল। তার পড়ার ঘর, বাথরুম সারিগ্রেটী, ড্রিংকেন। খানিকটা ভনী নিয়ে ছোট্ট ফুলবাগান—কী সুন্দর। সব তাদের পিছনে কেন্দ্রে আসতে হলো, কেঁচাব গেলো সে সামান্য বাগান—সে বহু—সেই সে দিন।

সুন্দর হলো বাস্তব জীবনের সংগ্রাম। সুপ্রিয়ায় মা চেয়েছিলেন—সে বিয়ে করে সংসার পাকুক, সুখী হোক। হঠাৎ সে তাই করতে, কিং তার নাকে আর চোটে বোন পুতুলকে দেখবে কে? আনন্ড, শান্তি, সুখ সে তার জীবন থেকে বিদায় দিয়ে শুরু করলো সংগ্রাম, ঝড়বার



ভগ্নিরা অন্যভাবে দু'খ তিকে চেয়ে অবাক হয়ে গেলো; অল্প: এবং ঝড়বার। এ ছাড়া সুপ্রিয়ার কিই বা কতবার ছিল?

নিজের সামান্য ঘর বন্ধন অপরের হাতে কুলে দিয়ে এগেতে, সে দিনই তার জীবন-স্বপ্ন শেষ হয়ে গেছে। আজ আকুল মনে থাকলো। পিছনের দিকে, বসন্তের জীবনের দিকে। সব বেয়েদের বা কাম। সুপ্রিয়া হিসেব করে দেখলে স্মরণ করবার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে সে বী গ্রন্থ করতে, তাই তাকে অসমর্থ রেখে পথের প্রান্তে

কেন্দ্রে আসতে হয়েছে। জীবনে তার বিচ্ছেদটাই সত্যি, ভাগ্যটাই বড়, বর্জনেই প্রথম হয়ে দেখা দিয়েছে।

আর একজনের কথা মনে পড়ে—সে হলো অল্প, সুখের দিনের বন্ধু। অল্প তাকে আপন করতে চেয়েছিল কিন্তু সেই তো, সুপ্রিয়া নিজেই তো তাকে বলেছে আমার সঙ্গে তোমার জীবন অভ্যাসে চাই না, ভাগ্যের জুয়াখেলায় আমার প্রথম হার—থাবা গেলেন, দ্বিতীয়, আমাদের সব গেটে, তৃতীয় কি তুমি হ'তে চাও?

—নতুন করে ঘর বাঁধবো, সংসার পাতবো—অল্প উত্তর দিয়েছিল।

—আর—আমার মানবান?

ভীষণ আগুন মনে আমাদের সংসারে।

না, তা হয় না, নাকে তুমি জানো না—এ সব যেন সেদিনের কথা।

হঠাৎ একটা কাকুনি খেয়ে সুপ্রিয়া তাকিয়ে দেখলো চিত্ররঞ্জন অভিনীত'র মোড়। টান খেয়েছে, লম্বাও খোঁজ বেগে চলেছে। আচমকা কাকুনিতে একটা লোক হনুনি খেয়ে তার গায়ে পড়তে পড়তে কোন রকমে বাঁচিয়ে তার পা'টা মার'ড়ে দিলো। নিজের অজান্তে সুপ্রিয়া বরণার অশ্রুট আঁঠু'র করে উঠলো—উঃ!

—নাশ করবেন, দেহতে পাইনি।

সুপ্রিয়া অপরূপের সুখের দিকে চেয়ে অবাক হয়ে গেলো; অল্প! অতাবনীর ঘটনা।

সুপ্রিয়া।

সেই কণ্ঠস্বর, একই ভাষা ভাষা—সুপ্রিয়া হাসলো।

—আকর্ষ্য ঘটনা—না?

—হ্যাঁ, ঘটনা-সংস্থাপনে আধুনিক উপকরণে হার মানার।

—তারপর, মা কেনন?

—আছেন কোন রকমে!

—সত্যি, কতদিন পরে দেখা, পুতুল কোথায়? ২

—কলমে পড়ছে।

—নিজে যা নিতে পারো মি—তাই কি দিতে চাও পুতুলকে?

—ঠিক জানি না, তবে পড়াছি, নিজে সব বেশে তেনে নিক।

—কিন্তু চলেছ কোথায়—অনুপ ভিজ্ঞাসা করলো।

—ব্রহ্মধামে। হুগ্রিয়া হাসলো।

ভাল করে তাকিয়ে দেখে অনুপ ভাবে—ওর হাসিটা ঠিক আগের মতই আছে।

এতখানি ? ও, অনুপ হাসলো। চাকরীতে বসলো।

—টুঁচ, হুগ্রিয়া মাথা নাড়লো, ব্রহ্মধাম, বাঙালীর মর্গ ভীর্ণসার।

বসলো তোমার পাশে ? বোকার মত অনুপ বলে ফেলো।

হুগ্রিয়ার মনে হলো—তার আগেই অনুপকে বলতে বলা উচিত ছিল।

—বসলো, অমরোপ করতে হবে ? হুগ্রিয়া নিজেই সন্দর্ভন করবার চেষ্টা করলো।

পাশে বসার অধিকার—

চাপা গলার হুগ্রিয়া বললো—এই, চুপ।

তীত কঠে অনুপ বলে—কেন ?

যেথায় না, কত লোক পাশে-পাশে।

—আমি ভোবছিগুণ পুণিবী নির্জন।

—যাযো, পাশে কোনও খবরের কাগজের রিপোর্টার আছে।

—না, না, রিপোর্টার নয়—লেখক আছেন শট্‌ফোর্ড লেখেন।

চাপা গলার হাসলো হুগ্রিয়া।

—পাশে বসার মত বয়স আমার নেই।

—কাপের ছুঁপাশে পাক ধরেছে বুঝি ?

—তার চেয়ে বেশী, লজা এসেছে মনে, বুড়ো হয়ে গেছি।

হ্যাঁ, আর আমি কচি দুকী আছি—এই বাথকে—

হুগ্রিয়া বিটে গলার মুহূর্ণন করলো—এসো আমার সঙ্গে। অনুপ হুগ্রিয়ার আদেশ উপেক্ষা করতে পারলো না।

—কোথায় যাবে ? অনুপ মূর্তের মত বলে।

—নিজক্ষেপে, ভায়াগনে। উঁচু গলার হেসে উঠলো হুগ্রিয়া। অনেক দিনের পুরানো হাসি ফিরে এসেছে হুগ্রিয়ার।

কেন, তার করছে ? হুগ্রিয়া কৌতুক করে বললো। না, তবে ভাবনা হচ্ছে—অনুপ বলে—কিন্তু তুমি তো কোনো কথা জিজ্ঞাসা করলে না ? কেনন আছি, বিয়ে করেছি কিনা ?

হুগ্রিয়া রান হাসলো। কেনন আছি তাকো দেখতেই



আজ্ঞে আজ্ঞে শিঁড়ি বেড়ে উঠতে লাগলো

পাছি। বয়সের অনুপাতে একটু বুড়ো হয়ে গেছে, রাত্রি প্রেমার নিত্যই হয়েছে, যেহে বড় হচ্ছে, বিয়ের আশাও জাবছো বাক্যে মাঝে। তাই না ?

হুগ্রিয়া চোখ তুলে তার নিকে তাকালো, অনুপের সঙ্গে চোখাচোখি হলো।

—যদি বলি বিয়ে করিনি।

—সরলমণ, বাংলা দেশে বিয়ে না করা তো চরিত্র-হীনতার লক্ষণ। বিয়ে করেছে। যদি বলি, ভবি হুগো হয়েছিল সংসারপাত্র। মনে নেই, চন্দ্রকান্ত পোত

দিয়েছিলে তুমি। কিন্তু জানো—তোমার পাশে করে না  
বাক্যের কথা ছিল। হঠাৎ সুপ্রিয়ার হৃৎ থেকে এ কথাটা  
অজ্ঞাতে বেরিয়ে গেলো।

অল্প অপরাধীর মত চুপ করে বইল।

—আমার অপরাধ জানি কিন্তু তুমি যাবা  
বিত্তেছিলে।

সে বাবা তুমি মনেলে কেন?

সুপ্রিয়ার কণ্ঠে যেন কাতরতা।

অনেক দিন পরে তোমার কাছে পেলুম, তাই  
পাশাপাশি একটু হেঁটে যেতে ইচ্ছে হলো। অনেক দিন  
পরে তুমি কিংবদন্তি। আর একটি ভিনির যদি আর  
একবার কিংবদন্তি... ..

সুপ্রিয়ার কণ্ঠের কোন ভিত্তি ভিত্তি।

কোনটা সুপ্রিয়া—কোনটা আর একবার কিংবদন্তি  
চাপ।

—আমাদের সেই বাজীটা, তোমাকে জানাতে যে  
ফুল-বাগানটা করেছিলাম।

—আজ্ঞা, চলি—

সুপ্রিয়া কিংবদন্তি হয়ে হাঁটতে শুরু করলো। লেট  
হয়ে গেছে হয়তো। কিন্তু অকস্মে পৌঁছেও সে আন্তে  
আন্তে শিঁড়ি খেয়ে উঠতে লাগলো। (Lift) লিফট  
নিলো না, লিফট-মান অবাক হয়ে তার দিকে চেয়ে  
রইল।

## উনত্রিশে আবণ

ঐতসমুদ্রমার চট্টোপাধ্যায়

ওল সতে তার দাবার পথে বলল শাওন ডেকে—

দাবার সময় হল এবার, যাব এখন থেকে।

সঙ্গে যাবে কলর কোর।

সম্মল বেদের পুত্র, সেয়া

বইবে না আর তক্তির খেচ।

মেঘের পাড়াবায়ে,

চিত্র হবে মেঘ ও মাটির যোগও একেবারে,

পার যদি বেধ, কবি, আবার কথার হারে।

বাববে কে তার, তার সাথে যে সুর বাবান

চকল সে, চপল সে যে, সে যে চলমান।

সারা বছর দিবস গুণি

একদিনই তার কথা শুনি।

তাইতে আশার এ আল তুমি

আমার মনে মনে —

হয়ত আবার মিলবে দেখা এমনি সে এক ক্ষণে,

আবার যেদিন আসবে শাওন স্বপ্ন কোর মনে।

তানি তুমি আসবে আমার হাজার হাজার বার,

আমার সাথে তোমার দেখা না হয় যদি আর,

শাওন দিনের হে অতিথি,

য়েবে সেলাম আমার প্রীতি,

তোমার আবাহনী সীতি

তোমার বরণ করে।

না হই যদি যেদিন আমি, তুমিই মনে ক'রে

নিভিহো বাবেক সম্মল ছায়া আমি-শ্রুত করে।



# পরিচালক কাগ'নৌত

অনুবাসক—ঐতিহ্যবান সেন

পকগিরিপুরে ভগবান বুড়ের আগমন

"এই আমি ভবেতি যে, সে সময় এসেছে যখন তখনই বুড় তাঁর পার্শ্ববর্তী ভাগ করবেন এবং মগধ দেশের নানান স্থানে জনন কল্পে কল্পে রাজপুত্র আসবেন।"

— ইতি প্রাচীন ভারতের পবিত্র বৌদ্ধ-বৃত্ত।

• •

যৌর যৌর প্রবু পকগিরিপুরের নিকটবর্তী হইলেন, তখন দিন প্রায় অবসান হ'য়ে এসেছে, হরিৎ বায়ুক্ষেত্রে ও দিগন্ত-বিস্তৃত প্রান্তরের উপর অন্ধকারী সূর্যের শেষ রেখারি দেখতার আনীরের মত ছড়িয়ে পড়েছে। আকাশের এখানে-ওখানে ছড়িয়ে রয়েছে তরকারিত মেঘমালা। এরা যেন স্বর্গেরপুতে গঠিত, প্রান্তরের সমান্তরে টুকরো মেঘের মল নিশেমে ভেলে যায়, আর তাদের নীচে দেখা যায়, বীর্ষ ছায়া ফেলে গৃহাতি-মুখে এগিয়ে চলেছে নিম্নস্তরের প্রমত্তাৎ মাছুষ ও দেহ। বিজয়ী কৃষ্ণগুলির পদতলে লীর্ণারিত ছায়া, লীর্ণনেপে রামধনুর বেঠনী। অশ্ব-চুই পরীলোকের মত তুষ্টির মন্থে কোমল আকাশে ভেসে গঠে প্রযুক্তিত শূন্যোজান-বেষ্টিত, বুদ্ধবোধী ভোর-সমবিত্ত, সৌন্দর্য ও প্রাণায়ুক্ত শোভিত রাজধানী। আরও বুঝে বর্ণিবারিকোর বিগলিত কণ্টিলেখনে অতিত বেখার মত দেখা যায় ঈষৎ উজ্জ্বলিত। সমগ্র পটভূমির বিলম্বে সূই এ শোভা অতুলনীয়।

এ সৌকর্যে প্রজ্বলিত করে অসুতব করেন পতীর আনন্দ; তাঁর চরণের গতি হ'য়ে আসে বহু। কত কৃত্ত-বিকল্পিত ঐ পরিচিত যুগে আনন্দাপ্রসূত হরম মেটে তঠে : ঐ সেই 'বৃন্দা পদ্ম', 'বিকৃত উপত্যকা', ঐ সেই 'ভবিষ্যৎ' 'গৃহীতশেখর'—এদের বহীরাণ লীর্ণ, ছায়ের ছায়, অপর সকল অপেক্ষা উজ্জ্বল—সবার অধিক আনন্দ দেখ উচ্চগ্রন্থেরের সিরি বিতর, এরাই ছায়ায় মতপত্রী

একজনের শুভাচিতে গৃহতাপী পর্বাটক, সংসার হ'তে নিকীর্ণের পথের পাত্র, প্রথম আশ্রয় পেয়েছিলেন।

সেদিন সূর্য যৌবন : তখনও তাঁর মনঃকল টিকল ভেল, জীবন যৌবনের উদার হ'তে প্রবৃত্ত শোণ-অশ্রুণ তখনও অনুভূত, কিন্তু সে মত উপেক্ষা ক'রে, মাতাপিতার বিলাপ ও অশ্রুতে শোকার্ত না হ'য়ে, গৌতম গাওপ্রাসার ত্যাগ করলেন ; শাক্যবৃন্দে অধিষ্ঠিত উত্তরাকল প্রতিত্যাগ ক'রে জন্মণঃ অগ্রসর হ'লেন গাভের উপত্যকা অভিমুখে। সেদিন এই সু-উজ্জ্বল বিতরের ছায়াভাগেই তিনি নিজেও প্রথম লীর্ণ বিজ্ঞান নিজে নিজেছিলেন ; প্রতি প্রাতে গাও-গৃহে ত্রিকারের গমন বাতীত এ স্থান তিনি ত্যাগ ক'রতেন না।

সে সময় এই শুভাভেই মগধাধিপতি বিদিশার প্রে-ছিলেন তাঁকে সর্জন করতে ; সেদিনের নবীন সন্ন্যাসীক বত অগ্রহোর ক'রেছিলেন পিতৃগুরে প্রজ্ঞাভর্ষণ ক'রে সংসার-কর্ম অবলম্বন ক'রবার ভ্রম ; এখানেই সে রাজ-পর্বাটক অবশেষে নবীন সন্ন্যাসীর বিশ্ববন্ধ বশীতে অতিক্রান্ত হ'য়ে নূতন বর্ষের প্রথম শির্ষণ অমৃতত্ব ক'রে-ছিলেন ; বর্ষাশ্রমসংগে সেবে পরণ নিজেছিলেন বুড়ের।

সেদিনের পর পূর্ণ পঞ্চাশটি বৎসর অতিক্রান্ত ; সে-দিন ও এ-দিনের মধ্যবর্তী সময়ে ভগবান বুড় শুণু বীর জীবনের নহে, বহুমতীর গতিপথও পরিবর্তিত ক'রে দিয়েছেন। সেই অষ্টীতের দিনটী, যেদিন তিনি ঐ মতপত্রী ছায়াছায় শুভার অধিবাসী—সেদিন ও আধিকার মধ্যে কত পার্থক্য।

সেদিন তিনি সন্তোর সন্ন্যাসী যাত্রা—বোঝসাতের ভ্রম সংগ্রাম করতেন, তখনও তাঁর মন্থে কত আধ্যাত্মিক যিগ্রহ, বৎসরযাত্রী বেঙ্কাকৃত আশ্ব-নির্ঘাভন, অমাহবিক বরণ। সেই তত্ত্বাবহ সাধনও হ'ল যার্থ। আর সে সাধনার কঠোরতা শুনেলে তাঁর অতি-সংযমী দিবাও তীব্রবিলল হ'য়ে পড়েন।

ভারপর...

তিনি বিজয়ী; সম্রাট-জন্মের কঠোর কষ্টে তাকে তিনি জয় করেছেন; আলোকের সন্ধান পেয়েছেন; অবসান হয়েছে সর্ব স্বপ্নের; সর্ব আশ্রয় সৃষ্টিকারী, ঐশ্বরিক কল্পনার পূর্ণ পূর্ণ-বৃক্ষের অন্তরায় হয়েছেন। তাঁর জীবনের সে বৎসরগুলি ছিল বর্ষানেছুর প্রভাতের মত, কখনও চোখ ধাঁধির বায়ু অত্যন্ত স্বর্ণালোকে, আবার তখনই মুহূর্তব্যধী পূজ পূজ যেন গভীর সন্ধানে বিবাদের হাওয়া বিছিরে দেয়। কিন্তু আজ, প্রত্যেক-আকাশের সিম্ব স্বর্ণালোকের মত তাঁর জীবন-বৈদ্যুত শর শিখ। সর্বভার বৃত্তধামি দিকচক্রবালের অন্তরালে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে যায়; তাঁর অস্তরের শাখি অধিকতর দীর্ঘায়তা ও নিম্নতা লাভ করে।

ভারত হীৰ্ব জীবন-দিনের দৃষ্টি অত্যন্ত স্বা। কাব্য সমাপ্ত। অক্ষর তিরির পরে সমস্তর সমাজ; প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন; বিখ্যাত হ'য়েছে সত্য মানবের নির্মাণ-মহ; এদিকে অসংখ্য পুত্রাত্মজ্ঞানবৃত্ত ভিক্ত ও 'ভক্ট', গৃহী শিখ ও শিখা এ সমাজে। স্বপ্ন ও এ মত প্রচারের উপভুক্ত হ'য়েছেন।

সবত্র দিলী অতিবাহিত হ'য়েছে নিঃসঙ্গ স্বপ্নে; নিঃসঙ্গ প্রবন্ধালের চিত্তার কলে এমনও তাঁর অস্তরে অন্তরীক্ষিত হচ্ছে—“এই দেশের হ'তে তুমি উদ্ধারলাভ ক'রবে, এই দেশের কবিত্বের অন্তঃপ্রভেরও নির্মাণের চরম বিকাশ অর্জন করবে। এ দেশের হ'তে তব বিদ্যার গ্রহণের দিন সমাপ্ত, বিদ্যার হ'তে আর নাই; তুমি চলে যাবে, বিদ্যার স্নেহে এ-দেশের হ'তে।”

সবুজে বিকৃত প্রান্তর কত সুবর্ণিত-মাতা, তবু কোমার বেন বিবাদের মূর বাজে—হে গৃহী দিলার।

“এত সুকট তুমি পকগিরির প্রান্তর। নানাভিগাম ভব পরিবেশ; তোমার ক্ষেত্র কল্যাণ সম্ভারে পূর্ণ। জন্ম-রজন তোমার কল্যাণ-বস্ত্রিত উপ-নয়নী, তোমার আবেষ্টনকারী ঐগিরিপূজ কী মানবমারকা। সর্বস্বান অপেক্ষা মনোরম এই স্থানটি হ'তে তোমার সম্ভার। তোমার রূপ বর্ণন করতে ভালবাসে, আমিও এইস্থান হ'তে শেষ বাতের মত তোমার উপকর্ষ বর্ণন করছি। কিন্তু না, আর একবার, আর একটী বার মাত্র, প্রিয় রাজ-

বৃহ উপত্যকা, তোমার আমি দেখব, দেখব ঐ অমৃতের গিরিরেখা-বন্ধ হ'তে। তার পর, আর কত নয়!”

সত্য ঘটনিত আসে; অবশেষে মাত্র ছুটি সৌভাগ্য স্বর্ণ-কিরীটে ঘূর্ণা মাথিরে মের তার শেষ কিরণ; প্রভু তখনও সম্ভারমান। এদের একটি রাজপ্রাসাদ; এখান হ'তেই বিদ্যার তাকে প্রথম বেবেছিলেম। অখ্যাত এক যুবক পরাণী; পরাণী সেদিন মধ্যাহ্নে পথ অতিবাহিত করছেন, তাঁর সৌম্য মুখিতে রাজপুত্র আকৃষ্ট হ'ল।

অপর সৌভাগ্য পুণ্ড্র-বিশিষ্ট মন্দির; পূর্বে এরই প্রাঙ্গণ-তলে দেবীর প্রসাদার্থে কুসুমারাজের উপাসক লক্ষ লক্ষ প্রাণ বনি দিত।

শেষ পর্যন্ত, উষারমান হারার সাগরে সৌভাগ্যের ছুটিও ডুবে যায়; দিনের শেষ আলোকে ভেগে যাবে 'বেউল-চুড়ার স্বর্ণছত্রগুলি; একটীর পর একটী ক'রে স্বর্ণ ছত্রগুলি বেন 'জোয়ার আর মনোর মাকে স্থির হ'বে রয়েছে 'রাজপুত্রের' উপভুক্ত আক্কাশনরুপে। সু-উচ্চ বৃক্ষগুলির ঘন মীল পটভূমিতে সাক্ষ্যদ্রিমান হয়; কিন্তু স্বর্ণছত্র-গুলির প্রতিফলিত রশ্মিমালা তখনও কঁক কঁক করে।

এই সময় আজিকার বায়ুশবের লক্ষ্যহণ প্রভুর নয়ন-গোচর হ'ল। কিরতল 'পূর্বে বৃষ্ট উজ্জ বৃক্ষশীর্ষগুলি নগরের অপর প্রান্তস্থিত 'আশ্রবনের'; আরোহণের স্বাক্ষার এই 'বন' (উদ্যান) ভিক্ত ভিক্তসবুহের বাসস্থান সহ তাঁর শিখ্য রাজবৈদ্য জীবক লক্ষকে দান ক'রেছিলেন।

দিনব্যাপী নিঃসঙ্গ প্রবণের আনন্দ উপভোগ করবার ক্ষণ তিনি তাঁর প্রভাত-পূজ এবং বিষণ্ণ অন্তর আনন্দের নেকুরে অস্থায়ী প্রাণ দুইগত ভিক্তকে এই আশ্রব অতিথুর পূর্বেই প্রেরণ ক'রেছিলেন। এও আনন্ডেন যে, পশ্চিম হ'তে তাঁর বিখ্যাত শিখ্য জ্ঞানী গারিপুত্রের অবিনায়কবে যুবক ভিক্তর একটী দল স্বর্ণাভকালে আভ-কুঞ্জে উপস্থিত হবে। যে দৃষ্টগুলি এর পর অতীত হ'বে, তিনি তার পূজ্যহৃদয় রূপ দেখতে পেলেন। দেখলেন, নবায়ত্তের পূজ্যগতের সঙ্গে অতিবাসন-বিনিময় করছেন, দেখলেন, নবায়ত্তের নির্দিষ্ট নৈম আদানে নিজে বাওরা হ'চ্ছে, প্রত্যেকের বহির্বিব্র ও ভিক্ষাপাত্র নেওয়া হচ্ছে। শুনে পেলেন, মহাশয় ও

উচ্চ চীৎকার করে এগুলি করা হচ্ছে; যেন বাজের হাটে ভোগেশের বিবাহ চলছে। তিনি জার্মেন, এ কখনো বিশ্ব-মাত্র আভিষেক নেই। বনবাণী দিঃহের মত তিনিও নির্জনতার নৈঃশব্দে মগ্ন হয়ে যান কবুতে ভালবাসেন; সমগ্র দিনের নিঃশব্দ ভ্রমণের আনন্দ ও এই সাক্ষাৎ-মোহর শান্তি উপভোগের পর দিনান্তে ঐ কোলাহলে প্রবেশ করা তাঁর পক্ষে ক্রান্তিকর।

তিনি বিরাট কবুতেন, নগরের মধ্য দিয়ে আত্মকৃত্তে আর বাওয়া হবে না; রাত্রির মত নগরের উপকণ্ঠে নিকটবর্তী কোন গৃহে আশ্রয় নিতে হবে।

এখিকে পশ্চিম আকাশের অনন্ত বর্ণ শিল্প রশ্মি সূর্যের মধ্যে বেহরকা করেছে, শেষ পর্যন্ত শিল্প রশ্মিরাঙ জলে উঠেছে হিংস্র নোহিতাকার। তাঁকে বেঠন করে প্রান্তরের সবুজ ঘন হতে থাকে; ক্রমশঃ সমস্ত মাঠ অন্ধরহ আনোকে উদ্ভাসিত ক্ষটিকের জার উদ্ভল হয়। কিন্তু দিক্চক্রবাল ভেঙে যায় হুস্মান্দর নীলাভ-মোহিত। আকাশ আচ্ছন্ন করে লাগের বান বয়ে যায়, কেউ জানে না, এ আলো না ছায়া-সকল দিক হতে গড়িয়ে আসে, ওঠে আর পড়ে, সূক্ষ্মতা পূর্ণ হয়, আত্মতির প্রান্ত রেখা মিলিয়ে দেয় অনন্তে; কৃত্তরশ্মি বিলনের ব্রহ্মের উজ্জ্বল হয়, নিকট চলে যায় দূরে, দূর আসে নিকটে, অনিন্দিততার কল্পনে প্রতিটি বস্তু ইতস্ততঃ করে আর বিপণিত হয়।

নিঃশব্দ পথচারীর পথশব্দে মন্থিত হয়ে বাতাস ভাঁড় দাদরুকের শাখা ভাগ্য করে চঞ্চল পক্ষ কোন উত্তানের উদ্বেগে গোগুলির আকাশে বেলে দেয়।

দিন অতীত, রাত্রি আর সমাগত; এই সময় প্রভু রাজপুত্রের উপকণ্ঠে পৌঁছলেন।

(২)

সাক্ষাৎ

প্রভু ইচ্ছা, প্রথম গৃহেই আশ্রয় নেবেন; এক্ষেত্রে প্রথম গৃহটির নীল প্রাচীর কৃষ্ণের অন্তরালে বেধা বাড়িল। দ্বার অতিমুখে অগ্রসর হতে গিয়ে দেখলেন, কৃষ্ণাখার আল কুলুড়ে; এক বৃহত্তর ইতস্ততঃ না করে প্রভু কৃষ্ণাখার আশ্রয়ের গৃহ ছেড়ে এগিয়ে চললেন। নগরের এই পথ

উপকণ্ঠে গৃহগুলি বিকিণ্ডভাবে অবস্থিত; তার ওপর কিছুকাল আগে কতে বহু বাড়ী পড়ে বাওয়ার আর একটী গৃহে পৌঁছবার পূর্বে তাঁকে বেশ কিছুকাল হাঁটতে হ'ল। দ্বিতীয় বাড়ীটী সম্পূর্ণ কোন প্রাক্ষণের গোলাবাড়ী। ভিতরে প্রবেশ করতে বাবেন, এমন সময় প্রভু চব্বত পেলে, প্রাক্ষণের ওই দ্বী প্রচণ্ড কলহে মগ্ন হয়ে পরস্পরের প্রতি অবিরত গালিঘরপ করা চলেছে। পূণ্যাত্মা দ্বান ভাগ্য করে আরও অগ্রসর হ'লেন।

পথের অনেকখানি পর্যন্ত প্রাক্ষণের প্রমোদোত্তান বিস্তৃত। ইতিমধ্যেই প্রভু জাতি অসুস্থ ক'বুতিলেন, তার ওপর তাঁর প্রসঙ্গবস্ত্রে নক্ষিত চন্দ্র কত ভওয়ার প্রতি পরিক্ষেপে তিনি দরদা অসুস্থ ক'বুতে লাগলেন। এই অবস্থায় তিনি সহবর্তী আবাসে উপস্থিত হ'লেন। উজ্জ্বল দ্বার ও গবাক্ষের চাক্ষুসালয়ে প্রবাহিত আলোকের জন্য গৃহটী বহু দূর হতে নরনঃগাভর হুজিল। উচ্চ উজ্জ্বল রশ্মি, পানপাতের বৃষ্ণক, কণ্ডালি, নৃত্যরত চরণধরী ও সপ্ততরী বৈদ্যঃ মংগল অর অরকণ্ড এ গৃহে আকৃষ্ট করত। দ্বার-প্রকোটে এক তরুণী দাঁড়িয়ে; পরণে তার রেশমি বেশ, পন্যর ঘূরির মালা; তাহলয়সে রঞ্জিত বস্ত্রকটি বিকশিত করে সে অভ্যর্থনা জানায়— 'বাগত অভ্যাগত! এতী প্রমোদাগার!' কিন্তু পূণ্যাত্মা চললেন আপন পথেই। যেতে যেতে তাঁর নিজের বাবুই মনে পড়ে— "পথিকের সঙ্গে গান ক্রমশঃ বলে গণ্য হবে, মস্তিষ্ক-বিক্রান্ত বলে গণ্য হবে নৃত্য; পথিকের সঙ্গে আশোভনীর দম্ব-বিকাশের হাস্য নিগুহতা বলে গণ্য হবে। হে সন্তা-প্রতিষ্ঠিত, নরনের সিদ্ধ হাতুই স্তোমার হাত হউক।"

ভ্রমণের গৃহ দ্বন্দ্বতী নয়; কিন্তু প্রমোদগারীরের উন্নত চীৎকার ও বোদালনি শুধায়ও প্রবেশ করে; কাজেই প্রভু বুদ্ধ ভ্রমণরততা গৃহ অতিমুখে চললেন। এখানে কসাই-এর ছ'জন কর্মচারী দিবেশ শেষ আদোতে কাজ দারবার অন্ত সত্ত্ব মিহ্র একটী গাড়ীর পেছা ক্রত চালায় তাদের তীক্ষ্ণ ছুরি। প্রভু কসাই-এর বাড়ী ছাড়িয়ে চললেন।

পরের গৃহীত সন্ধে তু পীড়িত হ'য়ে আছে কাঁচা কুৎ-  
পাত্তি; সমগ্র যিনের অধাবসারে এগুলি নিশ্চিত। তেঁতুল  
গাছের তলে কুন্তকাঠের ঢাক অবস্থিত। কুন্তকার তখন  
চক্র হ'তে একটি পাত্তি উঠিয়ে অপরগুলির কাছে রাখতে  
বাঞ্ছে।

তার নিকটবর্তী হইবে প্রভু তাকে বিনীত অভিধাদন  
কানালেন। বললেন, “হে মহাতাপ, আপনাত অস্থিবিধা না  
হ'লে আমি এখানে রাত্রি অতিবাহিত করব।”

“মহাতাপ, আমার অস্থিবিধা কথা নয়, কিছুকণ হয়,  
দীর্ঘপথ প্রবণে স্তাত্র একজন পরিব্রাজক এখানেই রাত্রির  
কৃত অশ্রয় নিয়েছেন। তাঁর সম্মতি হলে, হে মহাতাপ,  
আপনি সম্বন্ধে এখানে অবস্থান করতে পারেন।”

প্রভু তাবলেন, “নিঃসঙ্গতার প্রেরণ নহ। কিন্তু আমার  
নতাই এই সংপরিব্রাজক বহু পথ অতিক্রম করে বিধাবসানে  
এখানে আশ্রয় নিয়েছেন। তিনিও অপখিত ও হিংসা-  
উপজীবীদের গৃহ অতিক্রম করে, কলহ ও কদম্ব বিবাদের  
গৃহ হেতে পথ ও অযোগ্য প্রমোদের আগার ভাণ্ডার করে  
আনারই বস্তু কুন্তকার-গৃহ না পাওয়া পর্যন্ত স্তাত্র লাভ  
করতে পারেন নি। এইরূপ ব্যক্তির সঙ্গে রাত্রিযাপন  
সম্ভব হ'তে পারে।

তপস্বী বৃদ্ধ কুন্তকাঠের বহিঃকণ্ঠে প্রবেশ করলেন।  
সেখানে, স্বন্দর এক যুগ এক কোণে আপন আসনে  
উপবিষ্ট।

প্রভু তাঁকে বললেন, “হে পরিব্রাজক, আপনাত  
অপ্রীতিকর না হ'লে, এই বহিঃকণ্ঠে আমিও রাত্রি যাপন  
করি।”

“স্রাতঃ, কুন্তকাঠের এ-কণ্ঠে প্রভুত স্থান আছে।  
হে প্রভুর মহাতাপ, সানন্দে অবস্থান করুন।”

তখন প্রভু একটা বেণুবাগের পাশে আপনাত আসন  
বিস্তৃত ক'রে পদ্মাসনে উপবিষ্ট হ'লেন। সেহ কুন্তকাঠে  
অবস্থিত। অন্তর গজীর ব্যানে বহ। রাত্রির প্রথম  
প্রহর পূর্ণাঙ্গ। এই ভাবেই অতিবাহিত করলেন।

দ্ব্যকণ্ড প্রথম দ্বার উপবিষ্ট আছেন দেখে প্রভু বৃদ্ধ  
তাবলেন, “হুগে হুগে, এই বহু যুগ সন্তোষ আনন্দবহ  
সন্ধানী। এ-বিপদে একে জিজ্ঞাসা করলে কেন হুগে?”

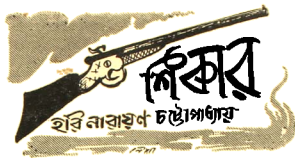
সঙ্গে সঙ্গে তিনি সুবকের দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা  
করলেন, “হে পরিব্রাজক, আপনি গৃহত্যাগ করেছেন  
কেন?”

বৃদ্ধ পরিব্রাজক উত্তর করেন—“রাত্রির অতি অন্ন-  
ভাগমাত্র অতিক্রান্ত। অতএব হে মহাতাপ, আপনি  
অবস্থান করলে, আমি আমার গৃহত্যাগের কারণ বর্ণনা  
করি।”

পূর্ণাঙ্গা ঐবৎ যত্নক-আশোষিত করে সম্মতি  
কানালেন। তখন বৃদ্ধ পরিব্রাজক তাঁর কাহিনী বলতে  
লাগলেন।

ও পুঙ্খ, পরতের এ হুগাপুঙ্খ, —বাঙালার নিজস্ব পুঙ্খ; এ উৎসব বাঙালার নিজের—বাঙালীর নিজের।  
যেহাং বাঙালী সেহাং হুগাপুঙ্খ।

হায়রে সেকাল। নভা, সেকালের সবই কিছু ভাল নয়, কিন্তু এই পুঙ্খাং বেলাং সত্যি নতাই বলি,  
‘হায়রে সেকাল।’ আঃ, সে কি অমোহাই সিরেছে। কি সে সব বড় বড় মহানৈবেদ্য মাঝানো ঘড়ি-ঘড়ি  
কাসেরে কি সে তজিয়াবা বস্তুনা! বাজাইতে বাজাইতে ঢাকচুলিদের কি সে উগ্রাং নাচন। হুগপুঙ্খার গড়ে  
সুগতিত পল্লিতে পল্লিতে কি সে বাঙালী-বাঙালী, ধাঁধা-ধাঁধা!



মুখোপাট। যে এভাবে ছুটে যাবে এ কিছ অমধ্য আশাও  
করিনি। শিকারের দিকে ছোটবেলা থেকে তৌঁক আমার কাছ  
প্রোবেদেব। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বক্তব্যকার সফলিত  
হ'য়ে সেই তৌঁক যেন মেঘার দাবিল হ'য়ে বীড়ালো। কলেজে  
একিক-একিক ছুটুকো। ছুটি পেন্সেট হ'য়ে ছুটকাম লম্বা থেকে  
আউ-এশ ঘাইলের মধ্যে জলাভূমিতে। অজ্ঞাত প্রতিদ্বন্দ্ব, ডা'হন,  
বাটর আর বনমোহনের লীলাক্ষেত্রে। শকাব্দ পূর্ব পটী  
চোপলার কোণে মধ্যে আছগোপন করে নৌকার ওপরে চুপ-  
চাপ বলে থাক শিকারের আশায়, মশার নিবন্ধর কামতেও  
নড়বার উপায় নেই একটুও,—সামান্য শব্দ পেলেই ক'ককে ত'ক  
জুড়ে যাবে ওখান থেকে। ডানার ব্যপটে কোথায় যিপে যাবে  
পর্যায়ের মধ্যে তাই ঠিক আছে। বোল আর বুলি তীব্রতা  
উপেক্ষা করে দুগুণত্বফল হবে সে এক পরবীর প্রতীকা।

কিন্তু এ সব কেমন পাল্লে হ'য়ে এলো একমিনি। এ কি  
আবার শিকার! স্মরণিনের পবিত্রমেঘ ঘল তরেকটা ছিন্নকট  
বনমোহন কিংবা বিগত-প্রাণ প্রতিদ্বন্দ্বপ্রতি—এতে যেন মজুট  
পোষার না। 'বিপ্লবের' ছাড়া কোন মানে হয় না শিকারের।  
লাফ নিয়ে লাড়ু হ'সাত এক বিবর্তিত স্তম্ভ শব্দলের শিঠের ওপর  
বলে কটী তোলাব আনন্দট আলাদা।

কিন্তু সেখানে বয়স বয়স টাইগার যেন একবারে হাজের  
মধ্যে এসে থা বিলো। শোট-গ্যাঙ্কটে স্নানে ভল্লি হ'লে  
বিলম্বাহুহ—নেপালের কাছাকাছি কোন এক দেশীয় রাজ্যের  
হোদাদ-চোবকা অমরোতর একমাত্রি হলে। পোক্ত শিকারী।  
তদ্ব্যতীত তাই কয়েক গজের পূর্ব গজ শুনে যেতাম। আবেগ  
বন ভেঙ্গে বিদ্যাবগতিতে ছুটে চলেছে হাতী। সাওদার ওপরে  
বলুক বাগিয়ে বিলম্বাহুহ। বড় দোলায় চ্যাটেব নীচে  
চকচক করে অগ্নি সূত্রহুতে চোখ হুটী। হঠাৎ একসময়ে  
থবকে ঠাড়াণো হাতী। ত'ত তুলে কুৎসে লম্বজ বন কাঁপিয়ে

তুললো। ঠিক সামনে একবারে মুখোমুখি এসে কাঁড়িছে  
পথিগুটী ভোণাণ্য একটু বাধ ত'কি মেঘে বসে লবেগে  
মজিতে আছকছে তাই পোলে হু'গত লম্বা লাফ। এর অর্থ  
কেন শিকারীর অজানা নয়। হাতীর শিঠের ওপদ উপর হ'য়ে  
ওরে টুপার টিপালো বিলম্বাহুহ। কলস কাঁপিয়ে এক চক্কাৎ,—  
মেঘের দিকটা অনেকটা আর্জনাভের মতই পোনালো। তাই পর  
কুলিদের লাহাযো বাঁশের সঙ্গে বেঁধে তাকে আনা চলো লগরে।  
কম্বাঙ্কলো বলম্বা লম্বা বিলম্বাহুহের চোপ-চুপের চেহ'রও  
যেন বরলে যেতো। কিন্তু মপ নিচো দুখের শুনীভলো, আর  
উচ্চল ছুটি চোখের তাহার কেঁপে কেঁপে উঠায়ে জললের নিবিড়  
ছায়া। আঘাতের লতীবও বক্তব ভোরাব কিছ তাই পথের  
কেনন একটা মজুট হুটীরে লগরে প্রাণ আর শিগার।

যদি শিকারের ওপর দু'ব জোর কিত না বিলম্বাহুহ।  
বলতো, নিশানা ঠিক থাকলে আর কলিঙ্কাই লগল থাকলে  
থাকবে থাকলে ক'বা খুঁব বড় কথা নয়। কিন্তু শিকারীর ওজানী  
হচ্ছে ওমহব'বাম শিকারের।

ওমহব'বাম, সে আবার কি? প্রথমটা বুঝতে মজুটকাই  
হ'য়েছিলো আঘাতের।

ওমহব'বাম হচ্ছে ভাঙ্ক,—কিনিক দিয়ে উঠতো বিল-  
ম্বাহুহের লম্বা কাঁড়ের লাব। জোৎস্না-বাত্রে কলপেট মজা  
খের ভাঙ্ক বদন টলতে টলতে মজিব'ব মজন হ'পারে হেঁটে  
হাতী ঘেঁষে তখন অশুর্ষ ছপ তাই চোলায় গহিতে। লম্বা পায়ে  
দোমে এখনো ওখানে আটকে থাকে মজা জুলের পোকা,  
প্রসারিত ছুটি লাত যেন দুঁকে বেড়াব জীবনের সাক্ষীকে।  
ঠিক যেন হয়, ছুটি চোখের তাহার দিগে কলহে—

সেই তো লবী মাটির কোলে

পড়তে গেছে হেথই চলে

তা'ই যদি আর গিব-অতলে এলিবে যা'ব আণে—

ভোগ্য করে ঘাই প্রাণটা বেলে

বুক ভরে নিই ভালবেসে

এ-কীমনেব বৈ-ক'টা তিন সাগরে আজও বাগে ।

এই ভাস্করিকার কবাই শক্ত বাপাশ । গাড়েব ওপন মাটা বাঁধল নিষ্কৃতি পাওতা বার বাঁধের ডাট খেঁক, কিছ বে কোন পাড়ে তব-তব করে উঠে ধাবে ভাস্কর—কোন অশুবিধা নেই । চারপাশ বা গাওয়া ভাস্কর যদি হয় তো কবাই নেই ।

ঘট্টার পথ ঘটা লাইতরী-কমে বলে চলতে আঘাতে শিকার-পক্ষী । একদিন বিলবাগড়ের নিকটে বন্দো : আপনাতো হে দিকারো যুব কোঁক দেখেছি । মাকে মাকে যান না কি এতক-ওতিক :

চোখে মুখে চতাল কুটে উঠিলো

নৈবাগড়ের ছায়া ।

কেন আপনাতা তো মাকে মাকে যান ভাস্করবন অকলে ?

হেসে ফেলি যাব । কোটী কাকার সঙ্গে প্রবন্ধবন বাওরা মাংস খেতে বড়ো নৌকার লাগানি টো টো করে কুঁচ খাঁর এতক ওতক চড়ানো আবারো জমির খোঁজবত নেওয়া, কোথায় ক'টি দিলো চৌবাং, কিবা বাহারিতি আল তুলে কে বাড়িরে ফেললো মিছের জমির সীমানা । তাও এসব সেকেন্ডে নিম্বুধ ধারে চুপি চুপি বেধিরে পড়তান গুজনে । কিন্তু ওট ধারে কুটিকওয়াল হ'লি কিংবা কোটী আকায়ের ওলবায়—বাল-ওট পর্বত ।

আপনাতের যদি অশুবিধা না তব তাই পুকার তুলিতে চলন না আমায়ের ওতিক । মিছেরে ডিকার্ড কবেই কবেই আনাতের । বিগ গেয়েবও অভাব নেই । বায়েন ?

অশুবিধা ! আনকে আমায় আর প্রোমেনের কবাই বৈব চলো না । আনাতের অনেকদিনের বস্ত্র এভাবে বণ নেবে ভাবাই বায় নি ।

পুকার কাছাকাছি কিন্তু একটু পোলদাল হ'বে খেলা, বিলবাগড়ের বন্দো, দুইশে পচে গেছি । সুসৌরী থেকে বাবা লিখেছেন দেখানে যেতে হবে আমাকে । কিন্তু আপনাতেরও কথা জিহবে, কি কবি বলুর্ন তো ?

কথা কুটলো না আমায়ের মুখে । পুকারটা একবারে হাতের কাছে এসে এ ভাবে পাপ কান্নিরে ধাবে তাবতেও কই কতে লাগলো ।

সগাধনে অবর্ত বিলবাগড়াই কবে দিলো, আপনাতা যদি কিছু মনে না করেন, আমি আমায়ের কবাই-অশুবিধকে দিবে

গিতে শাবি । তিনি সমস্ত দেখা পোনো কখনে । কোন অশুবিধা হবে না । আপনাতা বাংলা যথেষ্ট । বাওরা বাওরা আর দিকারের সব বকাবক তিনি করে ফেলেন । আমি যদি কি—আপনাতা উকনেই চলে যান ।

অশুবিধা ।

ছোট্ট টেশন । কাছাকাছি কাটকে থোকা পেল না, বিশেষ কিছুই দুইশেই পড়ে গেলো । টেশনের গেটের বাইরে এসে দেখি কাকে পাটন পাছটার তলায় দাঁড়িয়ে একটি লোক । এই খাড়া পাইন গাছটির সঙ্গে কাছাকাছি ঘেঁষে দিল বকেতে লোকটির । মাথায় পোলাব ছাট, খাকি পোষাক, তাবটে পাচের বং, কিছ সব চেয়ে আগে নকবে পড়লো তার দুটি অলুআল চোখ, সে চোখের পরিচয় তার গভীরে । দুটিপাতে মনে হয় সাক্ষী-লাইটের মত, মনোব অলুআল পুকার অলোকিত হ'বে ওঠে ।

আমায়ের দেখে এগিয়ে আসলো কুলজিত । বিলবাগড়ের বেকা চিঠিটা পড়ে সাময়িক তাববারে সেদান হুঁকে বন্দো, আপন আমায় সঙ্গে ।

একটু বুকেই মোথের পাড়া ছিল একটা । তাতেই উইলাম দু'মনে । কুলজিত বালারী বায়েব একটা ঘোড়ার চড়ে পাশে পাশে চলতে লাগলো । পথের দু'পাশে ঘন অগাধের চাপ ও গিলের বেলাতে ক'তক অবিরাজ ডাক । পাচড়-কাটা গুব । এ পাশে ওপাশে বড়ো বড়ো কালো পাচড়ের জু' । অগাধের কোল বেঁধে ছোট দুটি বাংলা প্রাণ একই মাথের । ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নেমে পড়লো কুলজিত । নানুন, এসে দেখি আমায় ।

পাইন আর বনবাউরের মধ্য দিয়ে সোদা বাজা । সামনের জেব টুকেই থমকে দাঁড়ালাম আমায় । বরজাব কাচেই একাও দুটি বায় খাবা উঁচিরে ত'ব শেতে অরছে । নীল কীচেব চোখ-জলো-জলো বণ বণ করে । এ পাশে ও পাশে ভাস্কর, হবিগ, চিতা নানো জন্তের মাথা টাটানো খেলো । দুটি কীচের কেসের মধ্যে কণা তুলে অরছে বৃত্ত আকায়ের দুটি সাপ । কিন্তু জেবের কোণের দিকে চেয়েই পাখরের মত নিদ্রল হ'বে দেলাম । বুঝে একটা বেতের চেগারে অশুভ পুকার একটা মেরে বলে আছে । বোলা হুলগোলা ভরকে ভরকে মেনে এসেছে কীদ আর পিষ্টেব ওপরে । মাছবের পিঠের দ্যবে এত সান্না হ'তে পাশে এ আমায়ের । বাবপার বাহিরে ছিলো । জেবের এট অশুভ পরিবেশে কেনে বেন মনে হাছিলো খেজেরিক ।

এতগুলো লোকের পায়ের আওয়াজেও কিছু মূ'ব তুললো না হেসেটা । পতী মনোবোশে হাতের সেলাইয়ের কাফ হবে বাড়িলো । কুলজিত একটু এগিয়ে দিবে ডাকলো—বাজা ।



ଉପରେ : ବେଢ଼ା । କ୍ଷତ୍ରୀ—ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର କବି । ଯାହା : କାଳିନ୍ଦୀ । କ୍ଷତ୍ରୀ—( ବାରେ ) ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର : ଯାହା  
( ବାରେ ) ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଚାଟାଢ଼ା । ନିତେ : ଶାନ୍ତ କାଳେ । କ୍ଷତ୍ରୀ—ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର କବି ।





চব্বসে উঠলো মেয়েটি। দাঁড়িয়ে উঠলো চেয়ার ছেড়ে, নিজস্ব কাপো দুটি ত্রোণ, খেত পাখরে কৌশলই কল্পা দৃষ্টি। মাথার কি এক স্পন্দন হয়।

এঁরা আশ্রয়ে অতিথি, কিলবাগাহু সার্বভৌম যত্ন। শিকারের ক্ষত এসেছেন।

হাত ছুটো জোড় করে নব্বাংর ভাবলো মেয়েটি, কিছুকণ কোন শব্দ নেই। সকলের নিঃশব্দে আওগাহও যেন শোনা যাচ্ছিলো। হাতের ফোলাইটা তুলে নিয়ে আঙুলে আঙুলে ঘন ঘন ঘেঁষে যেখির খেল মেয়েটি।

বহাতই বলতে হবে। এখানে আদার দরক সঙ্গে তক হলো পালতে বসি। পুত্র পুত্র মেঘের চাপে অন্ধকার হয়ে আসলো চারখিক। মরুতা, দিলতার ওক আর ইংকনিস্টানের পাগ-জলো তুলে উঠলো এতও বাতাসে। অনেককণের পাহাড়ী কোয়ার কলোজ্জ্বল আওগাহও চাপা পড়ে গেলো।

কাঁচের পানী বহু করে ঢায়ে মধো বসেছিলাম আদি আর প্রেমনে। পানী বিয়ে কুলজিতের বাগলোটা ঝাপা জেবা বাহু, আশ্রয়ে তবারক কববার হুত পাগ্লিজেছে বেসালী চাপা মরুক।

বাইরে হুশ হুশ করে একটা আওগাহও হুতই লাঞ্ছিতের বাইরে এসে দাঁড়ালাম। অনেকটা কমে এসেছে বৃষ্টি, কিন্তু কেবল ডাকের বিদায় নেই। বহাতি পায় কুলজিত এসে দাঁড়ালো, দেখেছেন কি বাসনা। মনটা পর্বত জিহবে যেন লগ লগ করছে।

আগুন, আহুন, এতধরে মরব মধো বসী মর তো আর পাবা থাক না—গতি যেন হাঁপিয়ে উঠেছে এমনি একটা ছুঁঝ ভাব কলো প্রেমনে।

না, এবার বহাংর পবনাতু প্রায় শেষ হয়ে এলো। আর বড়ো জোব দিন কুলজিত। তবে শিকারের পক্ষে জাবী অনুবিদা। পবনাতু এমন শিল্প হ'লে থাকে। চেয়ারে এসে বসলো কুলজিত।

এ কথা সে কববার পর প্রেমনে হঠাৎ মায়ামেবীর কবাতা জিজ্ঞাসাই করে বসলো।

একটু নড়ে বসলো কুলজিত। পা ছুটো ফেরতক বসলো হু একবার। তাগর খুঁ আঙুলে বসলো—আপনারা বা অনুমান কয়েছেন তা তুল নয়। উনি ঠিক এখানকার মেঘে ন'ন। আদি তঁকে নিয়ে আদি অনেক পুরাথেকে। তখন কবায়ার্ডার একটা তিমলী টান ছিল। আবার কোন হয় তঁর হাতে মিলেই ছোঁচাওয়ে মরছে। এমনও হ'তে পারে—শিকার কলজিত অথবা কাকমজাঝার ছুঁঝার উঠতে বাঁচা সব আশ্রয়ে সমুদ্রের ওপার থেকে,

তাগের মর্যোই কেউ তবত বসবার করে থাকবেন ওদের প্রাণে। কিছুই আভাষী নয়।

চুবাটটা চেয়ারের হাতলে ঠেকে ঠেকে হুটুঙলো ফেলে দিলো কুলজিত। অনেককণ মাথা তুললো না। আবার যেন ফেরলই মনে হ'তে লাগলো, ছাউ নয়, অত কি একটা ভাবনা ঠেকে ঠেকে সে যেতে ফেরে। তবত আশ্রয়ের কাছ থেকে খুটো আভাল কববার মজই এভাবে মরব নিচ্ছে।

অনেককণ পরে খুঁ তুলে আশ্রয়ের বিকে অনেককণ ফেরে হুটলো কুলজিত। আশ্রয়ের চেয়ে ও কি ফেলো কে জানে! তবত বিদায় কববার মতন কিছু পেয়েছিলো, ছাউ এক সময় আঙুলে আঙুলে বসলো ঠেকে পাওগাহও এক আশ্রয় ব্যাপার।

জাভা পানীর খাঁক নিয়ে ঠাণ্ডা হাওগাহ তলক। হাড় পর্বত ঠাপুদী বিছির বের। উঠে নিয়ে একটা মোড়া নিয়ে ছুটোটা বহু করে বিদায়। মজালাকিত মজা পাহাড়ী বহাংর মধো কেমন যেন পথকায় আওগাহ কুলজিতের। কাঁচের পানী ওপরে মাফাতু খেতে পড়ছে পাইনের পাতাঝলো। অনেক দূর কোথাও নটি আর পাখর ডেকে ডেকে পড়ছে মোহাংর কুলজিত। মরিয়াত বিদ্রোহের গিলিক।

সেবারে এতক বহা। মনদিন খেত একটানা জল আর বহু। পাহাড় থেকে মলের জোত মেঘে মাগে পায়ের কয়েকটা প্রান মেঘবায়ের তাকিয়ে কোথায় নিয়ে বেগো জাব ঠিক নেই। একটা গাছের শিকড়ের আটকে ছিলো কুলজিত। বোঝ হয় বহাংর দাঁকো পায় বহাংর মরব সেটা তেও পড়ে কোথায় ওপর। তাগ ভালো, গাছের শিকড়গুলো খুঁ মনোটা ছিলো, নইলে সেই জোতে কোথায় তাকিয়ে যেতো ঠিক আছে।

তা তো খুঁসাম, কিং, দু'মন আবার কে? দু'মন বসলেন না: জিজ্ঞাসাই করে ফেললাম।

ছা, ওহই বসী আর একটা পাহাড়ী ছোঁঝা। কিন্তু সে বেচাখিক কোণা মেগো না কিছুতেই। ঐকে বহুতই তুলে, বিয়ে দিয়ে বেরি হেলোটি তাকিয়ে গেছে।

যেন কিছুকণ হুচাপ। কিন্তু ফেরলই মনে হ'তে লাগলো যে, ইচ্ছা করেই হুত তোলা মরনি হেলোজিক। এমনও হ'তে পারে বীচবার মজ প্রাণপণে চোঁটা কয়েছিলো হেলোটি, চীংকার কয়েছিলো। খেয়েটন নাম মর জেবেও ছিলো হুত। কিও শিকারীর পক্ষে কি বাগা হিলো কোমার থেকে বীচকানো কুলজিত বের করে যে শিকড়ের ওপর নির্ভর করে তাকিয়েছিলো হেলোটি, সেটিকে কেউ নেওড়া। দু'মনের লোকে বাই তো করে থাকে।

কুলজিত, সেল হাথার অনেকক্ষণ পর শব্দান্ত এলোথেনো  
একবার ভাবনা দিয়ে উঠলো আদ্যোদেব ।

আরও বড়ো বিষয় বোধ হয় অশুভা করছিলো আদ্যোদেব ভক্ত ।

তাহা পূর্বের দিন সন্ধ্যায় পূর্বে গল্প করছিলেন তিনজননে ।

কুলজিতের শিকারের অভিজ্ঞতার গল্প । বঁকাই ছেড়ে দিয়েছে ।

আজকালের মধ্যেই শিকারের যোগ্যোনা যাবে—এই আশা করছি ।

ঠাঁও কথায় মধ্যে চমকে উঠলো কুলজিত । সেটা হ'লে

বলে কান খাড়া করে হইলো কিছুক্ষণ । আদ্যোদেব উৎকর্ষ হয়ে

হইলো । অনেক দূর থেকে যেন একটা বঁকাইর দম আসছে ।

পাহাড়ের ওপর আরহ হ'লে ছড়িয়ে পড়ছে বঁকাইর শব্দ । বঁকাই

না তো, যখন হ'ল আদ্যোদেব পারহাট যেন ঝাঁপছে গমকে গমনে ।

অনেক দিনের কথাটা কাহা ।

চোখের ছেড়ে লাফিয়ে উঠলো কুলজিত, তাহণব চুটে বেধিয়ে

গেলো । আমি আর লেমনে প্রভুনেই ব্যাখ্যায় এসে ঝাঁপলাম ।

বাইরে দিকের অন্ধকার । গাছে গাছে জোনাঝোনা বোকা । ঠাঁও

দূর কিছু তের করে একটা নারীকণ্ঠের চীৎকার ব্যাভাসকে চিবে

অনেকটা আত্মনামের স্বপ্নম খোলালো, তাহণব বদে এলো

চীৎকারের বর্ণ । কে যেন ঝাঁপছে আত্ম আত্ম । বঁকাইর

আওয়ার দূরে দিগন্তে ছোটে লাগলো ।

প্রেরণে ব্যাখ্যায় অজ পা ব্যাভাসেই ভলী বললো : বাধেন না  
হুইব ।

শিখর দিগন্তে বেলান দগ্ধী এসে ঝাঁপিয়েছে । কখন যিনতি  
ভায় হুই চোখে ।

ও দিকের আওয়ার ভলী, কে যেন ঝাঁপছে ?

বিড় বিড় করে কি বললো ভলী । শব্দ বোকা  
কথাগুলো ।

কে যেন ঝাঁপছে ভলী । আদ্যোদেব ব্যাভাসেই হবকা ।

না হুইব । পূর্বদিকের করে ঝাঁপলো ভলী : উনিই

ঝাঁপছেন । ওই বঁকাইর আওয়ার হলেই ওকস হ'ল ।

তাহা যখন ? পূর্বে ঝাঁপলো প্রেরণে ।

ওই বঁকাইর আওয়ার তনলেই উনি চুটে বেধিয়ে যান ।

যদিব সাধের পূর্বে পূর্বে আবার থরে নিয়ে আসেন । তাহণব—

কপাটো দেখ করত পাছলো না ভলী । ব্যাখ্যায় খুঁটিটো

চোখে করে কীপতে লাগলো । কিছুক্ষণ পর কপালের বাধ হুই

কললো সে চোখে দেখা যায় না হুইব । পিঠি বেটে বক

কোতোতে থাকে । সাধা সাধে কাল শিখা পড়ে যায় । তখন

অনিবার্যের চোখবাই পাটে যায় । খোলা দিগন্তে ওপদ

কেবল ওঠা-নামা করে চাবুক । কিছুক্ষণ পরে নিজেই কল নিয়ে  
এসে দ্বিটিতে যেন ওর চোখে-দুখে । আলমারী থেকে হাভব  
বোতল খেব করে ও'র দুখে আত্ম আত্ম ঢালেন । আমি একদিন  
জানিবার ভাঁক দিয়ে সন্ধ্যা বেধছি হুইব । তিনদিন তিনবার  
আমি হুইফট, ক'রে বেধিয়েছি । একটু দুখতে পারি নি ।

পাণ্ডে পাণ্ডে থরে থরে আসলাম আমি আর প্রেরণে ।

কিছুক্ষণ পরেই করে এসে চুটলো কুলজিত । নির্জিকার চোখায়া ।

উজ্জ্বলময় সামান্য বেশটুকুও নেই । বেতের চেয়ারে ব'লে পড়ে

বললো—একটু বেধী হ'লে গেলো । ব্যাভাসেই লাগলো দেখেই

আসলাম । দিন, আপনাতা স্বপ্নম খেতে : বেধী করে লাভ কি ।

তাহণব চুটলো অনেকদিন আগেই ভিত্তাখায় শিকারের

কাহিনী । কি ভাবে ওকে হাতাহাতি লড়তে হ'লেছিলো ভিত্তাখ

সত্তে । যাড়ের কাছে এখনও লাগ আছে চিত্তার ব্যাখ্যায় ।

বঁকাই খেয়ে দিয়েছে । ছেঁড়া মেখেব ফ'কে দিগন্তে বোলেবও

আকাশ পাওয়া গেলো ।

আপনামের কলেজের চুটিও তো হুইবে আসছে । দিন,

আর কতী মর, কাল ভোবের দিকেরই বোলেবোনা বাধে । গোবায়

পাহাড় এখন থেকে মাইল দূরেক হবে । দেখানে পৌঁছে

হুলাইবের দিগন্তে নাড়া বঁকাইর বন্ধোবস্ত্র ক'রা বাধে । দূর পাহাড়

কাটা পথ পাণ্ডে হুইটো হুইটো আর কিছুতে ব্যাভাস চলবে না । যেতে

কষ্ট হবে না তো ?

এ কথাই কোন উত্তর দিলো না প্রেরণে । বন্ধুটো শেড়ে

নিরে মল পথিকার করত মুক কললো ।

হাললো কুলজিত : তা হলে ওই কথাই হইলো । আমি

তৈরী থাকবো : ভলী লগে যাবে । সাড়ে তিনটা নাগার উঠে

পড়বেন, না হ'লে, বেধী হ'লে যাবে ।

নাচ রাতে একটা হুই টে আওয়ারে বিহানো ছেড়ে উঠে

বললাম । যান হ'লো কে যেন অনেকগুলো ঝাঁপে বসেন

আজকে আত্মে ভাঙছে । প্রেরণেও উঠে অগচ্ছিলো বিহানাত ।

কি ব্যাপার বললো তো প্রেরণে ?

কি আমি, কুলজিতের ব্যাভাসের দিক থেকেই যেন আসছে  
আওয়ারকাটা ।

হুইমানেই ব্যাখ্যায় দিগন্তে ঝাঁপলাম । দিকে জোৎস্নার আদ্যো

কোনা আছে লগে কিছু । পাইনের আত্মলে ব্যাভাসের কাঠোমোটাও

আম্পট ।

: একবার ব্যাভাস উত্তিত—কি বলো : হুইবে 'কললো' যাবে,

কি পতীর যাবে অদ্যো আওয়ার পা ব্যাভাসেই সাধ হ'লো না ।

গ্রেমেন কিছু দি'ছি দিয়ে নেমে গেলো হু'এক পা। বাবা হয়ে আদ্যাকও নামতে হ'লো। কিছুটা নেমেই বেখলায় আর একজন কে উঠে আসছে ওপরে।

কে!

আজ্ঞে আদি—হরীর গলায় আওয়াজ।

ও বাড়ীতে কি হয়েছে কলী।

মজা থেকে ওঁকে পাওয়া হয়েছে না। মনিবসাহেব কাছে পিঠে সমস্ত তর তর করে খুঁজে দেখেছেন। এখন যাবেন নঃ ওসিকে। মনিবসাহেবের দ্বাখার ঠিক নেই। হাতের কাছে হঃ পাচ্ছেন, তবু হু'দ্বার ক'হছেন।

জের ভিতর আবার কিংবদন্তি আসলার হু'জনে। হুটো চেতাবে হু'পচাপ হ'লে বইসার কিছুকণ। কেমন যেন পালিয়েল ব্যাপার। এতদিন তবু খুঁজি থাকের জোরে ফুলজিত আটকে রাখতে চেয়েছিল দ্বাখাসেবীকে। বহুকার নেই আর দিখাবে। কালই বক্তা হ'তে হবে বাড়ীর দিকে।

চেতাবে হ'লে হ'লেই বোম চর খুঁদিয়ে প'ড়েছিলাম হু'জনে। ওঠাৎ কলী'র আচমকা ডাকে বড়মত ক'রে উঠে প'ড়লাম। মনিব সাহেব নীচে অপেক্ষা ক'রছেন আপনাবের জন্য। সবথ নই ন্যাক কে শোখাত প'রে আর বন্ধু'ক নিয়ে নীচে নেমে আসলাম।

আব্বা! অককার। কীটমায় চাঁদের আলোয় দেখা গেলো—গেটের কাছে একটা ওক গাছে ঢোলান দিয়ে চূপ ক'রে পিঠিরে আছে ফুলজিত।

আগা কবি অনেককণ অপেক্ষা করতে হযনি আপনাকে।

কোন উত্তর নেই। কথাকলো ফুলজিতের কানে গেলো হ'লে যেন হ'লো না। জোব পায়ে সে এগিয়ে চলতে শুরু করলো।

আজ্ঞে আওয়াজ থেকে বেগোতাই প'স্ট দেখা

ফুলজিতের মূর। এলোহেলো পিকল চুলের দ্বাখ। কপালের হু'পাশের দিখাতলো ঘোটা হ'রে ফুল উঠেছে। চোব জুটায় অস্বাভাবিক দীপ্তি। বাব বার নীচের ওঁ'টোটা কামতে বাকু হ'তে দিয়ে। কোন কথা আর তাকে দিখাতলা করতে লাগল হ'লো না।

মাইল চুয়েক চ'লবায়ু পড়েই হাঁপিয়ে উঠলাম। হাতা প'র। তার ওপর ফুলজিতের সঙ্গে পাতা দিয়ে ঢলাও অলম্ব। খুঁটের ধারে পট পট ক'রে ছিঁকে থাকে বুনা লতাকলো। চুয়ে পড়া হু' একটা ভাল কব কপালে আর ধীরে এসে লাগছে। কিছু

জরকণ নেই কোনদিকে। গ্রেমেন আর মজী বেশ পিছিয়ে প'ড়েছে। পাহাড়ের বাকি দেখা যাচ্ছে না তাহলে। অপেক্ষা যে করবার সে উপায়ও নেই, তা' হ'লে সমস্ত মনলোব আড়ালে রাখিয়ে দ্বাখের ফুলজিত। এই জুঁটেরে মলল থেকে তা' হ'লে আবার আর বেগোতাই উপায় থাকবে না।

বেশ কিছুকণ চলাব পরে জলসের সীমানা পার হ'রে এলাম। ছোট ছোট কাঁটাপাছের বোশ এ-ব'রে ও থাকে। পায়ুন ব্যাড়া পাগাড। ওপালে উপত্যকা। অনেক নীচে পাহাড়ীলো গ্রাম। অককার অনেকটা পাতলা হ'রে এসেছে।

একটু এগিয়েই বন্ধু'ক পিঠিরে পড়লো ফুলজিত-এর মূক হু'টো হু'টো দেখতে লাগলো একি ওসিক। শিখারের গড় পাতলা ফুলেরে মতন নাকটা দি'টেক মটি ত'কে ত'কে এগিয়ে গেলো কিছুটা, তারপর কিংবদন্তি হ'রে পিঠিরে বইলো। মলল বৃষ্টি বৃষ্টি চোখে। বৃষ্টির অলম্বল ক'রে আদি যা দেখলাম, তবুও অনেককণ কথা বেগোলা না আবার মূর দিয়ে। সবকঃ বার'রে থেকে দেখতে পাহারও করা'র। বুনা পাছের মন জোপে তিকরের কিছু মজাওই পড়ে না, তা' হুটো ঢালু জমি হ'লে হ-পাল থেকে বোঝাও মূলিল। কিছু এলোহেলো ব্যাসে হু'লে উঠেছিলো পাতাচলো, তারই ক'ক হিটে বতীন পাতীর টুকুণে আর পালন আর একজনের কাকড়া চুলের কিছুটা দেখা গেলো।

ফুলজিতের দিকে চেয়েই চাঁদকার ক'রে উঠলান' আদি। ধীর থেকে বন্ধু'কটা মাঝিরে এসে কালো পাখরের ওপর সেজা। জেথ তায় ক'হছে ফুলজিত। দরুনাল, পালন হ'লো নাকি। এখনি একটা কাণ্ডই বাহবে।

ও কি ক'হছেন, বন্ধু'ক লগান। হাত শিরে তার বন্ধু'কের মলটা সবচেয়ে খেতেই আবার দিকে তাকি বৃষ্টিতে চাইলো ফুলজিত। ধাতকলো ক'হতে হ'লো।

বন্ধু'কের আওয়াজের সংগেই ছুটে এলো গ্রেমেন আর কলী। ধারে ক'হছেই কোথাও খুঁজি ছিলো ওয়া। তখনও অলম্ব অলম্ব ঘোঁরা উঠেছে বন্ধু'কের মল থেকে। জোপের আড়ালে আনত আঁটান।

কি ব্যাপার, বাব খুঁজি। ব্যালেন হ'রেছে তো, খুঁজে পড়ে চোব ভিড়িয়ে একি ওসিক দেখতে লাগলো গ্রেমেন।

খুঁজুলো না ফুলজিত। বন্ধু'কের মল মলটা আলতো জেপে ধ'রে বললো, না বাহিনী, বাহটা ধোর চর এখাবেও পানিহুইছে।



# শুধু শূন্য

শ্রীমদ্বাংসকুমার রায় চৌধুরী

দুহু-বৌ উঠানে এলি দিছিল। সেদিন ঠগু পুছো  
হলেই বহুবার নিত্যোন্নত হু পড়েছিল। এলি পিত পিত  
ভাষ মনে পড়ে গেল। এলি একদিনে তার ঝি হয়েছিল।  
কী কী সেদিন। শুধু তার বহু ভাষে কোন অল্পবিধা  
বীভূত শেয়। প্রাণের সর্গের ছিলেন তিনি। শুধু ডাক্তার।  
এ অফলে তার নাম জানে না এমন লোকই নাই। পালের  
কর্জনার মাঠে তারই দৃষ্টি নিয়ে আছে। কর্জনার মাঠের  
বহু বিচিত্র মর্মভর কাহিনী তাঁকেই নিয়ে আছে।  
বিয়ের বহুর পাঁচ তার বাবা এসে জামালেন, তাঁর পুত্রই

খত্তর কিছু বললেন না, আবার কবে সে বাড়ির মত  
বেড়াইকে রাখলেন। সকালে বাপের বাড়ী যাওয়া হবে।  
হঠাৎ খট্টল অদ্যটন। পরদিন সকালে খত্তর বললেন, না, বৌ-  
মাং বাত্তার পরকার নাই। বেগানের অস্ত্র নাই  
গ্যাপার কি। বাবা বললেন—অস্ত্র নাই কি রকম

খত্তর বললেন, আমি কেবে এসেছি তিনি তাইই আছেন।  
আমাকে মল যাওয়ালেন। তারপর গায় করে চলে এলাহ।  
—তাং যানে!

—যানে এই যে, আমি কাল হাতিয়েই নিগে গিয়েছিলাম,  
আবার ভোর না হ'তেই ফিরে এসেছি। বিধা না শু বাতী  
ফিরে ফেরে পড়েন, সব শোবে একটা গাছের ডগা বসিয়ে  
লেখে এসেছি।

গভীর নিততি রাতে বহু বেজির পড়েছিল তার বহু-লাঠি

নিয়ে। খট্টার বহু মাইল বেগে সে ছুটেছিল। কর্জনা থেকে  
নিগণ অনেক দূর। বহু-লাঠিতে ভর দিয়ে মাঠ, বাগ, বিল  
পার হয়ে নিগণে বহন শৌছলো তখন রাত হুপুর। কখনও  
বা চলতে চলতে পাশের শেয়াস, সাপকে ছুটে পালাতে দেখে।  
পোকা মাকড়গুলো বহু বহু করে গুঠে। নিততি রাতে বহু  
শন করে বহু ছুটেছে। কোন দিকে গ্রাভ নাই। তার কোইয়েচ  
কথা ঠিক কিনা তাই সে কেবতে চায়।

এই বহু ভাষের দিকে ফিরে আসে। এ বহুগেও তার  
সামর্থ্য ও শক্তির বাহাত্তরী আছে।

দুহু-বৌ এ কথা ভাবে আশ মনে মনে হাসে। তার মা  
বাবা, বহু-বাত্তরী কেটে নাই। এমন কি যামি পুত্র পথ্য  
তাঁকে অলসতার অবস্থার ফলে জেমে চলে গিয়েছে।

একদিন স্বামী বললে, সে বর্জমান বাবে। বিশেষ পরকার।  
বিন করেই দেবী হবে ফিরতে।

বহু তার বাঁশের লাঠি নিয়ে কর্জনার মাঠে ঝড়িয়ে ছিল।  
তার পাশ দিয়ে লোক গেলে আর বন্ধা থাকত না। হাতের  
ছোট লাঠি ছুটে চপুতো বহু বহু শব্দ করতে করতে। তার  
আঘাতে বহু-বহু মাথা তুলে ঝড়িয়ে গ'ত না। একদিন  
সেই আঘাতে দুহু-বাপের হাতে প্রাণ গাওয়া। তার পুত্র-  
হত্যার প্রাণভিত্তি করতে বহু সন্ধ্যায় নিয়ে বেশে বেশে ঘুরে  
যেতাকে লাগল। স্বামী-বহুও হাবিয়ে দুহু-বহু বিধা তাঁ এই  
কর্জনা গ্রামে রাস করত। বহু অকণ্ঠ সাধায়া অত্যা

তোম পড়ছে। ছোট একখানি ঘরে সে থাকে। পাল  
পড়িত বাতী তা খা করছে। ছোট একটু উঠান তার ঘরে  
সাজে। বাতীর পুতি নিয়ে সে সেইখানেই বাস করছে।  
কবি বা ছিল কোটা হুয়েক ডাকতি মাঘদার কবু সন বিয়েছে।  
হৃদয় চাই কর্ত। হৃদয় নবীং নিয়ে ডাকতি ভায় সাগ  
ত সাধারণ্য তাং ছিল না।

নিম্ন অবস্থায় হৃদয়-বো গিন কাটাং। গ্রামের বান বেনে  
লোকের কাম করে গিন ঢালায়।

সভায় অন্ধকার নেমে এসেছে। হাতীর প্রবীণ জালিয়ে  
হৃদয়-বো ঘর বসে কি করছে। হঠাৎ কানে ভেসে এল—  
বৌবা, বৌবা! বপু বপু করে কে বেন ঘরের সামনে এসে  
বীড়াল। নিছন কিরে দেখে তার মতর হু অবাধ বিয়া  
চেষ্টা আছে। চোখ ভুটা খোলাটে হয়ে গিয়েছে। মাথাং চুসে  
তেল নাই অনেক গিন খেত। পেত্যা খালখাড়া ও তোলা,  
কলুকে দেখে হৃদয়-বো হাট্টি মটি করে কেঁপে তার পায়ে কয়ে  
পড়িয়ে পড়ল। বহু স্তম্ভিত হয়ে গেল। কিছু কল্পল না।  
কোলা মাঝির ঘর থেকে বাইরে এসে বীড়াল।

হৃদয়-বো এত খটি ভল এমন হুং পা হুয়ে গিলে।  
খাঁসল গিরে হুগিরে গিরে বসল, বাবা, ফেরতক কেনে এ কই  
কেন্ডা কেন? আদি তো আর এ আগলে থাকতে পারি না।  
সব চলে যাচ্ছে, মাথাং আর বাওরা হচ্ছে না। এ পুতি বেন  
কিছুতেই মাথাং বন থেকে হুং যেতে চায় না।

বহু সাধনা গিলে। তাপাকে বিজ্ঞান গিলে। দিগ্ভর  
বিলত পুতি বনকে ভুকে ভুকে মাথাং হানল। সে বাঁধ  
কোটে গেল। হৃদয়-বো জামল এবাং পত্তর বাতীরে থাকে।  
কিন্তু সকালে উঠে আর হুয়েক দেখতে পাওয়া গেল না। মকাবে  
এসে ভোয়েই সে মাথাং নিরুশেষ-খাড়া হয়েছিল। তার অতি-  
পত্তর জীবনে এসেছে প্রত্যাশ। বাবা মকাবে গ্রামকে জন পড়ে,  
অবধ পালে রেতে মন চায়। ভায়ে, বৌবা কি এখনও তেমনি  
চায়ে পুতির ভিতার আঁতরি গিয়েছে না কি? এখনিভাবে অতর্কিত  
আর কয়েক বার হু বাতী এসেছে। কিন্তু বৌবাক্ষণ ঘর থাকতে  
পায়েনি।

হৃদয়-বো গিরের পথ গিন একথোরে ভায়ে ঢালিয়ে ধার। মনে  
বদন পুতির বেবা পায়েণ টেনে আসে—তখন গয়ে থাকে।  
অতীতের কথা ভায়ে আর কাঁচে। তার বদল হয়েছ, বৌবাক্ষণ  
সে বেক নবীরে নাই। বাঁধকায় চাপ চোখে হুং নবীরে  
একবার বিজ্ঞান করছে।

মাথাং পাল-বো এসে ঘরে ঢুকে বসলে, কি করছা গিরি?

এস বোন, বলে হৃদয়-বো তাকে ডাকলে। হৃদয়ে মেয়ের  
বসে মাথাং করলো অতীত গিরের কাহিনী। একবার তামা  
কাটোয়ার পত্তা নাইতে গিয়েছিল, সে কথাও ইনিরে বিনিরে বলতে  
শার্পল।

কর্ম্মনা গ্রামবানির সে সৌখ্য নাই। মজলোক কেনে  
গিয়েছে। পত্ত ভোয়ান বলতে গ্রায়ে আর কোট নাই। নিরীত  
লোকেরা গ্রাং এডে পালিয়েছে পুগিলের তরে। হৃদয়-বোও  
কর্মে গিন কাটে, এই ছোট ভিতে আগলিয়ে পড়ে আছে। বাতীর  
পুতি হুং ফেলতে কই হয়, এখানে না থাকলে সব ফুল যেতে  
পারে।

পাল-বৌয়ের ছোটবেলা মালতী হৃদয়-বৌয়ের কাছে থাকে  
সব সময়। ছোটবেলা চকলা হকিণী, হৃদয়-বৌকে কেন্দ্র করে  
তার চলে সব কিছু। সে একদিন বললে, মাঠে মাথাং পুন  
হয়েছে, জাম! হৃদয়-বো জনেছে সে কথা। হু, বলে অক্ষয়ক  
হ'ল। এইখানে একদিন তার বাবা পুন হয়েছিল। অতীতের  
কথা মাথাং তার মনকে চকল করে তুলল।

কিছুদিন থেকেই কর্ম্মনাং মাঠে মাথাং গোলমাল বেবা গিয়ে,  
তাড়া কল, কেতে নেওকা নিরতই আছে। বহুদিন পরে মাথাং  
এই বকম ঘটায় সকলেই স্তম্ভ হয়ে পড়েছে। হুং কথা মাথাং  
সবলের হুং হুং হুং বেড়াচ্ছে।

হৃদয়-বো চকল হয়ে উঠলো, তার মাথাং কেনল হুং  
লাগল অতীতের কথা। সে লাগল হয়ে বায়ে নাকি? করেতদিন  
পরেই পুগিলের লাল পাগড়ী বেগতে গেল গ্রায়ে। হঠাৎ সে  
জীবকায় ক'রে উঠে উঠে গেল বাতীর পালে। সেখানে একবার  
বীড়িয়ে সে মাথাং বেরিয়ে পড়ল মাঠের দিকে। লাগতেই মাঠে।  
হুং পুতুর আং কলল, সেইদিকে সে চলতে লাগল। কিছুহুং  
কোটেই সে হুং বেগা বেগতে গেল—এই ইজিন! লাগতেই হুং,  
সেখানে একমিনিট ঠেঁপ যায়। হৃদয়-বো হুং গিরে হাঁফাতে  
লাগল। জন কয়েক বাতী বসে আছে। ইতিমধ্যে ঠেঁপ এসে  
পড়েছে। বাতীরা ঠোঁ-নাচা করছে, একটা হুং হুং পড়ে গিয়েছে।

হৃদয়-বো কেনে ঠেঁপ হুংত আর কি। কি গেরে উঠে গিরে  
সে ঠেঁপে চড়ে বসল। ঠেঁপে তখন পর চলেছে বাতীরে মকাবে—  
এই কর্ম্মনাং মাঠ নিয়ে আর হুং সর্দারের কাহিনী নিয়ে।  
হৃদয়-বো কাল কাল করে চাইতে লাগল।

ঠেঁপ তখন চোখে চলেছে। একজন বললে, হুং বাতী তো  
এই কর্ম্মনাং গীরে। সেখানে কোট আছে কি?

—না। কেবল তার হেলের বৌ আছে। যে হেলকে সে ঐ ঘাটে বেঁধেছিল তুলে। হেলের বৌয়েরও বয়স হয়েছে। সে বোধ হয় ঐখানেই থাকে। তার আর কোন হেলে পুলে নাই।

দুহুন্-বৌ আ হা হা, বলে জানলার দিকে তাকান। তারপর ঘুরে কাশড ঢাকা নিয়ে তাঁরত লাগল ফাঁস ফাঁস করে।

ঐশ এলে খামল নিখনে। ছোট ঐশন। লোক বেশী না হলেও কম নয়। নিগন, নিগন নাম শুনেই দুহুন্-বৌ নেমে পড়ল ঐশ থেকে। তারপর চলল গ্রামের দিকে। এই গ্রামেই তাহা বাগ-বা, ভাই-বোন সব ছিল। খালেবিয়ায় মড়ক একে একে সব চলে গিয়েছে, বাড়ীঘর সব পড়ে রয়েছে—যেন জুপ। এই পাড়ার এক সমর কঠলোক ছিল, আর আর সেখানে কেউ নাই, সব পরিত্যক্ত। বাড়ীর লোক আছে, কিন্তু সে কাকও চিনতে পারে না। তাহেও চিনবার হস্ত লোক আর সে গ্রামে কমই আছে। পরিত্যক্ত ভিটেই খানিকজন সে ঘুরে বেড়াতে লাগল এবং আপন মনে কি বলতে লাগল।

—ক এখানে গীড়িয়ে ?

—আজি, আমাকে চিনতে পারিস ? তোরা মার কি ? কার হেলে।

—ঐ বাড়ীটা আমাকে। বলে ছেলেটি একটা বাড়ী দিকে আসল খোলা।

দুহুন্-বৌ আশ্বাসে বললে, হরিহরের বাড়ী নয় ? চম্ভিত হবার কে রে ?

—হ্যাঁ।

—তোরা এরা কোথায় ?

—সে সব গিয়েছে।

—তোরা না কোথায় ?

ইতিহাস একটা বুঝা স্ত্রীলোক সেদিক দিয়ে বাচ্ছিল, হরিহরের নাম শুনে বম্বকে গীড়িয়ে হেলেকে জিজ্ঞাসা করলে, কে যে মণি ?

—এই কিমা, লেবোঁ তো, কে একটা ঘেয়েলোক। হুম্মাখের বৌ এসে লামনে গীড়াল, দুহুন্-বৌ তখন নেমে এসে বাচ্চার গীড়িয়েছে। হ'জন হ'জনকে অস্পষ্ট চিনতে পেরেছে, হ'জনেই বলা হয়েছে। তেহাও তেমে গিয়েছে, দাঁত না থাকার হ'জনেই দুহুন্-বৌর বম্বলিতে গিয়েছে। বাবু, তবু তারা পরস্পরকে চিনলে। দুহুন্-বৌকে টেনে নিয়ে চরিনাথের বৌ তার বাড়ীতে নিয়ে গেল।

তারা পোজো বাড়ীর বত, লোকজন কেউ নাই, তবু বৌ আর তার ঐ ছোট ছেলে।

নিগনের হরিহর আর দুহুন্-বৌয়ের বাবা হ'জনেই সঙ্গীত চাষী ছিল। এ অকলে এদের কেন্দ্র নাম ছিল। চাষে এরা বেশ উদ্বৃত্ত হয়েছিল। পক, পাটী, লোকজনে তখন হ'বাড়ী সবসময় থাকত, এখন তার চিন্তাভাব্য নাই।

দুহুন্-বৌ তোরা গায়েই পালিয়েছে সেখানে থেকে। ঐশনে এসে বলে আছে। সমস্ত রাত সে বেলছে। বাগের বাড়ী ও শতাব্দীঘর অবস্থা তাকে লাগল করে জুলেছে। ঐশনের একবারে সে বলে আছে। আপন মনেই কি সব গুণ গুণ করে বলে থাকে, সেদিকে আর কেউ নাই।

কোথায় যাবে, কি করবে তার কিছুই ঠিক নাই। ঐশ খাসাখামাই সে পাড়ীতে চড়ে বসল। কোথায় যাবে পাড়ী, তাও তার জ্ঞান নাই।

ঐশ চলেছে কাটোয়ার দিকে। আসছে বর্ষদান থেকে। ঘুর ঢেকে বসল, মাঝার চুলগুলি গালের পাশ দিয়ে নেমে পড়েছে। উহু-বুহু, উজ্জ্বল দৃষ্টি। হঠাৎ সে চোঁরির উল্ল—উঃ, আবার সেই কথা।

এখানেও লবলের ঘুমে কি কথা।

চেরে থাকে !

নাঃ, আর সব না ! উপরান্ !

বাড়ীয়া ভাবে, শ্যামলী নাকি ? তারা নানা গল্প করেছে আর যথো যথো দুহুন্-বৌয়ের পানে আড়চোখে চেরে দেখছে। কণ্ঠস্বর কথা, বহু ভাকাতের কথা—এখানেও তাদের যথো হচ্ছে। নানা কথাব ফাঁক কয়েক এই গ্রামে উঠেছে।

ঐশ খামল শ্রীকণ্ঠে। দুহুন্-বৌ নেমে পড়ল, আর তার পকে দ্বাকা লজব নয়। সেখানে আর সেখানেই ঐ এক কথা ! ঐশন থেকে নেমে দোভা চলেতে লাগল। ঘুরে এছটা বাগান। সেখানে যেলা বসেছে। অনেক বাড়ী সেখানে। দুহুন্-বৌ যেলা দেখতে লাগল ঘুর ঘুরে, হঠাৎ সে বম্বকে ঝাঁড়াল এক বাগসার।

এইখানে হু'ঠাফুয়ের শিবা হয়েছিল। এইখানে সে কিছুদিন ছিল। তারপর শ্যামলী ঘুরে কোথায় যে চলে পেল তার ঠিকানা নাই। অত বড় ভাকাত হেলেকে যেবে কি অহতাপই না পেয়েছিল। ক্ষমারবর্ধ সব ত্যাগ করে সেখানে যেয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

তার কি কেউ নাই আর?  
আছে বই কি? হেলের বৌ আছে পেঁচে। সেটই সিংহ  
প্রাণী দেখে।

সকলে বলে উঠল—আজ্ঞা হা!

আজ্ঞা হা! আজ্ঞা-গা! বলে দুহুঙ্-বৌ পাশ কাটের চলে  
গেল।

আর প্রাণপথে না গিয়ে সোজা ঘাটপথে সে কাটোঘাট দিকে  
চলল।

কাটোঘাট বর্ধমান নদক। এই গ্রামের হাজার হাজার লোক  
গাড়ী দিন-রাত চলে। নদকের সমান্তরালে টেনে ট্রেনের লাইন  
পাতা রয়েছে। নদক দেখানে ট্রেন-লাইন পাশ হয়ে ওপাশে  
গিয়েছে, দেখানে একটা গুপ্তিখানা আছে। এই সেন্সেলকিং-এ  
থাকে একজন লোক। ট্রেন আসবার সময় বউক বউ করে  
বের। দুহুঙ্-বৌ আর চলতে পারল না। সামনে বেধা বার  
উল্লসে বোঁধা। ট্রেন এসে পড়ল হুঁকি। বউক বউ করে  
বাধার সকলকে অপেক্ষা করতে হ'ল।

ট্রেন চলে যাওয়ার পর বাড়ী পরিষ্কার হ'ল। লোকজন  
গাড়ী-খোড়া আবার চলতে লাগল। দুহুঙ্-বৌ সোজা  
কাটোঘাট দিকে চলল। কাটোঘাটের ঘরগা, বড় পল্লব,  
তার ওপর গলা আছে, হানাতীর বস দেখানে গিরে কীটু মধার  
প্রত্যহ। দুহুঙ্-বৌ গলাদান করবে—তাবপর কি করবে সেটাই  
জানেন না।

কাটোঘাট থেকে বাস ছাড়ি, সোজা বাধ বর্ধমান। ট্রেনের  
জের ভাড়া কল, ভাড়াভাড়ি বাধ। তার ওপর বাড়ী দিয়ে  
বাসের ঘর দিয়ে কেউ পেলেই কপাটুখানা তাকে ভেঁকে গাড়ীতে  
তোলে।

বাগ-কলি লোক, ঠাণ্ডাঠাণ্ডি করে মরে চলেছে। দুহুঙ্-  
বৌ তখন উজ্জ্বলপ্রাণ—চোখ-বুদ লাল, বাধা কল, পল্লব  
কাপড়খানা মাল্য, ডিটবহ। বাসের একধারে সে বলে আপন  
মনে কি বলছে।

বাগ কোবে চলছে। বাড়ার কঁকানিতে হাজীরা অতিষ্ঠ  
হয়ে পড়ছে, সবাই আর্জবনে কঁকানি করছে। একজন বলে  
উঠল, আবে বাধা এইখানে নাগিরে কাও। কুঁ ডাকাতের  
ঠাণ্ডানি খেয়ে এইখানে বসে ভাল, তবু নদীর-হেঁজা বউ হবে।

ঐ আবার হুঁহ কথা উঠেছে! বিদ্যুত বাঁঠ, দুই বেল-  
লাইন। দামনে কর্তব্যের ঘাট—পুহু, বাগান, ভীষণ দান;  
ইতিহাসের পাতায় এ লক্ষ্য হয়ে রয়েছে।

দুহুঙ্-বৌ বলে উঠল, জাইজাই, গাড়ী বাধাও। আর না,  
এখানেই নাইব। তাবপর বাস থেকে লাফিয়ে নামতে চায়।

সকলে হা হা করে উঠল, অনভ্যা বাস বাধাতে হ'ল।

দুহুঙ্-বৌ দেখানে মেয়ে সোজা নিজের গ্রামের দিকে-বেরে চায়,  
বিক্ত বাগান মনে তাকে হাতছানি দিয়ে ডাঙতে লাগল। গ্রামে  
হাওয়া হ'ল না, এক-পা এক-পা করে এগিরে চলল বাগানের  
দিকে। বাস চলে গেল হুত পক্ষে। দুহুঙ্-বৌ উদ্ভ্রান্ত  
দৃষ্টিতে এগিরে চলে, নদক গিরে উঠেছে সোজা পুহুকের পাড়ে,  
তাবপর মেয়ে চলছে পুহুকের পাশ দিয়ে; আবার পাড় ভিত্তি  
এখানে চলে গিয়েছে।

দুহুঙ্-বৌ পুহুকের পাড়ে ধাঁড়িয়ে হাট হাট করে বেরে  
উঠল। তার মনে হ'ল পুহুকের ঘায়ে ধাঁড়িয়ে কে যেন  
কান্নাচ্ছে। হঠাৎ পল্লব যেন ভিরিয়ে পড়ল। এই পুহুকের  
দেখানে লোক নাই, সব খা খা করছে, নিশ্চয় জনহীন প্রান্তরে  
বুকে শুধু ভেসে উঠেছে মরণ আর্জবন—একমনের নর, বর  
জনের, বহু বরদের লল। দুহুঙ্-বৌয়ের বাধাটা দুই গেল,  
তার মনে হ'ল কে যেন দুই থেকে তাকে লক্ষ্য করে বাঁশের  
পাখি ছুড়েছে, সেটা বেন নন্দ্রকপে দুটে বাসছে এইদিকে।  
এই এল বলে, বৌ বৌ তার লল। বিবের শত আর্জবন,  
ভৈরববহ একলকে যেন তাকে আঘাত করল। সে উচ্ছ্রিত  
হয়ে পড়ল।

অজান আনুহায দুহুঙ্-বৌকে যেন যেন হ'ল একজন দুটে  
এলে তাকে ধর বসলে, কে? সে যেন বলে উঠল, বাধা,  
আমি। আমি। আনোকেই দেখে বাসল।

বে দুটে এসেছিল সে কীভাবে লাগল। হুঁহনেই আবে-  
বহে কীভাবে লাগল। দুহুঙ্-বৌ হাত নিয়ে দেখলে, তার  
মাখাটা লাঠির ঘায়ে ছিঁচে গিয়েছে, তলকে তলকে বক্স, দিল  
পড়ছে। আনুল দিয়ে সে-গুলো ঘাঁটিতে লাগল। আর্জবন  
আই নাই, সব চূর্ণচূর্ণ। সে কেবলই থাবলে থাবলে সেই  
দুই হাত দিয়ে বেখতে লাগল।

বাগার বানবয়েক গাড়ীও পল্লব পোনা গেল। দেখতে  
দেখতে জায়া এসে দামল বর্জনায ঘাড়ের পেই বীতন্ম বিধি  
যাবে। দুই থেকে কে একজন বলে উঠল, ঐ-বে। আবার সে  
আমত হ'ল। কের না, ঐখানে যেন কে গড়ে আছে।

সকলে এগিরে গেল, উৎসুক তাবে দেখল একজন কুখা  
একটা পাথরে ছাঁড়িতে বাধা বেধে গড়ে আছে। ছাঁড়ি এক-  
মাথপায় বেঁচে, সেখানে পাথর আঁটা মনে আছে। বুঝা

আটমাথা হাত অঙ্গিভ ভরষ সেখানে পড়ে রয়েছে, মনে হ'ল সে  
যেন কিছু আগে সেটা আঁচল দিয়ে ঘাটছিল। বুড়ার চুলগুলি  
খোলা—মাথার তেল নাই, চোখ বন্ধ।

এক জন গিবে বেধলে তাকে। সেবেই চিনেছে—এ দেউ  
মুহুরের পৌ, বয়ু ভাকতেই বেলেই যে।

আর একজন মিংবাস কলে বসলে, মুহুর এখনই এমনি  
ভরষ পড়েছিল। তার হো আঁচ ঘাড়ীও পথ বেশ।

দিক্ত ঘাটের বুক তখনও গাড়ী দখ ওঠে নাই। বাড়ী  
হল একপুঠে মুহুর-মৌক দেখতে লাগল। এ বেধার অর্থে  
কাছিনী। বহু লেখনি ছাে এ-কাছিনী এ অকলে বাহুবেধ  
মুখে মুখে বেড়িয়েছে। পল্লী লম্বকে ইতিগাল। তুলেছে  
বিতীষিতা। অক্টোবর কাছিনী এমনি করে বর্তমানে হল  
কোণার, টানে ডিম্বাভের লীখা-বেধা।

## পূর্ববঙ্গে বিজয়াদশমীর উৎসব

(৫২ বঙ্গব পূর্ক)

শ্রী হুপেন্দ্রনাথ দাস

ঢাকা জেলায়, ভাঙাঙ্গের পূর্ক এক মতবলীক পক্ষিমে  
যে দুখক পক্ষিমে ভাঙাঙ্গের বিল সন্ধু চইতে উৎসব কুক্কোয়া  
বাণুনী এক পূর্ক অক্কোয়া নীতলগকা। নদীঃ মধ্যে অবস্থিত,  
তারার মান শাহুজিয়া পূর্ণগণ। এই হানিক চাঙিট গ্রামের  
নাম প্রসিদ্ধ—ইতাকের নাম বাণুনীধর ভীষনতী কাংগোপাভ,  
মাকিন, বহুগ ও লক্যাবলীধর ভীষনতী ভগবত। এই বগপক্ষে  
একটী থানা আছে এক ইগাবই অপবশায়ে বুড়াপাড়া নামক  
বিখ্যাত ভবিষ্যত-অনুবিভ গ্রাম।

১৮০২ সালের আদিন বাসে (১৮২০ খ্রীঃ অক্টোবর বাসে) আদি  
কাংগোপাভ্রামে আদায় পিশাখলানর শ্রীকুল মনোমোহন বহু  
মহাপ্রায়ে মুহু বর্ণাপুতা বোখিত সিংহাছিল। আদায় পিশা-  
খলান বিপতীক প্রায় বলবৎ পূর্ক আদায় পিদিয়া ভায়াবলী  
পথলাক গহন কথিয়াছিলেন। ঠাঙার একমাত্র পুর ভাকার  
শ্রীকুল ললিত মোহন বহু মখে বার মূল পথিত্যাপ কথিয়া গ্রামেই  
বাবদায় আভুত কথিয়াছিলেন। পিশাখলানদের দুইটি বুড়কুতো  
ভাই মত্রে ও সেবেই বহু—একই বাড়ীতে পুখকাত বাস  
করিতেন। উভয়ে পুজার সময় গ্রামে আদিয়াছিলেন। আদায়  
দৌদিদি (ললিতের ভ্রী) আদায়েরই গ্রামে মেয়ে।

কাংগোপাভার বাসকরণ ঐ অকলে বগপথিত। উহাঙ্ক হলেন  
উহাঙ্গের পূর্কপুর্ক-বিনিমালে ঢালনী গ্রাম হইতে আদিয়া তথায়  
বহুগালয়ে বাস করিত আভুত করেন। বাসকলনের সমুদয়েই

সেই সময় ভাপুকলারী ও বায়ায়ের ভবিষ্যদ্বা ছিল। তা হাড়া  
এই বঙ্গে বহু আটন ব্যবসারী ভগ্নবহু কথিয়াছিলেন। ঠাঙাঙ্ক  
মহকুমা নাগোপপক্ষে ওকলারী করিতেন এবং এখনও করেন।

তৎকালে গ্রামের স্রোচ ও বহুগণ যোব শাক ছিলেন। ছাপ  
ও মগিষ বলিষ শা ছাপবুও ও মগিষবুও মতকে ছাপন কথিয়া  
কেহ কেহ বগাথিক কাল ঢাকের তালে বুড়া করিতেন। ইহাঙ্গের  
মধ্যে অনেকের কাবলবারি উপর আশক্তি ছিল। কখন কখন  
আদায়ের মত অল্পবয়স্ক বালককে উহাঙ্গের উৎসব সলার শায়া-  
বিষয়ক গান করিতে আন্তান করিতেন। একদিন আদায়কেও  
গান পাঠিতে বাধ্য করা হয়। আদি বহন গান করি তখন  
সর্বাণেকা বহুবুদ আদায় আর এক পিশাখলানর শ্রীকুল কুক্কো  
হাস গানের তালে তালে বুড়া কথিয়াছিলেন, ইহা স্পষ্ট  
মনে আছে। কিন্তু কাবলবারি প্রতি অজ্ঞাত আশক্তি মধ্যেও  
ইহাঙ্গের ভক্তি অকৃত্রিম ও প্রাণাট ছিল।

আদি বৈদ্যনির জগীপুত্র বর্ণনা কথিব না। বন গ্রামে বন  
বাড়ীতে মেঘন পুতা হয়, সেইজন্যই হইয়াছিল।

এখন আদি আদায় আলোচ্য বিষয় বিজয়া বশরীর উৎসব  
বর্ণনা করিব। একটী থান পক্ষিমে কাংগোপাড়া হইতে আভুত  
হইয়া থাকিনা ও বহুগ গ্রামের পাথি দিগা ভগ্নগলের দিকটে লক্য-  
নদীতে পতিত হইয়াছে। পক্ষিমে বসুনী ও পূর্ক নীতল-  
লক্যানবীক এই থানটা সন্মুত কথিয়াছে, ইহাঙ্ক কেহ কেহ  
কাংগোপাভার থান এক কেহ কেহ ভগ্নগলের থান বলে।





# দিশারি কপোত

কালোচন্দ্র সেনগুপ্ত

বহু বৃহৎ চতে দিশারি কপোত

এনেছে স্তম্ভভিত্তক।

ওবে ও নাবিক ! সাজায়ে নে' শোভ

পোহাইল কুহটিকা ।

হাত ছিন্থিহি তায়ার তায়ার—

দুখের উর্ধ্বি জাকে উত্তরায়

হৃদ-কলাকা ওই উড়ে যায়

অলস অবজিতা—

উৎসুক হন কর প্রসারণ

অলস-বিলকা লিখা ।

ওবে ও নাবিক ! স্তম্ভকণ্ঠে টিক

কটিল কুহটিকা ।

চরিত্রার পানে মরিয়া হইয়া

স্তম্ভ কহ'সারি গান,

সোহল হুখে পদমানিকে

তু'নি' তাক্টিয়ালি তান ।

ওই কালো জালে শরিতা কাহিল

জল নহ' যেন আঁখি ঢল ঢল,

আঁখি নয় যেন কুটোহে কয়ল

হল হুল অভিমান

বিষহী প্রিয়ার ঘাণিত হিয়ার—

কুহ নখির প্রাণ ।

ওবে দুর্গদ-পুণ্ডর শখিক !

প্রকৃ কব অভিমান ।

দেব-দ্বারায় গোপুদি সযর—

অকণ্ঠ অকল

পাড়ে ও কিনারে বর্ষ কিনার—

কলকিবে কলহল ।

দিশারি কপোত সোনার বাঁচার

আদিত্য পুণিতে বহি সে না চায়

জা হ'লে তাকিবি—“ওবে আর আর—

আঁখাচ্ছিন্ন বগতল,”

বহা যিবে পাখী মূখ মূখ রাখি

পাখি বিষকল

ওবে ও পখিক ! বিক পখিক !

সেই ভায় সখল ।

হুত হুত হিয়া করে বহি পোন

হবে হবে থাকি থাকি,

ভবে আড়ই খাখা নাট

কখিবি লম্ব ন্যাকি ?

হুই করে বহি কেপট্টবে টান

অহুতুল বাহু মনে বকশান

মাথালে তুলে টাঙাও নিশান

মেলি প্রায় আঁখি,

সেই প্রব তায় যিবে সে পাচায়।

মূখ আকাশে থাকি,

ওবে ও নাবিক ! এই বেলা টিক,

আর বেলা নাই বাকী ।

নকল-বট বকে ততই

ককেব দট ভবি

ঘাটে ঘাটে চেরে দেখেবে বেবিবি

চোখা বাহিবি তরী ।

ক'কা ক'কা বহি ঠেকে কত মন

পিছনেব স্মৃতি কাগরে বপন,

অনিশ্চিতেব কুকেব কপোন

অভাবনীয়েবে স্মৃতি

উনিবে তপন দেখেবি তপন

পোহাইবে শরীরী ।

পাইবি পখিক ! আশার আদিত

হতাপায় ছর্জ'বি' ।

বীথে বীথে তরী বাহিরা চলিবি

হাসিবে ঘর্ষ-ঘর্ষ,

বিশারি কপোত নিজে বাবে পোত

সংঘে পুণ্ডরবি ।

যাত্রাপথেব বাধা হবে দুখ—

ওবে দুঃখিত বিরহ-বিহুহ

দুঃ-কপোতীর কণ্ঠ মধু

নুহ মেহুর হুদি

বিষহী বক প্রিয়ার বক

কুড়ারে জড়াবে বহি—

ওবে প্রসূত দুঃখা-নুহ

শিশাসা-বক্ত কবি ।

# বাবলের গঙ্গের আসর

ঐমেঘেন্দ্র লাল রায়

সে আজ অনেকদিনের কথা—তখনও অগ্ন্যবধ এই সৰ্কানা দুইয়ের রূপভরী বেছে ওঠে নি—তখনও চোখের নিম্নেবে কোটি কোটি মানবকে হত্যা করে এই হৃদয় হাতীর অগ্ন্যবেক তরাসহ স্থাননে পরিণত করবার কৌশল বিজ্ঞানের ঐক্যজালিক শক্তিতে আবিষ্কৃত হয় নি—তখনও ভারতের সৰ্কর হিন্দু-মুসলমান তাই তাই হয়ে নিম্নিমাণে মিলে মিলে কাজ করতো। সেদিনকার কলকত্কার বৈদ্যমনি জীবন ছিল পাণ্ডিত্য,—বা বর্জ্যমানের এই বিজ্ঞানিকার পটভূমিকার মধ্যে সত্যই বস্ত্রের মতন যেন হয়।

সেই পাণ্ডিত্যপূর্ণ সময়ে বাসিগতে একটা বাজীর বাটে পাড়ার ছেলেরদের গল্পের আসর বসতো। যে ছেলের বাজীর বাটে এই আসর বসতো তাঁর নাম হচ্ছে বাবল। বাবলের বাবা বা ছোট ছেলেনেদেরের বড় ভালবাসেন। পাড়ার কি বৃদ্ধ, কি বুয়া, কি পিতৃ লকলের সঙ্গেই বাবলের বাবা বেশেন। কখনও বা ছেলেরদের দলে “খিরোটের” “সোরাব কস্তার” নাটকে “কস্তার” লাঞ্জন, বড়োর দলে “সাক্ষাহান” নাটকে “সাক্ষাহান” লাঞ্জন। বাবল কখন ইরাণ বালক সেজে “বাক ভেরী বাক” গান করে, কখনও আবার চায়ণ-বালক সেজে “আমার অম্বত্বি” গান করে। বাবলের বাবা প্রায়ই তাঁর প্রিয় কুতুব “ভানী”কে নিয়ে পাড়ার ছোট ছেলেরদেরের সঙ্গে বেলা করেন।

বাবলের বাবাই সোংসায়ে ভাসের কলাউত্তেব এক পাশে খেজুর গাছের তলায়, আশে-পাশে পরিষ্কার করে একসাইল করবার জন্ত প্যারালেস বার ও বাডমিটন, তলিবন্ খেলার জন্ত কোটী তৈরী করিয়ে দিয়েছিলেন। যেখানে বাজীর কর্তার এই অবস্থা, সেখানে পাড়ার ছেলেরদের আসর ভাবে, সেটা খুবই স্বাভাবিক।

বাবল বালীগঙ্গ হাইকুলে ম্যাট্রিক ক্লাসে পড়ে—সে পড়াভ্যন্তের ভাল, আর কুটিলও বেলে ভাল। বালীগঙ্গ কুটিল ক্লাবের সে বিখ্যাত সেক্টর কর্তৃত্ব। মাকে বাকের গল্পের বাটেতে গিয়ে ও ম্যাচ খেলাতে দর্শকের উজ্জ্বলিত হাততালি অর্জন করে।



টানেল চইতে দাড়ী আসিতেছে

কিন্তু এ সব শুণ দ্বাত্ত বাবলের আর একটা বিশেষ গুণ ছিল।—পদ্য বস্তুবার অসাধারণ কমতা। যার জন্ত পাড়ার সববয়স্ক ও বয়সে ছোট ছেলেরদেরের তাকে খিরে গল্প তুনতো। এ কমতা সে পেয়েছে তার বাবার কাছ থেকে। তার বাবার কাছেও পাড়ার ছেলে বিশেষতঃ ছোট ছেলেরদেরের অনেক গল্প তুনতো—

এক ননিবারে বাবলের ক্লাবের সঙ্গে একভেলিয়া ক্লাবের তলি বল খেলার ম্যাচ হয়, সেদিন বাবলের ক্লাব জয়ী হয়েছে। ছেলেরা ম্যাচের পর হয়েছে বাবলকে একটা গল্প বলতে, বাবল সম্মত হয়েছে।

ম্যাচ খেলার পর বাবল ছেলেরদের সঙ্গে এসেছে বাজীতে। বাবল বাজীও মধ্যে এসে মাকে বললে “মা আজকে ছেলেরা সব গল্প তুনবে—আমার কাছে পাঁচজন ছেলে আছে—তুনি ভিন্ন মাঝিবে কটি ভেঙে বাও আর পাঁচ কাপ চা দাও—” বাবলের ছোট তাই গোপাল দুই ক্লাব নীতে পড়ে, বললে “ওখুচা নিদেই তো হর, ভিন্ন, কটা আবার কেন? ঠাকুর ভিন্ন ছৌর না—দাদার হতে: লম্বা চঙড়া করবাহেল।”

গোপালের বা বর্জ্যমান সময়ে হর তো গোপালের এ দুইভিন্ন জন্ত তাকে বক্তব্য নিতেন। কারণ, এই সময়ে হঠাৎ পাঁচজন অভিযিকে চা সেওতা (যেখানে তিনি একেবারে দুপ্রাপ্য, অপ্রাপ্য না হলেও) একটা বস্ত্র মত তীতিপ্রব ব্যাপার। কিন্তু সে

সবর বুকের আগে, দুহুই পর নয়—তখন এই “সুতলা মুকলা” পাত ভাবনা” বন্ধুত্বকে হৃদয়ের হাতে ধারি খেতে হয় নি, হৃদয়কে লক্ষ লক্ষ বঙ্গবাসীকে বন্ধুত্বকে আনিজন করতে হয় নি,—তখনও গোপালের মা বাবার আশ্রিত থেকে ও ছেলের কল থেকে ঘিরে আসা সুইই স্বাভাবিক মনে করতেন—বর্তমানের দালাল-হালাকার বীভৎসতা। তখন তাঁর ঘরেরও অতীত ছিল—তখন দেশের দোকানের কোন অস্তিত্ব ছিল না।

যেহেতু সেই কারণে স্বাভাবিক নিশ্চিততার বলে গোপালের মা চ’টেই বললেন—“গোপাল, তোরা অন্তো কথার পরকায় কী—ছোট সুই চোখ বড় বড় করে পাকা বুড়োর মতন কথা কখনো গা জলে দাখ।” গোপাল বললে “আমি কিছু বললেই তুমি ঐ রকম বকে—বাবা গর বলবে আর চেলেয়া ভিন্ন-কর্তী খেয়ে পর ভবে। কী পরকায় গর বলবার”—

বাবল বললে “সুই কেন গর কখনো বস—বাল নে”। গোপাল বললে “বা রে! সকলে কখনো—আমি কখনো না কেন?” বাবল গোপালের পিঠ চাপড়ে বললে “চটছিল কেন গোপাল, তোকে সুই চাইল কতী মা ভিন্ন দিয়ে তোকে যেমন—মা, তাকে তাই দিও”। গোপাল তখন হঠাৎ কথা প্রকাশ করে কেলে বললে, “সে দিন সকালে ভিন্ন-কর্তী হোল, দাখ আর দাখার বন্ধুরা খেল, আমি পেলার না।” তখন মা গোপালকে কাছে টেনে নিয়ে, আদর করে বললেন, তাই ব’ল, সুই তো বাব: বাড়ীতে ছিলি নে, তোরা ভাগতা সুই সেত্রে কেলছিল—তোকে ভিন্ন-কর্তী-হাড়া আমলেট তেজে বেবো। গোপাল এক গাল হাসি নিয়ে বললে “দেবে তো দা” মা বললেন “মেথো বৈ কী”—

এখন সব—বাঁহের থেকে তাক এলো “বাবল বাবল,” গোপাল বললে “আমি যাচ্ছি দাখা, তুমি এসো।” তাদের ছোট বোন তুতু, বরস লাভ হবে, হেসে ব’ললে “দাখা—গর বলবে, আমি কখনো”। বাবল বললে, “কখনো পারিস—বহি চূপ করে ওলিস”—তুতু বললে “হু”, বাবল বাঁহেরে গেল।

পূর্ণিবার চাঁদ তখন আকাশে হাসছে—চাঁদের আলো

বন্যার জলের মতন কম্পাউণ্ডের হবে। হাতিয়ে পড়েছে বাগলের বন্ধু—বেউ বেকিতে কেউ টুলে, কেউ নোড়োতে বলছে। বাবল বলছে মন্তবানে। বাবলের বন্ধু ভঙ্গবাসী বললে “চার কতো দেখী ভাই”। এই সবর তুতু এসে বললে “চার জল হবে গিরেছে, মা ভিন্ন-কর্তী ঠিক করে দিচ্ছেন, মীনা মিনি তেজে দিচ্ছে।” ভিন্ন-কর্তীর কথা শুনে সকলেই সুখী। বাবলের দাখাবাধ নাকি বিশেষত থেকে ফিরে এলে এই ভিন্নকর্তী কলকাতার প্রথম প্রচলন করেন।

গোপাল বললে “চল তুতু আমরা চা, ভিন্ন, কর্তী নিয়ে আসি—ঠান্ডার ও সব ধৌব না”। গোপালের আশ্রয়ের কারণ বাবল জানতো—এই সুযোগে সে আপনই ভিন্ন-কর্তী আমলেট খেয়ে চা আনবে, গোপাল ও তুতু চা, ভিন্ন-কর্তী নিয়ে এলো। এমন সময় তুতুর ছোট বোন মিনি—বড়র চার হবে, কীভাবে কীভাবে এসে বললে “উঠি টুলে” অর্থাৎ উঠে আমার কোলে করে খুব পাড়াও। বাবলের কোলে মিনি উঠে ব’ললো। বসেই মিনি বললে “আমু মিনি, পল্ল মিনি”—অর্থাৎ আমু মিনি ও পল্ল মিনিকে নিয়ে মা কী গান করেন তাই করে।” বাবলের বন্ধু রবি ব’ললে “সে আমার দাখ—আমি খুব পাড়িয়ে দি। রবি ছেলেরী বড় ভাল—সাহেবের ছেলে বলে ভয় হয়—তবে এক হকর সাহেব বলা যেতে পারে—বাবা বাবালী বা বেহ (কটলাগেতর)। আর রবির ভয় হয়েছিল বিশেষত, ও কিছুদিন ছিলও লেবানে। ইতিমধ্যে তুতু ও গোপালের চা, ভিন্ন-কর্তী পরিবেশন শেষ হয়েছে—গোপাল মিনিকে রবির কোল থেকে নিয়ে হার কাছে দিতে গেল।

চা খেতে খেতে অমর জিজ্ঞাসা করলে “কিসের গর বাবল”—বাবল বললে “শোন তো—” এই সময় গোপাল এসে বললে “বলো দাখা”—বাবল বললে, সে অনেক দিনের কথা—বাবা তখন এম-এ-পড়েন কলকাতায়—তিনি আর তাঁর বন্ধু রবেশ বাবু, আমরা রবেশ কাকাই বলি—ভাগলপুর হতে মুন্সেরে গিরেছেন পিনীয়ার বাড়ীতে। মুন্সেরের নাম কখনোই অমর বলে উঠলো—সেই মুন্সের—যেখানে সুখিকশে সব বাড়ী

ভেঙ্গে গিয়েছিল—বহু দোকান বাড়ী চাপা পড়ে যায়।  
যায়—।” হবি বল্লে—“বামার এক বছর বয়েছে যে  
মুন্ডের এখন বাতীর তলা থেকে গভীর রাস্তিগের চাপা  
কারার আওতায় পোনা যায়। তুহু বল্লে—“এই না  
বাতীর তলা থেকে কারা কানে।” বাদল বন্ধক দিয়ে  
বল্লে “চুপ কর তুহু—গল্প শোন্।”

বাদল আবার আরম্ভ করলে—মুন্ডের বাগারচাঁ: নারী  
মুন্ডের—বাংলায় শেষ বাতীর নবাব মীরকানিশের  
রাজধানী ছিল—এখনও মীরকানিশের দুর্গ আছে—  
দুর্গের মধ্যে সিঁড়ি বেরিয়ে গঙ্গার মধ্যে চলে গিয়েছে—  
দুর্গের পিঠ পাছাড়ে। কালো বল্লে “এই মুন্ডেরে না নীতা-  
কুতু আছে।” বাদল বল্লে “সীতাকুতু, ফিলিপ কুতু  
আছে—কুতু থেকে গঙ্গা জল বেবোয়—। বাবা যখন  
ছোট ছিলেন তখন সেই গঙ্গা মুন্ডের জলে চা করে বেয়ে-  
ছিলেন। এখন আর জল সে রকম গরম নেই—ফিলিপ  
কুতুর জলও গরম—কেল্নার সাহেব এক সময়ে এই  
জল থেকে শোভা-সম্মেলন তৈরী করে কলকাতার  
পার্লিভেন ঐ শোভা দেখে অনেকের ভিলুপেশিমা  
সেয়ে গিয়েছে।” হবি বল্লে “ঠাকুঁমাকে বাঙালি  
হয় তো—এখন পাওয়া যায় না।” বাদল বল্লে “না—  
এখন আর পাওয়া যায় না—।”

বাদল বলে বাজে—“বাবা আর রমেশ কাকা সেদিন  
মুন্ডের থেকে ফিরছেন কলকাতায়—এখন মুন্ডের থেকে  
আবালপুরে এসে লুপ লাইনের গাড়ী ধরতে হয়। তখন  
বুঝে আর অত গিয়েছে—সেই সময়ে বাবা আর রমেশ  
কাকা এসে পৌছলেন আবালপুরে।

আবালপুর পাছাড়ে যেয়া সহর—আবালপুরের  
ট্যানেল এ লাইনে বিখ্যাত।” তুহু জিজ্ঞাসা করলে  
“ট্যানেল কি দাখ।” অপর বল্লে—“পাহাড়ের মধ্যে  
মুন্ড।” তুহু জিজ্ঞাসা করলে “মুন্ড কি?” বাদল  
বল্লে “মুন্ডদিকির বিস্তার সময় বাটে যে প্রকাণ্ড উত্তর  
করা হয়েছিল—যেখেনি সুতো, এখনও আছে—গোল  
গর্ত চলে গিয়েছে।” তুহু গভীরভাবে বল্লে “ও  
পাহাড়ের মধ্যে গর্ত?” বাদল বল্লে “প্রকাণ্ড গর্ত—  
প্রকাণ্ড গোল মুন্ডা,—বার মধ্য দিয়ে যেলগাড়ী চলে

যেতে পারে।” তুহু অস্বাভাবিক হয়ে বাবলের দিকে তাকিয়ে  
বল্লে “পাহাড় কি করে মুন্ডা হ’ল—বাদল বন্ধক দিয়ে  
বল্লে “চুপ করে শোন্—” বাদল আবার বল্লে  
আরম্ভ করলে—“ট্রেনের দেহী আছে বেধে বাবা একটা  
ছোট্টেলে মুন্ডা ও মটরের কোথার অর্ডার দিয়ে ও  
আর একটা দোকান থেকে ভাল পটিয়ে মোতা, জমি  
কীর, আর কি—আর কল: কিনে ছোট্টেলে রেখে ও ফিনিক  
পত্র ছোট্টেলের একটা ঘরে বন্ধ করে বল্লে—এখনও



ট্যানেল চড়ে গাড়ী আসিতেছে

গাড়ীর আর এক গভী দেহী—চ’ল, বেড়িয়ে আসি—এখন  
মুন্ডের চান্দী রাত।” ট্রেনের কাছে পাহাড় ও লেকের  
মধ্য দিয়ে রাস্তার বেরিয়ে পড়লেন—পাহাড়ের বানিক  
ধানিক চাদের আলোতে যেন হালুচ্ছে আর বানিক বানিক  
অন্ধকারে যেন কাঁছে।

বাবা আর রমেশ কাকা বেশ বানিককণ বেড়িয়েছেন  
—হঠাৎ রমেশ কাকা বল্লে “যেহ তো পিছনে কে যেন  
আবার সঙ্গে সঙ্গে আসছে,—একবার বেখেছি হাতছানি  
দিয়ে ডাকছে।” বাবা পিছনে তাকিয়ে বল্লে “ও,  
পিছনে কেউ নেই তো, কি বল্লে?” রমেশ কাকা  
পিছনে তাকিয়ে বল্লে “তাই তো। যুব আন্দা। কিছু  
কী...” বাবা বল্লে “সীত-পাহাড়ের বানালার কাছে  
তুন্ডের গঙ্গা তনে তোর এই অবস্থা হ’লো না কি? চ’ল  
ছোট্টেলে মুন্ডা কানী থেয়ে ট্রেনে ওঠা দাখ—ট্রেনের  
বেশী দেহী নেই—খেতে হবে তো—। বাবা আর রমেশ  
কাকা পাহাড়ের দার দিয়ে ফিরছেন—রমেশ কাকা আবার  
বল্লে “পিছনে দিকে যেখিয়ে—“যেহ, ঐ—।” বাবা  
তাকিয়ে কিছুই দেখতে না পেয়ে বল্লে—“কেন, দুই

বান্দাবার কাছে শীর পাছাড়ে জুতের গর তুলি— চ'ল  
চ'ল গোপাল ব'ল্লে "বাবা ব'লো না শীর পাছাড়ের  
জুতের গরটা"—অমর ব'ল্লে "ওই দোখ তো ভোদের,  
বে গরটা তুলিস ভাই শোন"। বাদল ব'ল্লে "সে  
গর না হ'র আর একদিন ব'ল্বে—বাক—তার পর  
বাবা আর রমেশ কাকা জোটলে এসে বাঙালি নাওরা  
শেষ করে টেননের প্রাচীরদ্বয়ে তিনিখ-প'র রেখে পাথরসারী  
করছেন। খানিক পরে ট্রেন এসে উপস্থিত হলো।  
বাবা একটা খালি খার্ডক্লাস গাড়ী বেখে ভাতাই রমেশ  
কাকাকে নিয়ে উঠে পড়লেন।" অমর ও জগদীশ ব'লে  
উঠলো "খার্ডক্লাসে।" স্রোতালের মধ্যে অনেকেরই  
মুখ কী রকম হয়ে গেল।

যারা গর তুলছেন তাঁদের বাবার মোটর গাড়ী,  
টেলিফোন, রেডিও আছে। বাদলের বাবা খার্ডক্লাসে  
রয়েল রয়াল ক'ল্লে ভাদেও যেন আভিজাত্যে বাবে।  
বাদল অমর আর জগদীশের কথাই আশ্রিত পেয়েছে।  
বাদল ব'ল্লে "বাবা আর রমেশ কাকা খার্ড ক্লাসে  
চ'ড়েছেন তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই—মহাশয় গাড়ী  
খার্ডক্লাসে বান—বিলেতের প্রধান মহী ছিলেন রায়মহে-  
শ্যাকভোনাস—তিনি খার্ডক্লাসে যাতায়াত করতেন।  
বাবার মুখে শুনেছি, অগমিখ্যাত স্যাকটোন সাহেবকে  
একজন জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, "তিনি খার্ডক্লাসে রয়েল  
কেডান কেন?" তিনি উত্তর দিয়েছিলেন "কোর্ব ক্লাস  
নেই ব'লে।" যেক কাকার কাছে শুনেছি বোলপুরে  
যখন জহরলালজীর বেগে পড়তেন জহরলালজী  
রবীন্দ্রনাথকে লিখে দিবেছিলেন যে, কখনও তাঁর ঘেরকে  
মুখ নবীরে ফাট' বা সেকের ক্লাসে যেন না পাঠান  
হয়।"

রবি ব'ল্লে আমি তো বিলেতে ছিলাম—আররা  
শব খার্ডক্লাসে যাতায়াত করতাম। বিলাতে সাহেব  
বেমবের মোটর গাড়ীও থাকে, কোমও থাকে, আবার  
খার্ডক্লাসে রয়েল বেডার।

অমর ও আর সকলে এ—আলোচনা পছন্দ করছিল  
না—অমর একটু চ'টেই ব'ল্লে "এ সব কথাগুলো  
মুখি গল্পের বাইরের কথা হচ্ছে না। বত দোখ

করেছিল গোপাল শীর পাছাড়ে জুতের গর তুলতে  
তেরে,—না ?"

রবি ব'ল্লে "তোরা যে রকম খার্ডক্লাসে চড়া শুনে  
আশ্চর্য হয়ে গেলি, তাতে এ কথাগুলো ব'লবার দরকার  
ছিল।"

বাদল ব'ল্লে "থাক ও কথা—তারপর বাবা আর  
রমেশ কাকা গাড়ীতে উঠে হোন্ডল স্ট্রটকেল রেখে বেকিতে  
ব'লে আছেন। হঠাৎ গাড়ীর চারিদিক অন্ধকার হ'য়ে  
গেল।" তুফু ব'ল্লে "গাড়ীর চারিদিক অন্ধকার হয়ে  
গেল?" বাদল ব'ল্লে "হ্যাঁ—গাড়ী ট্যানেল এর মধ্যে  
চুকেছে—সেই গাড়ী ট্যানেলের মধ্যে থেকে বেরিয়েছে—  
অমনি রমেশকাকা বললেন "ঐ দেব, পাছাড়ের বাঁরে  
হাড়িঘে মহিলা হাতছানি দিয়ে ডাকছেন।" বাবা সেই  
দিকে তাকিয়ে ব'ললেন—ঠেক, কিছুই তো দেখতে  
পাচ্ছি না তুই কেপে গেলি নাকি ?

গাড়ী পাছাড়-পর্কত হেদ ক'রে হু ক'রে সমস্ত  
জুতিতে এসে পড়েছে কখনও, গাড়ী যুর গলার কাছে এসে  
পড়েছে। দেখতে দেখতে গাড়ী এলো মূলতানগড়ে।  
মূলতানগড়ের কথা হ'তেই গোপাল ব'লে উঠলো "আমি  
আর বাবা বাবার সঙ্গে মূলতানগড়ে গিয়েছিলাম। আহা!  
ইউটী কাকা কী হুমর বিচুড়ী বেঁধেছিলেন—আর চিড়ী  
হাছের কোর্বা আহা এখনও সে কথা মনে আছে।"  
বাদল বললে "গোপালটা কি রকম পেটুক দেখছিল তো।  
মূলতানগড়ে অমন বিখ্যাত গৈরীনাথের হস্তির আছে  
গলার মধ্যে—সে কথা ওর মনে পড়লো না—রবি বললে  
—বাঃ! তারী মুখর তো। গলার কাছে। বাদল বললে ঠিক  
গলার মাঝখানে নয়—একটু তীর ঘেঁষে, তুফু মাঝখানে  
বলা বেতে পারে বঁকাকালে। তবে হস্তিরের বাঁরে অল পু  
গলীর ও জল তরানক ঘোরে, বাবা নিজে পৌকোর হাস  
হ'য়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। রবি বললে হস্তির পু ব'ল্লে,  
না ? বাদল বললে "বাবা বলেছেন এ হস্তির অভিব্যাপ্ত  
হস্তির—বিখ্যাত চীন পরিব্রাজক কাহিয়ান ও হিউয়েন ত্সাং  
এই হস্তির দেখে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন"—রবি বললে  
"বলিস কি রে কাহিয়ান, হিউয়েন ত্সাং সুখ্যাতি করেছেন।"  
তুফু জিজ্ঞাসা করলে "কাহিয়ান কে বাবা"—বাদল বললে

আবার ‘চুপ করে শোন’—। বাবল বলছে তারপর ট্রেন জলভানগরে পৌঁছানো। বাবা আর রমেশকাক। প্রাট-করমে পরিচর্যা কর্জেন, ঘটাং রমেশকাক। বলে উঠলেন “ঐ সেব ল্যাম্প-পোর্টের কাছে ঐ সেই মহিলা হাতছানি দিয়ে ভাকছেন”। বাবা বললেন—“ঐক, আরি তো কিছুই যেতে পাছি না, শুধু যেখানি চাঁদের আলোতে ল্যাম্প-পোর্ট মিট মিট করে ঝলছে, তোর বাবা আর হুতু—হুই অনবরত ঐ কথা তাবডিস—নে, চল শীগুগির গাড়ীতে ওঠ, গাড়ী ছেড়ে বেবে।” গাড়ীতে উঠতেই ট্রেন চোড়ে গিল।

•

বাবল ব’লে যাচ্ছে “এইবার গাড়ী এসে নন্দনগরে পৌঁছালো—নাসনগর ষ্টেশনের নাম হ’লেও এর নাম “স্পাইনগর”। গোপাল সোমাসে বললো “এইখানে বেহলার পুছো হয়।” কালো ব’লে উঠলো “বেহলা পুছো তো বাংলায়, স্পাইনগরে হয়, যেহাং—কি বলছি গোপাল।” বাবল ব’লে “এখানেও বেহলার পুছো হয়, বোৎ হয় এই সেই স্পাইনগর, বাবা বলেছেন এই স্পাইনগর থেকে বাবিন হিশুভারতে হিশুয়া পদানবী দিয়ে বাগিছা কর্তে যেতো অদুর আনান, কোচিন, চারনা, তারপনী প্রভৃতি স্থানে।” কালো চিজাসা করলে “বঃদ, তারপনী কোন বাগিছা তাই ?” বাবল বললে—“অর্বদকা, Ceylon” এই স্পাইনগর লোকালে বিখ্যাত বকর ছিল—এই নগরের গজাভেই চাঁদ সবাগরের দৌকা ভুবেছিল। এই নগরেই চাঁদ সবাগরের ঘের বেহলার সঙ্গে লক্ষীন্দরের বিয়ে হয়েছিল—এই স্থানেই বিয়ের রাত্তিরে লক্ষীন্দরকে সাপে কামড়েছিল—এই গজার একদিন বেহলা মৃত স্বামীকে নিয়ে ভৈলার ভেসেছিলেন। বেহলা পুছোর দিন এখানে বেলা বসে, বনসার পুছো হয়, বনসার পুছো হয়ে গেলে গভীর রাত্তিরে বড় বড় গোখরো সাপ এসে ছুৎ-কলা বেবে যায়—কি তাদের গজহানীর শব্দ—রবি বললে “বড় বড় গোখরো সাপ টিক আসে ?” বাবল বললে “হ্যাঁ,” হুতু বললে “দাদা কটা সাপ আসে ?” বাবল বললে “চুপ কর হুতু” কালো বললে “কি এ কী বকন হোল, আনরা জানি বাংলায় স্পাইনগরে বেহলার পুছা হয়, বাবল বললে—

“তা হতে পারে, কিন্তু এখানেও হয়, তোর সম্বন্ধ করবার কোন কারণ নাই—আমাদের বাড়ী গজার বায়ে, চম্পাই-নগর থেকে বখন বহুশা সব গলা দিয়ে ভেসে যেতো—বাবা সাতার কেটে ঐ বহুশা বয়ে এনে মিতেন—বখন আমরা ছোট ছোট রাত্তিরে আবার সে সব বড় বড় মতুয়া ভেসে যেতো—ভাতে কী হুশর আলোর সাদা দিয়ে সাক্ষিরে মিতো—সেই আলোর সাদা কেনন হেলে চলে নেচে নেচে গজার ডেউর লকে চলে যেতো। কি হুশর বেবতে লাগতো”—হুতু চিজাসা করল,



বেহলা পুছা মতুয়া

“দাদা বহুশা কি ?” বাবল বললে “খুব বড় বড় কলায় ভেলার উপরে কাগজ, সোলা দিয়ে নানা-রকম ঘর তৈরী—করা,” গজা দিয়ে ভেসে যায়, এই রকম ভৈলার বেহলা ভেসেছিলেন—হুতু চিজাসা করলে “আজ্ঞা দাদা” বাবল বললে “আজ্ঞা দাদা নয়, একেবারে চুপ” বাবল বলে—

“গাড়ী ছেড়ে গিল। তার পর ভাগলপুরে এসে গাড়ী গাড়ালো—তখন প্রায় রাত্রি ৮টা হবে, বাবা আর রমেশ কাক ভাগলপুরের বিখ্যাত বজা ও বাবুসাই (টিকরী) এর খোঁজে গেলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বাজা পাওয়া গেল না

অগত্যা বাসুদাই ও কীয়েলা নিয়ে উঠলেন।" রবি জিজ্ঞাসা করলে "কীয়েলা কি তাই?" গোপাল সোৎসাহে বলে উঠলো: "হরিহা, ও কথা আর বোঝা বোঝা না তাই, বাটি কীয়ের পানভোজ্য রতনের বেশ বড় বড়। দু-পয়সা দাম হলে কি হবে—গরম গরম খেতে"—বাল্য বাবা নিয়ে বললে "সোহাই গোপাল বাবা, গরমের ছুটির সময় বাবাকে বলে ভাগলপুরে তেঁকে পাঠিয়ে দেবে—বাবা কীয়েলা যত পানিস। গোপাল বললে "হাবাকে বল'ত ত'খন।" বাল্য বললে "হ্যাঁ, এখন বাবা তা'র পর বাবা বললেন, "চলো রমেশ, গাড়ীতে উঠি। এই চলো। সাহেবগণের কেদারের ওখানে চার সপ্তক রাখার কথা আছে। গাড়ী কিছুক্ষণ পরে ছেড়ে দিলো, গাড়ী বানিকী সমস্ত কুটির দখল দিয়ে গিয়ে পাহাড়ের বাঁদ দিয়ে দুই ঘুরে যেতে শুরু করলো—একদিকে পাহাড় আর একদিকে গঙ্গা। গাড়ী হা হু করে চলছে, গাড়ী এসে শৌভলো কাহলগাঙে—বেশ সুন্দর ছোট গ্রাম, পাহাড়ের মধ্যে গঙ্গা পাশ দিয়ে বয়ে চলছে—খুব আশ্চর্যের স্থান। বাবার গাড়ী টিকিট ইন্ডেনের পথেই, স্টাটফরমের প্রায় বাইরে গিয়ে বাবার গাড়ী ধাক্কা দিয়েছে। বাবা রমেশ কাকাকে খেঁকিতে বিভ্রান্ত করে দিয়ে নিজে লাঞ্চে গিয়েছেন। টেনে বিশেষ লোকজন নেই—সাইনের দিক থেকে হঠাৎ একটা লোক বাবার গাড়ীর দরজা খুলে চুকলো। বাবা আর রমেশ কাকার সম্বন্ধ হয়েছে—লোকটা স্টাটফরমের দিক থেকে উঠলো না কেন? লোকটার চেহারা বিকী—খোব কাশো গারের মনসা ভেঁড়া কতুয়া, গলার বোলান রয়েছে মড়ার নাখার পুলি, এক হাতে একটা বোতল রয়েছে, আর একটা হাত লোভা ভাবে ছুঁচ্ছে। ছুঁতে বললে "ও রে বাবা! হাত লোভা ভাবে ছুঁচ্ছে—শাখ আমি গুনবো না—আমাকে হার কাছে নিয়ে চলো। গোপাল হাঁপে বললে "চল।" গোপাল ছুঁতে রবেন এসে বলল, বাল্য আরম্ভ করলে "বাবার ঐ লোকটাকে দেখে লস্কহ হরেন্দ্ৰ, লোকটা অসম্ভব ভালো অর্থ ঐক্যও দাদা ধবধবে হাড়ী—হালধে—তা হাথের তিনটে ঠাট নেই।" সকলে বলে উঠলো, "নাথের তিনটে ঠাট নেই।" অন্যর বললে "কি বিকী।" "সেই লোকটা ঠিক বলছে রমেশ কাকারই কাছে, তাই দেখে

বাবা বাহ থেকে নেমে এলেন। এর মধ্যে লোকটা মড়ার নাখার পুলিতে বোতল খুলে কি একটা তেল নিয়ে খেয়ে রমেশ কাকার কাছে আরো খেঁবে বললো, তার চোখ দুটো জমতে আভনেহ নতন। হঠাৎ রমেশ কাকাকে বললে "দেখ, বাহিরে যে" রমেশ কাকা বাইরে দেখলেন—কী আশ্চর্য। আবার দেখলেন—সেই মহিলা হাতছানি দিয়ে ডাকছেন। বাবা লোকটার কাছে এসে বললেন "উভরো গাড়ীসে, দাক পিনা নেই তোলা—উভরো।" লোকটা বললে "হাম সাধু হার।" বাবা বললেন, "আমি ও লু সাধু চাধু বুঝি না—নাম এখনি গাড়ী থেকে।" এই কথা বলতেই সাধু বাবার হাত চেপে ধরেছে। বাবা এক কাঁকনীতে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে লোকটাকে খেতেছেন শাকা। রবি বললে "হোর বাবার গারে খুব কোর ছিল বুঝি।" কোলা বললে "এমন তো দেখলে বোকা যায় না।" অন্যর বললে, "আমি বাবলের বাবার কটো দেখেছি, কন বরসে কী সুন্দর ও muscular চেহারা ছিল।" বাল্য বললে "তার পর সাধুর সঙ্গে বাবার ক্ষতাক্ষতি চলে, গার্ড সাহেব ও খেলচে পুলিস এসে উপস্থিত হলো। গার্ড সাহেব এসে টিকিট দেখতে চাইলেন, সাধু টিকিট দেখাতে পারলে না। পুলিস বললে—গুয়া শরতান হাট—বেতমিক—সহকে ককীর আর হাতনে সাধু—উভরো গাড়ীসে, পুলিস ভো বাটনেব ভতো দিতে দিতে সাধুকে গাড়ী থেকে নামালো। গার্ড সাহেব হাইসেল দিয়ে নীল আলো দেখিয়ে দিলেন—গাড়ী ছেড়ে দিল। বাবা আর ওপরের বাহে না উঠে রমেশ কাকার কাছে বিদ্বান করে নিলেন। বাবা গর করে রমেশ কাকার ঘন থেকে মহিলার কণ্ঠটা তোলাতে চোঁটা কছেন। গাড়ী লকোরে সাহেবগণের দিকে চলছে—কেবল পাহাড়। কিছুক্ষণ পরে গাড়ী বদন পাহাড়ের কাছ দিয়ে যাচ্ছে—দূরে একটা ভগ্নদুর্গ পাহাড়ের উপরে চাঁদের আলোতে দেখে বাবা বললেন রমেশ কাকাকে, "রমেশ এই সেই তেলিগাড়ী দুর্গ—বখন আমরা স্থল বা কলমে পড়তাম এই স্থানেই আমরা সব হেলেরা মিলে বিজ্ঞান-শাসনের অন্যর গান "বেবার পাহাড়, বেবার পাহাড়" মুক্খিল বন এতাপ বীর" দেখেছি। রমেশ কাকা



জিজ্ঞাসা করলেন, “কুঁর্স কে তৈরী করেছিল?” বাবা বললেন—বোধ হয়, ঔরংজেব বাহাদুর যেনকে রাষ্ট্র। হুম্মার হাত থেকে রক্ষা কর্তে। গল্প করতে করতে গাড়ী এসে উপস্থিত হলো সাহেবগড়ে। সাহেবগড় প্রকাণ্ড ট্রেন, পাহাড় সব বেধা বাচ্ছে। বাবা ও রমেশ কাকা ভাগলগুয়ের বাবুদাই ও কীরেলা নিয়ে কেসনায়ে গিয়ে চার অর্টার দিলেন। চাটা খেয়ে রেভেঁওয়া থেকে বেরিয়ে বাবা আর রমেশ কাকা গ্যাটকরবে বেড়াচ্ছেন, হঠাৎ রমেশ কাকা আবার বললেন—“ঐ দেখ, মহিলা আবার হাতছানি দিয়ে ডাকছেন, আবার বড় যেতে ইচ্ছে হচ্ছে।” বাবা এবারে মহিলাকে দেখতে পেলেন। আশ্চর্য হয়ে বললেন, তাইতো রে, চ’ল একবার দেখেই আসি গে। বাবা আর রমেশ কাকা মহিলার দিকে এগোচ্ছেন। মহিলা হাতছানি দিয়ে ডাকতে ডাকতে ক্রমশঃ ট্রেনের গ্যাটকরবের শেষ প্রান্তে চলছেন—তাই লক্ষ্য করে বাবা বললেন—“রমেশ, আর দেখতে গেলে ট্রেন ছেড়ে দেবে, চল গাড়ীর দিকে যাই। কিয় রমেশ কাকা-তা দৃষ্টেও এগিয়ে যাচ্ছেন দেখে বাবা এক রক্ষণ খোর করেই হাত ধরে তাঁকে টেনে নিয়ে এসে গাড়ীতে উঠলেন।

বাবা জিজ্ঞাসা হয়ে পড়লেন। এই মহিলাকে রমেশ কাকা জামালপুর ট্রেন থেকে দেখছেন, এ মহিলা কেনই বা হাতছানি দিয়ে ডাকছেন। বাবা নানান কথা ভাবতে লাগলেন। বাবার মনে হলো “যুদ্ধের পিলীয়ার কথা। যুদ্ধশক্তিবায়ের বারবেলাতে বেকতে নিবেদ করেছিলেন, তখন তিনি আর রমেশ কাকা লে কথাটা হৈলে উড়িয়ে দিয়ে ভাল কাজ করেন নি।” কালো বললে—“না, হৈলে কথাটা উড়িয়ে দেওয়া ঠিক হয় নি, আবার ঠাক’নাও কিছুতেই বাবাকে যুদ্ধশক্তিবায়ের বেফতে বেন না।” অমর বললে—ওসব অন্ধবিশ্বাস, ও সবের কি মানে আছে। রবি, বিলেতে বোধ হয় ও সব মানে না।” রবি বললে “কে বলেছে মানে না, তেলাপোকা, ঠিকঠিকি পণ্ডিত মানে। সকলে আশ্চর্য হয়ে গেল। জগদীশ বললে “সাহেবেরা এ সব মানে।” রবি হেসে বললে “হ্যাঁ।”

বলল ব’লে যাচ্ছে—“তার পর গাড়ী ছেড়ে দিয়েছে, তিন পাহাড়ের দিকে গাড়ী পাহাড়-প্রান্তর ভেদ করে চলেছে। যখন তিন পাহাড়ের কাছে গাড়ী এসেছে, বাবা একটা বীর্ষ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, “রমেশ, এই তিন পাহাড় থেকে রাজ মহল যাওয়া যায়—রাজমহল কেন নাম হলো জানি।” রমেশকাকা জিজ্ঞাসা করলেন “কেন?” বাবা বললেন, “এই রাজমহলের নাম ছিল আগে আগ্ন মহল। শতাব্দী আকবর যখন মাদনসিংহকে বাংলার শুবেরার করে পাঠান, তখন মাদনসিংহ এই



গম্বাক কোল। বেলা সন্ধ্যায়কে কোল করিয়া আসীন আগ্নমহলকে বাংলার রাজধানী করেন বলে এর নাম হলো রাজমহল।” অমর বললে ওটা তো তাই বোঝাবে।—বাঁধ বললে “তখন বাংলার মধ্যেই ছিল। ঐ রাজমহলের কাছে বাংলার শেষ দাবীন নাবাব বীর কালির উদুনা নামার যুদ্ধক্ষেত্রে ইরোমবের কাছে পরাজিত হয়ে সিরুফ-বাজা করেন—উদুনা নামার কথা মনে হ’লে কড়ই ছুঁত হয়, বাচ্—এই রকম সব গল্প বলে বাবা রমেশ কাকাকে অত্মমনস্ক করতে চেষ্টা করতেন বটে কিন্তু তাঁর নিজেও মনেও নানান প্রশ্ন এসে উপস্থিত হয়েছিল, তিনি কিছুই ঠিক করতে পারছেন না কে এই মহিলা।”

বেধতে বেধতে তিন পাহাড় ট্রেনে এসে গাড়ী থাড়ালো, ট্রেনে বসে বাবা আর রমেশ কাকা ট্রেনের গ্যাটকরবে বেড়াচ্ছেন। খানিকক্ষণ বেড়ানোর পর

হঠাৎ রমেশ কাকা ব'ললেন "ঐ বোম্ব, আমাদের গাড়ীর কাছেই মহিলা হাত-চামি দিয়ে ডাকছেন"। বাবাও বেবেছেন মহিলাকে, ছ'তেনেই ভাড়াভাড়ি গাড়ীর নিকটে গেলেন, সেখানে ভিড় ছিল, সেই ভিড়ের মধ্যে মহিলা হঠাৎ আবৃত হলেন। বাবা ব'ললেন "ভাই তো—চল গাড়ীতে উঠে—সময় হয়েছে গাড়ী ছাড়বার। গাড়ীর দরজা বন্ধ করে বাবা বেকিতে রমেশ কাকার কাছে ব'ললেন। রমেশ কাকা ব'ললেন বাবাকে "তোমার যে চোর ঘুম চলে আসছে—আবারও ঘুম পেয়েছে।" অর্থাৎ ব'ললেন "চোরের আর সোধ কী ব'ল—বিশ্ব মন্ডল" যা গোল বাহিয়েছেন—থাক আর তেবে কি হবে, আন্দা-দরজা সব বন্ধ করে তেবে পড়া 'বাক্'—ঠাঁহ: জানালা-দরজা বন্ধ করে তেবে পড়লেন। গাড়ীও ছেড়ে নিঃস্বে—উভয়েই বেশ নিঃশব্দ, বেশ খানিকক্ষণ উভয়েই গুমিয়ে নিঃস্বেছেন। হঠাৎ বাবার গুম



শ্রমের একটু ফ্রিই উপের সঙ্গে মাল গাড়ীর কদিনস হয়েছে তেজে গেল। বাবা উঠে দেখলেন গাড়ীর দরজা খোলা। রমেশ কাকা নেই।" সকলে এক সঙ্গে ব'লে উঠলো "রমেশ কাকা নেই, বলিস কী?" বাবা নেমে দেখলেন রাবপুত্র হাত ঠেপনে এসেছেন—তিনি ভাড়াভাড়ি এম্বিক ডব্বিক বেবে লক্ষ্য করলেন—রমেশ কাকার হাত ধরে মহিলা হ'ব'ব'ব' করে চলছেন ঠেপনের বাইরের দিকে—বাবা ভেঁট্টতে আরম্ভ ক'রলেন। বাবা ব'ললেন "রমেশ, হাত ছাড়িয়ে চলে আর, গাড়ী ছেড়ে বেবে—কিন্তু রমেশ কাকা বাবার কথা না শুনে এসিয়ে চলেছেন। বাবা ছুটে গিয়ে মহিলার হাত ধরে গেলেন। মহিলা বাতীর সঙ্গে দিলিয়ে গেলেন, বাবার মাথা কী রকম কর্তে লাগলো—বাবা বাবা ধরে বসে পড়লেন—রমেশ কাকা ভাড়াভাড়ি বাবাকে ধরলেন—গাড়ী ছেড়ে দিল। বাবা উঠে ব'ললেন "গাড়ী ছেড়ে দিল—ইটকেন, দাবী শাল, চৌরার কিন্ড, সবই বেল—বার বার তোকে দাবী ক'রলাম হস্তর দস্তন ভৌতিক কাণ্ড।"

রমেশ কাকা চাপা পলায় বয়েন, "ভুপ কত, যা এসেছিলেন।" বাবা আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন "যা এসেছিলেন—তোরা না তো ছ' বছর হ'লো বাবা গিয়েছেন।" রমেশ কাকা ব'ললেন বড় ভালো লাগে—ছিলো বার সঙ্গে বেতে, থাক, আর তেবে কি হবে—চল ওয়েটিং কমে বাববা করে-ওয়ে থাক। বাক্।" বাবা ব'ললেন "চল ভাই, টাকা-কড়ি-টিকিট ত্যাগাস পকেটে আছে।" তারপর বাবা রমেশ কাকার হাত ধরে জিজ্ঞাসা করলেন—"রমেশ, সত্যি ব'লহিসু তোরা না—এসেছিলেন?" রমেশ কাকা ব'ললেন "সত্যি ভাই"—

ওয়েটিং রুমের সম্মুখে তাদের দেখা হলো এক বাঙালী টিকিট-কলেক্টরের সঙ্গে। ট্রেন দিসু করবার কথা শুনে তিনি এসে ব'ললেন "আজ্ঞা ব'লার—এতই বেবেছেন কেলনারে যে গাড়ী পকাস মিনিট ষাঁড়ান নক্বেও দিসু করলেন, বলিচারি?"—বাবা আর রমেশ কাকা টিকিট-কলেক্টরকে কিছু একথা না করে ব'ললেন "ওয়েটিং কমে একটা বাববা করে দিন।" টিকিট-কলেক্টর ব'ললেন "আজ, ওয়েটিং কমে ছ'টো ইটি চেয়ারে ব'লেনে তেবে পকুন, বেলা ১২টার ট্রেনে যাবেন, আবার এখানে লকালে না হয় জানাহার করে মেবেন"—টিকিট-কলেক্টর চলে গেলেন, বাবা ও রমেশ কাকা ওয়েটিং কমে ইজি চেয়ারে ওয়েছেন, তজ্ঞা এসেছে, এই সময়ে ট্রেনের কিছু ঘুরে একটা ভয়ানক শব্দ হোল, বাবা ও রমেশ কাকা চমকে উঠলেন। ট্রেনের ভয়ানক গোলমাল। বার থেকে বহিরে উঠা ট্রেনে-মেবেন—সাহেব ট্রেন-হাটীর লোকজন-ভাকার সব ট্রাঙ্কটী ক'রুয়ে। রমেশ কাকা আর বাবাকে বেবে-সেই টিকিট-কলেক্টর ব'ললেন "খুব কপালভোর ব'লার আপনাংবের,—খুব বেতে গিয়েছেন, ট্রেনের একটু ঘুরেই ট্রেনের সঙ্গে মাল-গাড়ীর ভীষণ কলিগন হ'য়েছে—একিনের একটু কাঁয়ের সব ভেঙ্গে চৌরীর হয়ে গিয়েছে—" অনেক লোক আহত হয়েছে—বেবছেন দুটো ট্রী করে পুলিশ, ডাক্তার সব বহিরে গেল।"

বাবা শুনে অগাধ—বাবা ও রমেশ কাকা একিনের ঠিক পরের গাড়ীতেই বাক্তেন। বাবা ব'ললেন "বার ভুল হই রমেশ—তোরা না-ই এসেছিলেন রমেশ—তোরা জর্জে আমিক-বাচলাহ"—

এই সময়ে বাবলের বাবা বাতীর গোট বিয়ে কপাউতে আবেশ করলেন, বাবলের পুত্রর আসরও ত্যাগলো—

# ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀଚିତ୍ର

ଶ୍ରୀମଦେବ ଗଙ୍ଗାଧାରୀ

## “ଏକାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ”

କବି କହିଲେ :

ଦେବୀର ଶ୍ରୋତାବେ ଶ୍ରବଣ ହୁଏେ ହୃଦ ହ’ଲେ ସହାୟକ,  
ପୂର୍ବାତୀରେ, ସଞ୍ଜିତ୍ରସ୍ତବ ଇଚ୍ଛାନ୍ତି ଦେବଦଳ,  
ଆମା-ବିକଳିତ ହୃଦ ଆନନ୍ଦେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳି ଆକାଶେ ପୁର  
କାନ୍ତାଞ୍ଜନୀର ଦୁଃଖିର କେନ୍ଦ୍ର ଶୁଭେ ହୁଏ ନିବନ୍ଧନ !

ଓମୋ ସତ୍ୟଦେବି, ମହାମାତୃତଃ ଆଶ୍ରି-ବାସିନୀ ତୁମି ;  
ଶ୍ରମଣା ହୃଦ ହେ ସହାୟକତୀ ! ନିଶିଳ ବିଦ୍ୟ-ସାତା !  
ଶ୍ରମଣା ସ୍ତବ ଜଗନ୍ନାଥବି, ବଳ ବନ୍ଧୁ ତୁମି,  
ଏ ଚନ୍ଦ୍ରାଚରରେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଯା ଗୋ ତୋମାରହି ଆମନ ପାଶ !

ତୁମି ତୁମ୍ଭ ଯା ଆଶ୍ରୟ ଏହି ନିରାଶୁଳ ଶମ୍ଭବତେ  
ଏକାଦିକେ ହେବା କିତିଭଙ୍ଗେ ଯାଗେ, ତୁମିହି ଶେଷେ ହିତା  
ତୋହାର ମୃତ୍ତି ଅନାଦିତ୍ୟାୟ,—କିବା ଶୂନ୍ୟ ନୃତ୍ୟନେତ୍ର !  
ମୂଳ: ଅନନ୍ତରେ ଅଭିଳ ବିଦ୍ୟ କରିବ ଆଧ୍ୟାୟିତା !

ତୁମି କୈବଳୀ, ବିକୃ-ମୃତ୍ତି, ଅମାର ବୋଧାବତୀ !  
ସହାୟକେର ବୃକ୍ତ ତୁମି ଯା ଗୋ, ଯାହାଞ୍ଜନେ ଆଶ୍ରୟ ତଥେ,  
ନିଶିଳେ ଅନନ୍ତ ହୃଦେରେ ସୋହିତ ତୋହାର ଶ୍ରୋତାବେ ମୃତ୍ତି ;  
ତୁମି ବାସି ମୂଳେ ଅନନ୍ତା ହୃଦ ସେହି ତ ମୃତ୍ତି ମତେ !!

ମୃତ୍ତି-ବିଜ୍ଞା, ମୃତ୍ତି ବନ୍ଧୁ, ତୋହାରହି ଆମନ୍ତ୍ରଣା,  
ଅମଳ-ଅନନ୍ତୀ, ଅଭିଳ ତୁମିହି ହୃଦୀ କେନ୍ଦ୍ର ନାହିଁ ;  
ମୃତ୍ତି କୈବଳେ ଅତୀତ ସେ ତୁମି ଓମୋ ଦେବି ଅତୀତା !  
ଅବ୍ୟାଧିଯାବ ଡିଗ୍ ଅବିଦ୍ୟ, ଅତି ତବ କୋଣା ପାହି ?

ମୃତ୍ତି-ସୃଜନା ମୃତ୍ତିବି ତୁମି ମୃତ୍ତି-ସୃଜି-ସାହିନୀ  
ତବେର ମନ୍ତ୍ର କେଦନେ ବାଜାରେ ବନ୍ଧିବ ତୋହାର କାହିନୀ ?  
ହୃଦି ସୃଜନେ ମୃତ୍ତି ଅନନ୍ତେ ଅନ୍ତରେ ତୁମି ସହ ;  
ସୋକ୍ଷମାନ୍ତୀ ଓମୋ ମାତାବନି ! ଦେବେର ଶ୍ରମଣ ସହ !!

କଳା-କାର୍ତ୍ତାଦି କାଳଞ୍ଜନେ ତୁମି ସମ୍ଭବେର ମୃତ୍ତିବିଦି,  
ବିଦ୍ୟ-ସୃଜି ଓମୋ ମାତାବନି ! ତତ୍ତ୍ୱେ ମହ ଶ୍ରମଣ !!

ମିହିବାହିନୀ ମୃତ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱେ ତତ୍ତ୍ୱା ତୁମି ଅସହ  
ଡିଗ୍-ମହାୟା, ଓମୋ ଶ୍ରୀମଦାମ୍ଭା ! ମୌରୀ ମୋ ଶାନ୍ତି ମହା !



ମୃତ୍ତି-ସୃଜି ଶ୍ରମଣ-କାହିନୀ ମୃତ୍ତି ଶ୍ରୀତ୍ୟାୟ,  
ଓମୋ ମାତାବନି, ଦେବି ମାତାବନି ! ତୋହାରେ ନୟନାବ !

କୌଣ ଓ ଆର୍ତ୍ତ ମହାମାତୃତେର ମୃତ୍ତି ତାହାତାବ  
ବିନାସି ବଳ ମହେ ମାତାବନି, ତୋହାରେ ନୟନାବ !!  
ହେମୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟାବେର ମହେ ଶ୍ରୀଆଦିତ୍ୟେ ହିତ,  
ହୃଦମୃତ୍ତି ସାଦି-କବଳ-କାହିନି, ମୃତ୍ତି ମୋ, ଶ୍ରୀତ୍ୟାୟ !!

ଅର୍ଦ୍ଧ-ଶ୍ରୀ ମୃତ୍ତି-ସୃଜନେ ହିମ୍ବ-ସାହିନି ମୃତ୍ତି !  
ଓମୋ ମାତାବନି ! ହୃଦ-ସାହିନି, ଶ୍ରୀବି ମହେ ନତି !!  
ଡିଗ୍-ବିଦ୍ୟା, ହେ ସହାୟକ କେବି-ହୃଦ-ମୃତ୍ତି !  
କୌଣାବିଦ୍ୟା ଓମୋ ମାତାବନି ! ଶ୍ରୀବି ତତ୍ତ୍ୱେତେ !!

ମହା, ତତ୍ତ୍ୱ, ମହା ଓ ମାତା ମହା ଆଶ୍ରୟ ବୀର  
ସହାୟକବିଦ୍ୟା ମାତାବନି, ତୋହାରେ ନୟନାବ !!  
ତତ୍ତ୍ୱ-ସାହିନି,—ବିଦ୍ୟ-ବନ୍ଧୁ ବଳମୋହୁତା ବୀର  
ସହାୟ-ବନ୍ଧୁ ବିଦ୍ୟା ମାତାବନି, ତୋହାରେ ନୟନାବ !!

ବୈଦ୍ୟାବଳେର ନିକମୋତତା ମୃତ୍ତି-ତତ୍ତ୍ୱ, ସୋକା,  
ଡିଗ୍-କବଳ-କାହିନିର ମହେ ନତି କବି ଆଦିତ୍ୟାୟ !!  
କୌଣାବିଦ୍ୟାବିଦ୍ୟା ବଳ-ମୋହୁତା, ମହା ଆଶ୍ରୟ ବୀର  
ହୃଦମାତାବିଦ୍ୟା ଶ୍ରୀବିଦ୍ୟାବିଦ୍ୟା ଦେବୀବେ ନୟନାବ !!

ବିଦ୍ୟ-ସୃଜିତେ ବଳ-କାଳଞ୍ଜନେ କଳିଲ ହେ ମହାବୀର !  
ହୃଦାବତୀ ଶ୍ରୀ-ତାବିଦ୍ୟା, ତୋହାରେ ନୟନାବ !!  
ବିକଟବଳା କାଳବଳନ, ଅବ୍ୟାଧା ବିକୃତେ !  
ହୃଦ-ସାହିନି ଓମୋ ମାତାବନି ! ନତି କବି ଶ୍ରୀତ୍ୟାୟ !!

ମହା, ମହା, ସହା ଓ ବିଜ୍ଞା, ଶ୍ରୀତ୍ୟାୟ ମୃତ୍ତିବୀର !  
ହେ ବିଜ୍ଞା, ହେ ସହାୟକ ! ହେ ଆଦିତ୍ୟ ! ନୟନାବ !!  
ସୋକ୍ଷମାନ୍ତା ଓମୋ ବାନ୍ଧବି ! ସହ-ମହାବ-ସାହି,  
ନତି ବୈଦ୍ୟାବି, ତାବିନି, ସାହିନି, ଶ୍ରୀବି ହୃଦ ଆଦି !





### ঐতিহ্যের মজুমদার

আর কোঁড়াছড়ি করিতে কাহারও ইচ্ছা ছিল না ; তাহাণি ভীতভীরু বয়ঃ উত্তোষ-আয়োজন করিয়া ছুঁড়িলেন এবং অস্ত্র-শস্ত্র ও তৈলকপড় গুছাইয়া লইয়া বাইবার কাঁসে বসিয়া পৌলেন, বটী বানেকের মধ্যে জ্ঞান হইবে । পশ্চিমদর্শনের মনে যেটুকু বিরোধ দ্বন্দ্বা বীধিয়াছিল, এই কথাই সেটুকুও অবলান ঘটিল । তখন হইতে সকলেই উত্তম ব্যাখ্যানরূপে পথ্যাপারিত বৃক্ষের ছাঁড়ি বহু নয়নের পানে চাহিয়া রহিল ।

ইচ্ছাচর্য্য বয়ঃ পরন্তরে বসিয়া থাকেন, সিপাহী বিক্রোহের পূর্বদিন তিনি ক্ষুণ্ণিত হইয়াছিলেন । পুটিন সাম্রাজ্যের ভাগ্যাকাশে সেই দিনই রাহর স্ফোর । পরাবীনভার নাগপাশ হুজিরও নাকি সেই দিন পুচনা । এই শুভ বয়ঃকলা বাড়ীর লোকের মুখের ত হইয়াই গিয়াছে ; লহরের অধিকাংশ বাসিন্দাও জ্ঞানিত পারিবারে যে, জননী-মুঠের শয়ান অবস্থাতেও ঐ যোগযোগে ইন্দ্রি চমক রাইই করিয়াছিলেন ; লোকটি মহাতাপাবান ।

ভাগ্যবান, তাহাতে কোন সম্ভেদ, কোন কাণে, কোন লোক, করে নাই । দুসভা পৃথিবী অসভা ব্যবসারেও বয়ঃভার নাস্তিক্য করিয়া আনি জাণি, কিন্তু কনকপল-বিহারি কলমবনিনাবানী কল্যা, অগ্রগর হুগা হুয়ে রক, অকপন করে ও প্রদর্শনরূপে যে বয়ঃ কলিরাছিলেন তাহাতেই হাতীশালে আশ্রয় হাতী বীরা আছে ।

হুত-প্রদর্শনের শিল্প-নগর কানপুরের পাশে এক পত্র-গ্রামে এক নগর্য্য নেওটার প্রকৃতি কারকের গৃহে ইন্দির চাহের জন্ম । শিল্প নেওটারের কারকরনা সিপাহী বিক্রোহের অধিতে তন্যকৃত হুগায় শিতা পথের ভিহারী হইয়া, কয়েক

বৎসর পরে অতি দীন-দীন অবস্থার মধ্যেই পথলোক গমন করেন । ইচ্ছাচর্য্য লেখাপড়ার প্রবেশ না পাইয়া, তবুও হইবার পথে, ছেঁড়া ও হলদা ভ্রাকড়া লকরে মনোনিবেশ করে ; কাপড়ের কল্যা ঠাকুরাণি সেই ভ্রাকড়ার গাধার উপরেই কলম-বনানীপ্রবে কল্যাপন বিস্তার করিলেন । দেবতাবেশ বিচিত্র লীলা । বন, জন, মুখ, লম্বি, বটো, বাহু, দাঁহ কাহনা করে এবং পাইলে কীমন বহু জ্ঞান কত্রে, দাঁহ বয়ঃভারের তাগে বোল আনার স্থলে বিন আনা ছুটিয়াছিল এবং অর্ধজনভাবীর অধিক কাল সর্বাধিক লুপ-দস্তোগের পর, তাহার কোণের কোন কারণ না থাকিলেও শেষ পথ্য শয়ান অবস্থাতেও যেদিন ভীতভীরুর হাত বহিরা লকল নেওচে ও ব্যাখ্যান কর্তে আরও কিছু বিনের অস্ত্র যেহান বৃদ্ধি করিবার লক্ষে কাকুতি-বিনতি জ্ঞাপন করিলেন, সে দিন মর্ত্যের লোক হাসিয়াছিল এবং তাহাকে শুনাইয়া অথবা না শুনাইয়া মন্তব্য করিয়াছিল—নগর্য্যের মায়া এমনই হুশ্বেদ হটে ! ইতিবোব-পুণ ইচ্ছা চর্য্যের কাণেও কথাটা বোঝ হই গিয়াছিল এবং তিনিও বোঝ করি হাসিয়াছিলেন ; কিন্তু সে অস্ত্র কারণে । সে কথা এখন থাক ।

১২৪৭ সালের আগষ্ট মাস, স্বাদীনতা দিবস দিবস । পৌষ-পৌষ, মৌহিত্র-মৌহিত্রীতে "রাহ বাস" গিল্ গিল্ করিতেছে হটে কিন্তু চিত্রে তাহারও লুপ ছিল না । রাহ বয়ঃভার "এখন তখন" হইয়া আছেন, মিলেবৃত্ত : সন্ত তিন দিন তিন রাতি অথোত, অষ্টভক্ত, কলম বি হই তাহ, কাহকেই উৎসবের চিত্রাও লুপ-পরাহত । তিনি নিত্যই

উজ্জ্বল ও সজ্জ্বল্যাবার ভাই, নহিলে ইহারায়ে বলিত,  
বুড়ো ঘরবার আর সন্নত পেলেন না। আড়ালে আবর্তনে  
অন্তেও ঐ কথা বলিতেছে কি না ভাই বা কে জানে।  
স্বর্গীয় কাল বাঁচিয়া না থাকাই ভাল।

ভাঙার সে দিন টিকই বলিয়াছিলেন; সন্ধ্যায় পূর্বেই  
জানোয়ার হইল। ঘনাক্ষার মধ্যে ক্ষুদ্র বৃন্দাবীণের  
আলোকে আলো হর না বটে, তবে বাহুবের মনের  
ঈশ্বার অনেকখানি দূর হয়। নির্দেশসত্তা ওৎপন্নপথ্য  
প্রয়োণের পর, সার-গৃহিণী, রায় মহাশয়ের যুগের উপর  
কৃত্রিম পড়িয়া ব'লিলেন, ইয়াগা, আমায় কিছু বলবে না ?  
বুড়ো মায়েই খাড়া নাড়িলেন; সকলেই বুঝিল, অনেক  
কথা বলিবার আছে। একটু পরে বলিলেন, সকলকে  
ডাক। গৃহিণী করিলেন, সকলেই তা আছে। এই দেখ  
না, তুমি তিন মাসের খোকন পৰ্ব্বাক্ত তোমার যুগের  
পানে হাঁ ক'রে চেয়ে আছে। কত গুনিয়া বুঝি হইলেন।  
তত মধ্যেও হাসির রেখা স্পষ্ট হইল : খোদা চোখও  
একদম হইয়া উঠিল। বহুতমধ্যে, কক্ষের অঙ্গসরভাও যেন  
বুটিল।

ইশ্রুত জিজ্ঞাসা করিলেন, আজ কত তারিখ ?

গৃহিণী করিলেন, ২৭এ প্রাণণ। কেন না ?

“ইংরিজি কোন্ তারিখ ?”

“তেরই আগষ্ট।”

‘তাই’লে আজ বুধবার না ? বুধ, বৃহস্পতি, তারপরই  
ওকুয়ার, ভাই না ?” সন্বেহ হইবার কথা নহে : কিন্তু  
আহার যেন সন্বেহ হইতেছে।

“হ্যাঁ।”

“জেলোয়া উৎসবের উডোপ আরোজন-করছে না ?”

নিজীব বুধ অভ্যস্ত কৌণ ও বুদ্ধ কর্তেই কথা বলিতে-  
ছেন কিন্তু এমনই তীক্ষ্ণ ও সমাগ মনোযোগ দিয়া ধর-  
ত্তর লোক কথা গ্রাস করিতেছিল যে, তদন্তেই কক্ষমধ্যে  
যেন বিদ্যুৎ-তরঙ্গ খেলা করিয়া গেল। বুধ পুনর্নত করিলেন,  
কমল গ্রন্থাবকে বল, আহার কুশোৎসর্গ, দানদাগর  
প্রাচীর ধাতে যে দশ লক্ষ টাকা আছে, তার পাঁচ লক্ষ  
দিয়ে ঐ দিন, ঐ ২৩এ প্রাণণ—১৪ই আগষ্ট কানপুরের  
সমস্ত গদ্যবন্দ্যবকে একখানা ক’রে কাগজ আর এক  
ইন্ডিয়ারের সের যেন, কেউ না বাধ পড়ে। আর—

কমলগ্রন্থাব কনিষ্ঠ পুত্র, কাককর্ণ, বিদ্য-আসর সমস্ত  
তাহারই তত্ত্বাবধানে চালিত : পিতার কথা শেব হইবার  
পূর্বেই না’কে লক্ষ্য করিয়া বলিল, হা, বাবাকে বল,  
অন্ত কাগজ পাওয়া যাবে না।

বুধ নিজেই শুনিতে পাইলেন; বলিলেন, পেতে হবে  
যা। দ্বিতীয় বাণ্ড, লাট সাহেবের কাছে যেতে হয়, তা’ও  
যাও। পেতে হবেই; বড় আনন্দের দিনে বড় আনন্দের  
জিনিষই দিতে হয় বাবা। একখানি নতুন কাগজ পেলে  
সব্বীনের যে আনন্দ হবে নগণ দশটা টাকা হ্যাঁতে পেলেও  
ততটা আনন্দ হবে না। এ কথা বাবা, কনভেই হবে।  
আহার সজ্জা একদিকে আর ঐ ক’খানা কাগজ অন্ত-  
নিকে। বাবার আগে এ যদি না দিয়ে যেতে পারি, মরেও  
আমার স্বপ্ন হবে না। মরেও আমি শান্তি পাবো না।

বড় নাতিটি জিজ্ঞাসা করিল, ঠাকুঁর, বাবাকে জিজ্ঞাসা  
কর-না, আমাদের বাড়ী সামান্য হ’বে না ?

“ও কে, অস্ত বুদ্ধি ?” হবে বৈ কি লজ্জ, নিশ্চয় হবে।  
দশ হাজার টাকা মজুর কর, বড় নো। বরকার হয়,  
আরও মিণ্ড। সাজিয়ে আলো দিয়ে আমাকে একবার  
হংকরি ক’রে নিয়ে গিরে দেখাসু দাছ। তারপর, সেই  
আলো নেববার আগে তোরা হরি বোল দিতে দিতে  
আমাকে আর একটা আলোকিত আরগার রেখে আসিসু  
ভাই, আমি মুখ করবো না।”

পুত্রার পানীর দেওয়া হইল : বুধ তৃপ্তির নিঃশ্বাস  
ফেলিয়া করিলেন, বড়-নো, মনে আছে ত, স্বাধীনতা-বুধ  
আরম্ভের ঠিক আগের দিনে আমার অম্ম ? আমার দার  
যুগে শুনেছিলে ত সেই সিপাই-বিশ্রোহের গল্প—নাড়ী  
কাটবে, দাঁড়ি অবধি পাওয়া গেল না।

গৃহিণী বলিলেন, সে শু সবাই জানে।

“স্বাধীনতা যেদিন পাকী তার পরদিনই আমি চ’লে  
যায; দেখো। মুরের ভাঙারের সঙ্গে আমার কড়ার  
আছে। তাকে আমি দশ হাজার টাকা দিয়েছি।”

অন্তে হস্ত তানিতেও পারবে যে, এখনও দুই দিন  
তিনরাতি খাবী রহিয়াছে, এতখানি সময় না কাটিতেও  
পারে; কিন্তু হিন্দুস্তানী রহিবার কালেও আপা রাখি।  
যা, আমি সত্যি ভাগ্যবান, আমি ষাঁড়, সুখি যাক। রাখ-

পৃথিবীও দখল করি গোপন করিয়া কহিলেন, বেশ ত, বেগবে বৈ-কি।

জুস্ত সিংহ বেন কাগিয়া উঠিয়া গর্জন করিল, দেববো না? নিশ্চর বেগবে। তুমি ত জান বড় বো, কংগ্রেসকে আমি টাকু দিই, কংগ্রেসকে আমি সাহায্য করি বলে বিদায়-আশু টাকি কড়ি কতবার বাজেরগু হইয়াছিল, হাতকড়া দিয়ে লাগিরি পোতা দিয়ে কতবার আনাকে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে টেনে নিয়ে গেছে, তুমি ত বেগবে! তুমি কত কাঁধতে, বোনারা-কাঁধতেন, ছেলেরা রাগে কুলতো, ছোট্টোই মাতি নাভহুড়া তরে ঠক ঠক করে কাপতো, কোঁরার মনে নেই?

পৃথিবী বলিলেন, হ্যাঁ পা, তুমি কি বলছো? নাহয় কি সে সব দুর্দিন কুলতে পারে?

“বড় বো, কনু স্যেরেছিসু, সানবের ঐ তরবারটি দেবার জন্তে। তপস্বানকে ডাকতুম, বলতুম তপস্বান, হেঁচা কাপড় পুরে জীবন হুঁত করেছিসু, হেঁচা কাপড়ে আমি ভরাই নে, আমার সব বাক, ছুঁনি আমার দেশের স্বাধীনতা এনে দাও। আমি আমার জাকড়া পরি কিং আমার দেশ স্বাধীন হোক।”

“হ্যাঁ পা, তুমি এত কথা বলছো কেন? তিন দিন পরে জান হয়েছ, একটু চূপ করে তরে থাক না। আর, ও সব কথা না-জানেকে বল? তোমার বাড়ীর কথা জেড়ে পাও, বেপতজ, রাজ্যতজ মোক সবাই জানে। তুমি আর কথা বোল না। আমি পাথে হাত তুলিয়ে দিচ্ছি, তুমি চূপ করে তরে থাকো।”

“আচ্ছা, আমি চূপ করছি; তুমি ভয়ত ও অস্ত্রীকে বসো, তারা বেহালা বাজিয়ে সেই পানটি করুক। আমি শুনি।”

অস্ত্রী আদর্শি পৌষী, সাগ্রহে কহিল, কোন্টা বাদু, “বেগে বাই হুগ্যালোক?”

“টিক বলছে দিদি, টিক বলছে। বেগো না, তোমার খুব বীর বর হবে। আর বড় বো, ডাক্তারকে খবর পাঠাও, আমার কথা আছো।”

তখনি শোক চলিয়া গেল। অরুণ বেহালা লইল, অস্ত্রী বীণার বজা তুলিয়া গাহিল:

“যদি তাহে বেদ নাহি

তধু চোখে দেখে বেতে চাহি

ভারতের ভাগ্যাকাশে নব সূর্যোদয়।”

ইন্ডার খুয়াইয়া শড়িলেন; বড়বো সকলের অলক্ষ্যে চুপ হইলেন।

জানি না কথটা কি করিয়া কানপুরের জেতার হইয়া গিয়াছিল; সকলেই শুনি, ‘ভান্ডা: ইন্ডির’ মহাভারতের ভীষ্মের মত ইচ্ছামতী পণ করেছে, শনিবারের জেতর হবার আগেই সে মাঝি এ পৃথিবী থেকে চলে গাবে।’ ইন্ডর রায়ের অপর দৌড়াগা, সে ছিল অত্যন্ত শক্ত। বড় লোকের এমন দৌড়াগা কথটিং হয়। শক্ত তাহার হয় নাই। হয় নাই যে, সে তাহারই তপে। কোঁরার হইয়াও সে ছিন্ন বস্ত্র ত্যাগ করে নাই, দুইবার কোঁরার থাকিতেও সে কোন দিন কোঁরার চড়ে নাই, (কুটিলের স্নাক যারিয়ার অবস্ত বস্ত্রের আভ্যন্তর কহিছে।) অথী প্রাণী কখনও মনঃস্থ হইয়া তাহার গৃহ হইতে ফিরে নাই; আর সর্বোপরি মুখের নিচে ভাষা ও দরল হাসিটি সকল দনয়ে সকলের সমুদ্রই সে সজিত রাখিয়াছিল, কাছাকেও ব্যক্তি করে নাই। লোকটির মন পূর্ণ নৈশ্চল্য, তখন তাহার ভাববিচার ছিল না, সকলের সঙ্গে আহার-ব্যবহার করিত উত্তরকালে অনেকই পূর্ণ অত্যন্ত ত্যাগ করে, ইন্ডর তাহা পারিল না। গলায় কুলদীর মালা দেখাইয়া বলিল, জাত থাকলে কি আর বেটিং হই? বাহলা দেশের বাহিরে বাস ও বাহালী সমাজের প্রভাবশালী থাকায় আরও কতগুলি সুবিধা তাহার হইয়াছিল। তিন পুর ও দুই কস্তার বিবাহে বঙ্গদেশের বাহিরে বাসহেতু বড় খব ছোট খব বাহিয়া তাহাকে চরয়াণ হইতে হয় নাই। তাহাকে বড় খব জাবিয়া যে ব্যক্তি কস্তাধীন করিতে আশিচ্ছাছে সেই কস্তাকেই সে পূর্ববু করিয়া লইয়াছে এবং সে বাহার খবের কস্তা দিতে গিয়াছে, ইন্ড রায়ের কস্তাবোধেই তাহার কস্তাকে গ্রহণ করিয়াছে। দুই একজন বাহালী বাবু হরিহরজয়ের উপমা দিয়াছেন, ইন্ড রায় হালিগা বলিয়াছে, হ্যাঁগা, হেঁচা জাকড়ার আবার জাত কি?

হ্যাঁ, যে কথা বলিতেছিলাম, ~ পুণ্যলিগা বাহালী-

তটোণরি ইজ্ঞ রায়ের ইজ্ঞতবনকুলা গৃহ কয়নি হইতে লোকে লোকান্তর্য হইতেছে। সকলেই কলির ভীষ ঘর্শনে আসে। বাহারা ইজ্ঞ রায়েকু জানে, তাহারাত আসে; বাহারা কিছু জানে না, তাঁহারাও ভিত্ত করিতে আসে। ইজ্ঞরার কলিকালে ইজ্ঞাসুতা বর লাভ করিয়াছে, এত বড় পুণ্যদ্বা ব্যক্তিকে না দেখিয়া লোকে কিরূপে থাকিবে? কিন্তু, ইজ্ঞ রায়ের বাড়ীর লোক যত না ব্যতিব্যস্ত হইল, অনন্তর জনসমাগমে তাঁহার চিকিৎসকগণ অতি মাতার বিচণ্ডত হইয়া পড়িয়াছেন। সুতরাং সিন্দী ডাক্তার সকলের বড়, অদ্বিজ্ঞতা অধিক, মর্শনী সর্কাধিক, পশার খুব, নামতাকও অনেক, ব্যতিরও বেশী; তিনি আসিয়া কহিলেন, আর বশাই, আপনি চুক্তি ভুল করছেন কিন্তু; আমাকে আর দোষ দিতে পারবেন না।

ইজ্ঞরার বলিলেন, ঠায়া আপছেন, তাঁদের বেয়ে তড়ান। না হয়, পুলিশ ডাকুন।

ডাক্তার কহিলেন, কথা না শুনে সেখ পর্যন্ত আমাকে তাই করতে হবে। অনন্তরত মাছঘটাকে ত'আনি বেয়ে-কেলতে দিতে পারি নে। আমি মনে করছি গেটের সামনে আপনার অয়েল পেট্রিটা টানিয়ে দিই, লোকে ছবিকে দণ্ডবৎ করেই চলে যাক।

ইজ্ঞ রায়ে কহিলেন, বেড়টা দিন আপনি সামল্যতে পারবেন না?

ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন, বেড়টা দিন কেন, দেড় বছর থাকতে হবে; পুরো শতাব্দী না করে আপনি ছুটি পাবেন তেবেছেন? বাবীনতার রূপটা দেখে যাবেন না?

বুকের চকু ছল চল করিয়া আসিল, পাশে কনিষ্ঠা কক্সা শতবল বসিয়া ছিলেন, আঁচলে চোখের জল মুছাইয়া লইলে, বুদ্ধ কহিলেন, এ বয়সে আর লোভ দেখাবেন না ডাক্তার বাবু। সন্ধ্যারে আবছা জীব, লোভের বশে সারাজীবন চোখ-বীণা বলদের বস্ত্র ঘানি পোছের চারদিকে ঘুরেছি, এখন আপনাদের সকলকে—স্বাধীন পর সকলকে, আর আমার বাবীন না সম্বন্ধবিক্রে রেখে না গন্ধার কোলে চড়ে তাঁর কাছে বেতে পারলেই বাচি।

ডাক্তার বুকের একোটি বহিরা বসিয়া ছিলেন, আর একজন বয়ে বক্তের চাপ পরীক্ষা করিতেছিলেন, একিরা সমাপনান্তে কহিলেন, আপনি ত ভাল হয়ে গেছেন আর বশাই। এই বেশুন, বেতুড—

শামাইয়া দিয়া, বুদ্ধ কহিলেন, না, আর না। ডাক্তার সাহেব, আর না। আর আমাকে লোভ দেখাবেন না।

ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন, কেন, কিবদন্তী আপনাকে ডাকছেন?

“না, এখন আর কিবদন্তী ডাকেন না। এখন কে-ভগবানের আত্ম নেই, বর্ষ নেই, নাম নেই, বৃত্তি রূপও নেই, তিনিই ডাকেন।”

ডাক্তারের বোধ করি হাতে তখন কালকর হোপ্পিগত ছিল না; রহস্যলাপ চলিতে লাগিল। বলিলেন, মল নেই, নাম নেই—সে কি বশাই? তবে তাবেনই বা কি, আর তাঁকে ডাকেনই বা কি বলে?

“ছাই তাবি, ছাই ডাকি। অহং নিয়েই সারা। কেবল দাও দাও, কেবল কর কর, সারামণ এই ত করছি।”

আপনার কিলের অতাব রায় বশাই যে আপনি দাও দাও করবেন?

করছি বই কি!—বলিয়া বুদ্ধ চকু মুদ্রিগেন। বোব হয়, একটা কোন প্রার্থনা তখনই মনে পড়িয়া গেল। তাঁহার সেই অরূপ, অন্যর ভগবানের নিষ্ঠা নিবেদন করিতেই আত্ম নিবৃত্ত হইলেন। দুইটি অতি বহু জলের রেখা চোখের পাশ দিয়া গড়াইয়া পড়িল।

সেই রাতে, যেরে কেহ বসন নাই, কেবল একবারি জীর্ণ জীর্ণ, ও নাতি-উচ্চ নাতি-শীতল হস্ত তাঁহার বুকের উপর স্তম্ভ ছিল, রায় মহাপর ডাকিলেন, বড় বোঁ।

সৌদামিনী আসিয়াই ছিলেন, বলিলেন, কি?

ইজ্ঞরার যেন অনেক চিন্তা, অনেক ইতস্ততঃ, অনেক বিধা করিয়া, তারপর বলিলেন, বড় বোঁ, এক লগে যাওয়া যায় না, না?

সৌদামিনী স্তম্ভবরে কহিলেন, ইয়াগা, ডাক্তাররা



সবাই বলছে এ খাড়া কাঁড়া কেটে গেছে, তবু তুমি 'বাই বাই' করছো কেন ?

কেন করছি জান ?—বসিয়া বৃদ্ধ একটু খামিলেন।

“কেন ?”

“বলছি, তুমি একটু জল দাও।”

গৃহিণী উত্তীর্ণা বসিতেই, ছেলেরা, নাতিরা, নান্দ, ভাস্কর সচকিত হইয়া উঠিল। নান্দ ফিঙিং কাপে জল ভরিয়া আনিতে দিল, ইন্দ্ৰ রায় অক্লমিকে খুব করিয়া কহিলেন, বড় বৌ, তুমি দাও।

সৌদামিনী বুঝিলেন ; নান্দকে ইঙ্গিতে শরিয়্য বাইতে বলিয়া, কক্ষান্তরে ঢুকিয়া বহু পরিবর্তন করিয়া ঠান্ডা-ঘর হইতে গন্ধাভ্রণ আনিয়া স্বর্ণনির্মিত কোণাকূটী কুণী করিয়া বীরে বীরে স্বামীর অগ্রে দিকন করিলেন। ইন্দ্ৰ রায় কহিলেন, আহা, এই নইলে জল—ভারপর বলিলেন, বড় বৌ, ওদের ওতে বেতে বসো।

ঘর নিঙক্তি হইলে, ইন্দ্ৰ রায় পুনরায় ভাবিলেন, বড় বৌ।

সৌদামিনী কহিলেন, বল।

তুমি বলছিলে না, 'বাই বাই' করছি কেন ?

সৌদামিনী ঘরে সোহাগ চাপিয়া দিয়া কহিলেন, ই্যা গো, ই্যা, বলছিই ত।—কথাগুলি বলিয়া ফেলিয়া সৌদামিনী নিজেই বুঝিলেন, এ সৌদামিনী ষাট সত্তর বৎসর পূর্বেকার সৌদামিনী। এ পোড়ারদুই একতাল কোণার ছিল, কেনন করিয়া এখন এখানে আসিয়া বেব দিল ? কিন্তু সেই বিগত কালের প্রদলুতা সৌদামিনী এখন বহু দিনের দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াই পড়িয়াছে, এত অগ্রে সে কুঠ হইবে কেন ? খুব রায় বস্তু আবার বলিল, ই্যাগা, আমাকে ছেড়ে বেতে জোবার বুঝি একটুও কষ্ট হবে না ! এই বুঝি তুমি আমাকে ভালবাস ?—এও সেই পুরাতন সৌদামিনী। অভিনানে বুক ভরিয়া গেল ; ওরা নদীতে ঢুকান বহিল ; কঠোর অবস্থায় হইল ; গোধ জলে তালিয়া গেল। প্রোক্তা সৌদামিনী নবোদয় বয়স বস্তু কীভাবে লাগিল।

ইন্দ্ৰ রায়েরও সেই দুই অতীত কিরিয়্য আসিল কি ? কে জানে, ঠিক বুঝিগাম না। ইন্দ্ৰ রায় অতি

কটেই বেন আপনাকে সংবৃত্ত করিতেছিল, কহিল, তবে চলো এক সঙ্গে বাই। পারবে, বড় বৌ ?

বড় বৌ এ কথাই উত্তর দিতে পারিল না। কথা কহিবার শক্তি তাঁহার লুপ্ত হইয়াছিল ; নিঃশব্দে চোখের জল মুদ্রিতে লাগিল। ইন্দ্ৰ রায় তাহা বুঝিলেন।

কহিলেন, তুমি পারবে না বড় বৌ, তুমি পারবে না।

সৌদামিনী এ কথাও উত্তর দিতে পারিলেন না। পারা যায় কি ? ঠিক মনে পড়ে না, সে কতকাল। সে কতকাল আগে, সেই নোশোক-পরা ছোট্ট একটি মেয়ে বসুন্ধরে একখানা খোলাঘর ঘরে আগিয়া ঢুকিয়াছিলেন, সে কতকাল আগের কথা ! কতকাল ! কতকাল ! খোলাঘর ঘর হইতে বাঠকোঠা, বাঠকোঠা হইতে একতলা একখানি ঘর, সেখান হইতে ছোট্ট একখানি বাড়ী, ছোট্ট বাড়ী হইতে বড় বাড়ী, বড় বাড়ী হইতে এই প্রাক্সাদ। এই ছোট্ট প্রাণি, হাত ধরাধরি করিয়া কখনও হাদিয়া, কখনও ধাবিয়া, কখনও কলহ করিয়া, কখনও ভাল বাসিয়া এত দুই ও দুই পথ অতিক্রম করিয়াছে। এক নিমেষও তরে ছাড়াছাড়ি হয় নাই। এক নগের তরে বিচ্ছেদ ছিল না। আশ আশর বিচ্ছেদ, চির বিচ্ছেদ ; প্রেমের অনিবার্য অবলম্বন জাতিগত প্রাণ বোঝে কই ! বন মানে কই ! মনে হয় এখনও সব বাঁকী।

ইন্দ্ৰ রায় কহিলেন, বড় বৌ, তুমি ত সবই জান, দুই মানুষ, লেখা পড়া কবি নি, লম্বাও পাইনি, তবে তাঁর গানে চেয়েই নাকি এই নিরেনকইটে বহুর কাটিয়েছি, তাই তনতে পাচ্ছি, তিনিই বলছেন ওরে হতভাগা, আমলও দায়া ক্যাঁতে পারলি নে। বলছেন—ওরে বুড়ো, এখনও 'আবার আবার' করছিস্। আমলও আবার বড়, আবার বাড়ী, আবার আবার দেশ, আবার ভারতবর্ষ ! সংই যে তোমার জামিবে তরা। সত্যি বলছি বড় বৌ, তিনি কেবলই বলছেন, এখানে থাকতে তোমার আর 'জামি আমি' ঘুবে না। তুমি চলে যা।

ঘরে দুই কম শক্তির একটি নীল আলো জলিতেছিল, তাহাতে বুড়ের মুখখানি অতি অস্পষ্টই দেখা যায় ;

কিছু কথ' শুনিতে শুনিতে সৌদামিনীর মনে হইতেছিল, এক অপূর্ণ ভোটিতে তাহার স্বামীর শুভ বৈধ বৃন্দ-  
নামি অল্প অল্প কহিতেছে। বোধনৈ সৌদামিনীর স্বামী  
জন্মের সুখের ছিল এবং সাক্ষ্যের আলোকে তাহার  
আনন্দে দ্বিধা বিভা বিজ্ঞপ্তি হইত, আর সৌদামিনী  
তাহার স্নেহের ফুলের সাজি ও তাহার মনের পুষ্পপাত্র  
উভয় করিয়া ঢালিয়া দিত ও লোকটির শক্তি-সামর্থ্য,  
দয়া-বাস্তবতার দ্বারা; কিন্তু আজ অকস্মৎ যে আলো  
বেশিল তাহার মুখমণ্ডলে, সে আলো ত স্বপ্নও দেখে  
নাই! সৌদামিনীর আনন্দ হইল, সৌদামিনীর ভয়  
হইল। সুখে গাঁয়ে কাটা দিল, ছাৎনের চিত্তার বেহ অবশ  
হইয়া আসিল। হঠাৎ আবেগবশত স্বামীর পুত্রের পিঠে  
দুখ রাখিয়া নুতন বস্ত্রীর নত সোহাগে আনন্দে গলিয়া  
গিয়া বলিল, আমারকেও নিয়ে চলো। তোমার পায়ে  
পড়ি, ভগ্নো, তুমি আমার কৈলে রেখে যেয়ো না।

বুক সোহাগ, চোখে জল, মুখে বধু, সৌদামিনী  
আবার বলিল, তুমিই বলো, তোমাকে ছেড়ে আমি  
কেমন ক'রে থাকবো গো?—বলিতে বলিতে সৌদামিনী  
ভাঙিয়া পড়িল।

নয়! নদী, বাট-ভরাট বুক তোমার খেলো না;  
আলোয়ার আলো আলো! বেহ না, তুমিই ছলনা।  
আঁকশোয়ের সন্ধিনীকে আদর করিতে বন্ধের সে কি  
আকুলতা; ভগ্নের সে কি অপরিণীত আকুলতা; কিন্তু  
যির লব্ধ, নিশ্চল, নিস্তরঙ্গ।

অনেকক্ষণ পরে ইন্ডার একধামি জীব হাত তুলিয়া  
সৌদামিনীর মাথার উপরে রাখিয়া বলিলেন, বড় বো,  
একটা কথা বলবো?

সৌদামিনী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, বল।

“কথা রাখবে?”

“তোমার কথা রাখবো না? প্রাণ দিয়েও আমি  
তোমার কথা রাখবো রাখবো।—বলো।”

ইন্ডার কহিলেন, কেঁদো না, কাউকে কাঁদতেও দিও  
না। হাপাতে পারবে না, তা জানি, কিন্তু লক্ষ্যী, বেদন  
আমি থাকো, শৈশবটি তুমি কেঁদো না, আর কাউকে  
কাঁদতে দিও না।

সৌদামিনী কাঁদিয়া ফেলিল—সর্ব্বদা যেম কাহার কড়  
বহিয়া গেল, তখনই উঠিয়া বসিয়া চকু বার্কানা করিয়া  
কহিল, বেহ। কাঁদবো না।—কাঁদবো না বলিতে গিয়াও  
যে-কাল সে কাঁদিল, দুজের শিখিল বৃষ্টি তাহা দেখিয়া  
দ্রিয়মান হইত। পড়িতেছিল। ইন্ডার সার্থক যত্ন,  
আকুলতায় কহিয়া লইলেন। “দেখো, বেন ভুলো না”,  
বলিয়া ইন্ডার চকু মুচিলেন। সৌদামিনী আবার  
বলিলেন, তোমার কথা রাখবো, কাঁদবো না।  
“ঐ যে কাঁদতো?”

“ঠিক না, ঐই বেহ, শক্ত হয়েছি, আর কাঁদি নি।”

ভোরের পানী একবার আঁগিয়া, একবার হাত কলকর্মে  
উবার বন্ধন-পান গাছিয়া আবার বেহ হর বুঝাইয়া  
পড়িতেছে। আজ বহির্জীবে ভাগাইবার ভর অবিক  
কলরবের প্রয়োজন ছিল না। বিপদ রাতি ভোরভবের  
আঁখি-পাতে কি নিশা ছিল? মিলী ত' নিঃশব্দ  
করিয়াছে, লক্ষ্যী, কলিকাতা, বোম্বাই, হাত্রা, কটক  
সকলেই পবিত্র জন্মভূমির পূণ্য পাবন করিয়াছে। সেই  
যে মহারাষ্ট্রে “বন্দে মাতরং” সঙ্গীত আরম্ভ করিয়াছিল,  
কত কঠে, কত সুখে, কত ছন্দে, কত মূর্খনায় কতবার  
গাহিয়াছে সেই গান। নিশাঙ্কে তাহারই মূর্খনায় বাতালে  
কত হইতেছে। বিহঙ্গমও আজ লক্ষ্যের দান।

ছেলেরা ভোরের আগেই জাহাজেলে অবগাহন  
করিয়া আসিয়া নব বস্ত্র ধারণ করিয়া ভাদে উঠিয়াছে,  
জিব্বরঙ্গিত অশোকভ্রাত্তিত পতাকা হিয়া আজ গুরু  
তপনকে দায়ব অত্যাধনা করিবে। অগ্নিকে অগ্নিকে  
পতাকার দান। মোলাইতেছে, কনক-রশ্মি আজ নয়ন  
মেলিয়াই নব শোভা নিরীক্ষণ করিবে। গৌরবর্ণের  
গভোদিত্রি অত্র পল্লববস্ত্রিত পতাকাবানি যোহ হর  
অত্যাধনসাহী কোন বালক মহারাষ্ট্রেই উজ্জীন করিয়া  
দিয়াছে, প্রত্যন্ত-সরীরগালাসনে পূর্ণ্যমন্ডে পত্ পত্ পক্ষে  
হিল্লোপিত হইয়া নব জীবনের নবীন নির্বল সিংহ জন্ম  
প্রভাতটিকে, আরা, সতাই যেন ছন্দোবদ্ধ প্রণতি জ্ঞাপন  
করিতেছে। বলিতেছে, লহ নতি, ভগ্নো, লহ লহ প্রণতি।

প্রাঙ্গণে মহাসমারোহ। ক্রান্তি প্রবর্তে আসন্ন-  
হিরাচল ভারতের প্রতিচ্ছবি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, যে

কুম্বুলের দ্বারা সমাজের পাতীলীর ছবিখানিকে তিনরক।  
আলিগড় নদীর তীরে স্থাপিত করিয়া ছেলে-মেয়েরা যখন  
প্রভাত-সন্ধ্যা গাহিবার উত্তেজিত করিতেছে, বীর পদে  
সৌম্যমিনী আসিয়া আঁঠুপুত্র সৌম্যমিনীকে বলিলেন,  
সেই, একবার ঘরে এসো ত বাবা।

সেই বেন গীৎকার করিয়া কাঁথিয়া উঠিতে চাহিল।  
জন্মী নিষ্কম্প হিয়া কর্তে কহিলেন, ছিঃ বাবা!

সেই কি বলিতে গেল, সৌম্যমিনী বলিলেন, ঘরে  
এল বাবা, ডাকারবে বসে নিতে হবে কিনা দেখবে এল।

সেই প্রসঙ্গের বড় বেন গ্রাম আসিল, পদব্যাঘ্র  
ভিতরে প্রবেশ করিল। ছেলেরা মেয়েরা বিদল বিদল  
হুখে সৌম্যমিনীর পানে জিজ্ঞাসা-ভরা ব্যাচুল মেয়ে চাহিয়া  
রহিল; নান্দী-নান্দীষের লেখাধন করিয়া সৌম্যমিনী  
বলিলেন, তাল ক'রে লাফাও লব, তাই নাহি এখনি ঘরেতে  
আসবেন।

সেই ঘরে হুঁকিতেই ইঞ্জ রাগ কহিলেন, না গঙ্গা—

সেই বলিতে গেল, বাবা—

কথা না, না গঙ্গার কোলে—

সেই ভবুও ইতস্ততঃ করিতেছে মেঝের মিনতি বেন  
জন্ম-ভরা কর্তে বলিয়া উঠিল, বাবা সেই, এক বিদল  
বিদল করে না বাবা। আজ ২২-এ প্রবেশের পূর্ণা  
প্রভাত, বা গঙ্গা—

কথা জড়াইয়া আসিল। অবিশ্বাসী পাঠক, বিশ্বাস  
করিত না; বিশ্বাস পাঠিকা, অবিশ্বাস কর, কতি নাই;

ভবু বেন, পত্রপুণ্ডরিকাংশিগোষ্ঠিত বাট আদিবাহার  
ইঞ্জরার বেন লাক দিয়া বাটে উঠিলেন, কর্তে ভাবা নাই,  
চকুতে দীপ্তি নাই—বুঁকি দৃষ্টিও নাই, আঙে কেবল দক্ষিণ  
হস্তে অমিত বল, সেই কেবল তর্জনে করিয়া বলিতেছে,  
চলো, চলো, বেলো যে ব'রে বার—চলো।

সৌম্যমিনী হির কর্তে কহিলেন, একবার দেখবে না?

প্রাপ্ত-প্রাপ্তে আসিয়া ইঞ্জরার একবার নহন  
উদ্বীলন করিলেন, অশোক-চক্রটিকে একবার—শেষ বার,  
জন্মের পোষ শেখবার বেঝিয়া লইলেন, তার পর দক্ষিণ  
হস্ত সফালে দিয়া করিতে নির্দেশ দিলেন। সৌম্যমিনী  
পাশেই পাড়াইয়া চিলেন। মিলল নিশ্চয় প্রতীক্ষা।  
ইঞ্জরার অব্যক্ত ভাষায় কি কথা বলিলেন, কেহ বুঝিল না,  
তবু সৌম্যমিনী বুঝিলেন। পরে, পরে দ্বারীয়া ছটি  
দীর্ঘ হস্ত একত্রিত করিয়া গলাটি লম্বা করাইলেন। ইঞ্জ  
রার কি সেই বাসনাই ব্যক্ত করিয়াছিলেন? আশ্চর্য!  
পদম পরিভ্রমিত নিঃশব্দ বাহির হইয়া আসিল—আঃ!

কত্কা ও বহুভাষা কাঁথিবার উপক্রম করিতেছিলেন,  
সৌম্যমিনী বলিলেন, কর্তা বার বার ক'রে শরণ ক'রে  
গেছেন না, আশ্রকের দিনে কাঁথিতে নেই। কেঁবে: না।

ইঞ্জরার ঘুমে শব্দ কথা ছুটিল, গঙ্গার জোয়ার  
ধাকতে ধাকতে চলো, চলো।\*

০ ৭৮ নম্বর দুর্গাচরণ বিজয়ের আটানকই বর্ষ-বয়স  
পুণ্যপ্রাণ সানারমণ দাকের গঙ্গা-বাজে দৃষ্ট আমি স্বচকুতে  
মেঝিয়াছিলাম।—লেখক।





[ শিল্পী—হুম্মত সঙ্করদাস ]

## অভিযাত্রী

ঐপকানন ক্রেবস্তী

হে ঘোর বলাকা শোন !

দূর দিগন্তে লক্ষ্য সাধরে

ভাণা বেলে দাপ্ত কেন ?

কোথা কোন দূরে, মানস সরের পানে,

কোন, সে উচ্চ শৈল-শিখর-চূড়ে,

আপনারে কর বিরুদ্ধে ;

বলনা বহু কোথা হবে তব বাজা শেষ ।

অত হবির হাঙা রক্তে আঁকা,

ভ্রামলী বনের মাধুরিমা বাধা,

হুল পৌরতে চারিদিক ঢাকা

ছবিবী বদনী ঘোর ;

পাথরনি যেটাতে তোমার কোন সে তুষা ?

তোমার যক্ষে সে কোন সাহারা,

তুলিডাছে রক্ত, দুর্বোপে তরা,

কেমনে দিটিবে এই ছুরত্ব আশা ?

হে অভিযাত্রী, বহু আশায়,

কেন এই অভিযানে,

কোন বহির ত্বদিগ কণা

দহিহাছে তব প্রাণ ।

বাধা বহন কল্যাণাল নিশেবে করি জগ,

জীবনের স্বপ্ন, প্রতি পলে তরে,

জীবনেরে করি কর ;

চকল কর, দুর্বর কর, জীবনের জরণান,

তীক স্রবতার হোক আভি অবসান ।



# দিদিবাবীর ঘাট

## শ্রী নীলমঞ্জরী

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

প্রকাশের অল্প মেরেই নিজে চলে গেলেন। কিংবদন্তি বললাম 'শেকসিকার পাশে', বললাম ছিঃ ভাই, মনোরমার কথা কৈ আমল দিতে আছে।

আমার কথার মধ্যে শেকসিকার প্রতি আন্তরিক সত্যভূতি ছিল। আমার কথার মধ্যে সেই শেকসিকার স্মৃতিতে সেরা ও না—তাই কি আমার কথা শুনে একবারে তেঁকে পড়ল? যাক নীচু করে কথালে চোখ ঢেকে আঁকুল হয়ে কঁপতে লাগলো।

একটু অব্যবস্থায়। এতটা হৃদয় হওয়ার কারণ যে ঘটেছে টিক বুঝতে পারিনি। কি বলব তেঁকে না পেয়ে হুপ করে বলে যাইলাম বানিকল্প। মনোরমার প্রতি একটা বর্ষা স্মরণ মনটা উঠল তখন।

তাকে সাধনা দেওয়ার জন্য বললাম—

"মনোরমার মতন অভয় মেয়ের সঙ্গে কামোই কথা বল উচিত নয়, আমি ত এবার থেকে ওকে দখল মত এড়িয়ে চলব।"

একটু পরে শান্ত হয়ে বলল—

"সত্যি, কি অল্প মেয়ে মনোরমা, ও ত সম্পূর্ণ আমার 'সি' হয়—প্রাণই আমারে বাড়ী বাত। দুটী মধ্যে যাকে মাকে দিয়ে থাকত ও আমার বাড়ীতে। ওর সঙ্গে কথা বলতে আমার ভাল লাগে না—না নারিকম্ব অসভ্য আলোচনা ছাড়া ও খেয়াল কিছু বলতে জানে না। শুধুলাল 'তোমার সঙ্গে ওর কিছু কিছু কথা হয়েছে।'"

একটু হুপ করে থেকে বলল "আমার সঙ্গে বিশেষ কিছু অগত্য হয়নি, কিন্তু ওকে বাবা-মা পছন্দ করেন না—কোনও দিনই চলে না ওর সঙ্গে আমি বেশী মেশায়েনি। একটা ব্যাপার ঘটেছে—"

এই বলে হুপ করে গেল।

হঠাৎ।

বলল "ওই ব্যাপার দুটী মনোরমা ঘটেছে, সেটা তাই আমি বলব না। ঘাই হোক না, সেইজন্য ওর সঙ্গে কথা গুরুত্ব বলতে বাধ্য করেছেন। দুটী মনোরমা বিঃ একদিন আমার বাড়ীতে

এল না ওকে স্পষ্টই বলে দিয়েছেন যে একমত তাহে মিনারত আমারে বাড়ীতে এসে পর কখনও বাক্যনাথই পড়াশুনার কতি হয়, কামোই মনোরমার আমারে বাড়ীতে না আসাই ভাল। সেই ওর বাপ। ওর বিবাহ আমিই সব মাকে বলে দিয়েছি। তা কিন্তু নয়, ঘাই হোক ওর বাড়ীতে সেও এই নিয়ে আমারে বাড়ীতে মনোরমারিত করেছে।"

মনোরমার ব্যাপারটা জানবার কৌতুহল চল কিন্তু শেকসিকার বন্ধন বলবে না বলেছে তখন তা নিয়ে বিশেষ শেকসিকারিত করবার ইচ্ছে হল না।

তবু বললাম "আমার মনে হয়, ওর ব্যাপারটা সব মেয়েকে জানিয়ে দেওয়াই ভাল—তা হলে ও হয় ত একটু ভাব থাকবে।"

বলল "ছাই হবে—ও কি কিছু মানবে। উঠে যা-না তাই বলতে আত্ম করবে।" বললাম "এমনি ও ত যা-না তাই বলছে, এই ত তোমার নামে কিংকম্ব হিংসা অপরাধ গিলে।"

শেকসিকার কোনও কথা না বলে হুপ নীচু করে হুপ করে বলে হইল।

বললাম "ভাঃ আরেক সবার কি বকম একা করে, ওকে এ বকম একটা কথা বলতে ওর মুখে আটকাল না—ছিঃ।"

শেকসিকার হুপ করেই আছে। আমার বললাম "ও বর্ষা এই কথা নিয়ে আমার কিছু বলে আমি লাঠিহাণ্ডাখার প্রধান প্রকাশের কাছে গাফিলত বলে মালিশ চলু করাব।"

শেকসিকার একটু চমকে উঠল। "তাঁতাতাড়ি বলল "ও ছাঃ! সে কি কথা, ছিঃ—" বললাম "কিন্তু তাই বলে ত ওকে প্রায় দেওয়া উচিত নয়, ওর হুপ বন্ধ করা হয়েছে।"

একটু তেঁকে বললাম "অন্ততঃ এই বলে ত ওকে আপাততঃ মালিশে রাখব—তাঁতাতাড়ি দেখা থাক—কি—হয়।"

সত্যি বড় লগল মেয়ে শেকসিকার, আমার হাত দুটি ধর করে তাহে বলল "না ভাই, হুপি এ নিয়ে আর কিছু করো না—লক্ষ্যীটী, তা হলে ও অনর্থ কাণ্ড করবে। ও না করতে পারে এমন কাল নেই। ওকে না বাটাই ভাল।"

বললাম "ওকে তব করে চলতে হবে নাকি? আমার ঘায়া তা কিছুতেই হবে না।"

শেক্সপিয়ার কেমন যেন কাতর হয়ে পড়ল। একটু হুপ করে থেকে বীণে বাজানি ভাত করে বাসল আবার কীভাবে উপরে। ঘোড়ারি অরুণা দেখে একটা বর্ষার কলসার মতো উঠল ভয়ে।

বললাম “তুমি হুপ করে থাক। ওর সঙ্গে কোনও কথা বলার প্রয়োজন নাই। ওর সঙ্গে লড়তে আসি জানি। যা করবার আদিই করব।”

যানিক কণ হুপ করে হইল। তারপর বীণে বসল “কিছু ভাই, কথাটা শুনে একেবারে নিশ্চয় নয়। সেইখানেই শুধু ওর জোহর।”

চমকে উঠলাম। বিস্ময়ভরা নৃত্যে চাহিদায় শেক্সপিয়ার মুখের পানে। ও বলে কি?—

একটু পরে বললাম “বল সব কথা হুলে আনতে—আবার সব কথা জানা প্রকার।”

“শুক আর বলব।” এই বলে যানিক কণ হুপ করে হইল। তারপর কথার কথায় শেক্সপিয়ার কাছ থেকে যা শুনলাম তাতে ক্রমে তাহার বৈরাগ্য হইল না যে, “সত্যিই শেক্সপিয়ার ডাঃ হায়ের মধ্যে পড়ল। অরুণা জানে—বিশ্বের কোনও আশা নেই, বিবাহ ইত্যাদি অসম্ভব, তবুও শেক্সপিয়ার কিছুতেই নিজেকে সন্তোষ করতে পারে না—আত্মলীলা হয়ে গিয়াছে তেঁর মনে। নিজের মনে ডাঃ হায়ের প্রাণের উজ্জ্বল সব জ্বালি চিঠি লেখে, নিজেরি বাহ্যে বাহ্যে পড়ে, তারপর সবই সেগুলো একত্রে হাত-বাঁধে চাবি দিয়ে লুকিয়ে রেখে দেয়। এই বক্স—একখানা চিঠি মনোহর একদিন হঠাৎ বেধে ফেলছিল, তাই সে সব জানে, শেক্সপিয়ার তার কাছের প্রাণের উজ্জ্বল সব কথাই বলেছিল—একবারও ভাবেনি যে সে এ বক্স বিবাসন্যাকৃত্য করবে। শেষ পর্যন্ত বললে “কি হয়ে ভাই, আমি অনেক চেষ্টা করছি, কিছুতে যেন নিজেকে সামলাতে পারি না।”

কথাগুলি শুনে কেমন একটা অস্বস্তিপূর্ণ ভাবে মনটা গেল ভরে। স্বপ্নেও ভাবিনি এ বাণীর সত্ত্ব হতে পারে।

বললাম “কিছু ভাঃ হায়ের যে অনেক বয়স।” বললে “সে কথা বলে মনকে আমি অনেকবার বোঝাবার চেষ্টা করছি, কিছু কম ঠিক উঠেটা মনে। কবির মনকে বুঝে কত বয়স আমি ভাবতে পারি না। ডাঃ হায়ের কথাই যেন আবার মনের মাঝখানি পূর্ণ করে ধরা দিচ্ছে।

যানিক কণ অকস্মৎ হয়ে হুপ করে বসে হইলাম। ভিতরকারি ভাবের হাজার হাজার—প্রতিফলিত মনটা যেন ঝাঁপিয়ে উঠল। ডাঃ

হায়ের সঙ্গে প্রেম—জান আবার লমসা যেন কি বক্স-উঠল কেঁপে।

কথা আর বেশী দূর এতদো না। প্রাণের ঘটা পড়ে গেল—প্রাণ যেন ভরেছে। এখনই মেয়েটা এসে হাজির হবে। শেক্সপিয়ারকে বললাম “এ বিষয় কথা পরে হবে তাই।”

শেক্সপিয়ার নিজেকে সামলে নিয়ে সহজভাবে বসল।—

বাকী বিবরণ এলায়। মনটা আবার একটা ভাব-বাহ্যে এখনই তব্বর হয়ে আছে যে; বাইরের মস্তকের সঙ্গে তার যেন কোনও যোগই নেই। বাকীতে এসেও ঐ একই চিন্তা।—ডাঃ হায়ের সঙ্গে প্রেম।

কখন বিছানার তরে পড়লাম। ঐ একই চিন্তায় মনটা ভরপুর। কখন ঘুমিয়ে পড়তেছিলাম জানি না। স্বপ্ন দেখলাম—একটা লোক যখন পথ, লগাই চলছে। কখনও প্রাণের অগেয়েগেয়ে দেখছি, আবার কখনও মেজ-বোঁসি, হুয়া—লগাই যেন আছে। লগানে যেন পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন—ডাঃ হাঃ। শেক্সপিয়ার ও ডাঃ হাঃ হৈলে পথ করে পাশাপাশি চলছেন—মনটা আবার একটা বেগমার উঠছে ভয়ে, কিছু ভাল লাগছে না, কি একটা বাগে হুয়ে মনটা কেঁপে কেঁপে উঠছে। আবার যেন দেখলাম মনোরমার সঙ্গে আবার তীব্র বগড়া হয়ে গেল। সব মেয়েটা মনোরমার গিকে, আমি যেন একলা। একটা পাগড়ী বেগের গুড়ির মতলে পথ হাজিরছি, লগায়া যাব হয়ে আসছে। হাঃকেও হুঁতে পাচ্ছি না, প্রাণের মেয়েগুলোই বা গেল কোথায়। কেউ নেই। আমি যেন একলা, কেমন যেন ভয়ে আবার বস বস হয়ে আসছে—সে কি অস্বস্তিপূর্ণ হুয়া। এমন সময় বেঁচে পেলাম পাগড়ীর একটু নীচে ডাঃ হাঃ এসে গাড়িচ্ছেন। আমি যেন উকে বেঁচেই পাচ্ছিলাম হয়ে কেঁপে উঠলাম। তিনি যেন বসেন—পাগড়ী থেকে লাফিয়ে পড়তে। আমি তব পাচ্ছি বেঁচে তিনি যেন হাত বাড়িয়ে দিলেন। আমি যেন হাত লগা করে লাফিয়ে পড়লাম একবারে ডাঃ হায়ের মুকের মধ্যে। উঃ সে কি পুলক। কি ভুক্তি। তারপর আতিশয্যে আমি আহুল হয়ে কীভাবে লাফলাম—ডাঃ হায়ের মুকে মাথা রেখে।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। দেখলাম সত্যি সত্যিই আমি আহুল হয়ে কঁপছি। গোপের ভালে আবার বাসিন্দা গেল ভিকে। ডাঃ হায়ের মুকের মধ্যে আবার পাগড়ীর আনন্দটুকু কখনও আবার অবে অবে দিউর দিউর উঠছে। কিছুকণ পরে আবার ঘুমিয়ে পড়লাম।

সকালবেলা দুই তেলে সন্ধ্যা সন্ধ্যা পথিকার হতে আদ্য  
সূর্যের উপর ভেসে উঠিল—আমিও ডাঃ হাথের প্রেমে পাগল।

৪

একটা অশুভ তাগের আবেগে দিনের পর দিন কেটে যায়,  
আমি যেন একটা বসন্তকালে। বসন্তকালে—এ আদ্য কি হলো!  
কিছু ভুলে লাগে না, কোনও কিছুতে আর কোনও আকর্ষণ  
নেই, কতকগণে কলহে বাস, কতকগণে ডাঃ হাথকে দেখতে  
পারি—নিরন্তরই সেই সময় গুণি। হাত মাকে একটা নিকট  
হস্তাঙ্গার রম্ভা ওঠে তখন, ত হৃৎকণে হৃৎকণে কাগজ ওঠে—  
সবটী ত বুঝা, আদ্য কি হবে? কলহে হৃৎকণে পেলেট  
শোকালিকাকে আড়ালে নিয়ে যায়—প্রাণ ঘন নদীর গিরে তার  
উজ্জ্বল গুণি—তারই হৃৎকণে কণার দগ্ধ গিরে আদ্য প্রাণ ঘন  
হাঁক ছেড়ে বীচে, অথচ আদ্য মনোভাব তার কাছে কোনও  
দিক বিধে একটুও বসে না। পড়ে সেদিকের বিশেষ সাবধান করে  
ছিল। স্বীকরণে একদিন হৃৎকণে উজ্জ্বল গুণেছিলো, এক কাণ  
গিরে শুনেছি, অল্প কাণ গিরে যেকোনও গিরে, কখন আদ্য ঘনকে  
একটুই স্পর্শ করেনি। আর আজ শোকালিকার উজ্জ্বল কাণের  
ভিতর গিরে মর্মে প্রেমে কণে আদ্যকে আকুল করে তোলে  
নিজেকে সামলান যায় হয়ে গুণে। নেহাত সহস্র সহস্র  
শোকালিকা, তাই সে কিছু বুঝতে পারে না। কিংবা চর ত তার  
কাগজে দিকে চোখ ফুলে চাওয়াব অবসরই নেই।

একদিন হৃৎকণে গর্জনে বসেছিলো—আমি হলে পড়ে  
পড়ে মাঝ বেতায় না, এটা গ্রীক। সত্যই তখন একটা গর্জ  
একটা হোব প্রাণে ঘণ্টা ভুড়ক বসতাম। কিছু আজ ঘন  
আজ কিছুই নাই—অভিভূত আজ আদ্য প্রাণ, তাই সব নষ্ট  
সে চাষিয়েছে। আমক তেবেতি, কোনও দিকে কিছু কণার  
পড়িত নেই, উপায়ও বুঝে পারি। কত বাব তেবেতি একটা  
কিছু কথা বলব, পড়ায় বিধে কিছু বিজ্ঞান কণে, চরত তাই  
নিয়ে একটা পথিকার এবং শয়ে—ভাবতেও নদীর দিগ্ভাষ ওঠে—  
একটা ঘনিষ্ঠতার সূচনাও হয়ে যেতে পারে। দু'একটা বিধ  
যে তেবেতি গ্রীক কণি, এমন নয়; কিছু ডাঃ হাথের সঙ্গে ফেরা  
হলেই সূর্যের মধ্যে বসে একটা স্পন্দন প্রকৃষ্ণ, তাকে লাভ  
কমতে অনেককণে সময় লাগে। কোনও কিছু বলব ভাবতেই  
আদ্য প্রকৃষ্ণ হয় সেই স্পন্দন, তাকে খামোতেই সময় বাত কেটে।

একদিন শোকালিকাকে বললাম "একটা কিছু কথা বসতাম  
তাই, এ বসন্ত হুণ কণে লা-কণা কণার কোন ঘানে চর না।"  
শোকালিকা বলল, "কণার ত কিছু নেই তাই।"

বললাম, "একদিন আলাপ কণা—কোনও একটা পড়ায়  
বিধে কিছু বিজ্ঞান কণে।"

বললে, "সে আমি পারব না—তা' হ'লে কি মনোভাব কণে  
খাচ্ছে।"

বললাম, "ইস! মনোভাব তেবেতি দেখিয়ে যেতে হবে  
নাকি?"

শোকালিকা বলল, "তুমি মনোভাব তেবেতি নয়, লাভ কি তেবেতি?  
মনের আকুলতা কণার বই কণে না।"

বললাম, "আকুলতা তেবেতি কি তোমার আদ্য?"

বললে, "হ্যাঁ তাই—আমি এখন মুক্তি চাই।"

মনোভাব—এক প্রকার গিরে কোনও লাভ নেই।"

শোকালিকার কথা আদ্য ঘন মনেটেই লাগে ছিল না।  
মুক্তির কথা আদ্য ত তাগতেও পারি না—এই যে মর্মে বসন্তের  
হাওয়া আদ্য হৃৎকণে, সে হৃৎকণেও মর্মে বসন্তে যেমন: বাব, সেটুকু  
যে আদ্যই নিজে, তাকে আমি চাওয়াতে একবারেই চাওয়া  
নই।

একটু পরে শোকালিকা বলল, "স্বামীজী বলেছেন—"

একটু হুণ কণে গেল। স্বামীজী মর্মে বাবা-মার সেই  
সন্ধ্যা গুণে।

তখনাম, "তুমি স্বামীজীকে সব বসন্তে নাকি?"

হলে বললে, "না, মুক্তি ঘনি পাঠ, তখন বসন্ত।"

তখনাম, "কি বসন্তেই স্বামীজী?"

বললে, "স্বামীজী বলেন মনকে উভাভ কণে—তখনামের  
চরণে ভেসে বিধে চর—তা' হ'লেই মনের আদ্য বাব  
হ'লে।"

তখনাম, "তা' তুমি কি কণ?"

বললে, "আমি হোব হাতে বিজ্ঞানার গুণে তখনামের চরণে  
নিজে প্রাণ-ঘন ভেসে গিরে প্রাণের কণে বলি—আদ্য মনের  
আদ্য। তুমি বসন্তে লাও।"

তখনাম, "ডাঃ হাথের প্রতি তোমার এই মনোভাবকে তুমি  
কি মনের আদ্য বল মনে কণ?"

বললে, "আমি ত' জানি না—আমি কতটুকুই বা বুঝি। ঘনি  
আদ্য। চর তিনিই ফুলে নেবেন। হৃৎকণে না হৃৎ, বাব, ফুল-  
ফুলে প্রাণভিত হ'লে উঠবে।"

হৈলে বললাম, "বাব! তোমার সঙ্গে কথা বলা গায়—এত  
কণিকার আদ্য তোমার ভিতরে?"

বললে, "না তাই, কিছু এখন বড় কথা নয়।"

কি কণে—আমি কিছুই কণ না।"

এক বিধে শেকাঙ্গিচার স্তম্ভে আঘাত বনোভায়েব একথাযেই ছিল হ'ল না। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করুত বাস্তি পাতি কিন্তু ভগবানের ভক্তও ছাড়াইতে আমি বাস্তি নাই।

প্রার্থনা !—তা কথটা বললেই মন নয়। হাতেও বলেন—ভগবানের কাছে কার্যবনোভায়েব প্রার্থনা জানালে তিনি শোনেন। ভগবানকে বিন করুত ভেঙেই কেঁদে না—হিঁদে কি করেন।

সেইদিন রাতে বিদ্বান্যাত্তর চোখ বুজে ভগবানের গায়ে প্রার্থনা করলাম। মেহবোধেব একটা ঠাণ্ডা-মহর আছে এবং স্ত্রী-কর একটা শব্দও ছবি আছে—মেহবোধেব বলেন “কাথার থোপাল।” চোখ বুজতেই সেই ছবি মনের মধ্যে ভেসে উঠল। ঘনে ঘনে বললাম ‘ভগবান !’ ডাঃ বায়েব সঙ্গে আমার আলাপ করিবে নাও, দুইয়ে নাও ঠাণ্ডা মন আমার বিকে।’

এইভাবে দিনের পর দিন কেটে যেতে লাগল। রোজই বাস্তি বিদ্বান্যাত্তর চোখ বুজে ভগবানকে ডাকি—রোজই এক কথাই বলি। মনের তত্ত্বতাও দিনদিন বাড়ছে এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থনায় আত্মলভাও তদেব বেন বাড়তে লাগল।

রোজই ভগবানকে বলি—দুইয়ে নাও ঠাণ্ডা মন আমার বিকে। কিন্তু যদি সত্যিই মন ঠাণ্ডা হুরে ঠাণ্ডা—তাহ কি যে পথিতি—সেকথা কি আমি একটুও ভাবিনি? ঠাণ্ডা স্তম্ভে আমার বিহার মতন নয়—সেইটুকু আমি জানি। বইও—এখনও তিনি অবিহারিত—এ খবরটা যথেষ্টব কাছে ইতিমধ্যেই এস পৌছেছে, তবুও তিনি আমারে হাতাতও নও, এক সমাধেব শোক ত ননই। তাই ঠাণ্ডা স্তম্ভে বিহারেব কথা আমি বিহারেব আনতে পারি না। তবুও ঠাণ্ডা মন আমার ভক্ত আমারই মতন আত্মল শোক—এইটুকু কামনা সহজ প্রাণ বিধে কবি, একথা অস্বীকার করব না। একটা পনিচেরে নিবিড় অত্মতৃপ্তিতেই আমার মন বেন পাবে পূর্ণ পথিত্ব, নাইবা হ'ল শান্তাশান্তি প্রেব, নাই বা হল বিহার। ঠাণ্ডা আত্মলভাটুকুসত্ত্ব দিয়ে তবু অতত্ত্ব কহাতে চাই, সেইটুকুই আমার বাস্তি, তাহ চেরে বাস্তি কহাও ভগবান আমার সেই—কিও সেইটুকুই বা কেন পাবে না? তাতে কোন যোগ বা পাণ স্পর্শ করে বলে আমি বিশ্বাস করি না। আমার অতত্ত্বের গহনতলের অত্মতৃপ্তিনিষ্ঠে আমারই কাথার, তাহ সঙ্গে আর কারোও কোনও যোগ নেই, তাই সমাধেব দিক বিধে কাথও কাছে কোনও কৈফিয়ত রেওয়ার আমার কোনও গারিও নেই।

বাই শোক, এইভাবে মনের সঙ্গে একটা যোগাযোগ করে

নিখেলিয়াছে—চলেছে ঠাণ্ডা মন বিনভানি। এমন সময় এল ৩০শে জাণ। বিনভানি বোর হর কখনও জুগব না।

ডাঃ বায়েব সঙ্গে এসে আমি—আকাশ অন্ধকার করে ঠাণ্ডা যেন কথোকে, এত অন্ধকার যে যথেষ্ট বাতিভালি আলিয়ে দিতে হল। তবে বৃষ্টি আরম্ভ হল এবং অল্প কিছুক্ষণ বৃষ্টি। পরেই নিম্নাভগণ বিদ্বান্যাত্তরকে অঙ্গতব হস্তাঘাত হল ওক—ওক যেন আনিমত্ব। এইরকম হস্তাঘাত আমি একথাযেই সহিতে পারি না; সাধারণতঃ আত্মল দিয়ে চোখ বুজে বলে থাকি। হস্তাঘাত কোমল হৃদয়ে লজ্জা করেই আত্মল কোনে আত্মল দিয়ে চোখ বুজে বসতে হল—উপার নেই। লজ্জা করে নিখেলিয়ায় আঘাত ওক একটা যথেষ্ট হাতে কাণ চাপা দিয়ে বসেছে, তাই বোর হর আমারও ভগবান হল।

আনিমত্ব এইভাবে কটিল, বহুদিনের একটি বড় চরিত্রে, তবুও চোখকাণ খোলাব লাবল আমার হস্তি—কি জানি আমার হস্ত হঠাৎ প্রকৃত হ'ল। বলে আমি, সহস্য মনে হল—স্রাশে সহ্যই বেন হুণচাপ হরে পেতে, কোনও স্রাশা শব্দ নেই। সহ্যই কি আমার বিকেই চেরে আছে; চরকে চোখ চাইলাম। বা ভেবেছিলাম তাই—হুঁঃ হুঁঃ।

প্রেষণায়েব দ্রষ্টা জানি বিকেই যথেষ্টব হ'ল। চোখ চেরেই বহুত্ব যথেষ্টবে পেলাম স্রাশেব সহ্যই বোর চর আমার বিকে চেরে আছে—সকলের হৃদয়ে একটা চাপা কৌতুকব হাসি। ডাঃ বায়েব হুণ কথিবে চেরে আয়েন আমারই হৃদয়ে পানে—উজ্জল হুণী চোখ একটা স্রিধ চাপা হাসিতে উজ্জ্বলিত হ'ল উঠেছে। হৃদেব যথেষ্টবে কেরে কেরে উঠতে লাগল—অপরিমিত লজ্জা আমার আশ্রয় থেকে মাথা নীচু হ'ল গেল।

সহ্যে সঙ্গে সঙ্গে শব্দ শব্দ হরহর বস্তু। বাজল—হাঁক ছেড়ে বাজলাম। বাইবে তখনও হৃদলগ্নেব বৃষ্টি হুঁঃ। স্রাশ থেকে উঠে কাথও বিকে না চেরে প্রেষণায়েব বলবার পিছনেব বহুত্বব কাছে এসে ঠাড়ালাম—এই পথেই যথেষ্টবে দিয়ে প্রেষণায় বাইবে যান। এত বৃষ্টি যে, বহুত্বব বাইবে যাহাআহা হুণচাপ অঙ্গতব। হঠাৎ চেরে বেনি ডাঃ বায়েব উঠে এসে ঠাড়ালাম আমার পাপে—অত যথেষ্টব ঠাণ্ডা পিছনে। বৃষ্টি একটু না কমলে বেকার উপার নেই।

মাথা নীচু করে হুণ করে বাইবে আমি, সহস্য ডাঃ বাব এর কল্পলেন

“আপনারে নাম বুলা চৌহুদী।”

ডাঃ বায়েব বিকে একবার চেরেই কোনও বস্তু উত্তর দিলাম “হ্যাঁ”।



একটু হেসে বললেন “মাদুরীকে মনে আছে ?”  
চমক চটলাক ডাঃ কায়ের সুবেষ শিক : বললেন “জাতি  
মাদুরীর কাকা !”

হাসিটি টোঁটের উপরে তখনও থেঁতা করছে ।  
মাদুরীর কাকা ! টেনিট মাদুরীর সেট কাকা ।  
হাটের আকাশ অন্ধকার করে দুপলবারে বৃষ্টি চলেছে—

•

বামে বিছানার তরে আকুল অতুবে দেহকৌণিক গোপালের  
কাছে গ্রান হেল কুহজতা কানামাম । পিছির হাড়ে—আজ  
খেতেই যেন জানার ভাবনেম জরজারা হল শ্রুত : মাদুরীর কাকা !  
—একটি ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুযোগের সম্ভাবনার মন শূন্যকে  
উঠতে লাগল ।

ওঁৎকরে উপর মাদুরীক সঙ্গে যোগাযোগ চাখিচ্ছে । আট,  
এ, পাশ ক’বে বি-ও, জালে পড়তে পড়তেই বিবে চ’রে গেল  
মাদুরীর :

বিবেও নিমন্তন-পর পেয়েছিল, অগ্রহণে মাসের ২২টি বিবে  
ওঁৎ ছিল । কিন্তু বিবের সময় আমকা গুণ্ডিবে দেওরদে বাড়ী  
ভাড়া করে ছিলাম, তাই বিবেতে বাওরা হতনি । দাখার বড়  
মেসেটা টাইকলেতে ফুগে অতি-ওঁৎলাব হয়েছিল, তাই তাকে  
নিরে শীর্ষকাল চাওয়া কলমানর ভক্ত নওরবে বাড়ী ভাড়া করা  
হয়েছিল—পুন্ডার চুটিং পরত শাট-আট বিন কলেজে কামাই  
ক’রে আদি পেওরবে ছিলাম সে সময় । মাদুরীর বিবে হঠাৎ  
ঠিক হয়েছিল, তাই আগে কিছুই টের পাইনি । সেওবর থেকে  
কলস্কাতার বিবে এসে মরব নিবে শুনিছিলাম—মাদুরী বিবের  
পরেই স্বাধীর সঙ্গে বৃহ বিদেশে যোগালাবারে চলে গেছে, তার  
স্বাধী বড় উঁকনিজাত, সেইবানাই বেলে কাজ করে । একবার  
চিঠি অবন্ত মাদুরীকে লিখেছিলাম, অথবাও পেয়েছিলাম কিন্তু  
ক্রমে যোগাযোগ গেল হাটেরে ।

আজ মনে মাদুরীর কাকা আমায় সমস্ত গ্রাণ-মন অধিকার  
ক’রে আমায় সামনে এসে ঠাঁড়লেন তখন মাদুরীর সঙ্গে যোগা-  
যোগগী কিংহে পাওবার মন্ত মন আমায় আকুল হল । হাড়ে  
বিছানার শুয়েই ঠিক কলমান—কালই কলেজে মাদুরীর কাকাকে  
শুণাম মাদুরী এখন কোথায়, আছে কেমন । পরিচয়ের এমন  
প্রমাণ কথিরে লিখেছেন গোপাল—বামে বামে তার চরণ :  
আবার গ্রাণম কলমান ।

নানান এলোযেলো কথার মনটাকে পেয়ে বলল : সব  
কথাগুলিই যেন অনেক-মনে জন্ম । কলেজে বৃশা চৌধুরী

আমায় নাম—‘মাদুরী’ পুন্ডারী সামা প্রাথমিকা শ্রীকার আগে  
ফুলেই কাটিয়ে গিয়েছিলেন । বৃশা চৌধুরী—উনি তিনলেন কি  
করে ? কলেজের খাতার অবন্ত নাম আছে—‘কিন্তু উনি ত  
কায়ের সুবেষ শিক চেয়েই সেয়েই না । কি ক’রে জানলেন—  
আমাই নাম বৃশা চৌধুরী । নিশ্চয়ই চুনি চুনি লক্ষ্য করছেন ।  
চুনি চুনি তাইলে সবই লক্ষ্য করেন—দুই ত কম নয় !  
জানেন, আমাই নাম বৃশা চৌধুরী, আমায় সঙ্গে মাদুরীর  
অন্তরঙ্গতা হয়েছিল একসময়, সবই কেনে কেমন তাইবে ভোম :  
জাল মাদুরীরে হঠলেন দিনের পর বিন জালে পড়িতে যান—  
লোকীয়া সাংঘাতিক !

পরেই সিন মনে মনে ঠিক করেই কলেজে গিয়েছিলাম যে,  
আজ মাদুরীর বিবে নিশ্চায়িত জিজ্ঞাসা ক’রে যানিকতন জালাপ  
করব । কালট ডাঃ কায়ের কথার পর সন্তোভাবে মাদুরীর কথা  
জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল কিন্তু তাঁর কথার পর অতঃপর হয়ে  
এমনই অতিকৃত হয়ে পড়েছিলাম যে, কোনও কথাই জিজ্ঞাসা  
করা জারি । আজ লকাল থেকে মনে হচ্ছে—‘হিঃ ! কুজটা  
ঘোটেই জাল জাল । ডাঃ কায় কি জায়েলেন । অর যেরেখাই  
না জায়েলেন কি ।

আজ তাই জিজ্ঞাসা করাই এবিধে আদি চুত্ৰমকিজ ।  
যেরেখ তুমিয়েই জিজ্ঞাসা করব—বৃশতে বিতে হয়ে, আমায়  
মন সবুজ, কোনও গোপনাম নেই ।

বলানময়ে ডাঃ কায়ের জালে গেলাম । হাওরায় সহর কোনও  
কথাই হল না—বসি বসি করেও বলে উঠতে পারলাম না,  
কেমন যেন বাবল । মনকে বোকালাম—‘বসি না, উনি নিজেই  
হয় ত কিছু বলবেন । কাল মাদুরীর সঙ্গে নিশ্চয়ই আমায়  
বিবে কথা হয়েছে । হয় ত মাদুরী আমাকে বলবার মন্ত কিছু  
বলেও দিয়েছে । মাদুরী যে কলকাতায় নাও থাকতে পারে,  
সে কথা এখন জানেই এল না ।

জাল শেষ হল । স্বাধীরিতি মেয়েদের মধ্যে সাধনে পরাজিত  
ডাঃ কায় আমায়ের সঙ্গে এসেন—সেই এক জায, কায়ের  
সিক চেয়েও বেখায়েল না, এতটা কথাও বললেন না । কেন  
জারি না, যেন মনে একটু অতিমান চ’ল—মাদুরীর বিবে  
ক’একটা কথা বলবার প্রমাণ আমাকে দিলে কি এমন মগাভাবত  
অতঃপর হ’ত । আজো লোক খ’ হোক ।

মনে মনটিই আমায়ের যেরে শিরম কিংবে চলে যাচ্ছেন হঠাৎ  
যেন একটু অস্বাভাবিক চীৎকার করে শুভালাব, “মাদুরী এখন  
কোথায় ?”

নিজেৰ প্ৰশাৰ যবে নিজেই লিখিছে  
 ৰোকেট মাথা নীচু হৈছে, পল  
 যোহেঙেলৈও নবজাৰ কাকে  
 অহকে পীড়িতহে দেখে : ৬৪৭ যবে বাৰ না'ছিল ৭- ৬৫৭ কি ৭

জিবে ঝাঁপালেন আমার দিকে একটু এগিয়ে এসে ঠোঁট  
 হেসে বললেন—“মাদুরী মোহালাবাক্ষই আছে, সবচেয়ে পবিত্র  
 দিন তোরে কলকাতায় এসে পৌঁছাব কথ।”

ହାଜିବେହି ଚଢ଼ିଲେଇ ଡଳେ ଗୋଲେଇ କା ହ :

“সে আবে কেমন ?”

ଏଲେମେଣ୍ଟ—“ଆମ ମନର ଯେତେବେଳେ ଗଳ୍ପ ହେଉଛି ନା, ସାମାନ୍ୟତଃ ଏହା ଏକଟି ସ୍ଥଳରେ ହେଉଛି, ଆମ ମନ ସେତେବେଳେ ମନର ସାମାନ୍ୟତଃ ଗଳ୍ପରେ।” ଆମେ ତାହା କହିବା ଯେ, କଥାକଥାବେଳେ କଥାକଥାବେଳେ ଗଳ୍ପରେ।

ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧେ ଏକକଟି ସଫଳ ହେଉଛି । ଗୁଣାଳୟ—“ତା ଟାଲେ  
କଲକାତାରେ ଏବନ ବିହସିନ ଶାବରେ ଟି”

ବଳରାଜ—“ହଁ, ଯଦେ! ପୂର୍ଣ୍ଣାବସ୍ଥା ହେ ଯାଉଛି ।”

આવૃત્તિ ૨

ডাঃ বাইটেল রচনায়, "এক জাতিতে রক্ত। একদিন  
জাতিবন্দ—স্বাধীনতা সঙ্গী দেখা যাবে। সে দিনের ধূসী হবে।"

“ଭାଙ୍ଗା” ବସାଣୀ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟରେ ମିଶେ ବଳାୟ, ଉତ୍ତର  
ମଳା ଦିଶେ ସେଇ ଜାଲ ବଂଶେ ବେଢ଼ା ନା ।

সত্যকে নিয়ে মানুষকে বাতী পেলাম—মানুষী কলকাতার  
আবার পথেই যিহাযে সিনই বিকেল বেলায়। সত্যকে অস্বস্তি ডাঃ  
হায়েব কথা ইতিবাগেই বংশেহিলাম—অস্বস্তি ডাঃ পড়ান  
ইত্যাদি। সত্যকে হতে কথা বলেই—কি জানি, যি কোনও  
দিকে আবার হায়েব আবেগ কথার উচ্চারণে সত্যের চৌকি দৃষ্টে  
কথা পড়ে যায়। সত্যকে অস্বস্তি একবার বলেহিলামও যে  
ডাঃ সত্যকে সঙ্গে আলাপ করলে লাসা বিশেষ খুশী হবেন।

বাধু কলকাতার আদার ববর ডাঃ বাগ আদকে কলেজ  
জানিয়ে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন “বাধু আদ কলকাতার  
এসে পৌঁচেছে—মোটের উপর ভালই আছে।”—এই শব্দ  
আর একটি কথাও বলেন নি।—আদিও আর কিছু শুধাইনি।

হাস্যরসে বেগা কবাক্ষিত্ত্বের আগ্রহের মধ্যে অস্বাভাবিক  
কিছু নেই—সবো এক কথার বাকী হলেন। বিকেল ঠোঁট  
আম্বাঝ হাটবীরের বাড়ী গিয়ে পৌঁছলেন।

ତବାନୀମୁଦେ ବେଶ ଏକଟି ଚଢ଼ଘା ସାହାର ଉପରେ କୁଟିମାଧ ଥେକେ  
 ଭିନ୍ନ ଚାନ୍ଦ ସାମ ଉଠେ ମିତେଇ ସାବୁଦିମେବ ନବ୍ୟ ସଂଜ୍ଞା—ବୁଝେ ମେରତ

আমাদের কাঁধে রয়েছে ভারত : পাত্তীর মধ্য থেকেই উঠে দেখলাম  
—বাড়ীখানি, ছোট, কিন্তু বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, হলধর বা  
কব'। আমি ব'ড়ীতেই বাস বইলাম—সবর সম্বন্ধে উত্তর থেকে  
বন্ধ ছিল, তার মনে গিয়ে কাজে লাগলেন।

ଏକଟି ଚାକର ଦୋଷ ହେ ଏମିତି ମନ୍ଦିତା ଥିଲେ ତିନି ।

ପଞ୍ଚମ ଅବସ୍ଥାରେ "ଡା: ବାବୁ ଆସିଲେ ।"

চাকর: বোম্ব চম টিক বুকে পায়নি—বাল্যের ঘুরেছে দিকে  
 চেয়ে বসে। গাঙ্গা অঁকাব বসলেন "একদম—বিলি বসলেন  
 প্রকাশ।"

চাকরটো এতক্ষণে বোধ হয় বুঝতে পারলে, বললে "ও ছোট  
বাব—'মাক্স', নশুন ।"

এই বলে ঢুকই ডান পাশের একখানা ঘা খুলে দিল।  
 দাদা আমাকে ইস্যোহা ডাকলেন—আমি গাড়ী থেকে নেমে  
 বাড়ীর ভিতরে ঢুকলাম।

বাড়ীতে ঢুকই একটা। সত্ৰ বাবা—তার হ'ণ্ডে হুইল।  
 ঘর—গামনে আর একটা বসভায় একটা সত্ৰ জবের পর্বা  
 হুইল, নিশ্চই অন্দর বাড়িও পূর্ব। ঢুকই জান পাশের  
 বসভানিতে গিয়ে বসলাম—এইটাই বৈঠকখানা—ঘর। চাকরী  
 ভিতরে ঢলে গেল।

ନଳା କରାଣୀ—ଏହିକଥାରେ-କବିତା ବିଶେଷ ବହୁ ନା, କିନ୍ତୁ ସେମିତି-ସମ୍ପର୍କରେ ନାହାନ୍ତି । ଏକପାଶେ ଏକଥାମି ବହୁ ଉତ୍ତମାପୋଷୀ ନାହିଁ ବରଫେ ଚାନ୍ଦରେ ଡାକା ଏବଂ ତାହା ଉପର ପରିକରେ ଛୁଟି ଡାକିଲା । ଆଉ ଏକ ପାଶେ ହିମବାନୀ ନିଜେ କୌଣ-ସାକଥାରେ ଏକଜି କଥାମା ଧାବରେ ଡେଇଁ, ତାହା ଉପର କୁଳାନାମିକେ ଡାକିଲା କୁଳ ଉପରେ । ତାହା ଡେଇଁଲେ ଚାନ୍ଦବାନୀ ହସି—ଏକଜି କିଟାସ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହାନ୍ତ ବୃତ୍ତମୁକ୍ତି, ଏକଜି ସବିଜ୍ଞାନୀ ଡାହାରେ, ଆଉ ହଜି ସେମିତି ବହୁ କଟୋଗ୍ରାଫ, ଏକଜି ବୁଦ୍ଧେ, ଏକଜି ହୁଅନ୍ତେ, ଶ୍ରୀକ ଚିନ୍ତାତ ପ୍ରାଣେଶ୍ୟ ନା । ନାମାକ ନିକେ ଡେଇଁ ସେହି—ନାମା ଏକ କୁଡ଼ି ବୁଦ୍ଧେ କଟୋଗ୍ରାଫେ ନିକେ ଡେଇଁ ଆହୁତେନ, ଆସିବି ତାମ କରେ ଡାହାଣା—କୋଟି ମାତ୍ର, ନାମା ଚାନ୍ଦର, ବହୁ ବହୁ ମାତ୍ରା ମୌଫ-ଫାଣା ଡାକ-ମାତ୍ରା ଏକଜି ବୁଦ୍ଧେ ହସି, ଡେଇଁ ହଜି ହୋଟି ହୋଟି ଡେଇଁ-ଡେଇଁର ଡାକ । ତାମା ନାମାକ ନାମାକେ ଡାହାଣା—

“কে জানা—তুমি কখন কবে চেষ্টা বৈতন ?”

কথাটা বললেন 'বাবা বাগানতে হাশিম সেনের ছবি।'

হালসাহ "সে কি ! এ বাড়ীতে হাছিম সোমের ছবি ।"

ডাঃ হাভ টুকলেন যবে—বন্দবের দ্বিত পথিখানে, পাৰ চটী,  
পাৰে গেজি। ঠাৱ যিকৈ চাপ্ৰৱ্য পৰই যুগ আপনা যেকে নীহ

তবে সেল। তবুও আবার কেবলই যে কেউ বিশেষ  
পুলকের খিতহস্তে সুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল—আবার  
বুড়ি এড়াই নি।—একটা আনন্দের আবেগে ঘন অভিভূত হয়ে  
উঠল।

বললেন “ও—আপনি। ইনি?” দাফার দিকে চাইলেন।

দাফার বললেন “আমি বুড়ার দাফা।—আপনিই ত ডাঃ  
দাফা?”

বললেন “হ্যাঁ।—আপনারা এসেছেন—বিশেষ দৌড়ায়।  
দাফার এই পদেবর বাড়ীতেই বেড়াতে গিয়েছে। সবই দিচ্ছি—  
এখনিই এসে পড়বে।”

এই বলে চাকরকে ডেকে দাফারকে বসে দিতে বললেন।

তিন জনেই বসে আছি। শব্দই কথা কইলেন।  
বিশ্রু না মনে করেন ত একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।”

ডাঃ দাফা বললেন “বলুন।”

দাফা হৃদয় সেনের হৃদয় দিকে চেয়ে বললেন “তিনি কে?”

ডাঃ দাফা—একটু হেসে বললেন “আমার দাফা ম’দাই—দাফা

—একটু বিস্মিত হয়ে দাফা শুধালেন “দাফা দাফার দাফা  
সেন?”

ডাঃ দাফা বললেন “হ্যাঁ—সেনের দাফা”

হেসে দাফা বললেন “খিলখিল।”

আদিত্য তবু বিস্ময়ে অবাক হয়ে পেল। ডাঃ দাফা

দাফা।—এক পাল হেসে দাফার ঘরে ঢুকল।

## নীলাকাশ

### জীলগিত মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

দায়ক দিনের দাকে বেষ নীলাকাশ।

রাখ লগা প্রাণ তরে সত্যের আশাস।।

নীলাকাশ লতা মনে উন্মিল বেহিন।

বিখ্যার প্রলোভন হ’তে গেল লীন।।

সত্যের প্রশান্ত হৃদয় বেষ নীলাকাশে।

নীলাকাশের মোহ তব হৃদয়ে অবশেষে।।

নীলাকাশ দিচ্ আতি শান্তিময় মন।

তাহারি ধ্যানেন্তে তুমি কর প্রাণ পব।

নৃতন মনে নৃতন প্রাণে বেষ নীলাকাশ।

তাহাতেই পায়ে তুমি সত্যের আশাস।

নীলাকাশ সেবে তব মূর্তে গেল মোহ।

বেহ হ’তে মন ছাড়া কিসের লক্ষেহ।

নীল মনে তব প্রাণে বেষ নীলাকাশ।

নীলাকাশ করে তব সত্যের প্রকাশ।

নীলাকাশ বেষ আর তাঁর গুণ পাও।

মোহের জটিল কানে কত নাহি বাও।

নীলাকাশ চিরন্তন চিহ্ন নাহি হয়।

উহাতি ধ্যানেন্তে হ’ক সব তব অর

নীলাকাশে বাধ মন কর তাঁরে বান।

কোথা তব গুণ আসা। কোথার অজানত

পাছীতে নীলাকাশ মিলে গেল আজ।

নির্লিপ্ত ভাবেতে তুমি কর সব কাজ।

তাঁর রূপা পেলে বলে কর যো বিশ্বাস।

নীলাকাশ তিন অক্ষরেই আশাস।

দ্বীকৃত লতা বেষ নীলাকাশবাসে।

পূজীকৃত কর্তব্যশি মরে অবশেষে

নিভা লতা নিরঞ্জন নির্লিপ্ত আকাশ।

তাহারি ধ্যানেন্তে হ’ক সত্যের প্রকাশ।



# স্বপ্ন

শ্রী সৌরীন্দ্র মোহন মুখোপাধ্যায়

অনেক সাতাশবছর সতীশ অকস্মেৎ তাঁর পোড়  
এক টেলিগ্রাফ-অফিসের চাকরিতে কাচেরি-অগ্নিন  
লেনো। পল্লীগ্রামে বাড়ী। ইউনিভার্সিটির পাশের  
কোরে সহরের ধর্মীর গৃহে বিবাহ হুতবে অজ্ঞান হুতবে এবং  
ঐ পাশে আর ধর্মী স্বত্বের মই-অগ্নি-অগ্নি—দুই খুঁটা অবলম্বন  
করে তার চাকরিতে প্রবেশ। চাকরির একটা বছর  
প্রবেশনারিতে বসেছে। এ এক বছর মেসে ছিল  
আত্মনা। স্বত্ব শাস্ত্রীর সহ অজ্ঞান এবং স্বত্ব-গৃহে সে  
বাস করে নি—তার কাশে, নবোচ্চা অজ্ঞানতার ভাঙে মত  
ছিল না। পাঁচজনে বসে...  
তা বলে পনি রবিবার আর ছুটির দিনগুলোতে কি...  
এক চাকরিতে নাহিন। পুরো দেড়শো টাকা।  
প্রবাসী বললে—চলি পকাশ টাকা ভাড়ার তে  
ফ্রাটি মিলবে। 'তুমি ফ্রাটি তাহো।' একখানা শোবার  
ঘর, একখানা বসবার ঘর, আর একটু তাহাণা চাই রাসা-  
ভাঁড়ারের। একটা চাকর, বাস! চাকর করবে রাসা-  
বাসা আর বসবার বাস।

সতীশ বললে—ফ্রাটি আছে—টিক ঐ শ্রামবাজারের  
মোড়ে, চাও তো, কাল রবিবার আছে, দেখে পছন্দ  
করবে চলে।

রবিবারে ফ্রাটি দেখা এবং পছন্দ। তিনতলায় লব-

দিকের ফ্রাট—অরো যেমন চার, দু'খানি ঘর বসিগেদা।  
ঘরের গায়ে রাসা-ভাঁড়ারের অজ্ঞান ছোট-ছোট দুটি কুঠরী।  
ঘানের ঘর চাক-বাসার অজ্ঞান কাঠের পাটশন দিলে  
আত্মনার চক্রে কাপড়-ছাড় চুল বাসবার ঘর। ঘরের  
ঘে লব কাঠির পেরেছে সতীশ—বাট, কোচ্, ফ্রেসিং  
টেলি, আলবাসি—চমৎকার ঘরে বাসে খর ছাশায়।  
ভাড়া চলিটা করে টাকা। ট্যাক ফাড়ে, বাতার কাচে,  
অরোর বাপের বাড়ী ঘরে নয়, ঐ হোসের ঘরে।  
বাড়ীওয়াল যেমন ছুতনের মনের কামনা বুকে পাকা  
বাসবার করে রেখেছে!

ফ্রাট বেধে অরো বললে সতীশকে—ধর্মী নয়,  
বুকে! চার যদি তো কিছু বাসনা দিয়ে এসো আগাম।  
—টাকা তোমার কাছে না থাকে, আমি দিছি।

সতীশ বললে—আমার এখন অকম ভাবো অরো,  
যে তোমার টাকা নিয়ে ..

বাধা দিয়ে অরো বললে—তোমার টাকা আমার টাকা  
আলাদা নাকি, বাস অজ্ঞান...!

—তুমি—

দু' চোখের মূর্তিতে অকস্মেৎ অরো বললে—আমার  
টাকা নিতে বুঝি বশায়ের বাসে?

সতীশ বললে—তা নয়। আমার হাতে টাকা তো

বয়েছে। এখন থাকবে না, নিশ্চয় তখন নেবে। কনি কহে  
গায়েন,—তোমার পুণ্য। আমার পুণ্য। নহিলে পরে  
বাড়ি। আর আমি বললাম,—তোমার টাকা সে জানারি  
টাকা মো, বড় পারি নেবে; বেড়ে!

হুয়ো বললে—মাকে বগেছি, আমার সব জিনিস-  
পত্র নিয়ে যাওয়া। আর মার কাছ থেকে চেয়েছি  
একটা সেক্টর টেবিল—বসবার ঘরের জন্য।

পারি দেবে গুরু-ব্রহ্মণ। হুয়ের মা এলেন, বাবা  
এলেন তাইবোনার এলেন—ক্যাটে ব্রেন সবাবোহ দেবে  
চেলো! পাচ-তলা—তুমি বাড়ি। পারবার খোলের রতো  
অসংখ্য ঘর। সমস্ত বাড়ি, এতই ঘরো অনেক খোপ করে  
উঠেছে। মায়া বাড়ীর হুক থেকে উঠেছে মিশ্র  
কলহুসন। কলহুস-কোলাহলের আর শব্দ নেই।

গাড়িতে করে, টালা-গাড়িতে করে, কুলির মাথার  
জিনিষপত্র এসে ভাঁই। বা বললেন—আমি সব গোছগাছ  
করে বি'হুয়ো!

কামের আঁচল জড়ানো—কপালে ঘাম—চুর্ন কুসুম  
সে ঘামে সেঁটে রয়েছে—পুতুলের মুঁড়ি টানতে-টানতে  
হুয়ো বললে,—না মা, আমি শুভোবো। আমাকে নিকের  
হাতে সব কড়তে দাও। আমারই তো সংসার!

বুঝ হাতে মা বললেন—তুমিই তো করবে মা, তুমি  
অন্য তোমার ঘর তুমি করবে! তা হলেও এই সব জড়ানো  
রয়েছে, ঘামে নিয়ে উঠলি যে!

হুয়ো বললে,—পাখিটা খুলে পাওনা।

মা বললেন—হ্যাঁ, পাখি খুলে দি, আর লভ্যপের  
জড়ানো কাপড়পত্রের হাতায়ে উড়ে দাও।  
ওখিক থেকে এলো হুয়ের কোটি বোন পরা—  
শাড়ীর নীচের দিকটা ভিঙে জ্যাব জ্যাব করছে, কীভাবে  
উপর একটা ছোঁড়া শাড়ী। এসে বললে,—চৌবাচ্চা খুঁজে  
দাও করে জাকড়া ভাঁজে দিতে এসেছে। কলে জল এলোই  
তক্তি হুতে থাকবে এখন—আর কি করবে? বেলো  
সেজবি...

সেজবি এসেছে হুয়ে: ভাকালো পরীর পানে...  
হুঁচোবের মুষ্টি-চিহ্নার ভরা...হুয়ো বললে আর...

পরী বললে,—হ্যাঁ হ্যাঁ...নাহাঁহাঁ ঘরে দেলুকা  
খাটাই গে। কিন্তু তার আগে হুক? হাফুড়িটা!

মা বগলেন, তোমার আর হুক মারতে হবে না  
দেওয়াবে—তর্গি বুয়ে হুক মারা চাই...না হলে দেওয়াবে  
দুপুরে খুঁজে কোঁপরা করে' ফেলবে! ইদেনকে ডাকো,  
ইদেন চক এঁটে দেবে।

পরী বললে,—ডাকো বাবা গোমাদের ইদেনকে...  
আমি একটু হাওয়া খেয়ে নিই গে ততক্ষণ—শোবার ঘরে  
সেজবি পাটখানা পাতা হয়েছে তো।



জুবো মা এলেন, বাবা এলেন, জাউলোবো এলো—

মা হাসলেন, বললেন,—ভাই বাও।

বসবার ঘরের দেয়ল কাগজ পেতে হুয়ো তার উপর  
দেখে শুনে মানিনসই করে তুলছিল কীচের পুতুল...মা  
বললেন,—এখন আর অত করে' সালাতে হবে নায়ে।  
হলধর বা হুয়ে রয়েছে, পাডারি, বলবি তো...

হুয়ো বললে,—না মা, আমার অমন চড়িয়ে রেখে  
বোনো কিছু করতে ভালো লাগে না!

মা বললেন,—গায়াবে বাট। বাবুনবেহে' উল্লন  
পাতলো' কেমন, দেখে আসি।

হুয়ো বললে,—অমনি আমার ঐ নতুন চাকচাকীকে  
যলে দাও মা, চোতটা থেকে ঘরে ত্রাতে তেল খেন করে  
রাখে, একটু পরেই চাক করতে হবে তো।

মা বললেন,—চারের বাবরা আমার ডাঙা থেকেই  
করে' নিয়ে আসবে। কেঁপে কেঁপে আসি বলে দিবেছি। গাড়ীও  
গেছে। সেই গাড়ীতে করে' পাঁচটা বাজবা ন'জ চা' আর  
লুচি-টুচি বেঁধে নিয়ে আসবে।

মুহুরা জুটুটি তলাতে তাকালো মাহের পানে, বললে,  
—কেন কুনি এমন করলে? 'আমি মনে মনে ঠিক করে'  
রেখেছি—

মা বললেন,—আমার কথার এ বাংরা হয় নি বাপু  
যে আমার উপর রাগ করবে? উনিই বাড়ী যাবার সময়  
আমার বলে' গেলেন, পাঁচটা বাজবার আগেই যেথেকে  
নিয়ে চা আর বিকলের জলখাবার পাঠিয়ে দেবেন

অজিমানের মূহুরে মুরো বললে,—বাবার কিস্তি ভারী  
অস্তুর এ!

মা আরো বললেন,—কাল থেকে সব করো মা তুমি!  
আজ একবারে সব নরনতি হয়ে রয়েছে।

মা আর বেতের কথার নাকবানো ঘরে ঢুকলো সতীশ।  
তার হাতে কাগজে অভ্যাসে মন্ত একটা প্যাকেট, সেটা  
মুহুরাকে দেখিয়ে সতীশ বললে,—ভাবার পর্দা ত'খানা  
দখল কর খেকে নিয়ে এসুন। আর ছ'খানা কাল সে  
নিয়ে বাবে বেলা দশটার মধ্যে।

পাকা গৃহস্থিও তলীতে মুরো বললে,—এখন আমার  
পর্দা দেখবার সময় নেই। শোবার ঘরে বৃত্তি পরী আছে,  
তার হাতে দাও গিয়ে বসো, খাটের উপরই ঘেন  
রাবে! এখন না খোলে

বেশ, বলে' সতীশ বাড়িল শোবার ঘরের দিকে,  
মুরো বললে,—রত্ন?

সতীশ বললে,—রত্ন কাটের ঠিক করে দিবেছি—  
কুপির মাথার এখনি এসে পৌঁছুবে।

—পিতলের পাইপ তো?

—নিশ্চয়।

হাত নটা। বসবার ঘরে জিনিষপত্র ব্যাড়াছাড়ি  
ডাঁই হয়ে আছে। মা বাড়ী গেছেন, পরী, ইশেন, বিনী  
সকলে পেছের দরজা দিয়ে। মুরো বার নি, তার অনেক  
কাজ, একমুণ্ড নড়লে চলে না। মা বললেন,—মোর  
তালো এঁটে চ' মুরো, খেয়ে দেখে আসবি।

মুরো জবাব দিল,—আজ আমার সময় হবে না বা;  
আমার বাবার তুমি পাঠিয়ে দিবে। পরীও আজ আমার  
কাছে রয়েছে থাকবে

মা বললেন,—ইশেনকেও পাঠিয়ে দেবো। সে  
থাকবে। নতুন ছাত্র—তোমার চাকরটাও নতুন—তার  
উপর সতীশ আজ রাতে বাড়ী থাকবে না।

—বেশ।

সতীশের অফিসে ডিউটির রকমভরম আছে। হুগার  
তিন দিন তার নাইটডিউটি হাত আটটা থেকে তোর  
পাঁচটা পর্যন্ত আজ নাইট ডিউটি।

পরীকে ভাই মুরো বলছে, হাত—জেগে সব শুনিবে  
কেনবো পরী। পারবি না? একটা হাতের তো।

পরী সগর্বে জবাব দেছে—খুব পারবো।

নতুন চাকরটা—ছোটখাট কর্মদাশ খাটছিল, স'নটোর  
সময় হঠাৎ খেয়াল হলো মুরোকে বাক্স আনা হয়নি—  
আর ডেটলের বিনি—

মুরো তাকে পাঠালে হেলোর বাড়ীতে মাহের  
কাছে। রিপ নিয়ে দিলে, এ ছুটো কেলে এসেছি।  
নতুন চাকর মাণিকের হাতে পাঠিয়ে তাকে অমনি  
খাইয়ে দিবে, কাজ চুকে যাবে। বাবার অস্ত্র আমার  
কেন বাবে বেচারা!

মাণিককে পাঠিয়ে বসবার ঘরের দেয়ল মাঝবার  
অস্ত্র মুরো রূপোর বেলনা-বাগানের মুক্তি। খুললো। বিয়ের  
সময় অনেক কিছু উপহার পেরেছিল—রূপের টী-সেট,  
ফুলদানী, ফটো-ফ্রেম, ট্রে—একরকম।

ছাত্রের ঘরে ঘরে রীতিমত লাড়া জেগেছিল। গাড়ীর  
পর গাড়ী...এত জিনিষপত্র...তাও বেশ সৌধীন জাতের,  
ছোট একটা রেফ্রিগারেটের পর্যন্ত! এত লোক, এত ঘন!  
সকলে খুব চাওরা-চাওরি করলো—বিস্ময়িত হুঁটী কর্বাৎ  
যে সে বাজে তাকালে নয়। শয়না-ওঠালা! সৌধীন।  
আলাপ-পরিচয় করবে কি, কোতুলক বৃণ্ড করতে কেউ  
মোরের কাছেও এসে দাঁড়ালো না—নাহে তাতে নতুন  
তাকালের লজ্জার হানি হয়।

সতীশের পিতলের ছোট বেন-গ্রেট খান ক্রুশপিত্তে পরিচর নিয়ে নিকে খেতে সাহাবাকমে এসে উদগ হর—  
লাগিয়ে দুটের বাইরের নরকার এটে বসে এসে স্পোরে— জা. ছাড়া সুতো স্পাতি বোর কইছিল বাসা বাধার প্রথম  
খালন খেলনার স্ত্রীতে সুতো করলো মনঃসংযোগ। উদ্বেগনার কোঁক অনেকখানি করে এসেছে, তার উপর

ঘরের দরজা খোলা— হঠাৎ দরজার বাইরে ভাগলো! এখন নিতাইই একা  
অপরিচিত কঠে বসে—আসতে পারি ?

সুতো চমকে উঠলো! কে ? এ-কালের মেয়ে সে  
কটন থেকে বি-এ পাশ করেছে লক্ষ্যের দ্বার বারে না—  
কাপড়টাকে সন্তুষ্ট করে সে এসে বোরে বাঁড়ালো।

দরজার বাইরে টাউজারগরা এক তরুণ স্ত্রী। গায়ে  
চাক সাট, তরুণের মুখে সখিত হাসি।

সুতোর চোখে প্রশ্ন— মুখে তাকা নেই। সনের গহনে  
নাখুঁটির পরিচর সংগ্রহ করছিল।

মুহু হেসে স্ত্রী বসলে, আমার আপনি চিনছেন না,  
জাখেন নি তো? অবনো! সতীশদার সঙ্গে ছটাই—বেখা  
হলো—ভালবোনি কোরয়ে। আমি টানে উঠছিমুখ.  
নাখিলেন সেই টান থেকে।

মুহু কঠে সুতো বললে—ও!

তরুণ বললে,—আমার নাম মৃণাল। আমার দিদি  
আর সতীশদার দিদিমা দু'জনে ছিলেন বাগবুতো বোন।  
কাজেই আপনি হলেন আমার বৌদি। তা ছাড়া সতীশ-  
দা আর আমি দু'জনে এক-বুলে, এক-বলেজে পড়েছি।  
আমি চুকেছি এ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেলের অফিসে—  
আমরা কাজেই থাকি। টাকার পূল পার হয়ে বাঁচে থেকে  
পাচ হ'খানা বাড়ীর পর।

তরুণ মৃণাল যেন বংশ-পরিচয়ের জেতাব। বিশ্বরে  
সুতো একেবারে হতভম্ব! তরুণ বললো,—সতীশদা  
বললে—আজ আপনাদা এট স্ট্যাটে আড্ডানা বাঁধছেন।  
বললে, পারিস তো ঘাস মৃণাল, তোর বৌদি একা সব  
গোছগাছ করছেন, একটু সাহায্য—...! বানো, এ কাজে  
আমার পেজাল ভ্রাক আছে বলেই আর কি। তা  
আপনার কদুর কি হলো বোদি।

কথা শেষ করে বিনা-আজ্ঞানে ছোর করতে মৃণাল  
চুকলো! ঘরে সুতোর গা-বেঁধে। সুতোর কেবন যেন  
তক্তিত তার।

কিছু ঘে-নাখুল এতখানি আত্মীয়তা আর অস্বস্ততার



সতীশের নরকার বেন-গ্রেট লাগিয়ে সেওটা হচ্ছে।

আলাভন করবে, সে বিশ্বরে নির্দেশ নিয়ে রাখছি, তখন  
যেন তাড়িয়ে রেবেন না।

সুতো একবার ভাবাব দিলে না।

মৃণাল বললে,—এখনো সব গুছিয়ে তুগতে পারেন-  
নি,—এটা বসবার বর ? ও! স্পোরে ও সব জিনিষ এখন  
আলদা রেখেছেন বৌদি! দিন-কাল যা পড়েছে, তত-  
অতিবি হয়ে এসেও অনেক এখন—তা আপনি তখন-  
তলার উপর, তার মজ বটে, অনেকখানি 'নরগেহ'  
গহনা-পত্র সঙ্গে রাখবেন না, নোদা, রাখবেন কোনো  
সেকী-ভালো!

সুহো বললে,—শেক্স্‌পীয়ারেই নয়, এইখানেই সঙ্গে  
থাকবে।

সুপালের ছুঁচোখে অনিন্দিত হইল।

সুহো বললে,—লোহার নিম্নক আচে একটা... চোটি,  
তবু কোয়ার্টেট লোক, নয় ?

—হুঃ! হুবে তার চাষি সবচেই হুঁসিয়ার! একটা  
ঘটনা বলি তবে, গুহুং বৌদি। এই জ্যাটি-বাড়ীগুলো  
যে একটুও নিরাপদ নয় গরমালো লোকের পক্ষে,  
সে-ঘটনা থেকে তা'র বেশ বুঝতে পারবেন! সত্যীন্দ্রকেও  
তাই বলছিগুন তবু, সে-সে জ্যাটি নিলে সত্যীন্দ্র! তাকে  
বললে, চোটি গুহুংগোরে বাড়ী লেগুন না রে। তা থাক,  
এখন গুহুং সে ঘটনার কথা।

সুহোর কেমন অবস্থি ঘোষ হচ্ছিল, নিজেই ঘর,  
সে ঘরে এই প্রথম অতিথি। সে অতিথি আবার স্বামীর  
আত্মীয় নয় শুধু, অতঃপর বন্ধু, বন্ধুর বন্ধু,—সুহো বললে,—  
আমি চা' তৈরী করি। আবার সব সংক্রাম আছে।  
এক জেলে—প্রথম দিন আগনি এলেন, আর একটু  
চাঁও থাকেন না, তা হয় না। আমি চা' তৈরী করতে  
করতে আগনির গরম শুকাবে।

—শে! আমি, আপনারা অল্পপূর্ণর ভাত, না খাইরে  
কি থাকতে পারেন?

ঠোত এনে সুহে আলসো, তারপর তাকে চাপিয়ে  
বিলে জল-ভরা কেটলি। চা'র পরে পেয়ালা-পিরীচ তিনি  
সব...পট এনে ভেড়া করলো, ক'রে সুপালের পানে  
ডাকিয়ে সুপালকে বললে,—এবার বলুন আপনাদের গল্প

সুপাল পারচারি কহে' এটা টেনে ওটা নেড়ে আলসাবা-  
পত্র দেখছিল, বললে,—এ ছোট বাছটা ?

সুহো বললে,—ওতে আছে ক'খানা গহনা। বিরহ  
সময় উপহার পেয়েছিলুম...একটা নেকলেস আর কটা  
আলি—যেমন রাখা ছিল, তেমন এনেছি। এইবার  
জুলাও।

সুপাল বললে, এতলো—এমন করে কেলে চড়িয়ে  
রাখতে নেই বৌদি। কেন, আবার গরম ওনলেই বুঝবেন।

সুপাল গরম হুক করলো,—কর্ণওয়ালিস টীটের উপর  
জ্যাটি-বাড়ী। দোতলার বান পাঁচেক ঘর নিয়ে থাকতেন

আমাদেরই এক বন্ধু, তিনিই স্বামী। তিনিই স্বামী,  
সৌখীন মাহু। সেই জ্যাটেই তাঁর পাশের ঘরে

স্বাক্ষরিত আর এক তর লোক...একদিন তিনিই  
মহাবিহারে সিনেয়ার গিয়েছিল...স্বাক্ষরিত নটর পোন্তে...

সেবার ঘরে ভাল লাগিয়ে। কিংলো রাত আর  
থায়োটার। ফিরে এসে ঘর গুলে দেখে, পাশের ঘর

আর তার ঘরের বাত্রে যে দেওয়াল, সে-দেওয়ালে একটাও  
গর্ত। আর সেবার ঘর থেকে একটা লোহার নিম্নকই

যেনলুন লাভ। পুলিশ এলো। পাশের ঘরের  
ভাড়াটের কোনে: চিহ্ন নেই। সেবার সে ঘরে পড়ে

আছে শুধু একখানা ছেড়া বাছুর, টিনের একটা হাউলতাকা  
কেটলি আছে, একটানা পোড়া বিড়ি। তাহুন একবার

ব্যাপার—আপনার এই যে ঘর, এর ওপাশেও তো  
ঘর আছে...সে-ঘরে অল্প ভাড়াটে। বরন, একদিন

আপনার বাড়ী নেই, ফিরে আসে যদি যেনে, ঐ  
দেওয়াল খুঁড়ে চোর এসে সব নিয়ে গেছে।

সুহোর সর্জক হুহুং করে উঠলো—যেহে বন্ধু সৌ  
সৌ করে যেন মাঝার উঠেছে সেখানো।

সুপাল হাসলো, বললে—আর একটা ঘটনা বলি—  
আমাদের টালার ব্যাপার—এই সেদিনের কথা।

এক তর লোক কোথায় গেছেন। বাড়ীতে তাঁর স্ত্রী  
একা। রাত নশটার সময় হঠাৎ বাড়ীর যোরে

কড়া নাড়লো। স্ত্রী যেতারা। গড়ে মোর গুলে বিলেন,  
—সঙ্গে সঙ্গে একজন বাছুর বাড়ীতে ঢুকলো।

চুকেই একখানা চাবির স্ত্রী হু-চোখ বেঁধে ঘরমা  
দিলে বন্ধু করে। তারপর কামা-দুহুং কহে' গহনা

টাকা-কড়ি নিয়ে হাওয়া হয়ে বেরিয়ে গেল। আর দস্তার  
ব্যাপার। আসে পানে অল্প লোকের বাসা—রাত নশটা

আর এমন কি বৌ রাত বলুন ?—তাই ঘরে আপনাদের  
তো ছুঁচিবাজ প্রাণী, সত্যীন্দ্রের নাইট-ডিটলি প্রায় তিন

দিন ক'রে...

আতঙ্কে সুহো যেন নীল হয়ে গেল।...যেন হচ্ছিল,  
সে যেন বাড়ীর স্পর্শ হারিয়ে শূন্য হুহুং! মাঝার মধ্যে

শুধু বোঁহার কুণ্ডলী...এমন সময় হঠাৎ সুপাল বলে  
উঠলো—অল্প হুটেছে, বৌদি—



—ও! হুতো খেন হুগল কাটিয়ে বর্জলোকে নানলো।  
কেটলি নাখিয়ে হুতো বনুলে,—কনডেলড্‌ বিছটা নিয়ে  
আসি রামাঘরে আছে।

হুতো গেল বিছ আনতে। কিহলো তখন। কিরে  
না দেখলো—

নিরবে সে পাখর বনে গেল! দেবলো, ওদিককার  
দরজা বন্ধ, মুখাল সেবার সেই বাজটা হাতে নিয়েছে  
আর একথানা চাবরে জডো করেছে শেলক থেকে  
গেড়ে জপোয় খেলনা বাসন টীলেট, অপোর হুগ হাটী,  
ঘোড়া, বাছ জডো করে পুঁটলি বাঁধতে।

হুরোকে বেঁধে সেবার বনকে ধাঁড়ালো। হাতে ছিল  
ছোরা, ছোরা। তুলে সে বললে,—টুশদ তনেহি কি এর  
একটি চোটে—বা বলি হুগচাপ শোনে। টাকা চাই, যা  
আছে কাছে দাও—

ময়চালিতের হতো হুতো গুনলো—তুলে বিলে তার  
হাতে—হাতের চুড়ি বোলগাছা, ললি, গলার সোনার  
হার মশ ত্রি—বা হাতে ছিল বীনার কাছ করা সোনার  
কাঁকণ সেই কাঁকণ, মগল একশো সাতার টাকা সাদে  
পনের আনা যা ছিল তার হাত বাঁধে—

মুখাল সব জডো করে পুঁটলি বাঁধলো। তারপর  
বিহানার চাবখানা তুলে হুতোর মুখচোখ টাইট করে  
বাঁধলো—বেঁধে বাঁধকনে তাকে পুরে রেখে বেরিয়ে  
এলো। বল এলো—দায়ে গড়ে কঠিন হতে হলো। পাছে  
আবি বর থেকে বেঁকবান্না চাবকার তোলেন—হুতো  
আতো! বৈশী আদায় হতে;—কিন্তু অতি লোভে গীতি  
গঠে হুতোহেন গমে গড়েছি—কাজেই আচ্ছা—মহকার—

বেন সিনেদার পছিরে বিলার ছবি। মুখাল ভেননি  
গেল চলে—তারপর—

অনেককণ পরে পরীর জাক—ভাকের পর জাক—  
সেজদি—সেজদি—

হুতোর সাজ সেবার উপায় নেই! সেবে বাবজবের  
দরজায় ধাক্কা। দরজা গেল গুলে। পরী বললে—  
এ কি!

হুজি পেরে হুতো কোনো একবে বললে, যা  
ঘটেছিল।

তবে পরী বললে—বাড়ী চ তাই। ইশেন আনুক।  
গাভী এখনো নিরে বায়নি—স্তোর খাওয়া হলে বাসন-  
কোশনগুলো নিরে বাবে বলে পাড়িয়ে আছে। তার  
পর রাতে আবি বলি মরোয়ান এসে থাকবে ইশেনের  
সঙ্গে।

হুতো তধু বললে হ—

পরী বললে—মুখ হাত ধুরে আর—কাপড় ছাড়।  
ছেড়ে শীগিরি খেয়েনে সেজদি—তার পর বাড়ী চল না—  
বাবা বললেন,—বা গেছে, তার জন্ত ভেবে কি করবি  
প্রাণটা যে বায়নি—

বা বললেন,—হ্যাঁ। আবার পায়ে কাঁটা বেছে জাখে  
প্রাণে বেয়ে বায়নি, আবার অনেক পুণ্ডির জোর বা,—  
বাবা বললেন—ত্যাগে থাকতে হবে না—পাতো  
গোটা বাড়ী ভাড়া নাও না হলে আবার এই ব্যাধাক—  
বছিন না সেলুক-সাপোষ্ঠি হতে পাতো! এ মুণে  
ছেলে মেরেবের ঐ যে হোপ হয়েছে—কি করে আলাদা  
সংসার পাতিবে। আরে, সে কি সহজ ব্যাপার বাপু।  
যাছব তো কপোত-কপোতী নয়।



# ভারতের খনিজ সম্পদ

নকুলবিহারী পাল

ভারতবর্ষ কৃষি-প্রধান দেশ; এখানেই কৃষিকা ও জল-বায়ু কৃষিকার্যের বিশেষ উপযোগী। কিন্তু ভারতের খনিজ সম্পদও নগণ্য নহে। কৃত্তবিস্ময় পরীক্ষার বৈজ্ঞানিক যেন, এখানে, এমনও প্রচুর খনিজ সম্পদ অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে এবং উপচুর্ন ব্যবস্থা ও সুদৃশ্যকর অন্বেষণ অনেক খনির কার্য সম্পূর্ণরূপে প্রসার লাভও করে নাই। তবে সম্প্রতি ভারত-সরকারের কৃত্তবিস্ময় বিচারের দ্বারা সম্প্রদায় চটাইতে বলিয়া আশা করা যাইতেছে যে, অল্প ভবিষ্যতে ভারত খনিজ সম্পদে অতুলনীয় হইতে পারিবে। এই বিশাল ভূখণ্ডের চমিন কোটি অধিবাসীর নিজস্ব চাহিদা মিটাইবার জন্য যে-পরিমাণ খনিজ পদার্থের প্রয়োজন রহিয়াছে তাহাও ভারতে খনিজ সম্পদ-নিষ্কাশনের সম্ভাব্যতার অধিকৃষ্ণ।

জগতের কোন সত্তা যেনই খনিজ সম্পদে স্বয়ংপূর্ণ নহে। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেও ইহার কোনও ব্যতিক্রম নাই। নব্বিও ভারতে খনিজ প্রস্তরের পরিমাণ লীমাইন নহে, তবু কোন সত্তাভাবের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় কতকগুলি খনিজ প্রস্তরের প্রাচুর্য্যও এখানে পরিলক্ষিত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, অত্র উৎপাদনে ভারত পৃথিবীর মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে, ম্যাঙ্গানীজে দ্বিতীয় স্থান। তথ্যভাষ্য লৌহপ্রস্তরও যে-পরিমাণে উৎপাদিত হয় এবং পণ্ডিতদের নভে যে-পরিমাণে সংরক্ষিত আছে তাহাও কোন দেশের পক্ষে সর্ব্বের বিষয়। ইহার পর নান কয় যাইতে পারে কয়লা, লবণ, তাম্র, টাইটানিয়াম, বেরিলিয়াম প্রভৃতি খনিজ ব্যবহার। তবে বর্তমানে ভারতে যে সমস্ত খনিজ পদার্থ উৎপাদিত হয় এবং বাহ্যিক ব্যবসা প্রচলিত আছে, তাহার অধিকাংশই বায়ুপ্রস্তর-গঠিত। অন্তরাং বায়ুপ্রস্তর ব্যতীত অন্যান্য খনিজ পদার্থ সম্বন্ধে বিশেষ ব্যবস্থা সহকারে কার্যে চালাইলে এই সমস্ত শিল্পের সম্ভাব্যতার দৃষ্টে সম্ভাবনা রহিয়াছে।

এখানে একটা প্রশ্ন দ্বাৰাভাষ্যই উঠে, খনিজ সম্পদ বিপণিতে আনয়ন কি কুরি। এক কথা বলা যাইতে পারে,

যে-সমস্ত পদার্থ বৃ-অভ্যন্তর হইতে মাথুদের ব্যবহারের নিমিত্ত উত্তোলিত হয়, তাহাই খনিজ পদার্থ। কৃত্তবিস্ময় অবস্থায় খনিজ সম্পদ কখনো কখনো ব্যাপক ভাবে প্রয়োগ করিয়া থাকেন। তাহারের নভে নান্যপ্রকার প্রস্তর, বাসি, লবণ, বিভিন্ন জাতীয় কয়লা এবং অন্যান্য খনিজ সম্পদের অন্তর্গত। এই প্রথমে খনিজ সম্পদের ব্যাপক অর্থ গ্রহণ না করিয়া সীমাবদ্ধ অর্থে কখনো প্রয়োগ করা হইবে। সে-নভে সকল প্রকার দাতব্য প্রস্তর, কয়লা, খনিজ তৈল, চূর্ণ ও লবণজাতীয় প্রস্তর, উচ্চতাপে গলনশীল নানা জাতীয় প্রস্তর এবং যে-সমস্ত পদার্থ গৃহ-নির্মাণ কার্যে ব্যবহার হয়, যেমন প্রস্তর, সিমেন্ট প্রস্তরের ত্র্যাবলি-বাসি ও নানা জাতীয় কয়লা—সেই সমস্ত ত্র্যাবলির উপর ব্যাখ্যা লীমাবদ্ধ রাখা হইবে।

ভারতবর্ষে বৃ-অভ্যন্তর-সম্বন্ধীয় খনিজ পদার্থের মধ্যে অভ্যন্তর রহিয়াছে, তবে প্রতিবেশী ত্র্যবল্লেশের এই জাতীয় খনিজের তহবিল প্রচুর। তাহা ব্যতীত জগতের সর্ব্বমোট গ্রাফাইট প্রস্তর পাওয়া যায় নিহলে। ভারতে যে সত্তাবিক বিভিন্ন প্রকারের খনিজ পদার্থ বর্তমান রহিয়াছে তাহার সকলগুলি বর্তমানে উৎপাদিত হয় না। সে বাহ্যিক হটক, শিল্পজাত খনিজ পদার্থ উৎপাদনে ভারতের অবস্থা নিরক্ষিত বিভাগ হইতে পরিচুট হইবে।

১। যে-সমস্ত খনিজ প্রস্তর ভারত হইতে প্রচুর পরিমাণে বিদেশে রপ্তানী হইতে পারে এবং সমগ্র জগতের ব্যবসায়ক্ষেত্রে ভারত-কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে তদ্বাচ্যে উল্লেখযোগ্য হইল লৌহ-প্রস্তর, টাইটানিয়াম প্রস্তর ও অন্যান্য।

২। যে-সমস্ত খনিজ পদার্থ দ্বারা ভারতের নিজস্ব চাহিদা মিটাইয়াও বিদেশে কিছু পরিমাণে রপ্তানী করা সম্ভব, তাহা হইল ম্যাঙ্গানীজ, বক্সাইট (এলুমিনিয়াম প্রস্তর), ব্যাগনেসাইট (ব্যাগনেসিয়াম প্রস্তর), প্রাকৃতিক সর্ব্ব-পদার্থ (যেমন কার্বোয়ানডাম), সিলিকা, জিপসাম (ক্যালসিয়াম প্রস্তর), অটোমিকা নির্মাণের গ্রানাইট প্রস্তর, বোনাইট বাসি, স্ট্রোটাইট (ব্যাগনে-

সিরাম মার্কিক \* ১), উচ্চতাপে গলনীয় প্রভর ও বৈদ্যুতিক প্রভর।

৩। বর্তমানে ভারতের নিম্নমাত্রা চাহিদা মিটাইবার মত বনজ প্রবোধ নথো নান কল্পা যাইতে পারে—করলা, সিমেন্ট প্রভৃতির ব্যবহার, আলুমিনিয়াম প্রভর, ক্রোমিয়াম প্রভর, অক্সালিক নিষ্কাশনের বিভিন্ন প্রভর, মাইল প্রভর, স্টেট, নানো-জাতীয় কর্দম, লাইন (চূণ) প্রভর, বনিক বহন প্রভা, সোডিয়াম-গঠিত মণ ও ক্ষার, ফিট কঠি, কঠ-প্রভরের বালি, সোহাগা, ফেলস্পাথ (পটাসিয়াম, আলুমিনিয়াম ও সিলিকার খৌগিক পদার্থ), নাইট্রেট, ফসফেটস, জিবকন, অক্সেনিক, এক্টিমি, ডায়োডিয়াম প্রভর, বিদ্যুৎ নৃত্তিক ধাতু প্রভর প্রভৃতি।

৪। যে-সমস্ত বনজ পদার্থের ক্ষত্র ভারতকে আংশিকভাবে বা সম্পূর্ণভাবে ক্ষত্র দেশের উপর নির্ভর করিতে হয়, তন্মধ্যে রৌপ্য, নিকেল, পেট্রোলিয়াম, গন্ধক, বজা, সীসা, টিন, পারদ,

টানস্টেন, প্রাটিনাম, স্বর্ণ, গ্রাফাইট, পটাস, এসব-ই (রাজ্য নির্ধারণের ক্ষত্র একপ্রকার আলকাতরা) প্রকৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

উপরে যে-সমস্ত বনজ পদার্থের তালিকা প্রস্তুত হইল, তাহার মধ্যে দুই একটি বাতীত লবণগুলি ভারতীয় বনি হইতে উৎপাদিত হওয়া সম্ভব। তবে বর্তমানে উহাদের মধ্যে মাত্র অল্প কয়েকটাই উৎপাদিত হইয়া থাকে। ভারতে যে-সমস্ত বনজ প্রবোধ আদিক্য গ্রহণহে, তন্মধ্যে দুই একটির কার্য মোটেই প্রসাৎ লাভ করে নাই। উদাহরণ-স্বল্প বলা যাইতে পারে যে, ত্রিভাঙ্গুর তাত্য প্রচুর পরিমাণে বোনাকাইট বালি রহিয়াছে। বোনাকাইট বালি হইতে অতি অর্থোজলীয় খোরিয়াম ও হিলিয়াম গ্যাস পাওয়া যায়। কিন্তু উপরূক্ত পরিচালনা-অভাবে বোনাকাইট বালি হারা কোন কার্যই সম্পাদিত

হইতেছে না। সে পাহাড়ই হউক, ১৯৪৪ সালে সে পরিমাণ বনিক পদার্থ ভারতবর্ষে উৎপাদিত হইয়াছিল তাহার মূল্য সমস্ত নিম্নতালিকার সঙ্গিবিষ্ট হইল।\*

|            | পরিমাণ    | মূল্য                   |
|------------|-----------|-------------------------|
| করলা       | ২৩,১২,৬৭০ | টন ২৭ কোটি ২৭ লক্ষ টাকা |
| খোদালী     | ৩৭, ২৮*   | ৮৮                      |
| সৌর প্রভর  | ২,০২,৬১৪  | ৪৬                      |
| ভারত প্রভর | ৩২৪, ১১৮  | ৩৭                      |
| মজ         | ৭২,২৮৮    | ২ কোটি ৭০               |



|              |            |                        |
|--------------|------------|------------------------|
| মরন          | ১,৮৩৬,৭২৬  | টন ২ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা |
| পেট্রোলিয়াম | ৩৭,৩১৫,১১৭ | .. ১                   |
| স্বর্ণ       | ১৮৪,৪২৮    | আউন্স ৩                |

|                                |            |             |
|--------------------------------|------------|-------------|
| ইসোব্রাইট                      |            |             |
| (টাইটানিয়াম প্রভর) ১০০,৭২৪ টন |            | ১ লক্ষ      |
| সন্ট-স্টার                     | ২,১১৮      | —           |
| কাথেনাইট                       | ২২,১৮৬     | ৬ লক্ষ      |
| ক্রোমাইট                       | ৩২,৪৪৪     | ৭           |
| ম্যাগনেসাইট                    | ৪৩,২৮৭     | ৪           |
| অক্সালিক নিষ্কাশন              |            |             |
| প্রবোধ                         | ১০,২৫৭,৮২৮ |             |
| জিবকন, বজাইট, বৈদ্যুতিক প্রভর  |            |             |
| টানস্টেন প্রভৃতি               | ১০,৭২৮     | ০ লক্ষ টাকা |

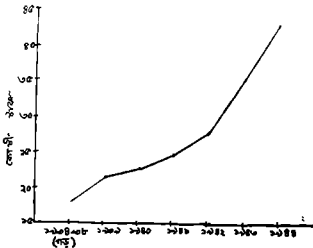
সত্ত্ব ত্রিষ বৎসরে ভারতে উৎপন্ন বনজ পদার্থের পরিমাণগত বিবরণমতে দেখা যায় ১৯৪২ সালে সর্বোপেক্ষ বন্য পরিমাণে করলা ভারতে উৎপাদিত হইয়াছিল, তৎসমস্ত ম্যাকালী ১৯৪২ সালে, পেট্রোলিয়াম ১৯৪১

\* জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ায় বিবৃতি হইতে।

\* Ors কবাটারি বালো অর্থে অনেক ক্ষেত্রে 'মার্কিক' ব্যবহার করা হইয়াছে।

সালে, অত্র ১৯৪১ সালে, লবণ ১৯৫০ সালে, পৌরপ্রত্য  
১৯৪২ সালে এবং তাত্র ১৯৪০ সালে লক্ষ্যপেক্ষা বৈধি  
উৎখাত হইয়াছে। বর্তমান সত্যাপ্তে পেটোলিয়াম  
একটি অতি প্রয়োজনীয় বস্তু পদার্থ। ১৯৪১ সালে যে  
পরিমাণ পেটোলিয়াম ভারতে উৎপাদিত হইয়াছে, তাহা  
সমগ্র পৃথিবীর শতকরা ০.১ ভাগ নাত্র। এই পরিমাণ  
পেটোলিয়াম দ্বারা ভারতের নিজস্ব চাহিদার এক-  
তৃতীয়াংশ নিতান সন্তব। গত কয়েক বৎসরে ভারতে যে  
পরিমাণে বিভিন্ন প্রকারের বহিঃপদার্থ উৎপাদিত  
হইয়াছে তাহার মূল্যগত এবং পরিমাণগত বিবরণ ১ম  
এবং ২ম চিত্রে লেখ-সাহায্যে দেখান হইয়াছে।

| বস্তু           | ১ কোটি ৪৪ লক্ষ টন | ১ কোটি ৩৭ লক্ষ টাক | ৪০'২ | ৪০'৪ |
|-----------------|-------------------|--------------------|------|------|
| অত্র            | ৪ লক্ষ টন         | ৩৪ লক্ষ টাক        | ৪০'৪ | ৪০'২ |
| তাহার প্রত্য    | ১২ লক্ষ টন        | ৫২ লক্ষ টন         | ১০০  | ১০০  |
| পৌর প্রত্য      | ১৪                |                    | ৪১'৮ | ৪২'০ |
| বাগা ও গুহ-     |                   |                    |      |      |
| নির্মাণ প্রত্য  | ১০                | " "                | ১৮'৮ | ১৪'০ |
| মাল্যবীজ প্রত্য | ২৪ লক্ষ টন        |                    | ২'৪  | ১'৪  |
| মাল্যবীজ কৰ্ম   | ২০                |                    | ৪২   | ৪১'২ |
| মাইট            | ১                 |                    | ১০'২ |      |
| কোমাইট প্রত্য   | ৪                 | ১ লক্ষ             | ১১'৮ | ১৪'৭ |



২ম চিত্র

ভারতে উৎপাদিত বহিঃপদার্থের শতকরা ৪০ ভাগই  
বিহার প্রদেশে উৎখাত হয়। এখানে অনুশনক্ষে বাট  
প্রকারের বহিঃপদার্থের অবস্থিতি জানা গিয়াছে।  
ভারতের বিভিন্ন প্রকারের বহিঃপদার্থবো পেটোলিয়াম,  
কোবাল্ট, ট্রিনিয়াম ও মিশ্রনাম ব্যতীত অন্যান্য সকল  
বস্তুই বিহারে কম-বেশি বর্তমান আছে। ১৯৩৮  
সালে একমাত্র বিহার-প্রদেশেই বিভিন্ন পদার্থ যে  
পরিমাণে উৎপাদিত হইয়াছিল, সমগ্র ভারতের  
কুলসার তাহার শতকরা ৪০ নিত্যপদার্থ দেওয়া  
হইল।

উপরোক্ত বহিঃপদার্থ ব্যতীতও  
বিহারে অনেক মূল্যবান ও অতি  
প্রয়োজনীয় বহিঃপদার্থ রহিয়াছে।

যে সমস্ত ডালিকা প্রদত্ত হইল,  
তাহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে,  
ভারত বহিঃপদার্থে অত্র যে কোন  
সুসভাধেশ অপেক্ষা কোন অংশেই  
হীন নহে। তবে হু-বের বিষয় যে,  
ভারতে বহিঃ ব্যবসা যে কোন  
পরিচালিত হইতেছে তাহাতে দেশের  
বহিঃপদার্থের ভবিষ্যৎ মোটেই  
আশাবাদ নহে। শিল্পভিত্তি এবং  
বহিঃ পরিচালকবর্গ জুড়িয়া বান  
যে, দেশের অর্থনীতি সম্পদ বা

জীবন সম্পদ বৈজ্ঞানিক উপায়ে বৃদ্ধি করা সম্ভবপর,  
কিন্তু বহিঃপদার্থের ক্ষেত্রে তাহা সম্ভব নহে। সুতরাং  
দেশের বহিঃপদার্থ বাহাতে কম প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়ো-  
জনীয় কার্যের নিমিত্ত ব্যয়িত না-হয়, তৎক্ষণত সকলের  
দৃষ্টি রাখা একান্ত কর্তব্য। কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে তাহার  
অন্তথা হইল হয়। উপরোক্ত বস্তুগুলি এখানে উল্লেখ করা  
হইতে পারে যে, অত্র, মাল্যবীজ ও আরও অনেক অতি  
মূল্যবান বহিঃপদার্থ একমাত্র কাঁচামাল দ্বিগুণে বিদেশে  
অতি নগণ্য মূল্যের পরিবর্তে রপ্তানি করিবার নিমিত্তই  
উৎপাদিত হইয়া থাকে। অথচ এই সমস্ত পদার্থ হইতে

প্রস্তুত প্রণালি অব্যাহত রাখার বহিষ্কৃত দ্বারা ক্রয় করিয়া থাকি। বেশে উপযুক্ত শিল্প-প্রকৃতির অত্যাধিক টহোর একমাত্র কারণ। তাহা হাঁড়, ভারতবর্ষে কোন বনিজ মালেকের হইতে হইলে তাহার কোন বৈজ্ঞানিক জ্ঞান থাকিবার প্রয়োজন নাই এবং কৃত কৃত বনিজ মালিক কোন বৈজ্ঞানিক নিয়োগ করাও অপব্যয় মনে করেন। এইরূপ নীতি অবলম্বনে মালিকের ব্যক্তিগতভাবে কবচিং লাভ হয় বটে, কিন্তু বেশের মূল্যবান সম্পদের যে অপব্যয় হইতেছে, তাহা অপরিসীম।

দেশের সমস্ত প্রকার বনিজ প্রস্তরের তথ্য, উপা দেশের শিল্পের তথ্যকে নির্ভর করে বিশেষভাবে করসা-সম্পদের উপর। ভারতের করসা-বিনিয়োগে প্রচুর করসা সংশ্লিষ্ট আছে। কিন্তু বর্তমানে অকাজে কুলায়ে যে-ভাবে করসা ব্যবহার হইতেছে তাহাতে অসংখ্য লক্ষ্য বৎসরের মধ্যেই দেশে প্রয়োজনীয় প্রণালির শিল্পের স্বাধীনতা হ্রাস হইবে, তাহাতে কোন লক্ষ্য নাই। যে-সমস্ত ক্ষেত্রে নিষ্কর্তার করসা-কাজ চালান হইতে পারে, সেখানেও উৎকৃষ্টতর করসা ব্যবহার হইতেছে। কোক প্রস্তুত করিতে প্রচুর পরিমাণে করসা ব্যবহার হয়। এই পদ্ধতিতে যে প্রচুর পরিমাণে অল-কাতরা পাওয়া যায়, তাহা আমাদের দেশে কোন কাঠেই লাগে না। অথচ এই অলকাতরা হইতে বোটের তৈল,

জালানী গ্যাস ও অনেক মূল্যবান পদার্থ পাওয়া যায়। হিসাবে দেখা গিয়াছে যে, এই প্রক্রিয়ার জন্য আমরা বৎসরে ৩ কোটি গ্যালন অলকাতরা নষ্ট করিয়া ফেলিতেছি। ভারতে আজ বাদীন এবং বায়বীয় লবণ সরকার সুপ্রতিষ্ঠিত। অশো করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে ভারতের বনিজ সম্পদ সুরক্ষিত ও বনিজ-শিল্প সুসংবদ্ধ হইয়া নিত্য বৃদ্ধি শিল্পের উত্তর হইবে।

ভারত আজ বিতর্ক হইয়াছে। দেখা হইতেছে, বনিজ সম্পদে ভারতীয় ইউনিয়ন পাকিস্তান অপেক্ষা অনেকাংশে সমৃদ্ধ। আগেই বলা হইয়াছে, অল্প উত্তোলনে ভারত পৃথিবীর মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে এবং মাল্যবাহীকে দ্বিতীয় স্থান। পাকিস্তান অল্প বা মাল্যবাহী বনি নাই। বেসুচিহ্নানের খোঁজ ও পাঞ্জাবের তিলাস জেলার আর পরিমাণে করসা পাওয়া যায়। পশ্চিম পাঞ্জাবের আটক জেলায় পেট্রোলিয়াম উত্তোলিত হয়। তাহা হাঁড়। এখানকার সন্নিবেশে প্রচুর পরিমাণে লবণ পাওয়া যায়, যদিও বর্তমানে ভারতে উৎপাদিত লবণের অধিকাংশ বোম্বাই ও মাদ্রাস উপকূল এবং রাসপুতানার লবণ হ্রদের জল হইতেই প্রস্তুত হয়। বেসুচিহ্নানে গন্ধকের অবস্থিতি জানা গিয়াছে। ভারতে উৎপাদিত প্রধান বনিজ পদার্থগুলির তির তির ভাবে আলোচনা-এসকো এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা হইবে।

কাল জুর্গোৎসব; আজ তার স্থান হুতন।। যের যের বেশের সোকার মনে যখন একটা আনন্দ প্রবাহিত হচ্ছে তখন তাদের সঙ্গে আবার বর্ষ-সংস্কারের বিচ্ছেদ থাকা সত্ত্বেও সে আনন্দ বনকে স্পর্শ করে। শতদিন স-র বাড়ি যাবার সময়ে দেখেছিলুম রাস্তার দুধারে প্রায় বড় বড় বাড়ির দালান বাজেই প্রতিমা তৈরি হচ্ছে। দেখে আবার মনে হল, বেশের ছেলে বুড়ো সকলেই হঠাৎ বিনকরেকের জন্তে ছেসেমাছুস হয়ে উঠে একটা বড় সোহেব খেলার লেগে গেছে। ভেবে দেখতে গেলে আনন্দের আয়োজন বাজেই পুতুল খেলা—অর্থাৎ তাতে আনন্দ ছাড়া আর কোনো উদ্দেশ্য নেই, লাভ নেই—বাইরে থেকে মনে হয় সর্বদা নষ্ট। কিন্তু সমস্ত দেশের শোকে মনে বাতে একটা ভাবের আকোশল এনে দেয় তা কি কখনো নিকল হতে পারে? প্রতিবৎসর কিছুকালের জন্য মনে এমন একটি অস্বস্তি আত্ম অবস্থা আসে যাতে সহ্য ক্রীতি বরা সত্যের অস্বস্তি হতে পারে, মাগবনী বিলম্বের পান, প্রিয় সন্নিধান, বহুভেদে সুর, পরভের রৌদ্র এবং আকাশের বজ্রতা সত্যতা মিলে মনের মধ্যে আনন্দ রচনা করে।



## তোমার এই অপূৰ্ণ দান

ঐশ্বৰ্য্যেণ বিশ্বাস

তোমার এই অপূৰ্ণ দান স্বাধীনতা।

আমরা যেন এর উপভুক্ত হই, ভগবান্ !

যনে প্রাণে কণ্ঠে বহনে আমরা যেন দেশসেবক হই।

স্বৰ্গপ্রাপ্ত শতশ্রামাদা দেশে

অন্ন দাত, বস্ত্র দাত, গৃহ দাত প্রভৃ।

নদীর জল হোক নির্মল, পের,

বনের ফল হোক সুমিষ্ট, সুস্বাদু,

এ দেশের মঙ্গল কর।

বহু দিনের পুরাতন তারতবর্ষ!

বহু দিনের ভগদাদর সাহুতি—

বহু দুগের জনসত্ত্ব বহু পথ কেটে বহু মত নিয়ে

যারে এসে শৌঙ্কটে!

তারা হারায় নি, বিশেষ গেছে—

হুকে নেই, নিকটতম হয়েছে।

এই গুহানো গম্বুজ, বহুজন-জননী ভারতমাতার

ঐশ্বর্য্য কিরে আহুত।

যোক মিহোব এই ভ্রাতৃত্বোৎসব,

যোক অবদান এই কলহ স্বপ্নের।

মহাআত্মীর প্রাণের আকৃতি সার্বক হোক,

শান্তি আহুত।

মিলনে বিরোধের পত্নিসমাপ্তি ঘটুক।

সর্ব দুগের শ্রেষ্ঠ মানবের

সাধনা কি ব্যর্থ হবে?

বহু দিনের শোষণ যদি শেষ হ'য়ে থাকে ভগবান্,

এ বেশ তুমি শাসন করো।

অবোধ তোমার জ্বায়ে দণ্ড,

দুচ-করে সেই দণ্ড ধরো। চক্রপাণি!

উজ্জ্বলতার অবদান হোক—

শরভের স্বর্গ-কিরণের মত

সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার কিরণে

এ দেশ প্রোক্ষল হোক।



# সিঁড়ি বতর

শ্রীগোপালদাস চৌধুরী

চপেছি বর্ষদ্বায়ে—স্নেহ গৃহিণী মৃদুনা। ইষ্টলানে  
পূব তিত্ত, গাড়ী ছাড়বার আশ সেনী নেই। আনন্দের  
তিল বেড়া বাতলের টিকেট, পাছে গাড়ী ফেল ক্রি এই  
আশংকার একটু পা চালিয়ে এসে যে কানরাটা স্নেহে  
পেলায় তাতেই উঠে পড়লাম।

হোই একটা কানরা—মাত্র তিনখানা বেঞ্চি। তার  
একখানা সম্পূর্ণ দখল করে বসেছিলেন আধা বয়সী এক  
নাড়োয়াজী বেঠে ও তাঁর দুইটা পত্নী। পরে তিনেডিলান  
শেঠকীর নাম বেথাবটার খটখটিয়া, বাড়ী ভরপুর। বাকী  
দুখানা বেঞ্চেতে বসেছিলেন আমরা বাঙ্গালী স্ত্রী-পুরুষে না  
দশজন আর খটখটিয়াও একজন নন্দী, আকাংখে তাৎক্ষণিক  
ভরপুরের 'হিস হেভিনেন' বলা যেতে পারে। দুই পাশের  
বাকী শুধু বটখটিয়ারা, আর সবাই ছিল নিকটের বাড়ী।  
কেউ চলেছেন বিহিঝাব, কেউ মধুপুর আর কেউ সেওবর।  
কানরায় মোটবারেই পরিমাণও নেহাৎ দক্ষ ছিল না।  
কাছেই বাজীরের বেশ একটু ঘেঁষাঘেঁষি করেই বসতে  
হতেছিল।

গাড়ী কাটার কাটার তিক সবরেই ছাড়লো, কিন্তু বিশ  
পচিশ গজ দীর্ঘে দীর্ঘে গিয়ে সেই সঠক এক্সপ্রেস ট্রেন  
হঠাৎ অচল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। কোন স্নাক্সব্রেস্টে  
ঘটেছে বনে করে সকলেই উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়লাম; কিন্তু  
তার কোন লক্ষণ না দেখে আবার নিশ্চিত হয়ে মালপত্র  
গোছাচ্ছি, এমন সময়ে স্নাক্সব্রেস্টে বটাতে শব্দ শোনা গেল,  
জানাল দিয়ে বাণ্য গলিয়ে একটু সুঁকে সেখান, একজন

গোকরাধারী স্বামীজি সিগারেট সুঁকতে সুঁকতে খড়নের  
শব্দে স্নাক্সব্রেস্টে সুবরিও করে আনন্দের কানরার দিকেই  
এগিয়ে আসছেন। তাঁর একমুঠে সদা কাঁকড়া আঁকড়া  
চুল সিগারেটের উজ্জ্বল ধোঁয়ায় স্নেহ পাশে দিয়ে ছাওয়ায়  
উজ্জ্বল।

কাহার সঙ্গে ছাড়ার মত গোকরাধারীর কিছু কিছু এক-  
ঝোড়া স্ত্রী পুরুষ ছুটে ছুটে আসছিলেন। এঁদের ভিত্তি  
কি ট্রেনটাকে ধবকে পাড়তে হল! বলা বাহুল্য ট্রেনের  
হঠাৎ গতিবোধের কারণ শুধু অজানা নয়, একটু রহস্য-  
জনকও বটে। কথায় বলে হাকিন ফেরে ত হতুন ফেরে  
। সেই বকম হোকই দেখা যায় গাড়ী ফেল ক'রে নিয়ন্ত্রণ  
হয়ে বহি আরোহী ফেরে কিন্তু চলমান ট্রেন আর  
ফেরে না।

নবাবগত বাজীরা ট্রেনে এসে উঠলেন—এং উঠলেন  
আমাদেরই কানরায়; গোকরাধারীর মুখে পান, ট্যাকে  
শিরাশালাই আর হাতে একটি সিগারেটের স্টান। সতী  
তত্ত্বলোকটিও নিঃশব্দ ছিলেন না—একহাতে গোকরা  
হালের একটি কোলা, অপর হাতে পিতলের বেশ বড় একটি  
টিকিনক্যারিয়ার; আর মহিলাটি বহন করছিলেন এক গা  
গহনা, একখানা পাখা, আর আরব্যোপস্তাসের 'অক'  
পারীর ডিমের আকাংখে একটি ডিম—নিঃসন্দেহে স্বর্গ-  
পানের গুণাধ। মহিলাটির পাশে বাকী চুল, জমকালো  
শাড়ী, আদ্যাক একশো ভরির সোনাধানা আর পকাশ ভরির  
রুপার পানধান দেখে বনেই হয়নি—ইনি তত্ত্বলোকটির

সহস্মিনী। দুপটা পরে ভেঙেছিল। স্বামীজিকে কামরায় প্রবেশ করতে বোধেই রেখাবান ‘আইরে নহাণাকী’ বলে হিক হেভিনমকে ইঙ্গিত করতেই সে নহাণাকীকে নিজের সিংহাসন ছেড়ে দিল। স্বামীজি আরামে আসন-শিডি নিয়ে বসলেন। রক্তমাংস স্নানাগার বশত আমরাই নাচের ভগ্নের কাছাকাছিই ‘ন যমো ন তমো’ হয়ে গাড়ি বইলেন, এদিকে আবার একটি স্ত্রী মাথার হোল্ডলের দুকুটে পরে কামরায় ছুঁড়ে পড়িয়ে তার স্বভাবতঃ পকম বোঝা সুরকে শব্দে চড়িয়ে আরোহী সজ্জকে সঙ্গিত করে তুলছিল।

মহিলাটির ভোগ্যক্তি দেখে স্বজাতির সম্মান সহজে সবার চেতন পরামর্শ সহস্মিনী দুপটা দেবী স্ত্রীকে নিষাদে চ্যান-পলাকে খানেক ভুবিয়ে পানাকে উপলক্ষ্য করে একটা কঁাতাল কতার দিবে বলে উঠলেন—বলি ঠাণ্ডা, ভুবি কেমন লাগা শুকর বোক বলত ? মহিলাটি ঠাণ্ডে গাড়ির আর ভুবি কিনা নবাব পুতুনের মত বেশ বলে ধরে। এমন বোঝাকেনে নাহুণ ত বেহিনি ! ওঠ, বিদিকে বলতে যাও। বহুন, পিবি।—

দুহুটে কামরায় সকলের দৃষ্টি মৃত্যু-মাগনেই আকর্ষণ করলে। আর এই সুযোগে সকলের অলক্ষ্যে বেশ প্রস্তুতিত ভাবে নহাণুগের নাইট এরাউন্ডের মত আমি উঠে বাতলাঘা, ‘দিবি’ তিলার্ক বেরী না করে আনার ত্যক্তাসন অবিকার করে বলে পড়লেন। গার্ডনাহেবের হাশীশ শোনা গেল, গাড়ী আবার আভেনোড়া ভেঙে চনতে নুক করল। আমাতে আর হোল্ডলের মালিকে মিলে সোঁতকে টেনে টুনে গাড়ীতে তুললাম। স্ত্রীটা—একটা সিকি পেয়েও গভগব করতে কল্প করল না। আর বা স্বভাব !

গাড়ী চলতেই বুদ্ধা উঠে এসে তার ‘দিবি’র পাশে কায়ের হলেন আর দিবিও অর্ধা-পানের সরাব্রত মূলে বেশ করে ভালাপ ঘমিয়ে তুললেন। এই অন্ন সময়ের মধ্যেই তারা যেন লতাকায়ের সাহোদর হয়ে পড়লেন—যেন কত কালের আলাপী, কতকালের অরহক বন্ধু। আশ্চর্য্য কথা এই ক্রান্তি। এরা আপনজনকে পর করতে যেমন পারে, তেমনি পরকেও আপন করতে জানে। ক্রীকৃতি প্রলয়কবী কিনা জাদি না, তবে ক্রীকৃতি যিহা যে অষ্টম-খটন-পটীস্নী এটা প্রত্যক্ষ দেখলাম।

গাড়ী বর্ড লাইন হয়ে চলছে। রেখাবান স্বামীজি সঙ্গে ইতিমধ্যেই বেশ দহরম-দহরম করে ফেলছেন; হুঁকানেই শেখার মার্কেট আর সোনা চাঁদির ভাণ্ড নিয়ে যেতে উঠেছেন। স্বামীজি এটি মধ্যে হুঁপতা সিগারেটের অ’মদাং আর তনাল কাঠি আর উজল পান নিশেধে চর্চণ করে ফেলছেন। শুক্লমতী ‘দিবি’ ঘন ঘন পানার বাতাল করছেন আর পান অর্ধা বিস্তরণ করছিলেন এবং স্বামীজিকে বাহংবার খাচাই করছিলেন। ‘দে, বেটি দে, না দিবে ত ছাড়বিনে’—বলে বাবা ভক্তের দান গ্রহণ করছিলেন।

পংম্পর-বিক্রম-স্বামী পণ্য ও পুণ্য ব্যবসায়ীর এই অশোভন আলাপ আলোচনার বিরক্ত হয়ে হোল্ডলের মালিকের সঙ্গে আসাপ জুড়ে মিগার। ইনি স্বামীজির একজন ভক্ত; পোষাকে-আবাসকেও তাঁরই খাটি লাগবে। পরণে কাছা কোঁচা ছীন পেকড়া মুটি, চরণে বিভাসাগরী চটা, মাথার পো’টেক হাত লম্বা টিকি আর মুখে এক ছোড়া সাদা পোঁক ও এক ইটা-লম্বা শম্ব ববল বাড়ি। দেহটি ক্লশ হলও হেঙেরই মত গুচ ও সরল; বরণ পক্ষা পক্ষা হব—নাম অতুলানন্দ পাল। সার্বক তাঁর এই নামটি। ক্রপে পোষাকে ব্যবহারে তিনি অতুল, গুরুপেয়ার আদর্শে তিনি ভরপুর আর গুরুকে পালন করাই তাঁর যেন ধর্ম !

পাল মহাপ্রয়ের অষ্টম-সমুদ্র মহন করে যে রক্ত নিচয় পাওয়া গেল তার ন্যেকপ ভালিকা এই—যৌবনে রক্তপূর মেগার রাগেটি কুলের গ্রহান শিক্ষক ছিলেন; বয়ঃসংস্র আগে স্বামীজির দর্শনলাভ করেন পক্ষাযক—ইষ্টমায়ের উপর। মাঝ নদী ঘিরে ইষ্টমায় চলছিল হঠাৎ স্বামীজি এসে উঠলেন বড়ন পায়ে নদী বেঁটে। পাল মহাপ্রয়কে দেখেই বললেন—কক কক করে পাগল হয়েচি, কিরীটেবরে বা দর্শন পামি। কিরীটেবরেই পাল মহাপ্রয়কে দীক্ষা যেন স্বামীজি। স্বামীজি সাক্ষাৎ ঐকত, অশৌকিক তাঁর কবতা, অগাধ তাঁর পাণ্ডিত্য ! রান মোল আর কুলনের সময় ব্রহ্মমণীয়া কিরীটেবরে আসেন। সে সময় ভাগ্যান্ন ভক্তেরা স্বামীজির সাধন বহিরে নুসর ধনি,



দুর্ভাগ্যবশত, মধ্য-কোবিলের ডাক শুনে পান আর হির  
কুশলা ও আনীর-কুশনের হুড়াহুড়ি বেধে ছুট হুয়ে বান।  
পাল মহাপ্রব্রের বিরতি শুনে মহিলাদের মুখে বিষম,  
বুধদের চোখে কৌতুক আর আবার কুৎসে অঙ্গে উঠল  
শঙ্কর।

স্বামীজি সম্মুখে আরো কিছু সম্বন্ধে শোনবার  
আশায় পাল মহাপ্রব্রকে জিজ্ঞাসা করলেন—স্বামীজি  
কোথার চলেছেন?

—‘প্রান্তরে’। পাল মহাপ্রব্রের লক্ষণ উত্তর।

—অস্ট্রিয়া কোথায়?

—অস্ট্রিয়ায় কিরীটেশ্বর।

নানটি কানেতে পারি নি?

সিদ্ধাবা খ্রীষ্টান্যগননক বিভাবারিবি স্বামী  
মহারাজ।

বিভাবারিবি। ইনি কি খুব পণ্ডিত?

বলেন কি মশাই, এর মত নরুপার বিদ্বান আর  
কে আছেন? আগম, নিগম, মর্শন, পুরাণ, জ্যোতিষ ও  
বৈদিক শাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য বেধে কানী, কাকী, স্রাবিড়  
ও উৎকলের শাস্ত্রাচার্য্যণ স্বামীজিকে বিভাবারিবি উপাধি  
দিয়েছেন।

ইনি কি বাঙ্গালী?

ইনি যে কি তা বলা শক্ত। তবে বাঙ্গালী ন’ন।

বেশ ত বাঙ্গলা বলছেন?

বাঙ্গলা কি বলছেন? ইংরাজী, ফরাসী, আর্মেনী,  
ডেনেল, তামিল, হিব্রী, সিন্ধী, মারাত্তী, উড়িয়া, পুজ,  
ওকুয়া—সব ভাষাই অনর্গল বলতে পারেন।

এই উরট উত্তরে একটু উল্লস না হয়ে পারলাম না।  
লোকটা বড় পাগল নয় ত? বাচাই করবার বতসবে  
আবার জিজ্ঞাসা করলাম—

শিবোরা বুকি সবই বাঙ্গালী?

না, বহুভাষী।

শিষ্যসংখ্যা কত?

অসংখ্য।

নাঃ, লোকটা নেহাতই পাগল। পাল মহাপ্রব্রের  
সহিত আলোশে ইতফা দিয়ে স্বামীজির দিকে ছু

কিরাস্তেই বেলায় তিনি সিগারেট টানছেন আর খট-  
খটায় হাতখানা নিজের হাতের উপর রেখে নিব্বি  
মনে ভাগ্যগণনা করছেন। কি বলেন গুনবার আস্তে  
খটখটায়-গুহুগুহু এক হাত লম্বা হোমটাটি ছ’হাতে উঁচু  
করে স্বামীজির দিকে নতুন নতুন চেয়ে আছেন। রেখাব-  
টাদের হাতখানা ছেড়ে দিয়ে স্বামীজি ‘দিদি’র দিকে  
চাইতেই অনর্পান হাজির। স্বামীজি একসঙ্গে গোটাচারি  
সম্বরী পান মুখে পুড়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে নীরবে  
সোবার কুণ্ডলী স্তম্ভিত করত লাগলেন।

এবল উৎকর্ষের সুরে রেখাবটায় জিজ্ঞাসা করলেন—

কি বলেন, মহারাজজী?

মহারাজজী শ্রিত মুখে বললেন—বেখলায়, তোমার  
হুটি খুব প্রবল বাদনা, পুজ ও অর্বলাতের; কিন্তু উত্তর  
বানের বেখলাই বিঘন বন্ধ।

হতাশভাবে রেখাবটায়—তা হলে কি আমার অর্ব  
আর পুজ লাভ হবে না?

কে বললে হবে না। বক্র পুণিশের মত বক্র গ্রহও  
খুব পেলেই সোখা হয়, শুভ হয়।

আমি আর চুপ করে থাকতে পারলাম না।  
স্বামীজিকে জিজ্ঞাসা করলাম আপনি কি বলতে চান  
বেখতারি খুব বান?

আমার প্রশ্ন শুনে ‘দিদি’ ও পাল মহাপ্রব্রের মুখ-চোখ  
ও রাগে রাঙা অথ! স্বামীজির কথার উপর কথা।  
এত বড় আশঙ্কা। মনের ভাব বেশ অশ্রুপট্টা  
এইরূপ। স্বামীজি গভীর অঙ্গের দ্বার। বাইরে কোন  
রূপ-বিরাগ নেই। আমার দিকে এগরমুখে চেয়ে উত্তর  
লিলেন—খান বই কি। বেখরোয়, গ্রহযোজ্য শুভুতি  
নৈবদ্যোগ্রাহ্যের শাস্তির অর্জই না শাস্ত্রকারগণ যোগ-বজ  
পাতি-বজায়নের ব্যবস্থা দিয়েছেন। বাহুব খুলি হয়  
টাকা-পরমা পেলে, আর বেখতারি খুলি হন মূল-চন্দন  
পেলে। কার্তিকঃ হুইই খুব।

রেখাবটায় বাবু—গ্রীক বলছেন মহারাজজী, খুব  
পেলে বড় সাহেবশ্রিত খুব হয়! আমি বললাম—বেখতারি  
শ্রিতির অর্থ পূজা-অর্চনাকে খুব বলা চলে না।

বুদ্ধতার কানের কাছে ‘দিদি’ খুব দিয়ে গড় পড় করে।

কি যে বললেন, গাড়ীর ঘর্ষের শব্দে কিছুই শোনা গেল না। হয় ত আত্মাই বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ পোষণ করলেন। অকস্মাৎ নিঃশব্দে অশ্রুনির বত তেজে পড়লেন দুহলা—বাঘো! বলছি, নিজে যেমন কালাপাহাড়ি সম্ভাইকেও তাই মনে কর। পুণ্ডা-মর্জা। ঠাকুর-দেবতার কি জানো তুমি?—ঠাকুর-দেবতার কথাই তের ঠেনে 'বিদি' জুড় করলেন বিহিবুধে—বিহিবু ঘরের ছেলেরই কি কালাপাহাড়ি চঃ! ঠাকুর-দেবতার সঙ্গে যে সমীহ করে কথা কইতে হয় এও কি বলে দিতে হয়! বাবা কি যে সে মনিত্ব! বাহুবের বেহে লক্ষ্যং ভগবান। গাড়ীটা ত ছেড়েই দিয়েছিল—বাঘা বাহুবের কড়ে আঙুলটা তুলে ধানিয়েছিলেন বলেই না উঠতে পারলাম। বারীজি—ও সব গুহ কথা এঁদের কাছে কাল করছো কেন রাধারানি! এরা বুদ্ধিবাহী—ভক্তের মত বিশ্বাসের ঘোরে ভগবানকে বীকার করা এঁদের স্বভাববিরুদ্ধ। এরা চান তাঁর লক্ষ্যং ধর্মন, প্রত্যক্ষ প্রমাণ। ভক্তের চক্ষু যে ভগবান, বুদ্ধিবাহীর কাছে সেই হয় শরতান। নাও নিকি রাধারানি! পেঁটা কয়েক পান আর এক চিনট ভর্না—অলৌই রাধারানির মিকে হাত বাড়ালেন। রাধারানি পান-ভর্না নিতে দিতে—কেন বলব না? এ ভোে আর পোনা কথা নয়, সকলেই ত নিজের চোখে দেখেছে। পুস্তক না দেখি কে পারে অতুল নেড়ে চলন্ত গাড়ী ধামিয়ে দিতে।

স্বাভিতি টিনের শের সিগারেটটা। বড়িয়ে বাশি টিনটা। আর ব্যস্তিত দিঘাশালাইএর বকলটাকে আনালার বাইরে ছুঁড়ে দিলেন। পাল মহাপর পূর্ণব্যক্ত বলির তেজের থেকে একটা আনিকোয়া সিগারেটের টিন আর এক বাকল দিঘাশালাই বাবার হাতে দিলেন। বারীজি এক হুপ বেঁটা ছেড়ে বললেন—রাধারানি, ও তোমার বেয়েলি জিব। বদতে চাইলে কি বলতে পারবে তোমার এই পাপল স্লেহের ছ শ'বছরের স্বীবনের প্রত্যেকটি মুঁটিনাটি।

দুহলা বিশ্বদ-বিশ্বাসিত-পশুপশাপনয়নে ই। করে 'বাঘা'র প্রত্যেকটি কথা উদ্বল করছিলেন। বাঘার বহল দু শ'বছর পেরিয়ে গেছে তখন তক্তিতে গলে পড়লেন।

বাঘাকে হাতপাখার বাতাস করতে করতে 'বিদি'—তা না! পারি, দু দশটা ত বলতে পারব। বাহুবের মধ্যে শ'কে শ'ই ত আর কালাপাহাড়ি হয় না। বাবার জীবনকথা তরেন কোটিকে গুটীও যদি তক্ত হয়, বিশ্বাসী হয়, সেও ত কম ভাগির কথা নয়।

বাঘা বুধে একটু হাসির আনন্দ টেনে—না! রাধারানি, তুমি বাঙ্গালীকে ঠিক চেয়ে না। অগন্তের সেহা নাভিক তারা। তাদের কোটিকে গুটীও তক্ত হয় না; তারা চিরদিনই দেববিধে প্রচাটীন, শায়ে অবিশ্বাসী।

একটু তক্তকে গিতে রাধারানি—সে কি বাবা। কত লাখে লাখে বাঙ্গালী ত আপনাকে তক্ত করে, আত্মনে আসে।

স্বাভিতি বললেন—হ্যাঁ, আসে গতি। কিন্তু তারা তক্ত-বিশ্বাসের টানে আসে না। তারা আসে সত্যের যোগ সারাতে আর কিলে স্বাভাভাতি লাখেপতি হবে তার সত্যনে। তাদের উদ্বেগ সিদ্ধ না হ'লেই শাধু-গত ছোচ্ছো, বাটপাড় আরো কত কি? পাল মহাপর স্তম্ভনে—সেবার যে কুকক্ষেত্রে দ্বিগ্নগ্রহণের দিন লাখে আখো পোককে এক কালি চাব দেহিয়েছিলেন, কয়েছিল কেউ অবিশ্বাস।

স্বাভিতি—কেন করবে? তারা ত বাঙ্গালী ছিল না! তারা ছিল পশ্বিনে—তুলসীদাসের দেশের লোক, সকলেই তক্ত, সকলেই ঈশ্বর বিশ্বাসী।

রাধারানি—কেন হরিধারেরও ত লাখে লাখে বাঙ্গালী, বিদ্বানবী, পাঠাবীর স্রুধে অথোধ্যা মহা-রাহের মান-বাধোনে উঠোনে নিচুর তক্তনে আঁটি রেখে মন বিনিটে গাছ ভগ্নিয়ে দবাইকে পাক। লিচু খাইয়ে-ছিলেন। ঠেক, সে কেনতা ত বাঙ্গালীরা অবিশ্বাস করেনি।

আবার নাভিকা-বুদ্ধিতে লজ্জিত হয়ে 'বিদি'র হাত থেকে পাখাটা নিয়ে দুহলা বাঘাকে বাতাস দিতে দিতে—এই নাভিক বনিত্তির কথাই জ্ঞাপ করবেন না, বাবা। ঠর স্বভাবই ঐ রকম—ঠাকুর-দেবতা কিছুই বিশেষ টিপেণ করেন না। শাধু-রাব আদেপে—তিনি লক্ষ্যং ছি দুহলা,

—যে যার থাকতে উঠে একটু ভপ-ভপ করি বলে  
ওর কাছে কি কম টিটকারীটা সহ্যে হয় আমাকে !

স্বামীজি ব্রহ্মলোক হাকসকুলে সরসার মত তক্তিমতী  
বেশে প্রসন্নভাবে বললেন—তোমারের মত তক্তিমতী  
মায়ের মল বেশে আছেন কলেই এই লাখে লাখে  
বহুতের হিম্মত লনাতন গ্রন্থ আঙু ঠিকে আছে।  
পুত্ৰময়ের কথা শুনে দাঁত নাও। বর্ণের বেসেহীয়া বা  
বিশেষ করেন ওরা তাও হেসে উড়িয়ে দেন। শোন  
বা শুবে একটা অস্তি গোপন কথা। কেবল বেশে যখন  
ছিলাম সে সময় নিত্য এক কুড়ি নারকোল বেতান।  
আজ নারকোল বেতানটি তখনই পড়ে থাকতো সেখে  
তঁকরা প্রসাদের লোকে খেতে গিয়ে তেকে সেখতো  
তঁোতঁো—এতটুকুও খাঁস নেই জেতরে। ঠিক যেন  
হাতী-খাওয়া করেথেন।

‘নির্দি’ সহ্যে—আমরা কিং বাবাকে অমন করে  
নারকোল খেতে দেখিনি।

স্বামীজি—যেথাবে কি করে! মশতুকা মোটাকসপ  
যে তার লাললেন। একদিন! সন্ধ্যের ঝড়ির পাশে  
নারকোল-বনে বসে আছি, এমন সময় বহু গগেন-  
জননী দেখা দিয়ে বললেন—ঠাকুরপো, তুঁকি নারকোল  
খাওয়ার ছিবি! হি, অমন করে আর খেও না।  
তোমার নারকোল-খাওয়া সেখি আমার গগেনত বামন  
হয়েছে সেও তার ফাকার মত করে নারকোল খাবে।  
জাকো দিকি যে-ঝাড়া ছেলের আবদার! খেল থাকিস  
খা, নারকোল আমার কেন? অনটুকু কচি ছেলে ঝিচেবে,  
অমন করে নারকোল খেলে! না জাই ঠাকুরপো,  
পাপলক নাকের ভুঁই দেখিয়ে যা, নারকোল খাওয়া  
হেতে বাও। সে আঙ হুশো বহু আশের কথা, সেই  
থেকে নারকোল খাওয়া হেজেচি।

আমি চোখে কোঁচকের অমন লাসিরে বললাম—  
আমাদের মত তেও কুড়িয়ে খেলেই ত’ পারেন।

স্বামীজি একটু বহিম হাসির সঙ্গে—যেথলে ত’  
রাগরাণী পুত্ৰের মন! বা পার্শ্বতী বিশেষ করেন,  
তোমারী বিশেষ করো, এঁরা তা’ করতে রাজী নন। যোষ  
এঁদের মন—এ-সেদের মাটির। যা’ ইংরেজ, আমেরিকান,

জাপানীরা বিশেষ করেন, বালালী তা’ আনাচে নয় বনে  
করে হেসে উড়িয়ে দেন।

পাল মহাশয় স্বামীদের উপর চোখ বুজিয়ে নিয়ে  
মায়ার দিকে তাকিয়ে একটু চোখা পলার—আলনার  
কুশাপ্রার্থী রনসকটে বিপর চাচ্ছিলসাহেবের ঘটনাটাও  
এঁরা হয় ত’ অবিশ্বাস করে কুড়ি ধরে উড়িয়ে দেন।

বিশেষ করে আমার দিকে কুড়ি দৃষ্টি হেনে স্বামীজি  
আমার মূক করলেন—ভাল কথা মনে পাড়িয়ে দিলে,  
কতুল। শুধুম সকলে সাহেবদের গুণ—বিশ্বাসের কথা।  
এঁরা বালালীর মত অপরাধ একত্রে গোয়ার মন, গুণের  
আদর জানেন। চৈতন্য গড়লে ভারতীয় গুণীদেরও  
খোসাবুদি করে কাজ দিল করেন। এই চাচ্ছিলের  
কথাই হল। বু-উ-ব হুঁসিয়ার লোক কি না। পুথাগো  
পত্রের কাইল খেঁটে ঠিক ঠিক ধর করেছিল যে, ক্লাইভ  
আমার সাহায্য নিয়েই আর্কট আর পলাশীর যুদ্ধ জয়  
করে। জাপানীরা কোহিমার ঝাটি গেয়েছে, মিজাপকের  
অবস্থা অনেকটা ‘কি হয় কি হয় হুঁদে তর কি পরাধর’  
ইংরাজ ও আমেরিকান-মূল তহেই আছেন। চাচ্ছিল  
শোভাল এছাড়াগেনে ক্রিপসকে পাঠিয়ে দিলেন আমার  
কাছে। মিজাপকের এই কুড়িনে যাযা হুঁদে বেতে হ’ল  
ক্রিপসের সঙ্গে মশিগুহে। বত এবেতোমো-ছিল সব-  
তুণিকেই ময়দায়া হুঁদকিত করলার। জাপানীদের  
সাধা হুঁদিনি তার একটিকেও ধারেল করতে। মশিগুহের  
রাজবাড়ীর প্রশস্ত করে ক্রিপস-ওরাজেলের তত্বাবধানে  
জাপানিহুদন বজ করলাম উদয়ন্ত অবধি। যজ্ঞ পূর্ণহুতি  
বিলাস—সক্রে সক্রে হুঁদাও ভুব দিলেন—”

আমি জোর করে ধরে রাখা মৌনতা হাতিয়ে ফেল-  
লাম। একটু স্নেহের মূহুরে বললাম—আর বজগু হেতে  
চক্ৰকুঁচ বিকু চার হাতে চাহনী লক্ষ্যাতী যোযা নিয়ে  
বোঁধ হয় মর্শ দিলেন।

স্বামীজি আমার মেথটা ঘেন বুঝিলেন না এমন একটা  
ভাষ-বেথিরে চক্ৰকুঁচাধনি নটের মত হটাৎ হুঁদেচোখে  
অসুঁক বিশেষের তান দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—তাই ত’  
ম’পার, এ-সব গোপন খবর আপনি জানলেন কি করে?  
নিচুই আপনি জাপানীদের গুপচর—ইংরেজের হুঁদন।

সতয়ে বুদ্ধি—না বাবা, উনি গুপ্তচর নন, গুপ্ত—চোরী  
জেন্সের মানেভার।

বাবীজি হো হো করে উঠে যেসে—ঠিকই হয়েচে,  
সেই ভজ্জেই যতদূর গুপ্ত দূর রাখেন। পরে কি হ'ল,  
ভাও গুহন নকলে। বোবা চারটি ক্রিপস-গুহ্যভেদকে  
দিতে যেতেই তাঁরা ত' তরে দৌড় দিলেন—পড়ি ত'  
মরি। আমি কি করি! তখনই বাবা হয়ে উঠে, বাহায়ে  
আমেরিকায় গিয়ে চারটি বোমাই টুহান লাহেবকে  
দিলাম। এই বছরের কলেই মিত্রপক্ষের ভর হ'ব বুড়ে।  
সাত্তাত্তোর এই মহোৎসবের জন্ত চাফিল আমাকে  
'Saviour Temporal of the Empire and Americas'  
'অর্থাৎ সাম্রাজ্য ও উত্তর আমেরিকার মানবজ্ঞানকর্তা'  
উপাধি দিতে চেয়েছিলেন; কিন্তু 'উপাধি ব্যাধিরে ত'  
আপসা ক'রে উঠা বুঝার পথিত প্রত্যাত্যান করি।

সাম্রাজ্যী—সেবাবও ত' বাবা কান্দিতে ইত্থ-বজ  
করেছিলেন। বজ শেষ হুতে না হুতেই মেখে হেরে  
কেলে আকাশ—জিন দিন ভিন সাক্তির সে কী তুটি!  
সহরে শাঁতার ভল।

'বাবা' প্রলম্ববুখে—বেটার সব মনে আছে সেব'ছি।

রোবাবটাসের কানের কাছে ঘোমট-ঢাকা মুখখানি  
কি যেম ভণ ভণ করিল। রোবাবটাস ঘোড়হাতে—  
বাহারাকী, বজ করলে অর্ধ ও পূত্র লাভ হবে?

বাবীজি—সাত্তাত্তোর করে ললে না হবে কেন?

রোবাবটাস—কলিকালে কি বছরের ফল পাওয়া যায়?

বাবীজি—যায় বই কি? তবে বজ বিবি-বিবানে  
বিত্ত হুয়ে সাত্তাত্তোর হুওয়া চাই। এই ত' সেদিন  
হাফা শিব-প্রলাপ গর্বের পুরোষ্ট-বজের জন্ত আমায়ই ভাক  
পড়েছিল। বজবিবি মেখবার ভজ্জে গোভিলের গুহুগুহুখানি  
পড়ে ত' আবার চুখিহি। হুয়ে কুল, টিকা কুল, ব'ব কুল—  
কুলের হুড়াহুড়ি। হুহাদি সংগেবন করে বজ করলাম,  
কল হাতে হাতে পাওয়া গেল। চক্কাহানি হাতে ব্রহ্ম  
হর্শন দিলেন। ১৮ খেয়ে হ'ল মাস মশ দিন পরে রানীহা  
সেবদ্বারও পূত্র লাভ করলেন।

রোবাবটাস যাবাবী সোক, হ'সিরাটীর একটুকু জুটী  
নাই। কোন্ বজ কত ব্যর পড়বে তা জেনে দিয়ে বজ-

বজই আগে করা স্থির করলেন এবং ঘোড়হাতে বাহারাক-  
কীকে জিজ্ঞাসা করলেন—বজ-বজ কত তাঁকা পাব?

বাবীজি—মুগদক্ষিণায় নভভণ-হাফার লাখ, লাখে  
কোটি।

রোবাবটাস—কোখায় করবেন বজ?

বাবীজি—অমরভীতের, কিরীটেবহে।

পাল মহাপদ—ঐবানেই ক্রিপস লাহেব বাবার সঙ্গে  
সাক্ষাৎ করেন।

আপাবববক সাহেব, হোঁরাটে গ্রং-এর চপবাবটী  
এক সহযাত্রী বিকিত্র সঙ্গে বললেন—Noneed to  
All boob।—যত বাজে কথা।

পাল মহাপদ চটে চটে বললেন—কোনটা ম'শারের  
কাছে বাজে কথা হ'ল তুনি?

চপবাবটী—লক্ষবাতী বোমা, গুহুগুহু সংগেবন,  
পুরোষ্ট-বজ, বৌদি-ঠাকুরগো-সংবাদ—কোনটা ছেড়ে  
কোনটা বলি?

পাল মহাপদ—আপনারাইংরাজের চর্কিত চর্কণ করেই  
বজ বজ পত্তিত সেজে বসেন, সাত্তাত্তোরের ত্রিঐশান্যও  
ধেবেন না। বেদব্যাসের সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, যবতর ও  
বংশাচরিত—এই পক্ষপক্ষাক্রম আনন্ড-পুণ্যে হব-  
পার্কীতা সংবাদে আগমান-বিত্তি অধ্যায় পড়ে দেখবেন,  
ঠাকুর বা বললেন অন্ধরে অন্ধরে নিলে বাবে।

চপবাবটী—আনন্ড-পুণ্য বলে আবার কোন পুণ্য  
আছে নাকি?

তবেই দেখুন—পাল ম'শার বললেন—সাত্তাত্তোর  
আপনার কত সর্গাণ, গীমাবজ। আর এই কুহু জ্ঞান-  
গরিম নিরে সফরীর বস্ত কর ভর করছেন জ্ঞান-সাগরের  
ভিবিবিলের সঙ্গে—বিবি স্বয়ং গোপাণ্ডববস্ত্র প্রীক।

পাল মহাপদের বাকপাক্ষে কামরারতিবর একটা বিস্ত্রী  
পরিবেশের সৃষ্টি হল। এতক্ষণ বা লোক বাগুয়েই ছিল,  
এখন তা বাহুয়ে পত্তিত হবার যোগাড় হল। বুদ্ধি  
পর্ষায় সাক্ষীর অ'চল কোথায় জড়িয়ে 'হুয়ে মেহি' ভাবে  
ঠেতের। শেষে কি কৌজবারির দারে আসাবী হ'রে  
নাহেহাল করবে আমাকে; এই আশঙ্কার সংকুচ বাকী

জলন্তরককে তৈলফিলা একেপে প্রদানিত করবারট দ্বন্দ্বের  
পাল মহাপ্রভের বিকে তাকিয়ে বললাম—আনন্দ-পূরণের  
কথা বলছেন ? সে ত আমার নিত্যপাঠ্য—কঠর । আমি  
কি ছাই আনতায় যে, আগমানক বিভূতির সেই আগমানক  
আবাসের এই সাক্ষ্যে সিদ্ধবাণী ।

আমার এই জ্বাবকোচিত ভোল্টফেসে (volte face) অর্থাৎ ভিগবাকী বিরে সম্পূর্ণ উল্টো দূর দূরার প্রথমে  
আনেকেরই রাগ হয়েছিল । কিন্তু আমার কেতুক-চকল  
চোখের অর্ধপূর্ণ ইংগিত গেরে তাদের রাগ অল্পাংশে  
পরিণত হয়েছিল ।

বিষের সেবা স্নানরী পারা নগরীর পতনে দিটলারের  
বত না আনক হয়েছিল তার চেয়ে শতগুণ আনন্দ বল  
পাল মহাপ্রভের, আমার এই পরাতত্ব-সুচক মরম হুরে ।

বিভরীয় এসর তকীতে পাল মহাপ্রভের দিটলাস  
করলেন—এখন ত আনলেন । এখন ত আর সম্বোধন নেই  
যে বাবা চান্দর দরঃ শ্রীকৃষ্ণ ।

আমি মাথা চুলকাতে চুলকাতে বললাম—আজ্ঞে,

একটু সম্বোধন—তবুও একটু খেঁকে গেল । জীবনে ত  
শ্রীকৃষ্ণ করনো দেখিনি । তবে সিদ্ধবাণী যে একটি  
অবতার-বিশেষ, এ আমি হাজার বার বীকর করি ।

আমার মত কালাপাহাড়কে সহস্র বিঘনবলে  
পরিণত হতে দেখে বৃদ্ধনার আনন্দের আর সীমা নেই ।  
সে ভাঙাতাড়ি কোমরে জড়ান জাঁচল খুলে দার দাবার  
তাপড় টেনে সভ্য-তব্য হয়ে বসলো ।

দ্বিবি অর্থাৎ সিদ্ধবাণীর বাহ্যাবলি আমাকে লক্ষ্য করে  
টিটনী কাটলেন—এখনটি যে হবে তা আগে থেকেই  
আনতুম । আরো দেখেছি ত—কত কত কালাপাহাড়কে  
বাবার পাঠার পড়ে পারে মাথা ঘুটোতে ! বলে ‘হাতি  
ঘোড়া গেল তল শুভা বলে কত বল ।’

গাড়ী বর্ষমানে এসে গাড়তেই আমি সস্ত্রীক নেমে  
পড়লাম । চন্দ্রাবারী ওস্তাদোক্তি কাণের কাছে কিস  
কিস করে বললেন—মহাপ্রভ ত বেশ একচাল চেলে সরে  
পড়লেন । আমায়ের এই গর্তবিশ্রাণ শেষ কতকণে যে  
জানি ।

## যে গান শরৎ-মনে জাগাল পুলক...

“দখে দেখে ভই বসুল ক’রায়, টাংরে খপনে মডোমীল পেছে তবিরায়” (N 27750) পর প্রকৃতির এই অসীম নীলিমায় নীলিম হুব  
হনে জীবন স্পন্দন জাগিয়ে

“মায় না জানা পবিত্র ভগ্নো ভগ্নো কোথায় একা ?” (N 27739) কোথায় লুপ্ত কবে—কোথায় দেখা হয়েছিল—বহিও আজ তা  
স্বপ্নে নেই, “তবু যে আজ ধানীর গান স্রবঃ-সম্বহরী” নাম ধনের মূল ছুঁতে বেড়ায়—তবে—তবে কেন আজ যেতে চাও ? কেন-  
বেধ “যেহ সনের কাফনা নব-বসুলের সোপান প্রবতিদায়” (N 27751) হাওয়ার হাওয়ার হুজিয়ে পড়ের—আমি তাইই বাহুবীর্য আর  
গানে গানে “আমি নীচের বাড়িয়া বাই, বুড়ারে যেইকু পাই, তাই নিয়ে যোহ স্বপ্ন বসল” (N 27738) দলক ক’বে তুলতে চাই ।

পূর্বমুখ প্রকৃতির দ্যাক্ত আকাজ্ঞা স্বপ্ন অস্তরের নীলিমায় এমন দৃষ্ট হয়ে ওঠে, তখনই বিককির বীণা আপন মনে থেকে ওঠে  
“সু হাওয়ার বেহ খোলা আজ ম’মি ম’মি ছবঃ-নবীর কুল হলে ভাগে লবরী” (N 27737) হুত কবি সেই মধু-নবীর জাবাবেশে  
এর কবনে “আজ মনসের পরাবরে কোন বাহুবীর্য কবঃ-বানন, খোলাক জুহু উঠে-এর পরে ?” (N 27752)

প্রেমের স্বপ্নে বিভার পূর্বমুখ-প্রকৃতির চাওয়া ও পাওয়ার মাঝে আসে দ্ব্যস্তি—আজুল কঠে বেঁধে ওঠে মর-বীণা, “দ্বিনের ভাগে  
মৌর আলার, তকর মাগা পুড়ার বাগার, সেই জানতা কহা বঃ—কহা ক’র প্রকৃতি” (N 27753) আজুল কবনের এই ব্যাভুল  
একপের মধ্যে বেহতার আপিন-পারার মত কবির সত্যী আঙ্গান ভেসে আসে—

“বহু দূরায় দেখনি খলে, অদ্বনি কি কুই আলুবি হ’লে ? তেরে বারে বারে টেলতে হবে, হরতো দূরায় টলবে না ।” (N 27736)  
কবির এই আশানে নিষ্ঠুরতার বিশ্বাসে ভরে ওঠে মন...আপন-তোলা প্রবের ককোর বেগে ওঠে “আমায় ভল্লসো বা তাই মত  
হল চবন পাকে ।” (N 27754)

প্রেমের স্বপ্ন-আবেশে বিভার জাগিতা সহসা বহু টুটে গেল, চোখ ঘেলে সে দেখলো—দার। বিশ্ব বেগে উঠেছে, আপন পর্কে,  
মাগা উঁচু ক’বে গাঁড়িয়ে আর—কি কই ? ভাকত তবু কই ? শিখর রূপায় হঃ-সৌম্য ভায়ত দ্ব্যস্ত তপনবন্ধে জেত  
প্রাণনা কবে—প্রাণ দ্যত—প্রাণ দ্যত । সেই আঙ্গানে—নৃতন সুখ-সুখ উটল, টুলি ভিবি দ্ব্যস্ত ।” (N 27736)

ভাকত-বন্ধি আসনে দ্ব্যস্তী ভিড়ে গেল ত’রে, তার উল্লাস কঠে ভাক কিল—“কে কুজ মাগো যে—আগো যে মাগো মিন্দায়ন ।”  
(P 11883) তিনবটা তার বিঘর-নিশান পদকে আকাশের বৃকে উজিয়ে সেই দ্ব্যস্ত ভাকত বিশ্ববাসীকে আশান দিল ।

“হুত জাউ দার পুখিরায়

(P 11883) হুত কবিয়ে লাম ।”

# ছায়াচিত্রের নক্সা

ঐহরিশদ দে

আবারের ফেরী ছায়াচিত্র নিয়ে সাহিত্যিক, সমালোচক বহু বার বহু বিখ্যেত সমালোচনা করেছেন— উন্নতি এবং অবনতির বিধি কারনের আলোচনাও তাঁরা করেছেন—সমস্তা যেখানে প্রবল হয়ে গড়িয়েছে সেখানেই তাঁরা সম্মানবাহিনীর ইমিত দিয়েছেন। এইসব অতীতের আলোচনার কলে ভেতন বিশেষ কিছু পরিবর্তন না হ'লেও কিছুটা বে ইহা নি একথা বলা চলে না। কিন্তু বেশ যে-ভাবে ক্রত পরিবর্তনের দিকে এগিয়ে চলেছে সে-তুলনার এ-শির যে বহুত পিঠিতে আছে একথা আজ অতিমত সর্বকথ্যও স্বীকার করবেন। পিঠিতে থাকার মূলমত কার্য হচ্ছে অবনতির লক্ষণ। এই অবনতির সঙ্গে সঙ্গে সমাজে যে দৃষ্টি আবহাওয়ার সৃষ্টি হচ্ছে তা প্রত্যক্ষ আবারের চেতনের সাধনে ভেলে উঠছে। সিনেমা-শির জুজ করার বস্তু নয়। ইহার সঠিত সমাজের একটা নিগূঢ় লক্ষণ জড়িত আছে। কার্য, সমাজ যেখানে তেজ পড়েছে—জাতি যেখানে বিব্রত হ'য়ে ধ্বংসের পথে যেতে বসেছে, সিনেমা-শিরই সেখানে আলোক-যন্ত্রিক হাতে করে এগিয়ে এসেছে নতুন পথের লক্ষণ দিতে। সংস্কৃত, সুসংবদ্ধ করে জাতিকে তুলিয়েছে সাম্য-মৈত্রীর মিলনের গান। সভ্যজগতে—বিশেষ করে স্বাধীন দেশে—এই শিরই সমাজ ও জাতির কৃত্তির অঙ্গবিশেষ। উদান-পত্রের যাত্রা-পত্র ইহারই হাতে। ইচ্ছা করলে এ শির জাতিকে আদর্শরূপে পড়ে তুলতে পারে—আবার জীবন্ত একটা জাতির ধ্বংসের পথও প্রস্তুত করতে পারে। বিশেষরূপে ছায়াচিত্রই একমাত্র শির, যে শির সমকালের মধ্যে একটা আবল পরিবর্তনের দ্বারা আবদ্ধ পারে।

এ তো গেল শিরের অরোজনীর কথা। এবার যোগ্য দাক, কেন এবং কিসের জন্ত এই সিনেমা-শির আজ চরম বিকাশের পথে যাত্রা পাচ্ছে। কোথায় এর মূল ? কিসের অভাব ? যেতন দিনের পর দিন ক্রমাগত অবনতির দিকেই যেতে পাচ্ছে। আবহা হুপিপত্তমের গোড়ায় দিকটায় পর্দা তুলেই পরিচালনার যোগ-জটিল এবং সুপা-পদাঙ্গী সঙ্গী সাহিত্যের অভাবটাই প্রকাশিত:

যেখানে পাই। পরিচালনার যোগ-জটিল দ্বারা হাতে সেই পরিচালককে সম্পূর্ণরূপে দাবী করা চলে না। কার্য, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তাঁকে নির্ভর করতে হয় প্রয়োজকের উগ্র খেয়ালের উপর। বস্তুত: সেইখানেই পরিচালকের স্বাধীন কৃতি এবং নিজস্ব কৃতিত্ব দ্বারা হ'তে পড়ে। দ্বিতীয় অত্যন্তের জন্ত লেখক, পরিচালক এবং প্রযোজক এই তিনজনই দ্বারা: দাবী। প্রযোজক জান তাঁর ব্যবসায়ী কৃতিত্বকে যেমালমাকি সাহিত্য, পরিচালক জান তাঁর নিজস্ব কৃতিত্ব সাহিত্য—দাবী। কিন্তু নির্ভর করে দর্শকের উপর আর কিছুটা নির্ভর করে প্রযোজকের উপর। এদিকে সাহিত্যিক নির্ভর করেন প্রযোজক এবং পরিচালকের হুত মতবাদের উপর। কার্য, বাংলা দেশের অবিকাল সাহিত্যিক দ্বারা: পেরের দ্বারা তাঁদের সাহিত্য সৃষ্টি করতে হয়—একটা তাঁদের নিজস্ব মতবাব এবং কৃতিত্ব বিশদর্শন সেওয়া দ্বারা: কোন উপায়ই থাকে না। এ-হাড়া এঁদের হাতে বহাজন (কিনামুসিয়ার) নারক আর এক ব্যক্তির আর্জিয়ার হটে—তাঁরও একটা খেয়াল আছে—সেটাকেও যেতে নিতে হয়—এই সমস্ত বহু বতের সমষ্টিতে যে গম-সাহিত্য সৃষ্টি হয় তাতে সমাজের এবং জাতির দিকায় মূলে প্রতিনিহিত দাবী: সৃষ্টি হ'তে থাকে। আবার অনেক পরিচালক নিজেই রচনা, সংলাপ নিয়ে নিজেই রূপ দান করেন। মোটকথা সর্বক্ষেত্রে ব্যবসায়ী মনোভাব এবং দাবের মোহ নিয়ে এই সিনেমা জগতায় করে। এই ভাবে সর্বকথ্য স্বাধীনতা এবং স্বাভাবিক কৃতিত্বকে বিশদর্শন দিয়েই আজ সিনেমা-শির চরম অবনতির পথে নেমে চলেছে।

যুদ্ধের পর অনেক অব্যক্তদাবী এবং অজ্ঞাত-মূলশীল পরিচালক মতন। সিনেমা-জগতে আর্জিত হ'য়ে অনেক ছবি তুলেছেন এবং অজ্ঞাপি সে-কাজ থেকে বিরত হ'লেন। ইহার কারণ, এবং কোথা হ'তে এলেন, শির লক্ষ্যে এঁদের কতখানি জ্ঞান আছে—সে-বিষয় আজও বহুসংখ্যক আবারে ঢাকা রয়েছে। দেশের এই অর্থ-

নৈতিক দৃষ্টিতে অকার্যে এই অর্থব্যয়ের কি প্রয়োজন ছিল—আজ সেই কথাই বিশেষ ক’রে চিন্তা করার দিন এলো। যারীন বেশ হ’লে এই অসংখ্যক অপচয়ের জন্য দেশবাসীর কাছে তাঁদের তৈক্ষণ্য দিতেই হ’ত। এ ছাড়া আনাদের বেশে নান্দ-করা যে-সমস্ত পরিচালক আছেন তাঁরা বহুক্ষেত্রে দর্শকদের কলিত্ব অস্বীকার করেন। অনেক বলেন, দেশের লোক তাঁদের বই বুঝতে পারে না, বা বোঝার যতো তৈরী হয় নি, স্ততরাঃ প্রথম শ্রেণীর ছবি বাজারে চালু ক’রে লাভ কি? কিন্তু আমরা তাঁদের এই প্রশ্নের একটিনাড়া উত্তর দিতে চাই যে, যদি তাঁদের অসীম পাণ্ডিত্য দর্শকরা নাই থাকে, তবুও দর্শকরা সহজে গ্রহণ করতে পারে এমন কিছু না হয় তৈরী করুন। ভাল-ও বোঝে না অথচ ভাল প’রবর্তে বা তাঁরা চালু করেন তাও গ্রহণ করে না—কি তাঁরা তৈরী করেন সেই কথাটাই না হয় তাঁরা বনুন। তাঁদের ছবি দেখার পর দর্শকরা পথে-ঘাটে, পার্কে, রাস্তানে ও চায়ের টেবিলে প্রতিনিয়ত বিতর্ক সমালোচনা করে চলেছে। দর্শকরা কি আলোচনা করছেন সেকথা তাঁদের কানে যায় না এমনই কিছ হুণের বিষয় বীরা ভেগে বুকের তান দেখান তাঁদের আগাগোনা সহজ ব্যাপার ত নয়! দর্শকদের সহজে ধারণা তাঁদের পরিবর্তন হওয়া দরকার—বিশেষ ক’রে আজকের যুগে। তবেই দেশের লোক নতুন কিছু শিখতে পারবে, নইলে এর সর্জনশা পরিণাম আরও তরবার আঁকার ধারণ করবে।

এইবার সহকারী পরিচালকদের মধ্যে ডু’ একটা কথা বলতে চাই—সহকারী কথাটা খুব নিকট নয়, এ-সম্পর্কে পৃথিবীর শিল্পক্ষেত্রের দিকে নজর দিলে সহজেই গোলটা নিটে যাবে। যেটা কথা সহকারীরা হচ্ছেন পরিচালকদের এক বাণ নীচে, কিন্তু আদ্যদের সঙ্গে এই সহকারীরা

পরিচালকদের মাঝে থেকে যোগ দর হাজার বাণ কি তারও বেশী নিয়ে পড়ে আছেন। প্রতিক্ষেত্রেই পরিচালকরা কর্তৃত্বশক্তি শো দেখিয়ে এঁদের অস্বা ক’রে রেখেছেন—কোন কিছু দেখবার অযোগ্য দেওয়া তো বুঝের কথা, দেখবার আগ্রহ একাধি গেলে তাঁদের কটা নিয়ে সবটা দেখে যায়, অথচ এঁদের শিক্ষা দিলে প্রতিক্ষেত্রে পরিচালকরা সাহায্য পেতে পারেন। উভয়ের হোদ-অতির মধ্যে একটা সত্যিকারের ভিন্নিবে: অমূল্য হয়। একক শক্তি যত অসামঞ্জস্য হ’ক, সহযোগিতার অভাবে পরিপূর্ণ বিকাশগত কোন দিনও ঘটতে পারে না, বিশেষ ক’রে দিনের-রাতের তো নয়ই।

আজ আনন্ডা হারীন। ছ’শ বছরের পরানীমন্ত্যে শিকল ছিড়ে আজ জাতি আশোকেব সন্ধানে ছুটেছে—এই আলো আলবে শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞানের যথার্থে। শিল্প তাকে দেবে পরিপূর্ণতাপ—সেই পরিপূর্ণতার মাঝে দুর্ভ হ’য়ে বুটে উঠবে শিল্প। পমবই আগটের পূর্বে যে-দিন ছিল সে-দিন আজ আর নেই, আজ স্থাবর-জঙ্গম-কীট-পতঙ্গ, পত-পক্ষী থেকে সমাজ এবং মানবগোষ্ঠী নতুন কিছু চাইছে। পুরাতনের কলকানির খেলা শেষ হ’য়ে গেছে—সাহিত্যিককে তাঁর সাহিত্যের মধ্যে ছুটিয়ে তুলতে হবে সত্যিকারের সাহিত্য। যে সাহিত্যে থাকবে বাহ্যের বাঁচবার সমাধান—ঐক্য, সংহতি এবং সংঘের তরঙ্গীন ইজিত। শিল্পকে তাঁর শিল্পের মধ্যে শোনাতে হবে নব জাগরণের গ্রাণ-বাতাস গান। ব্যবসায়ীর মনোভাবের আবহা সংস্কার ক’রে এগিয়ে আসতে হবে প্রয়োজককে। তবেই এই অস্ট চায়া-শিল্প আবার ভেগে উঠবে—ভেগে উঠবে জাতি, ভেগে উঠবে সমাজ দীর্ঘ শতাব্দীর পরিসম্রাধ—হ’তে—নব অকণ আভার নব কলেবরে দম্বরে বলবে—বলেনবাস্তব।



## ভারতমাতার প্রণাম

যানীন্দ্রেজ্ঞাৎতদুপশমদে বকীবাবরুদা  
 যুক্তা সাত বহুতকবিরৈতপিতা ভারতমাতাঃ ।  
 স্বাধীনঃ তাতা নবরবিকিঃ কুত্ববঃস্বতপাঃ  
 বদে দেবীঃ অর-অর-রতৈবধাতরঃ বীরবন্দ্যাদ্ ॥

পতাকা প্রণাম

বীরেন্দ্র প্রণতি

যা ধন্তে মহাবানীনাং তত্বানাং রেখাদিতঃ  
 বকপি বৈকবঃ চক্রে পরমঃ ধাম তেজসাদ্ ।  
 যা চ ত্রৈলোক্যভেদেন বর্ণিতমুপেহী  
 তাহতীয়াঃ অগচ্চাঃ পতাকাঃ তাতা নমাবাহু ॥

অহুতু অহুতু নেতা বীরসিংহঃ হুতাপঃ  
 অহুতু অহুতু গাভী বীতহিংসো মহাত্মা ।  
 অহুতু হুতলমাতো যেন বেনাসি হুতু  
 অহুতু বিলমপীঠে ভারতে তে পতাকা ॥

### অম্রবাদ

১। যে ভারতলক্ষী বহুকাল কংস-কারাগারে  
 বেবকীঃ মত মেজের প্রহায়ে অর্জুহিতা কীণকার্য হইয়া  
 অবরুদ্ধ ছিলেন; তদীয় সম্মানগণ নিজপাত্ররুবিং দানে  
 তাঁহার তুষ্টি বিধান করিয়া তাঁহাকে আজ বিমুক্ত  
 করিয়াছেন। তিনি স্বাধীন, মহাবীত হরিব ন্যায়  
 বশ্রতঃ সন্মুখা। ভারতের আরাধ্য “কুত্ববঃ”  
 রূপিনী বীরবন্দ্য। মাতাকে অনন্ত অর-শব্দ সহকারে বন্দনা  
 করি।

২। যিনি মহাদি চতুর্জিৎপতি তবের প্রতীক-চিহ্ন-  
 স্বরূপ চতুর্জিৎপতি রেখার বিকৃতিত সকল তেজের  
 পরমাত্ম বৈকল্যের চক্রে চবরে বাধণ করিয়াছেন, পরম  
 গুরুত্বের সংযোগবশে যিনি সত্য, রজঃ, তমঃ তেবে  
 ভগবত্বের দ্বারা জীবর্ষে আকারিত হইয়া বিশ্বতপা  
 হইয়াছেন, সেই প্রকৃতিপুরুষ-স্বরূপা ভারতীয় পতাকাকে  
 প্রণাম করি।

৩। সিংহলব-অমিত বিক্রম নেতাবী সূতাবচন্যের  
 অর হোক, অর হোক হিংসাকরী রাহেদ্য গাভীর। তোমার  
 পূজ্যগণ অহুতু হোক, যে যে ভোমাকে মুক্ত করিয়াছে।  
 সর্গভারতের বিলম-পীঠে ভোমার পতাকা নিভা  
 বিজয়িনী হোক।

শ্রীবরদাক্ষ্মর বোদান্তশাস্ত্রী



# সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা

বাংলা ভাষা ও বাঙালীর ভবিষ্যৎ

বঙ্গদেশ বিধিত হইবার পর হইতে বাংলায় আশঙ্কা করিতেছেন যে, পূর্ণ বাংলায় বঙ্গভাষা উচ্চ-চোপা-চাপকান, ঞ্চিগান-করিয়া বিকৃত হইয়া পড়িবে এবং পশ্চিম বঙ্গে উহা ভারতীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রীয় ভাষার প্রভাবে পুরোপুরি না হইলেও কিছুটা হিন্দুস্থানীগতি হইয়া পড়িবে, তাহাদের সেই আশঙ্কার আহুতাও অশ্রুদার ছিল। ভাষাই জাতির সংস্কৃতির বাহক, এবং বিশেষ করিয়া আমাদের বাংলাবিশেষের ক্ষেত্রে, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যই আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির সবচেয়ে গ্রেট ধনিক। বঙ্গীয় সুবিধা সাতের স্তর অথবা সাত কোন সর্বভারতীয় বাঙালৈতিক কারণে, আমাদের সাহিত্যকে দুর্বল হইতে দিতে পারে, এই আশঙ্কাই আমাদের ছিল, আর এই কারণেই আমাদের সাংস্কৃতিক কল্যাণেরোপটা একটু দুশ্চিন্তিত হইয়াছিল।

কিন্তু অত্যন্ত আশা ও আশ্রয়ের কথা, আমাদের সেই আশঙ্কা যৌব করি বিফল হইতেছে। পশ্চিম বাংলার প্রধান হস্তী বান্দীয় শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল যৌব মহাশয় বাংলা ভাষাকে পশ্চিম বঙ্গের সরকারী ভাষার মর্যাদা দান করিয়া প্রস্তুতি এক যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। এখন হইতে পশ্চিম বঙ্গের বাঙালী সরকারী কার্যকলাপ প্রাদেশিক ভাষার মাধ্যমেই নির্বাহিত হইবে। বাংলা সরকারের সমস্ত বিভাগীয় অফিসগুলিতে কাগজ-পত্র, নথি ও ফাইল প্রভৃতি বাংলা ভাষায় রচিত হইবে—ওধু যে-কলম হানে ও ক্ষেত্রে বাংলা ভাষায় সাহায্যে বক্তব্য-বিবরণকে পূর্ণরূপে উপযুক্ততার সহিত উপস্থাপিত করা যাইবে না এবং যে সব ক্ষেত্রে বা যাহাদের নিকট বাংলা ভাষা সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাত বা অসংগত, ওধু সেইখানেই সাধারণ পারস্পরিক মনোভাবের আদানপ্রদানের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গভীরভাবে ইংরেজি ভাষা ব্যবহৃত হইতে পারিবে। এইরূপে অগ্রসর হইয়া পশ্চিম বাংলা সরকার আগামী বছর

হুগোলের মধ্যেই ইংরেজি ভাষার রাষ্ট্রীয় ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করিয়া দিতে পরিবেন বলিয়া পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। ভাষা জাতির কৌলীন্যের পরিচয় বুঝিয়াই ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বর্তমানে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার বাহনরূপে ব্যবহার করা হইতেছে। জাতীয় মর্যাদার দিক হইতে ইহা এক অসামান্য যুগান্তকারী ঘটনা, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকারই এখন প্রাদেশিক ভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাষার পদে বরণ করিয়া লইলেন। ইহা এক যুগান্তকারী অগ্রগতি। জাতীয় ইতিহাসের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও ইহা একটা অদ্বৈতীয় অধ্যায়।

বৈদেশিক প্রভুত্বের নাগপাশে বন্ধী ছিল বঙ্গীয় আমাদের বেশে বিদেশী প্রভুত্ব ভাঙে বঙ্গভাষা ব্যাপ হইয়া পড়িয়াছিল, আর আমাদের মাতৃভাষার স্বত্বক লোচলেক্ষেণে বিদেশী ভাষাটা মনোভাষাে ব্যাহত করিয়া রাখিয়াছিল। ওধু তাই নয়, গোটা ভারতের রাষ্ট্রভাষারূপে এবং আমাদের সমস্ত শিক্ষার বাহন হিসাবে উহা আমাদের জাতীয় চেতনায় মর্মে মর্মে এমনই প্রবেশ করিয়াছে যে, আজও আমাদের অনেকেরই বহুদূর ধারণা যে, ইংরেজি না শিখিলে আমাদের সভ্যতার শিক্ষাই পূর্ণ হইবে না। 'শাহেবী ধরণে হাস', আর শাহেবী ধরণে কাপার দিন অবসর বহনিত ব্যবসাই গত হইয়াছে, কিন্তু সুব জাতীয় সভ্য গঠনের পক্ষে ইংরেজি ভাষা যে আমাদের ত্যাগ্য, এই ধারণাটা এখনও আমাদের অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিই বরদা করিতে অস্বীকৃত। আশা করা যায়, অতঃপর এই দাদনদোভাব আমাদের জাতীয় চেতনায় হইতে অপসারিত হইবে।

বাংলা দেশের সাহিত্যিক-ভাষা রাজ্যধারে, সমানিত হয় নাই, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধনে বধ্যবাধ্য সমাদর লাভ করে নাই, সংস্কৃতির বাহক হিসাবে সমাজের মত সে জাতির জীবনের পক্ষে পক্ষে পুষিয়াছে, তথাপি এই বাংলা ভাষাতেই এত উর্ধ্ববরে ভাগ্যবশিত সাহিত্য রচিত হইয়াছে, যাহা পৃথিবীর সকল সংস্কৃতিরই প্রভা পাইবার

যোগ্য। ঔপনিবেশিক হাস্যে আরও ব্যক্তিগত বাৎসরিক  
বহু সাহিত্যিক বিবরণেরা হইয়াছেন, পৃথিবীর জ্ঞানভাণ্ডার  
সীমিত লাভ করিয়াছেন। তথাপি বাংলা ভাষার পক্ষে  
এতাবৎ রাষ্ট্রীয় নথ্যাদা পাওয়া তো দুঃস্বপ্নের কথা। বাঙালী-  
দের উচ্চশিক্ষার বাহন হিসাবেই তাহাকে কেমনে মানন  
নওয়া হয় নাই। রাজ-ভাষা ও শিক্ষিতের ভাষা হিসাবে  
ইংরেজি ভাষাই আসন্ন জমাইয়া বসিয়াছিল; তাহারই  
কাকশ্যের প্রতি চাহিয়া আনাচে-কানাচে থাকিয়া  
অন্যদের মধ্যে বাংলা ভাষা বাড়িয়া উঠিতেছিল।  
এতোক জাতিত্বই জীবনধারণের আবিস্কৃত ভাষার মধ্যেই  
নিহিত থাকে। সেই নৃত্যভাষা এতাবৎকাল যখন  
অসীমতার পথে নিমজ্জিত ছিল, তখন বাঙালী জাতির  
পক্ষে কোনরূপ কল্যাণই কানন। করা যায় না। বাঙালী  
জাতির এই দুই শতাব্দীব্যাপী অসীমতা স্বীকারের নানা  
কারণের মধ্যে ইহাও অল্পতম কারণ—তাহাতে আর  
সন্দেহ নাই। পশ্চিমবঙ্গ সরকার আর এই জাতীয়  
প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য বদ্ধপরিকর।

আন্তর্জাতিক ব্যক্তিসমূহ তাবাত্তবিনদেরও স্বীকার  
করিয়াছেন যে, ভারতের বিভিন্ন প্রাথমিক ভাষাগুলির  
মধ্যে বাংলা ভাষাই সপ্তমতম এবং সাহিত্যিক দৃষ্টি  
দিক দিয়া অগতঃ সপ্তম ভাষার মধ্যে উহা সপ্তমস্থানীয়।  
এই ভাষার মাধ্যমেই মাইকেল মধুসূদন দত্ত, ‘বন্দোবস্ত’-  
এবং কবি বঙ্কিমচন্দ্র, মহাকবি গিরিশচন্দ্র, বিদ্যকবি রবীন্দ্র-  
নাথ এবং কথাসিদ্ধী শরৎচন্দ্রের বড় বিরাট প্রতিভাধরদের  
আবির্ভাব—অথচ এই ভাষা-ভাষী জাতি পনের দুইশের  
বুলি শিবিয়া অক্ষি কাস্তারিতে ও আবাগতে কাজ  
চালাইয়াছে, পলে পলে হোঁচট খাইয়াও বিদেশী শাসকের  
ভাষাতেই উচ্চ জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষা লাভ করিয়াছে;  
তথু তাই নয়, এই নিম্নতর পরদৃশ-বৃত্তিতে গর্জ করিতেও  
শিষ্ট-পা হয় নাই; জাতীয় জীবনের পক্ষে, সাংস্কৃতিক  
ঐতিহ্যের পক্ষে ইহার চেয়ে মানিক্য বিঘ্ন আর কী  
হইতে পারে? আর সেই মানিক্য বেধ কাটিয়া বাইতে  
প্রবৃত্তি বরিল।

অবশ্য ইংরেজি ভাষার যে আর কোনরূপই প্রয়োজন  
হইবে না, এমন হঠকারী উক্তিও আবদা আসন্ন দিতে

পারি না। ইংরেজি ভাষা পৃথিবীর মধ্যে সর্বত্র  
ব্যাপকভাবে কথিত ও আলোচিত ভাষা, তদুপরি বহু ও  
দল-সম্পন্নও উহা জুলনাহীন; ইংরেজি ভাষা এই  
কারণেই আন্তর্জাতিক নথ্যাসম্পন্ন। আর এই অল্পই  
বেশ-বিবেশের জ্ঞান আহরণ করিবার জন্য এবং  
আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কখনো  
বিচরণের জন্য আমাদের পক্ষে ইংরেজি শেখার আবশ্যিক  
অবশ্যই থাকিবে, এবং সেই দিক দিয়া ইংরেজি ভাষা  
আমাদের জাতীয়তাবাদের পক্ষেও তাম্বা হইতে পারে  
না। তাহাকে ত্যাগ করিতে হইবে সেইখানে—যেখানে  
উহা আমাদের জীবনধারণের সাধারণ ক্ষেত্রেও আমাদের  
অভিজ্ঞানবস্তুর শক্তি করে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের  
কল্যাণ-চেতনার ফলে সেই স্থান হইতে এখন ইংরেজি  
ভাষাকে সরাইয়া দেওয়া হইল। কিন্তু এখনও অবিহা  
প্রাথমিক প্রচেষ্টার ক্ষুদ্র মাত্র, উচ্চতর পৌরুষের উহা  
মাত্র উদ্বোধন; এখন এই প্রচেষ্টাকে সম্পূর্ণ সাফল্য দান  
করিবার এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানে সর্বতোমুখী সমৃদ্ধি আনয়ন  
করিয়া এই উদ্বোধনকে অস্বল্প করিবার সচিব বেশের  
সকলেরই। দেশের শিক্ষাজীবী, সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী,  
সাংবাদিক ও চিন্তানায়ক—সকলজাই এই দায়িত্বপূর্ণ  
কাজে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। রাজনীতির দৃষ্টিক  
দিয়া বাংলা আর বিখ্যাত বটে, কিন্তু মূলগত জীবনধারণে  
বাংলা আজও অক্ষত। এই প্রেক্ষার আবিস্কৃত হইল  
বাঙালী ভাষা, বাহ্যকে পূর্ণপালিক্তান-বালীয়া ভাষার  
রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করিবার জন্য সমবেতভাবে দাবী  
করিতেছেন। তাই বনে হর, পূর্ণ ও পশ্চিমবঙ্গ, যদি  
জাতীয় ভাবেই নৃত্যভাষাকে অকলঙ্কিত রাখিতে  
কৃতবর হয়, এবং উভয় বস্তুর সম্মিলিত সাধনার সে ভাষা  
যদি প্রকৃতই স্বর, আরও জাগ্রত এবং আরও প্রাণবন্ত  
হইয়া ওঠে, তবে রাজনৈতিক বাবক্ষেপ সন্দেহ বাংলায়  
আন্তর্জাতিক সত্য কোন আঘাত লাগিবে না।

শান্তি সেনাবাহিনী

কলিকাতার শান্তি সেনাবাহিনীর ইতিহাস দীর্ঘ দিনের  
নয়। মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে ইহার জন্ম, কিন্তু এই

আম্মিসের মধ্যেই এই নতুন বাহিনী, যেতঃ কর্তব্যান্ধা, তত্ত্ববুদ্ধি ও নিরানুযায়িতার মধ্যে দিরা সুশৃঙ্খলভাবে কাজ করিয়া বাইতেছে, তাহা একদিক দিয়া আমাদের নবলভ স্বাভাবিক চেতনা যেমন গৌরবজনক, তেমনিই সাম্প্রদায়িকতার অভিলাষে বিবদবান জাতির পক্ষে নতুন কল্যাণকর আশীর্বাদস্বরূপ।

পশ্চিমবঙ্গের প্রধান বহীঃ দানবীর শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের উদ্যোগেই শান্তি সেনাবাহিনীর প্রথম পরিচয়লাভ হইয়াছিল এবং ১৯১৫ আগস্টের অব্যবহিত পরেই প্রধানতঃ তাঁহাদের গঠিত প্রচেষ্টায় সেই পরিচয়লাভ কার্যকরী রূপ গ্রহণ করিতে সক্ষম হয়। দ্বাদশবৎসরকালিত কলিকাতার নাগরিকগণ অনেকদিন হইতেই নরো নরো অসুখ করিতেছিল যে, যদি সুস্থ ও নিরপেক্ষ আবহাওয়ায় মধ্যে শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করিতে হয়, তাহা হইলে দৃঢ়রূপে সেই শান্তিকে প্রতিষ্ঠা ও রক্ষা করিতে—পারিবে এমন একটি বহীঃদান সেনাবাহিনী একান্ত ভাবে কাম্য এবং অবিলম্বে এইরূপ একটি প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগন অপরিসীম। এই প্রয়োজনীয়তাকে পূরণ করিয়াই একেবারেই বিশিষ্ট নাগরিক প্রথমে শান্তি সেনাবাহিনী একটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন, অন্তঃপর দাখিলাতিক ও অন্তঃস্থ সকল শান্তিকামী দল ও প্রতিষ্ঠান হইতে এই কেন্দ্রে লোক নেওয়া হইতে থাকে। এই ছোট দলটির প্রধান কাজ হইল বঙ্গালায় জনসাধারণকে গুপ্তস্বাক্ষরের আখ্যাত হইতে রক্ষা করা, এবং ছোট্টবক ধরনের বেশাদ সাম্প্রদায়িক অনাগরিক জীবনকে কলুষিত করিতেছিল, তাহা হইতে জনসাধারণকে উদ্ধার করা। ক্রমে এই কেন্দ্রসংক্রিষ্ট কাণ্ড, শাসন, পত্র, পুস্তক পত্রিমাণ্ডল হইয়া বর্তমানে বিরাট বহীঃসংরক্ষণভিত্তিক হইয়াছে।

মত ১লা সেপ্টেম্বর কলিকাতা সহরের পুনঃস্থাপিত সর্বব্যাপী শান্তি সন্থা কতিপয় স্বাধীনবৈ ও নির্লোভ বর্গাভ্যন্তর হঠকাক্রান্ত বিপর হইয়া পড়ে। এবং এইদিন হইতেই শান্তিসেনা-বাহিনীর সংগ্রাম ও জয়যাত্রা শুরু হইয়াছে। চারিদিক বহিরা ক্রমাগত সহরের পথে পথে দখলীকৃত শান্তিপ্রেমদায়ক শান্তি-অভিযানে আত্মনিবেশন

করে। আনুষ্ঠানিক ভাষা প্রয়োগ করিতেছি না, আত্মনিবেশন শব্দটির অর্থ শান্তিসেনারা প্রাণের বিনিময়েই অকস্মে অকস্মে পালন করে। শুভাভা প্রতিরোধের সৈন্য, শান্তি ও স্বাধীনতার ধর্মাত্মী শান্তিকামীদের তাই তাহারা শত্রুর মতই গ্রহণ করে, তাই কানুনগোর মতো শত্রুর মতোই তাহাদের উপর গুণ্ডারা আক্রমণ করে। এই আক্রমণে ভিন্নজন শান্তি-সত্যপ্রিয় জীবনাবধান বটে। কিন্তু শত চোঁটা করিয়াও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ সৈন্যঃ শান্তি সেনাবাহিনীকে পরাজিত করিতে পারিবে না, বরং জনকল্যাণকামিতার অনন্যরূপে মনোবলে কংগ্রেস তাহাদের নিজেদেরই পরাজয় বীকার করিতে হইয়াছে। শান্তি সেনাদের প্রবল অহিংস প্রতিরোধকে কৈরীতে না পারিয়া গুণ্ডার দল আত্মপোষণ করিয়াছে। কলিকাতার শান্তি-বৈরত্মী স্থাপিত হইয়াছে।

শান্তি-সেনাবাহিনী এক্ষণে আরও শক্তি সংগ্রহ করিতেছে। আর এই শক্তি জোগাইতেছে কলিকাতার শান্তিকামী জনসাধারণ; অপূর্ণ দৃঢ়তা ও তত্ত্ববুদ্ধির মধ্যে শান্তিবাহিনী ক্রমেই অপরাভের হইয়া উঠিতেছে। ছাত্র-সম্প্রদায়, যুগ্মসম্প্রদায় ও প্রতিক্রিয়া, প্রগতিশীল সমাজের এই তিনটি প্রধান স্তরের কেহই তাই আশা আর শান্তি-সেনাবাহিনীর উদ্যত আহ্বান হইতে নূরো ব্যক্তিভেদে পারিতেছে না। সুখের বিষয় এবং আলীম আলার বিষয়, শান্তি-সেনাবাহিনীর মধ্যে যেরূপের জন্তও একটি যত্নগ্রহ প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে। সহরের শান্তি-অভ্যন্তরে গণক তাহাদের কর্তব্যও কোনো আশে কম নয়। সহরের নানানস্থানে সকল সম্প্রদায়ের বৈরো ও দ্বিলাগো সভা-সমিতি করিয়া নিজেদের মধ্যে প্রীতি ও বৈরো বন্ধন মুক্ত করিতেছেন।

আশা করি, অবিলম্বেই কলিকাতার শান্তি-সেনাবাহিনীর আনন্দে ভারতের সকল স্থানেই এক সর্বভারতীয় শান্তি-অকৌহিনী গঠিত হইবে, এবং শান্তির বৈরী ও স্বাধীনতার শত্রু সকল—প্রতিক্রিয়ার সবল দৃঢ়তা হৃৎকলি—সেই বিরাট অকৌহিনীর শক্তমান তত্ত্ববুদ্ধির আশ্রিতে কলিলা হইয়া যাইবে।

### জাতীয় চিত্র-প্রদর্শনী

গত বালে সিনেট-হাউসে একটি নূতন বংগের চিত্র-প্রদর্শনী হইয়া গেল—জাতীয় চিত্র-প্রদর্শনী। বিমুখায় ইতস্ততঃ না করিয়া বিবাহীন চিত্রে যোষণা করা যাউতে পারে, উপভোগ করিবার মত, সেমের অল্প ইতিহাসবোধ সহজে কবিবার মত সত্যই কিছু সেই অস্থানটিতে ছিল। গত দুইশত বৎসরের ইতিহাসে পরাবীনতা। অগ্ন্যারগের ক্ষয় ভাঙের স্বাবীনতাকারী গণ-আত্মা যে মরণজয়ী সংগ্রামে লিপ্ত ছিল, উক্ত চিত্রপ্রদর্শনীতে সেই সংগ্রাম ও সংগ্রামেরই চিত্ররূপ ইতিহাস বিস্তৃত করা হইয়াছে।

এখানেই পরীক্ষার চিত্রাবলী দেখিতে গিয়া মনে পড়িলে তাঁহাই কথা, যিনি এই চিত্রগুলি সাফাইবার পরি-কল্পনা ঘটনাক্রমে করিয়াছিলেন এবং যিনি বহুতর কল্যাণ কর্মার্থে এবং সুবন্দন আদর্শের অনুপ্রেরণার জীবন দান করিয়াছিলেন, মনে পড়িলে সেই স্মৃতিপথ বন্ধোপাধারকে। জাতীয় চিত্র-প্রদর্শনীর একজন অগ্রদূত কবী হিসাবে তিনি এই পরিচালনার দৃষ্টি অক্ষরী ভাবে তড়িত ছিলেন। গত ১৮ শতাব্দীর শেষের সাম্প্রতিক উত্তরভাগের সময় প্রতি-বিদ্য পরিচালনা। বালে তিনি ভগবৎ-কর্তৃক আক্রান্ত হন—এবং এই আক্রমণেই তাহার জীবনাবসান ঘটে।

প্রদর্শনীর চিত্রগুলিকে একটা বিশেষ অঙ্কনের মধ্যে সাজানো হইয়াছিল, যে অঙ্কনের মধ্যে হইতে ইতিহাসের সূক্ষ্ম ব্যাখ্যাত্মকভাবে সহজেই বুঝিয়া লওয়া যায়। প্রত্যেক পাণ্ডিত্যে জাতীয় সংগ্রাম-ইতিহাসের একটা প্রধান অধ্যায়ের প্রতিরূপই ছবি দিয়া বিস্তৃত করা হইয়া-ছিল, এবং সেই পাণ্ডিত্যের মাঝে ছিলেন এক এক জন বৈজ্ঞানিক, তিনি প্রত্যেক দর্পকের কাছে জাতীয় ইতিহাসের সেই চিত্ররূপ বিশেষ অধ্যায়ের পরিচয় তাৎপৰ্য্য ব্যাখ্যা করেন, তাহাতে আমাদের স্বাবীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞতম ব্যক্তিটিও এই সংগ্রামের পটভূমি হইতে স্পষ্ট করিয়া ইহার পরিচালনার ও বিস্তৃতির সত্য পরিচয় পাইতে পারে।

ছবিগুলির অর্থন সত্যই অশেষমাত্র ছিল, এবং ছবি-গুলির আবেশনও বহু জীবন্ত ছিল। সেগুলি প্রেক্ষিত

দেখিতে মনে হইতেছিল, প্রকৃতই যেন ইতিহাসের চলমানতার মধ্যে প্রতিটি হইয়া গিয়াছিল। বিশেষ করিয়া 'জাতীয় অভিযানের' চরিত্রাঙ্গি এমনই বাস্তবোচ্ছল, এমনই সুমধুর হইয়াছিল, যাঁরা দেখিলে দর্পকমাত্রেরই মনে জাতীয় গভীর একটা অকৃতপূর্ণ অনুপ্রেরণা ও অজ্ঞাতকে প্রতিরোধ করিবার একটা মনোভাব আসিয়া প্রতি-হৃত হয়।

এই চিত্রপ্রদর্শনী সম্পর্কে আমাদের তরক হইতে একটি প্রশ্ন আসে। এই প্রদর্শনীটিকে আরও ব্যাপকভাবে পরিচালিত করা হয় না কেন? স্বাবীনতা আন্দোলন পাইয়াছিল বটে, কিন্তু স্বাবীনতার প্রকৃত চেতনা এখনও ভারতের গণমানসে সুপ্রতিষ্ঠিত নহে, উহা এখনও পর্যাক্ত ও একটা জীবাণু ভাবপ্রবণতা ছাড়া কিছুই নয়; এই জন্যই দিকে দিকে আত্ম শিকল-ভাঙা চেতনা বিস্তার হইয়া ব্যাপক বিমুখলার পর্যায়সিদ্ধ হইয়াছে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, এই বিমুখলার মনোভাবটা দৃঢ় হইবে এবং দেশবাসী ভাবপ্রবণতাকে বিশুদ্ধ দিগা প্রকৃত রাষ্ট্রিক বোধে উৎসাহ হইতে পারিবেন,—আর আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, নিরঙ্কর ও অক্ষিণিত ভারতবাসীকে স্বাবীনতার বাস্তব বোধে উৎসাহ করিবার নৈশ এই জাতীয় চিত্র-প্রদর্শনীর 'মতো' কিছুই আর ভল ফলদায়ক হইবে না। তাই মনে হয়, এই চিত্র-প্রদর্শনীর ক্ষয় যদি অমেরুগুলি প্রয়োজন সন্ম প্রকৃষ্টিত করা যায়, এবং সেই সন্মগুলি যদি বাস্তব প্রাণে প্রাণে ঘুরিয়া ফুলে ফুলে এই প্রদর্শনীর অস্থান করেন, এবং জাতীয় ইতিহাসের বাস্তব চিত্রগুলিকে যদি সুবোধো ব্যাখ্যা সহ সত্য দেশবাসীর সামনে উপস্থাপিত করেন, তবে দেশবাসী অল্প দিনের মধ্যেই একটা সুস্থ স্বাভাবিক চেতনা লাভ করিতে পারিবেন।

### পুলিশের অস্ত্র-পত্রে-প্রদর্শনী

সম্প্রতি মোরার সাহু'লার রোডস্থিত পুলিশ-মহাবলে ভারতীয় বিপ্লবীদের হাঙ্গা ব্যবস্থার এবং পুলিশ বাহিনী কর্তৃক দৃত অস্ত্র-পত্রে এক প্রদর্শনী দেখানো হয়। আমাদের জাতীয় জীবনে রাষ্ট্রিক স্বাবীনতা অবতাই আনিয়াছে এবং পররাষ্ট্র পন্থি পরিচালনার যে পুলিশ-বাহিনী বহাতিব্রোহী এবং স্ব-স্বাধ-বিবেচী দৃঢ়

কৃত্য। গ্রহণ করিয়াছিল—আজ সেই পুলিশ-বাহিনীই যে অল্পকাল আগে দেশবাসীর সুযোগ গ্রহণ করিতেছেন, উক্ত প্রদর্শনী হইতে সেই আশার সংবাদ প্রচারিত হইতেছে।

হুই পত বন্দনবাসী পরাবীন তারতবর্ষ বাহিনী, নতুন এক আশাভরিত হইতেছে ইংরেজ-শাসিত হইলেও তারতবর্ষ আশা কোন দিনই পরবাসনের সুখলভে হয়-বার বিদ্যানে গ্রহণ করে নাই, তাই কোন দিনই এই তারতবর্ষ বাহিনীর সংগ্রামের আশা হয় নাই। সুতরাং রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে তারতবর্ষ পরাবীন হইলেও বাহিনী-গতাবে বিহার। বাহীন মনোভাবসম্পন্ন ছিলেন, এবং বিহার-তারতবর্ষ বাহীন করিবার জন্য গ্রহণ করিয়া প্রতিরোধের অস্ত্র কুলিঙ্গা হইয়াছিল, সেই অস্ত্রেই আশিক নিবর্তন এই প্রদর্শনীতে দেখানো হয়।

বাহীনতার প্রত্যয়ে জাতির সেই প্রত্যঃস্বপ্নীয় জন-বরণে সজানদের প্রচার সক্ষে স্বরণ করিয়া পুলিশ বন্দ-বাহীন বন্দবাসী হইয়াছেন। পুলিশ-বাহিনীও যে এই তারতবর্ষেরই বাহিনী, সেসের বাহীনতার উদাহরণেও আশা হয়, সেসের বীর সজানদের প্রতি স্বরণাঙ্গি নিবেদন করিবার সুযোগ পাইলে উদাহরণেও স্বরণাঙ্গি করেন—এই প্রদর্শনী তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। বৃটিশ-শক্তির অধীন পুলিশ তৎকালীন বন্দবাসী বীরদের বিহার ও নীতন করিয়া যে গুরুত্বের পরিচয় দিয়াছিল, আজ বন্দবাসীর সমক্ষে শুধুই সেই বোধ কামনার্হও যদি এই প্রদর্শনী করা হইয়া থাকে, তাহা হইলেও পুলিশ আশাবাদের বন্দবাসের পাত্র।

সম্রাটবাদের পটভূমিকা যিদেই শাসনকে স্বর্গ করিবার জন্য যে প্রচেষ্টা হইয়াছিল, আশাবাদের জাতীয় আশাবাদের পক্ষে তাহা সত্যই মঙ্গলময় ছিল কিনা, সেই প্রশ্নের জবাব দিবার সময় এখনও যে আসিয়াছে, একথা কেহই ভোর করিয়া বলিতে পারেন না। শুধু ভবিষ্যতে পটভূমিকার ইহার সম্বন্ধ বিচার হইবে। কিন্তু এখনই যেক, আশাবাদের জাতীয় আশাবাদের ইতিহাসে এই অধ্যায় যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, সেই সম্পর্কে আশা

করি, কেহই সম্বন্ধ প্রকাশ করিবেন না। কিন্তু বৃটিশ-শাসিত পুলিশের যোগদানবিহীন এই অধ্যায় এখনও আশাবাদের কাছে একটা অস্বাভাবিক রহস্যের মতো। উক্ত সম্পর্কিত পুরাপুরিতাবে না হইলেও আশিকভাবে যে সেই রহস্যের দ্রুতবে জালটা কিছুটা অস্বস্ত হইবে—একথা মনে করিলে বাস্তবিক হইবে বলিয়া মনে হয় না।—পুলিশের মধ্যে যোনা যোনাই করিয়া বিশেষী বাহিনীতে হস্তাণ চেষ্টা হইতে শুরু করিয়া ১৯০২ সালের আগস্ট-আগস্টের দুগ পর্যন্ত, এই অধ্যায়ের সময়ের সব প্রমাণ ঘটনাগুলিই এই প্রদর্শনীর মাধ্যমে প্রচার করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। শুধুনি শুধু অস্ত্র-পত্রগুলিই নহে, এই বীর সময়ের মধ্যে বিহার-শক্তির সঙ্গে গ্রহণ করিয়া বিবরণের বস্তু গুরুত্বপূর্ণকে বিশদভাবে করিয়া তুলিয়াছিলেন, সেই সব বীরপ্রতীকের পুলিশের যেকর্ডের আলোক-চিত্রগুলিও প্রদর্শিত হয়—এবং বীর গুরুত্ব ইহার কলে আওত গুণি পাইয়াছে। এই সব বীরপ্রতীক শরীরের সম্পর্কে বহু তথ্য প্রত্যক্ষ প্রমাণের অধিকারে আশ্রয় হইয়াছিল, কিন্তু এখন উদাহরণের সম্পর্কে অনেক নতুন আলোক পাওয়া গেল। প্রশ্নিত প্রশ্নগুলির মধ্যে একটি ডাকটিন-পেন-পিত্তল, একটি ছুরির আকারের পিত্তল ও কতিপয় গুলি-বোমা সব চেয়ে কৌতুহলোদ্দীপক।

কিন্তু একটা কথা। সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বের স্বাভাবিক প্রশ্নগুলিও আবার এই প্রদর্শনীতে স্থান পাইল কেন? সম্রাট-বাহিনীর সংগ্রামটা ছিল বাহীনতারই সংগ্রাম। সেই দিক দিয়া বিবেচনা করিলে এই সংগ্রাম ছিল আশাবাদের জাতীয়তাবাদের স্বর্গ-বৃক্ষ। পক্ষান্তরে সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব দ্বারা বাধাইয়াছে, তাহাও তারতবর্ষ বাহীনতা-বৃক্ষকে প্রত্যাহাত করিবার জন্যই অস্ত্র চালাইয়াছে, জাতীয়তাবাদের কষ্ট-পাথরে এই বৃক্ষ অর্ধেকের দৃষ্ট বলিয়াই বিবেচিত হইয়াছে। তাই এই প্রদর্শনীতে অর্ধেক-বৃক্ষের অস্ত্রগুলি প্রদর্শন করিবার সুযোগ দিয়া কি এই প্রদর্শনীর পবিত্র উদ্দেশ্যকে কিরূপে স্বর্গ করা হয় নাই?

আর একটা কথা। বিদ্রোহের অন্ত-মন্ত্রের পাশে পুলিশদের ব্যবহৃত অস্ত্রগুলিও কি প্রদর্শিত হওয়া উচিত ছিল না! আমায়ের তো মনে হয়, সম্ভবতঃ যদি অত্যাচারীর ছবিও অত্যাচারিতের পাশে রাখা যাইত, তাহা হইলে ভারতীয় ইতিহাসে আন্দোলন অধ্যায়ের কাণ্ডাটো আশেপাশে বাস্তবায়ন হইয়া আঁতঃ স্পষ্ট হইয়া উঠিত পারিত। আশা করি, অন্তঃসম্পর্কে পুলিশ-কর্তৃপক্ষ ভবিষ্যতে বোধোপায় সংস্কারের পরিচয় দিবেন।

### বিপ্লবদুগের একপৃষ্ঠা

ভারতের দর্শনশ্রেষ্ঠ বিদ্রোহীর রূপবিহারী বঙ্গের নাম বড় কেহ অবগত নহেন। কিন্তু একদম বিদ্রোহী আমায়ের চোখে পড়ে নাই। ভারতের স্বাধীনতা ছিল তাঁহার একান্ত কাব্য! জীবনের বেধ দিন পর্যন্ত ইংহাই ছিল তাঁহার ধ্যান জ্ঞান। আজ বাঙ্গালীকে তাঁহার জীবনের অতি স্মৃতি একটা ঘটনা তুলাইতেছি—তিনি তখন বেহাঙ্গনে, তাঁহার একান্ত বিদ্যালী অচ্যুতর বিশেষে বসন্তলাল তখন শাহোরে।

১৯১২ সালের ২০শে ডিসেম্বর রাজপ্রতিনিধি লর্ড হার্ভিল্ল নুগন 'দলীতে সন্ত্রাস শোভাযাত্রা করিয়া ইতিহাস-প্রসিদ্ধ 'বেগুনান বাবু'এর দিকে ঘাইতেছিলেন। নুতন রাজধানী মিল্লিতে তিনি রাজকীয় কনভা প্রবেশ গ্রহণ করিবেন। তিনি হাতীতে চড়িয়া ছুইনস্ পাউন্ডে হইয়া টানসী চক্ পিয়া ঘাইতেছিলেন। কত রাত্রা বহাভাষা, প্রকারী কল্লভাটী, সাগর গোক, সৈনিক বাহিনী প্রভৃতির একটি বিরাট শোভাযাত্রা আসিতেছিল। লোকের অসম্ভব ভিড় আর বাতবাকন। কে কাহার দিকে তাকায়, কে কাহার কথা শুনে, সকলের দৃষ্টিই সন্ত্রাসী লাউনাহেবের উপরে নিবদ্ধ। বর্ণকের অস্ত্র নাই। বিভিন্ন বাঙালী বসিবার স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে। পাঞ্জাব ভাসনাল ব্যাঙ্কের বাড়ীটি ভিনভলা, এখানে প্রায় সেরশত ছুইশত লোক একত্রিত হইয়াছে। খোতলা বরং বারান্দার নির্দিষ্ট হইয়াছে জীলোকদের বসিবার স্থান। বসন্তও বাঙ্গালী জীলোকের বেশে সেদিন-শাক্তী পরিচয় সেই দলেই থাকিয়া শোভা-যাত্রার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। বসন্ত সাহোয় হইতে ছইদিন পূর্বে দিল্লী পৌছিয়াছিল।

সে ১৯শে ডিসেম্বর সাহোয় হইতে রতনা হইয়া দিল্লী পৌছিয়াছিল। সেই জনতার বসন্তকে বড় প্রবল মানাইতেছিল। তাহার হাতে দ্বারািত বোমাটি কেহই দেখিতে পার নাই। শীতকাল, গায়ে গরম কাপড়ও ছিল। বসন্ত একেবারে সশুখে চলিয়া আসিয়াছিল। শুধু যেমন বাঙা একটু বেশী ছিল। অবশ্য মিথ্যালা করিল 'ভেরি নাম ক্য। বহিন্' বসন্ত হাসিয়া উঠর করিল, 'বেবি নাম্ দীলাবতী।' যেহেতু পুনরায় অস্ত্রদিকে চাহিল। বসন্ত বেশী কথা কহে না, শোভাযাত্রার লক্ষ অপেক্ষা করিয়া বহিরায়ে।

চতুর্দিকে প্রেয়ী, বিস্তৃত ভেদন সন্ত্রাসী নয়। বড়লাট বৃত্তিয়াছিলেন যে, অস্ত্রোত্তেবের হেতু বসন্তের বহিত করিয়া বাঙ্গালী বিদ্রোহগণের বনোহরন করিতে তিনি সশর হইয়াছেন। তাই বাঙ্গালী বিদ্রোহী তাঁহার উপরে অস্ত্রক্ষেপ করিবে না। তিনি পত্নী লেডী হার্ভিল্ল সহ হাসিতে হাসিতে কথা বলিয়া আসিতেছেন। এদিকে বসন্ত হেলিল লকলের দৃষ্টি শোভাযাত্রার দিকে নিবদ্ধ। হেলিল, এইতো সুযোগ উপস্থিত, কিন্তু কে একজন তাহার দিকে চাহিয়াছিল, অননি দীলাবতী (জীবনশী বসন্ত) বলিল, "বড় আশ্চর্য, নাম্‌নে বেগো বহিন্।"

যেহেতু চোখ কিরাইল আর বসন্তও অলক্ষ্যে খড়-লাটের দিকে তাহার লক্ষ্য ছুঁছিল। কেহ দৃষ্টি করিল না। স্বয়ং লর্ড হার্ভিল্লও নয়। তাঁহার ও তাঁহার স্ত্রীর বসন্তুল বিদ্যা কি একটা গিয়া একেবারে পল্লভাতে চোপবারের উপরে পড়িল। সে চলিয়া পড়িতে লেডী হার্ভিল্লই প্রবেশ লাটনাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। পল্লভাতে চাহিয়া একেবারে ভক্তিতাহতের মত নির্ভাক হইয়া পড়িলেন। তাঁহারও পৃষ্ঠভাগে বোমার ছিটকানি (Splinters) আসিয়া লাগিল। কণকালময়রা তাঁহার বেহ কাশিতে লাগিল, তিনি সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িলেন।

কি হইল, কি হইল। চারিদিকে হুলস্থূল পড়িয়া গেল—কে কাহাকে বেধে—নিজের প্রাণ লইয়া লকলেই ব্যস্ত।

বসন্ত হাতী বাধাইল, শোভাযাত্রা ছত্রস্ত হইল। অবিলম্বে বড়লাট বাহাদুর হাসপাতালে স্থানান্তরিত হইলেন। তাঁহার বেহ হইতে বোমার প্রোথিত অংশ-

গুলি বাহির করা হইল, তিনি বড় চুর্নল হইয়া পড়িলেন, সমস্ত শত্রু অস্থিরভাবে কাটাইলেন। এদিকে জাহাজ Guy Fleet Wood Wilson কোনরকমে বরষাবের জাহাজে সপ্তম করিয়া ফেলিলেন।

বলন্ত বোমাটি নিক্ষেপ করিয়াই কৌশলে দূরিত পড়িল। অবশেষে রাসবিহারী তাহার গুপ্ত অপেক্ষা করিতেছিলেন। তিনিই বলন্তকে অপচয় সক্ষম ভূমিত করিয়া দিয়াছিলেন। কালবিলম্ব না করিয়া গোখর পরিবর্তন করিয়া বলন্তকে লাহোরের গাড়ীতে উঠাইয়া দিয়া তিনিও পরের গাড়ীতে বেরাছন চলিয়া গেলেন। এদিকে ধর-পাকড়ের হিড়িক পড়িয়া গেল।

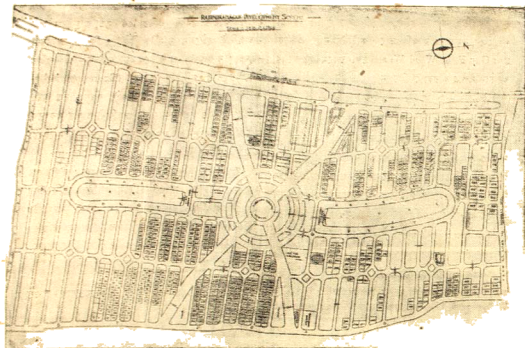
বেরাছনে সকালে যাহার সঙ্গে দেখা হয়, এই প্রসঙ্গ উঠিলে রাসবিহারীর জোহরের পরিসীমা থাকে না। কি পার্শ্বিক বাহ্যিক। বড়লাটের উপরে গুলি। সেইদিনই লঙ্ঘ্য বড়লাটে বঙ্গ ও স্বাধীনতা করিয়া ও ঐ

মুগ্ধে কর্তব্যের নিম্ন। করিয়া এক সত্য আত্ম হইল। সভাপতিই হইলেন রাসবিহারী। ও কি সে জালাদারী বক্তৃতা! বড়লাটের প্রতি বোমা নিক্ষেপ—এই গর্হিত কার্যের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া, (Expressing indignation at the dastardly Crime) কখনও বঙ্গ বর্ষণ করিয়া, কখনও অক্ষম নরনে ওজস্বিনী তাহার সকলকে মুগ্ধ করিয়া দিলেন। সকলে বলিল, 'দেওতা', সাহেবরা বলিলেন, Oh! What an angel Rasbehari!

স্বাধীনতা করিবার গুপ্ত বড়লাট বহাভূত ইহার শব্দ সঙ্গীত বেরাছনে সাক্ষি হইলে আসিয়া থাকিলেন। এখানে রাসবিহারীর ছিল অব্যাহিত দ্বার। বড়লাটের মিলিটারী সেক্রেটারী রাসবিহারীর কাছে বাসলা পড়িত।

এতবড় একটা প্রসঙ্গও হইয়া গেল, কিন্তু কেহই প্রকাশ্যেও আত্মত্যাগ কোন স্থান পাইল না।





## বালিগঞ্জ নগর

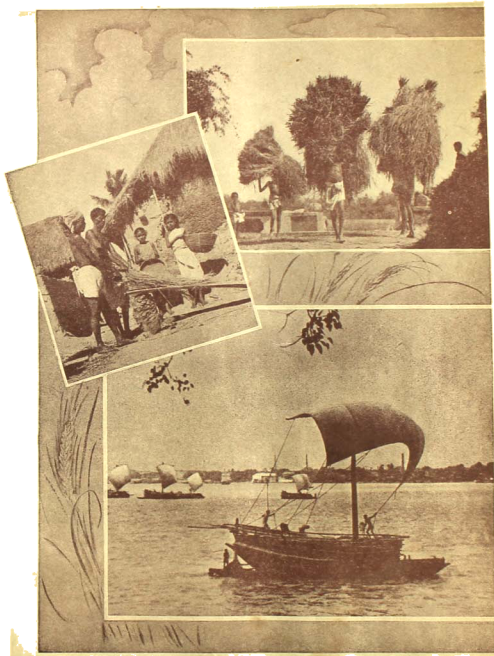
বালিগঞ্জ বিল্ডিং সোসাইটী লিঃ ঢাকার মেলায় বিকৃতিকর নামে প্রকাশিত 'ব্রহ্মীন্দ্র নগর' নামে একটি নতুন সহর পুস্তকের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করিয়াছেন। ইঙ্গ কলিকাতা হইতে মাত্র ২০ মাইল দূরে প্রাচীন উৎকল যোড়ের পাশে হুগলী ও চুচুড়া রেলপথের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। সহর হইতে গঙ্গা এক মাইল দূরে। আধুনিক স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের সকল প্রকার সুব্যবস্থা সমাবেশে ইঙ্গ একটি স্বাস্থ্যকর স্থানে পরিণত হইবে। সহর পরিষ্করণ প্রায় ২০০০ জনের দ্বারা হইবে, প্রতিটি ব্লক হইতে ১০ কাঠা পরিমিত বিভিন্ন আকৃতির এবং যাকলাব মধ্যস্থিত ক্ষেত্র প্রয়োজনের উপযোগী। পরিষ্করণটি পূর্ণাঙ্গ হইবে একটি কলাকেন্দ্র এবং পার্শ্ববর্তী পূজা-যজ্ঞের সমাবেশে—ইঙ্গ ছাড়া বালক ও বালিকাদের স্কুল বিভাগ, হাসপাতাল, জম্মতি-জনন, যুবক ও কিশোরদের স্কুল খেলাঘর মাঠ, মহিলাদের স্কুল একটি পার্ক, ছেলে ও মেয়েদের স্কুল পুস্তক পুস্তক প্রতীক, পুল সমন্বিত একটি লেক, প্রমত্ত বাড়ি, পরিমিত চিত্র ও নাট্যশালা, পোষ্ট অফিস ইত্যাদি এবং অভ্যন্তরীণ বাহ্যিক আধুনিক প্রতিষ্ঠা এই নতুন সহরটিতে থাকিবে। সহর জল সরবরাহের এবং মল নিষ্কাশনের নিষ্কল ব্যবস্থা করা হইবে। সহরে যে সকল বাড়ী ইহা হইতে তাড়াতাড়ি প্রান্তিকভাবে বিক্রি ও ইলেক্ট্রিক্যাল সংযোগ থাকিবে। বাড়িগুলি ১০০ ফিট হইতে ন্যূনতম ২০ ফিট পর্যন্ত প্রশস্ত হইবে। কাগজের অভাবটুকু এই সংকে কোন বিদ্যুৎ পুষ্টিকা কাপোয়ান সহর ভর মাত্র, কিন্তু ১০০ আশ্রিত থাকিবে হইতে এই পরিষ্করণের নতুন সর্বসাধারণের স্কুল খেলাঘর। অন্য ডোভার লেন কোম্পানীর ওয়ার্ল্ডস অফিস অফিস এই নতুন বোনা বাইতে পাবে। এখনও প্রতিদিন সন্ধ্যা মিথিলায় চর মালিকান বস্তা, জেমন ও মল সরবরাহের ব্যয় হিচাপে এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। বিদ্যুৎ কোম্পানীর নিম্ন অস্থায়ী প্রটেক্টর ভদ্র নামে খেঁচকারী ক্ষম হইতেছে। বিজ্ঞপ্তি বিবরণের জন্য যে কোন দিন বেলা ১০-১০টা হইতে বৈকাল ৫টা নাখা সাক্ষাৎ করুন। পূজাঘর দুটি মনো ও অফিস প্রান্তে ১০টা পর্যন্ত বোনা থাকিবে।

ডাঃ এন্স. এন্স. সিংহ. ডিরেক্টর.

## বালিগঞ্জ বিল্ডিং সোসাইটী লিঃ

ওয়ার্ল্ডস অফিস : ৩৭ ডোভার লেন, কলিকাতা ২৯। ফোন : পি, কে, ১৯৬







পঞ্চদশ বর্ষ

অগ্রহায়ণ - ১৩৫৪

{ ১ম পত্র - ৬ষ্ঠ সংখ্যা

## অবস্থাতেই বুঝিয়ে দেয়

ঐক্যদারনাথ কল্যাপাধ্যায়

ময়মনে বিরাট শতা। আদিত্য-কোমলতা কেয়াগীই বেশী। কিছু ফুল-কলসের ছাত্র, পাচ-দিশালী জনতাও আছে। ঐ সাহেব বক্তৃতা দিতেছেন।

“আমরা আমাদের গৌরবের ঐতিহ্যের কথা আজ ভুলতে বসেছি। ভুলে গিয়েছি যে, আমরা সেই চৌকী ধর উত্তরাধিকারী—যাঁর উজ্জ্বল স্মরণি একদিন সশস্ত্র প্রোচের বাধা নত করিয়েছিল। ভুলে গিয়েছি যে, আমরা বীর মহম্মদ ঘোড়ার যুগোজ—যিনি অষ্টাদশ বার ভারতের হিন্দু রাজাদের পরাজিত ও লাহিত করেছিলেন। আমরা বিদ্রোহেরী তৈমুরশাহের বংশধর, সপ্তদশ দৈনিকের অধিনায়ক বঙ্গবিজেতা বক্তৃতার বিলিকীর হস্ত এখনও আমাদের শিরায় প্রবাহিত।—এ কথা ভুললে আমাদের বৈশিষ্ট্য হারান, কালের হিন্দুদের সঙ্গে এক হয়ে যাব। তা কিছুতেই হ’তে পারে না। আমাদের স্বপ্ন আলাদা, আতি আলাদা, সংস্কৃতি আলাদা, আমরা চিরকাল আলাদাই থাকব। এ দেশ আমরা: বীরাণ্ডে, স্কটের বিনিময়ে চর করেছিলাম, এ দেশ আমাদের।”

ওদিকে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে জনসভায় গমন হইয়া উঠিয়াছে। জনপ্রিয় নেতা হ্রীদলকান্ত সিংহ বলিতে-ছিলেন—“রাজ হিন্দু আত্মবিশ্বস্ত, তাই সে লাহিত, অবমানিত, প্রতিপদে অংগেহিত। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, একদিন এই হিন্দুগাই শোধে বীর্ষো, জ্ঞান ভগ্নতের সভ্যতার অগ্নি ছিল। এবাই অগ্নিতে দর্শন-বিজ্ঞানের চরমোৎকর্ষ বেধিয়েছে। এবেরই রাণা প্রতাপসিংহ প্রথম পরাক্রান্ত যোগেশ্বর সঙ্গে সংগ্রাম করে আত্মবিশ্বস্ত অত্মর রেখেছিলেন; মহারাণা শিবাজীর গৈরিক পতাকার ভাষার দীপ্তি অত্যাচারী আওরঙ্গজেবের অর্ধচন্দ্র রান করে দিয়েছিল। আমাদের মনে রাখতে হবে যে প্রতাপসিংহ শিবাজীর বীররক্ত আজও আমাদের রক্তকে পরিপূর্ণ করে। মনে রাখতে হবে, এট বাঙ্গলাই রাজা বিহারসিংহ, যিনি ভারতীয় সভ্যতার প্রচারে হুদুং সিংহল ধর করেছিলেন, তিনি আমাদেরই পরিজন। এ দেশে আরহমানকাল হিন্দু ছিল, হিন্দুই থাকবে। বিদেশী বিদ্রোহকে আমরা ঘন দিতে পারি কিন্তু আশ্রিত হিন্দু।

অথও হিব্রুহান একবারে আনায়েনই দেশ। সেইর গোলান হোসেন ও রসমর ঘোষাল বসাক্রমে বয়সান ও পাঠ হইতে বাহির হইয়া শিয়ালকদেহে রাঙা বহিলেন। উভয়েই সওদাগরী আপিসের কেরানী, ভেলিপায়েসেবার। উভয়েই এক গ্রামে পাশাপাশি বাড়ীতে বাসেন, এক পাচিলে বসিলেও অতৃপ্তি হয় না। এ বাড়ীর কথাবার্তা বজ্রক্ষেপ ও বাড়ী পৌছায়, রসমর-গৃহিণী বাড়ীতে বসিয়া অক্লেশে হোসেন সাহেবের স্ত্রীর সহিত সংসারখাতার পুঁটিনাটি আলোচনা করিয়া থাকেন। ট্রেনের সঙ্গে উভয়ের দেখা হইল, কিন্তু বাক্যালাপ হইল না।

অক্সফোর্ড একজনের আসিতে দেখী হইলে অক্সফোর্ড তাঁহার ভক্ত অপেক্ষা করিতেন। তাঁহার পর আপিসের বড়বাবু চূর্ণাবহার, কোম্পানীর অধিষ্ঠার, সংসারের অজ্ঞান-অভিযোগ অর্থাৎ ছুটা দুখ-দুঃখের কথা কহিতে কহিতে একসঙ্গে বাড়ী পর্য্যন্ত যাওয়া—ইহাই ছিল নিয়ম এবং আপিস ও সংসার লইয়া সাতা বিনের নীরব, কর্তব্যস্বভাবের পর এই অবসর টুকুর ভক্ত উভয়েই উদ্বিগ্ন হইয়া থাকিতেন। আর নিঃসঙ্গ ব্যক্তিগণ যতিল। আর অতীতের বলিষ্ট ইতিহাসে তাঁহাদের ন্যায়েরিঃ-পীড়িত অকালকীর শরীরে উত্তেজনা আনিয়াছে, স্ত্রীকথা ও প্রতাপসিংহের যুগ্মান বীররক্ত মস্তিষ্ক উত্তপ্ত করিয়াছে। সুতরাং রসমর বিদ্যমী গোলান হোসেনকে দেখিয়াও বেন তিনিতে পারিলেন না; হোসেন সাহেবও কালের রসমরকে দেখিয়া নূন কিরাইয়া গেলেন।

গাড়ীতে উঠিয়া জাতা-ছুতা সাবলাইয়া ভাল করিয়া বসিবার পর অজ্ঞাত সহযাত্রীদের প্রতি বনোযোগ দিবার অবসর হইলে রসমর দেখিলেন সানবের বেড়ে নুসানুখি গোলান হোসেন বসিয়া আছেন। দীর্ঘকালের অভ্যাগ অজ্ঞাতসারে কাণ্ড করিয়াছে। মনটা বিবাহীয়া জটিল, এতটা পথ ঐ লোকটির সহিত এক সঙ্গে কাটাইতে হইবে। আগে আনিলে অল্প কামনার উদ্ভিষ্টেন। কিন্তু উপায় ছিল না, ট্রেন ছাড়িবার ঘণ্টা দিয়াছে, তিলক বনে রসমর পাশের নাড়োয়ারী অজ্ঞানেকের প্রতি বনোযোগ দিলেন, বনে বনে একটু

আত্মীয়তাও অস্বস্তি করিলেন। হাজার হউক বদমী এবং বজাতীর, ইহারাষ্ট তো সত্যাকার আপনার লোক। কিন্তু ফটকার বাজায়, পাটের ঘর, তিনিই ভেঙাল কার-বায়ের বস্ত্র হিসাব তনিত্ত তনিত্তে কথার খেই হারায়াই ফেলিলেন, গল্প বেনীকণ চলিল না। হোসেন সাহেবও সজবস্ত: স্বপ্নসংকতিভাষ্য আত্মীয়তাহুয়ে কোণের কাবুলীওয়ালারটির সহিত 'শালান' বিনিবয়েহ পর আলাপ আরম্ভ করিয়াছিলেন কিন্তু উদ্‌বৃদ্ধিত পোস্তর সহিত খাটি বাতলায় আলাপ জমিল না। ছুই চাষিখবার পর বামিয়া গেল। গোলান হোসেন ও রসমর ঘোষাল বিকল্প মনে নীরবে বসিয়া বহিলেন। গাড়ী যাত্রাতি কলসী-ভাঙায় আসিয়া বানিল। ট্রেন হইতে বাহির হইয়া উভয়ে পরিত্রিত পথ হরিয়া অপরিত্রিতের নত ইটিতে লাগিলেন। আর ইহাদের মধ্যে ব্যবধান দুস্তর—জাতি, ধর্ম, সংজ্ঞাতি সবই পুণক, সুভাষা অথও নীরবতার বধন বাড়ী পৌঁছিলেন তখন সজ্ঞা উজীর হইয়াছে।

—“বন্ধু, তোরা বা কোথায় যে, সব অককার কেন?” রসমর বাড়ী ছুকিলেন।

“না ঐ পশ্চিমের দূরে আছে। আলো নেই বে, পড়ব কি করে?” “এখনও আলো আলা হয়নি কেন?” বলিতে বলিতে রসমর নাওয়ার উঠিলেন।

“ক’দিন থেকেই তো বনছি তেল তুরিয়েছে। আর এক ফোঁটাও নেই, রোগ! মেয়েটাকে অন্ধকারে শুইয়ে রাখতে হয়েছে।” ঘরের ভিতর হইতে ক্লান্ত কণ্ঠের আওয়াজ আসিল। “তুকে আর কেমন আছে গো?” এককণে রসমরের বনে গড়িল। আপিসের ফাইল ও লেখার ও সভাব অবলাকান্ত সিংহের প্রবর বাস্তিতার উত্তেজনায় কনিষ্ঠা সস্তার অস্বস্তির কথা তিনি জুগিয়া দিয়াছিলেন। বেচারী ১২.১৪ দিন ক্রমায়ে তুগিতেছে।

“এর তো একতাবেই রহিয়াছে—”

“খেয়েছে কি?” চিন্তিত মুখে রসমর প্রশ্ন করিলেন। “তপু শীতকৃত আর কিছুতেই খেতে চাই না। ক’দিন তো হয়ে গেল, শান্ত মেয়ে তাই জুগিরে ভাসিয়ে খাওয়াচ্ছিলাম, এমুই মিচরিও তো এল না।”

প্রীর কণ্ঠে অভিযোগ ছিল সানাক্রাই হস্তাণার স্মৃতি

ছিল বেশী কিন্তু এটুইই রসনের অক্ষমতার লক্ষ্যে  
আখ্যাত করিল। বলিলেন—“বা বেশে পাওয়া যায় না,  
তা নিয়ে শোক করে তো লাভ নেই। ওর চেয়ে  
হীরে-মুক্তো কেনা এখন সম্ভব।”

“একটু তিনিও তো বাড়াতে নেই। যা ছিল গেল  
সম্প্রাচ্ছেই শেখ হয়ে গেছে।”

“সবই আমার কপাল। বাঙ্-গে, এখন তেলের  
বোতলটা আর একটা গামছা কি এক টুকরা কাপড় যা-হর  
কিছু দাও, বেশিগে চোঁটা করে।”

রসনের পন্ডিষের ঘরের সামনে গিয়া ঠাড়াইলেন।  
“সারাদা দিন বেটে এই বাড়ী চুকলে, একটু জিরোও, বুখে  
হাতে জল দাও, তার পর বেও এখন।”

“না বাবু। কর্তব্যটা আগে সেবে আসি।” রসনের  
দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া নাওয়ার উপর বসিয়া পড়িলেন।

গোলাম হোসেনও নিরবজির শায়িতে আত্মা  
করিবার অবকাশ পান নাই। ও বাড়ীর টুকরা টাকরা  
কথা হইতে বুঝা বাইতে ছন যে, ভাঁড়ারে চাল বাড়ত  
এবং অবিলম্বে ব্যবস্থা না করিলে যে এ বেলা হাঁড়ি চড়বে  
না—এ কথা প্রবেশদ্বায়ে হোসেন সাহেবের কর্ণদোচর  
হইয়াছে।

কিছুক্ষণ পরে। রসনের তেলের বোতল ও গামছা  
পাইয়াছেন। তেল নাই হুতরায় লটন ও নাই, আর  
উর্জের ব্যাটারো তো পূর্বকালের বিশেষ স্মৃতি না থাকিলে  
আজকাল পাওয়াই যায় না, অপর্যাপ্ত। রসনের ভালি বাড়াইতে  
বাড়াইতে অন্ধকারে বাজারের পথ গরিলেন। বানিকটা  
বাওয়ার পর শিহন হইতে আওয়ার আলিল—“বোখালে  
মাকি।”

রসনের ঠাড়াইয়া পড়িলেন। শিহন ফিরিয়া বেখেন  
লটন হাতে গোলাম হোসেন আসিতেছেন।

“হোসেন ভাই, কোথায় চললে?”

“বাজারের দিকে, বজল বিক্রায় গোলা পর্যন্ত।  
কুঁচি।”

“বানিও ঐকিছুই থাকি, গোলোক শার বোকায়ে  
যাব একবার।”

“একটা আলো নাওনি কেন? এ সময় অন্ধকারে

যেদোনো উড়িত নাহ, ওপাড়ায় শ্রীনবর ছেলোটাকে তে  
দিক বোড়ের ওপর কানড়ালে গে দিন।”

একটু হাসি ভাঙ্গিয়া রসনের বলিলেন “আলো জলবে  
কি দিয়ে! বাড়ী ঢুকে বেশি সব অন্ধকার। মটুর না  
বললেন আর এক কোঁটাও তেল নেই। বোতল নিয়ে  
খেরিয়েছি বেশ না। আর এক মূঁড়ল খরোজে পুঁকীটাকে  
নিগে, তিনি বিহুর কিছু একটা না হলে সে আর পটা  
থাবে না, আরওনি দাড়াবিন—”

“ভারই বা দোষ কি বল—তেলে নাহুব—”

“না, বোখা কাকুরই নর কিছু কি করে যে কোণ্ড  
হয়! বানি তো আর গেবে উঠি না তাই।”

“সবারই ঐ একই অবস্থানে নানা, ও নিয়ে আর মাথা  
খরাপ করে লাভ কি বল। এই বেশ না, লনত দিন  
পরে এক পোছর রাত কাটিয়ে বাড়ী এলান। বুখে  
হাতেও জল হিইনি, বললে চাল না আনলে এ বেলা  
হাঁড়ি চড়বে না। আনলা থেকে লুপীখানা টেনে নিয়ে  
বেড়ির পকেট, তারপর বজল বিক্রায় মজি—নগর টাকা  
দিয়েও দুনা নামে জিনিষ পায কি না জানি না।”

কথা কহিতে কহিতে বাজারের মোড় আসিয়া  
গিয়াছিল। এখানে হইতে দু’জনকে দুইটিকে বাইতে  
হইবে। গোলাম হোসেন বাইবার আগে বলিয়া গেলেন  
“তোমার কংছ হরে গেলে এখানে এসে আমার ভক্তে  
অপেক্ষা কোরো বোখালে—একসময়েই যাওয়া যাবে,  
অন্ধকারে একলা যেন বেও না।”

কাছ চুকায়: রসনের মোড়ে আসিয়া ঠাড়াইলেন।  
জিনিষ পাইয়াছেন কিন্তু সুবিধা বুঝি। গোলক শা বু  
জো বাবই আবার করিয়াছে। নাস কাবারের এখনো  
যে অনেক বেরী, কতই বা ভাব: যায়। হোসেনের এত  
বেরী হচ্ছে কেন? তাহার নখে দুটা প্রাপের কথা কবিয়া  
তবু বানিকটা হাতা হওয়া যায়।

ক্রাও বেছে মোড়ে ঠাড়াইয়া অপেক্ষা করিতে করিতে  
রসনের বোখালের ঘন গোলাম হোসেনের অস্ত চকল  
হইয়া উঠিল। কোথায় গেল সে কিছুক্ষণ পূর্বে বেঠো  
বক্তাবের বুখে শোনো বহু বিদ্যুত কথা বান্ধাল। আর

পরের বাচ্চাকুহীতে মিথ্যা আপন যত্ন উপভোগ।  
ছি ছি—পাশল হয়েছি নাকি। হোসেন আমার বামা-  
বন্ধু, সহপাঠী, সহকর্মী, এক পাড়িলে বাস। চিরদিন  
একত্রে বসে, গাফানো, আর কাল কিনা তার সঙ্গে কথা  
কইলুম না! ছি ছি এ কোন্ বুদ্ধি এসেছিল। আজ তার  
পায়ে বসে কমা না চাইলে আমার শাস্তি নেই। কিন্তু  
সে এখনো—ফিরছে মৈ কেন, তার ভেত্রে আমার যে  
চিন্তা বাড়ছে। কাল না তেবেছিলাম তার সঙ্গে আর  
সব্বন্ধ রাখব না! তা কখনো সম্ভব নাকি? কি, হয়েছে  
কি? আনন্ড বা ছিলুম—তাই থাক, সেই ভাল  
নেই, সেই ভাল নেই, সেই মন নেই, সেই তেল  
নেই। কে যিত্তে আসছে কে? যারা বড় তার বড়ই  
থাকবে—আমরা আমরাই থাকব। তাই তো! হোসেন  
এলে যে বাচি—

অন্ধকারে কে বলে উঠলো “এই রকম করেই মৃত্যুর  
জান করে দে—

যোবাল। ও কি হোসেন, আবার পায়ে হাত কেন—  
হোসেন। জুনি না যিহে, না হয় আমিই যিহুম।  
এইবার সাপ্পটা জালি, নিবে গেছে। আমি অনেকক্ষণ  
এসেছি, কি সব বড়ছিলে, তনুভিহুম। এই বলেই হোসেন  
হলমহকে জড়িয়ে ধরে তার কাঁধে মাথা রাখলে। হলমহও  
তাকে জড়িয়ে কেঁদে উঠলো—“আর যেন আমাদের কুল  
না হয় তাই—বড় বড় থাকুক। আমাদের একমুঠো পর  
ছুটলেই যোগো।”

হোসেন বললে—ভিহরী আমরা সবাই, তারা নানের  
কাপাল, আমরা অয়ের। আমাদের খোঁজ কেউ নেবে না।  
যানো, বুকেই তো চলো। বাড়ীতে যেয়েই শুগেই।  
অবস্থাই নাহককে সভাটা বুঝিরে দেয়। উত্তরে দ্রুত  
ছুটলেন।

## বনস্পতি

ঐগোপাল বটব্যাল

গো! কড়! বনস্পতি যথো যথো কাঁপে।

অস্ত্র শাখার তার কত পঙ্কি-নীড়ে

সস্ত্র শাখা তত কাদারি যাপে :

ভেবেছো তাবের কথা গিসার ভীড়ে?

বনস্পতি সমাধিতে আঁতর্পনান্বিত!

কটিন সাধনা তার নীচ বকা লাগি,

কিনিত যতনী এত—সত্য-সাহা-স্মিত

অন্তরে উৎসল তাব প্রাণ তিক্রা দাগি।

প্রাণ অগ্নিতলে কাণে নিপাতর

কখন পড়িবে নীচ কুমিতলে থলি,

লাবক সাধনা বধে—অদ্রুত অস্ত্রব

অসহায় শাহকর কথা ভাবে বলি।

অস্তিত বড়ো প্রতি লাভকরে অবি!

নীলকণ্ঠ নিল বিধ বটে আপনার—

যতো দুঃখ যতো ক্রন্দন যেনে লর বসি,

ইদঘনে ওঠে মৃদা শান্তি-বাসিষ্ঠার।

# বিশ্বের রোমান্স

শ্রীজনরত্ন রায়

ছেলের বিষয়—গোপালের।

কিন্তু নামকরণ যোটেই ঠিক হইল না, কারণ 'রোমান্স' জিনিষটা এখনও নূনতম পল্কা—মনের মোহ—হাওয়া সহ্য না—ভাঙিয়া পড়ে। কিন্তু এই বিষয়ে তা' পাইলাম—তা' যে ভাঙিতে পারে না তাহা বন্ধ-লাভ।—বা' অন্তরে গাঁথা হইয়া গেল। কারণ, তা' হাওয়ার চেয়ে তের ভায়ি। তবে এক দল লোক আছে যাঁরা বলে এই দুনিয়াটাই হাওয়ার চলে—তার ভিতর-বাহিরে তখুই হাওয়া। স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি, আমি সে উড়ানো-উড়ুঁ মনের নই।—পৃথিবীর টানে আমার পা'ছুটা মাটির সঙ্গে গেঁথে আছে—আমরা মাটির-মাংস (?)—ওপরে উঠব না—উঠতে চাই না—আমরা বহনশী।—আকাশে উড়িতে গিয়া কি দশা যে হয়—তা' আমরা খুব দেখিয়াছি।... পাঁচটে কাটা খুঁড়ি সেই মাটিতে আঁগিয়াই পড়ে!—তার পর হু—সেই কাদার বার লটপট! তার চেয়ে বেশ আছি বাপু এই মাটির দেশে।—তা' সে বড় হোক—অথও হোক—কিছু যায় আসে না। হাঁ, বলিয়া রাখা ভালো—আমার খত্তরবাড়ী বড় বেশে।

বাড়—কি বলিতে কি বলিতেছি?—আয়তরিত লিখতে বলিলাম না'কি?

ব্যতিক্রম হইতেছে—অভ্যাগটা দিবকতক করিয়া গিয়াছে।—সত্য মিথ্যা সাঝাইবা গম কলার অভ্যাগটা।

এটা অল্প দিকে ভাল দিতে যাওয়ার কল।

বা'র অল্প শুকতেই গড়গোল হইল নাম রাখা নিয়া।—গম লেখা শুরু জিনিষ। আমরা মশ্ব কবিত্তে গিয়া ইহা বেশ বুঝিয়াছি। এটা একেবারে কুজটিকা হইলে চলিবে না। বরং জলন্তের মতো। দুনিয়ার সঙ্গে খানিকটা লাগিয়া থাকে চাই। এইভাবে বলার কাক্তে বার্তা পাক্‌গুত্তান তা'র অন্যর হইয়া যায়। বাস, বাজীকি, শরুজ—সবাই ঐ এক পোড়ের লোক। ইতিহাস, সাহিত্য—সবই যে সত্য-মিথ্যা দিশানো গয়ের কাঁপা।—শ্রীকৃ তা'র নাম পূরণ—রাখার—বিস্তরক বা চরিত্রবাদী—সব ঐ এক জিনিষ। আমাদের চোট গর—ঐ বিশ্বের রোমান্সও বিদ্ধ তাই।

এইবার বলি তখন—

বিশ্বের নামে কিন্তু ছেলে ভয়াইত। বলিত—এটা নাকালু কল। আবার মনে তাহা সার বিত না। কারণ ভাল-বিল্লি-উক্ সবই এ'তে আছে—দীর্ঘকাল পরখ করিয়া বেখিতেছি! তখু তৈতো নয়। তবে 'দিল্লিকা' নাড়ু' বলিতে পার বজ্জনে। কারণ খাইয়া পশ্চাত্তাপ পার নাই—বুঝি আপনান-আমার মতো ছু'এক জন(?)—অবিত্তি যদি আমরা দত্তি কথা বলি।—তবে পত্তার গ্রার বোল মানা—সবাই। আবার যাঁরা না: যার তত্তাত্ত হা-হুতাপ করিয়া বুক চাপড়িয়া মরে!

একটা বাজে কথা বলিয়া: নিই—মকুবা প্রদব বেরনা ঘাইবে না।—হিংসিত্তবুখে, আর পেরাভলিত্তবুখে ছু' মনেই তো দিল্লীর নাড়ু' বাইলেন, দেখিতেছি। এ'র কল কি হয় দেখিবার জিনিষ!

এটা কিন্তু আমাদের গয়ের কোনকিছু নয়। আমাদের গম হইল বিশ্বের রোমান্স নিয়া।

এই বোশেখ মাসের শুভ পরবার দিনই স্ত্রী বলিলেন—ছেলের বিয়ে দিতে হবে এই মাসেই।

বহুতপস্বাদিনী সতীদের দাক্ষণ সমীহ করি। আমাদের স্ত্রীর নামের সহিত আবার এক সতীর নামের মিল আছে। এইসব সতীদের সাপটু জানি! তাই হতভম্ব হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—বিয়ে?—ছেলে বিয়ে করবে?—কোঁথার—কোন্ মেয়েকে?

বলিলেন—ছেলে মনেছে এই বোশেখ মাসের মধ্যে বিয়ে হওয়া চাই—নৈলে সে আর বিয়েই করবে না।

তোমাককর বটো—তবে এখন বাপ।

একটু দম নিয়া স্ত্রী বলিতে লাগিলেন—জাছা, ছেলে বিয়ে করবে না—এখন আশুগুবি কথা তুঁদি জাবলে কেন?—ছেলের বিশ্বের বরস পেরিয়ে যেতে চলেছে যে। তুমি না মিল বছরে কোটপিল করে বিয়ে করেছিলে।

বাধা হইয়া উত্তর দিতে হইল। বলিলাম—দেখ, আমাদের দেশে কোটপিলটা সতীরাই করে এসেছেন।—সতীস্বমীদের এ ঘোষটা রীতিমত আছে।

কিন্তু যথোপ পাইলেই উনি নিজের সোখটা আনার  
থাকে চাপান।

শ্রী আবার বলিলেন—হেদের কথা তথা দেই  
মেয়েটী—কলমে পড়ে—গান জানে—খুবী পড়িতে  
চড়ে বেঁচে হয়—

বুজিলান প্রজ্ঞাপতির নির্মল নামে সেবেক বোমাপ্ত !  
কারণ, স্ত্রোমাকবর আবহাওয়ার সঙ্গে অংকন হয় এই  
বিয়ের কথা: একটি 'সাহিত্য-বাসন'। আমার একটি  
সাহিত্যিক বস্তু তমো নাতুল সেখানে এই কথাটি  
পাড়েন।

শ্রীকে বলিলেন—কিন্তু—

তিনি বলিলেন—কিন্তু কী ? তুমি বেবেছিলে। তা  
সেবেক নব্বয় নয় আমি আমার চোখে দেখে। আমার  
তো অঙ্গরী নই—কিন্তু তোমাদের সাঙ্গারে অলভ্যতা কি  
হয়েছে আবহা এসে ?

সতীলক্ষ্মীরের ভিত বহন চলে, তখন কি বলিলে কি  
হয় আমি। চুপ করিয়া সেলাম।

শ্রী বেবেছিলে মেয়েটীকে—আইজার হইয়া গেল।

বলিলেন—তোমাদের চোখের ঠিক নেই। তখন  
সেবেছিলে কোন্ চোখে, আর এখনই বা সেবেক কোন্  
চোখে ?

প্রবু হইতেছিলান বলিতে—তখন বেবিয়াছিলান  
আমার চোখে—আর এখন সেবেতেছি তোমার চোখে।  
কিন্তু শাসন হইল না বলিতে। সতীলক্ষ্মী কোন্ দেহাতে  
বলিলেন বেশ বুঝিতে পারিলান না। যদি রোমান্স ভেঙে  
যায়—থাক! প্রজ্ঞাপতি পার্থা দুলাইয়া বেড়াইতে  
লাগিলেন।

বিবাহের আগের দিন।

ঐশ আছে পাত্র বৈকালের এক্সপ্রেসে বাইবে।  
সঙ্গে বাইবেন তার মা, আরও ছ'একজন। এক্সপ্রেস  
রাস্তা ভিনটায় পৌঁছিতে। একটু বিলান নিয়া ভোরের  
দিকে পাত্র কবিরসল করিবে। তারপর সকালে হইবে  
গারে হাঁসু—ইত্যাদি। আর—বব্বাজীর দল হাজার  
প্যাসেঞ্জারে দিগে বিয়ের দিন সকালে পৌঁছিতে।

পাত্র থাকিল কলিকাতায়, তার বন্ধুবান্ধবদের যোগাড়  
করিয়া নিয়া সকাল আগে হাওড়া ষ্টেশনে আসিবে।  
পাত্রের বাপ-মা প্রভৃতি আমরা, এ মাফন হইতে ছুঁপরের  
ট্রেন লক্ষ্য করিয়া ষ্টেশনে চলিয়াছি।

ষ্টেশনে আসিবার কালে কি উৎসাহ—কি রোমনাক,  
করদিন হইতে গুঁটিমাটি কত কি যে ভরাইয়া গওয়া হইল।  
গায়ে হালুনের হালুখাটা—পাতি নব্বয়ের চুবুড়িটা। বাসি  
বিয়ের কাপড় কৈ দেহুই না তো ? পাত্রের না বাড়িগত,  
সেগে বাবা চাইয়া আমাকে চীৎকার করিতে হইল—এই  
ট্রেন ফেন হলে সব বানচাল হয়ে যাবে—ষ্টেশনে চল।

ছ'একটা ভিনিস সতাই পড়িয়া থাকিল। তার মধ্যে  
থাকিল বব্বাজীরের খাবার তত্ত্ব লুচি-সেবাই খুঁড়িটা, ছই  
নব্বয়ের সেই কলের কুঁচোটা।—কি বিলটি।

তুমি সেলাম এ সব ছোটখাট কথা—এ যে ষ্টেশন  
সেবা বাইকেছে !

ষ্টেশনে আসিয়া ভিনিস গুনিয়া নামানোর ডার দেওয়া  
হইল তাইপোনের ওপর। টিকিট কিনিতে টাকা দেওয়া  
গেল আনাইকে। আমার ছোট ভ্রাতার সঙ্গে আমার শ্রী  
বাঁহিতে বাঁহিতে বলিতেছেন পোনা গেল—বাড়ি থেকে  
লুচির খুঁড়িটা যেমন কোরে হোক আনাও ঠাকুর-পো—  
নৈলে হাওড়া ষ্টেশনের সেই তো সব অখ্যাত আর  
আজনের হয়ে খাবার-পত্র—।

টিকিট-খর হইতে চুটিয়া আসিয়া আনাই বলিলেন—  
তারি বিপদ হল—ট্রেন সাত বটা লেট !

যাঃ! মাথার ধাত দিয়া বদিয়া পড়িলান।—এক  
কুৎকারে সব রোমনাক বিলাইয়া ফেল।

আর চার বটা পরে একখানা পাকি পাওয়া গেল।  
জায়াতেই উঠিলান।

হাঁ, ইতিমধ্যে বাড়ী থেকে বড় বেগে খুঁড়ি করিয়া  
লুচির খুঁড়িটা ষ্টেশনে পাঠাইয়া দিয়াছে।

বাড়ী করিবে না বলিয়াই এ ট্রেনটার উঠিলান। আমি  
এ ট্রেনে দিয়া সেগারে পুরী কোন ট্রেন আর পাওয়া  
বাইবে না। তবে পরের দিন সকালে হাওড়া থেকে  
নাওয়া চলিবে। যদি হেলে হাওড়া ষ্টেশনে থাকে, তবে  
বিবাহের লক্ষের আগে পৌঁছান সম্ভব হবে।

হাওড়ায় বাড়িমানি পৌছিল রাত বারোটায়।  
কোথায় বা ছেলে?—একটু পরিত্রিত খুণও নাই।

ভাড়াভাড়ি ওয়েটিং-রনে সকলকে চলিয়া বাড়িতে  
হইল। কারণ, স্টাটকরদের সব আলো এক সঙ্গে নিভিয়া  
গেল।

হাওড়া ট্রেনে বেয়েবের ওয়েটিং-রনে, আর পুকুরের  
ওয়েটিং-রনে পাশাপাশি। জিনিষ নানাইবা বাধায় রাত  
দিয়া সবাই বসিয়া আছে।

ঘটানামের কাটিয়া গেল।

উইলিয়াম—কর্তব্য ভুলিলে চলিবে না। নিবনে বুক  
বাধিতে হয়। ছেলেটা স্থায় বুনাইয়া পড়িতেছে।  
পুতুল-ঠাকুর বিস্ত্রিতের পাড়াগরি করিতেছেন। তাঁহাকে  
আজ অধিক শুভিতা দেখাইতে হইবে। ট্রেনে আনা  
লুটি-মুটি ভিনি বাইবেল না। ট্রেনেরে খাবারের সোকান,  
ফলের বোতল—সব বন্ধ। খুঁড়িয়া দেখা গেল উষ্ম লালের  
ঠেলা পড়িতে কিছু লতা আটার মোটা মোটা কালো  
পেরী আর দুর্ঘর্ষ মিঠাই আছে। পুরোহিত তাহা  
খাইয়াই লক্ষ্যে রাখিয়া পণ করিলেন। তেলেরে  
কিছু কিছু বাওরান গেল। নিভেদেরেও অস্ত্রানল বাঁধে-  
না-না।—

ওয়েটিং-রনের আশ্রয়ে হাওড়া ট্রেনে রাত কাটানো  
এই প্রথম। আগে এখানে কাহাকেও রাত কাটতে  
দিত না। কারফিউ জারীর কল্যাণে তাহা দিতেছে।  
বুন-অর্থনের গুণ নাই—কিন্তু চুরির গুণ বৈ নাই তা নহ।  
দারে পড়িয়া রকম-বেরকমের দাজী ওয়েটিং-রনে পড়িয়া  
আছে। পড়িয়া আছে বলিয়া তাদের পতপ্রকৃতি বুনাইয়া  
গিয়াছে—এমন মনে করিবার হেতু নাই বৃত্তিতে পারিলাম।  
চোখে পড়িল আবারের একটা বায়ের পিতলের ডালটা  
খুলিয়া দিয়া কুলিতেছে। আত্মকালকার তালগলে  
একটু দাক্ষ্যবাক্তিতেই খুলিয়া যায়। খুলিয়া পড়িয়া যায়  
নাই এই খুণ। জাবি লাগাইতে দিয়া বায়ের ডালটা  
খুলিলাম কিছু চুরি গেল কি না দেখতে। একটু ফিরিল  
সার্কেটে রোঁব দিতে দিতে ওয়েটিং-রনে ঢুকিয়া পড়িবাছে  
সে আবার খোলা বাসটার মধ্যে তার হাতের ছোট বেরটা  
চালাইয়া দিয়া ঝাঁকিয়া দেখিল। মনে হয়, বন্ধুক, পিতল

চুরি-ছোরা আছে কিনা তার অনুসন্ধান করিল। পাশে  
ফিরিয়া ত্রিশচল্লিশ জন পাতল-পরা খালি না সৈনিক  
তাদের জিনিষের গাধা আর সিগারেটের খোয়ার আড়ালে  
খুঁপাণ করিতেছিল। সার্কেটের আশ্রিতে সচলিত  
হইয়া তাদের দুই ভিনটা লোক বড়বড় করিয়া পলাইয়া  
যেন মনে হইল, তাদের মধ্যে একজনের নাখা হইতে পা  
পর্যন্ত বোঝা-জাপা ত্রোলোক। সার্কেটের একটু  
হাসিয়া চলিয়া গেল। যাইবার সব নিত্যরত ৩৬ পেট  
ন্যানটাকে একটা ছপটি সাগোইয়া দিয়া গেল। লতা  
আবির মেজাজ এখনো তেননিই আছে বুলিলাম। হড়া-  
ছড়ি শব্দে আবারের বনের অনেকই আগিয়া উঠিল।  
আনি তাদের বলিলাম একটু করে তোদল। কিছু যুখে  
দাও। আনি আর এসব সানলেতে পারছি না। দুইটা  
হুঁর অনেকখণ হইতেই আনাগোনা শুরু করিয়াছে।  
আমার ভয়গতি বলিলেন—রাত কত? বলিলাম প্রায়  
তিন প্রায়। তিনি বলিলেন—খোঁঠাকরকে কিছু  
প্রাঠান উচিত ছিল একতর।

আমরা খুণ-হাত দুইতে কলে বাইতেছি। যাইতে  
যাইতে আবার লেজ ভায়া বলিলেন—তুমি খুণে কিছু  
সানলে উঠেই দেখছি—গোপালের কোন ঝেঁজ গেলে  
না কি?

বলিলাম—ঝেঁজ পাই নি—তবে তরসা পাছি বুক,  
যে গোপাল একসঙ্গেই গিগেছে—আমার একটা বন্ধ  
গোপালকে খুণ ভাল বাসেন—সঙ্গীক বহুদাজী বাবের  
বলেছিলেন তাঁহাই বৃত্তি করে নিয়ে গেছেন। হঠাৎ বেয়ে-  
বের ওয়েটিং-রনে হইতে একটু; যেন তাঁৎকারের শব্দ কানে  
আসিল। তাইপো—বলিল—কোজনার গলা যে—  
আমিও শুনিলাম আমার জী বলিতেছেন—বেখহ বেখহ  
—ঠাকুর বলে গেলেন—শিবের পাড়িয়ে বলে গেলেন—  
ছেলের সঙ্গে সব আপনার লোক গিয়েছেন, সব করে  
দেবেন তাঁরা—ঠাকুর দেবেন—

সবাই বেয়ে-ওয়েটিং-রনের দিকে নৌড়িল। দাক্ষ্য-  
বাক্তিতে হিঁপুখানী দানী দ্বারা খুলিল। আনিও কোঁ-  
হলী হইয়া গিয়া পড়িলাম। গিয়া দেখি ত্রী-প্রশাম  
করিতে করিতে বলিতেছেন—ওঁকে ছেড়ে ছুঁনি এগো না



ঠাকুর—সে যে আমার জীবননে, আমার গোপাল-  
হেনব বিয়েতে কোন :জলের কাজ করতে গেলাম না  
আমি—তুমি খেব সেখানে—তুমি খেব ঠাকুর—ঠাকুর—  
ঠাকুর!

আমার ভগ্নীপতি একটু সাধুগ্রন্থতির লোক। তিনি  
বলিয়া উঠিলেন—আর কোন চিহ্ন নেই—গোপাল ঠিকই  
গিয়েছে—এতকণ খোঁজে পেল—ঠাকুরের দয়া—আশনা-  
দের গুরুত্ব হয়।

সকলেরই মন খানিকটা হাফা হইয়া গেল। বিশেষতঃ  
ওতটিংকনের বিবাক্ত দ্রুতি হাওয়া থেকে ঝাঁকায়  
আশিঃ সকলে যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। ঠেঁসনের  
ইটার দ্রুত টিকিট-খরচের সামনে পাখার নীচে ছেলেরা  
দু'খানা সন্তর্ভক্তি বিছাইয়া ফেলিল। সকলেরই তখন  
আহাঃের দ্বন্দ্ব কুটি আশিরাজে বেলিলেন। বাইতে বলিয়া  
আমার ত্যাগ আমার দ্বন্দ্বকে বলিলেন—আপনার কথা  
আমর: নিশ্চিন্তি হয়ে যেতে বসলাম—কিন্তু আপনি তো  
নুপে বলও দিলেন না!

শ্রী বলিলেন—সান্তার কাগজ আমার ছাড়তে হবে—  
ভোরও তে: হ'ল—ভোরের সামনের গঙ্গার মান-আলিক  
করে তার পর যা হর হবে।

সকলেই ছেলের জাতি বস্ত্রের নামে একখানা  
আর্জেন্ট টেমিগ্রাম করিয়া দিলাম। লিখিলাম—বিরের  
আগেই আমার পৌছিতেছি।

আবার যেন খানিকটা রোষাক অল্পতব করিলাম।

হানাদি ও প্রান্তরাল সনধ্য করিয়া কিণ্ডন তিনগুণ  
বরে হাওড়া ঠেঁসনে ফল নিষ্টি প্রবৃত্ত কেনা পেল।  
কারণ, এই দলটির সারা দিন কাটাঁইবার উপচার চাই।

আবার টেণে উঠিলাম। বি-এ-আর-এর ঠেঁসনগুলির  
নীচু নীচু গ্যাটকন, ছোট ছোট লাইটপোষ্ট, সহযাত্রী  
উদ্ভিদ্ধাবাসীদের ছাবতাব, পোষাক, তেলগু মহিলাদের  
অন্যত্বত বাথার স্বককেশ মনে যেন একটা দৈত্যের আবেশ  
আনিয়া দেয়। তার উপর বঙ্গপুত্র হইতে দ্বাত্রীর  
চাপাচাপি আর তীর পরনে একবারে 'ডিব গিফ' হইয়া  
গেল। কুঁছোর অল কখন বুঝাইয়াছে। যেখানে  
সেখানে অল বাওয়া অল করিল ছেলে-বুড়োর। আমার

এক পাশে একটা এগার বাওয়া বস্ত্রের তেলগু দেয়।  
আর এক পাশে বস্ত্র পরনের বস্ত্রের দৌহিত্য। একটা  
লম্বা দৌড়ের ঠেঁসন। তার মধ্যে তেলগু বেয়েটি হ'বার  
অল খাইল। দৌহিত্যটিরও তুফা পাইয়াছে। সে  
বলিল—দাদু, আমার একটু অল দিতে বল না।

বেয়েটি তার কথা বুঝিতে না পারিলেও তাদের  
মালে করিয়া একটু অল আনিয়া দাচ্চুকে দিল। দাদু  
তার হাত থেকে অল লইতে পারে না। আমি বলিলাম  
লক্ষ্য কি?—কেন দিচ্ছে বাও না। দাদু সেহাৎ প্রাণের  
দারে খাইল। তার কান দুটি লাল হইয়া উঠিল।  
বেয়েটিও দেখি দ্বাত্রীর দিকে চোখ করিয়া মাথা নীচু  
করিল। আশিলাম ত্রয়েরের কথা—

ট্রেণটা আসিয়া দাঁড়াইতেই দেখি অল্প গাড়ী থেকে  
ভার্য, জামাই, ভগ্নীপতি প্রবৃত্তি আসিয়া আমার ত্যাগ  
দিতে লাগিলেন—নাচো—নাচো—এলে পড়েছি তো—  
কি করছ? গরের 'স্ট' পেলে না কি?

কাজেই ভাড়াভাড়ি নাহিলাম। নামিবার সময়  
ফলের বৃত্তিটার অশনষ্ট কদলা লেবু দুটি ঐ তেলগু  
বালিকাটির হাতে দিলাম এবং তাহাকে একটু আদর  
করিলাম।

এই যে আপনারা এসে গিয়েছেন—গোপালও ঠেঁসনে  
আসছিল—বেশ ছেলে আপনায়—আর কি চমৎকার  
লোক আপনার বৃত্তি আর তাঁর জী—আপনার সব কাক  
করলেন তাঁরা।

পাত্রীর কাকার বস্ত্র—বিন আদারের ঠেঁসনে নিতে  
আসিয়াছিলেন, তিনি এক নিঃশ্বাসে এইগুন ততবার্তা  
জানাইলেন।

সকলেরই মনে পুলক-রোষাক জাগিয়া উঠিল। আমার  
মনটা বস্ত্র ও বস্ত্রপরীর প্রতি কৃতজ্ঞতার গুণপুত্র হইয়া  
দিয়াছে।

আমার দ্বীকে লক্ষ্য করিয়া আমার ভগ্নীপতি বলিলেন  
—ঠাকুরের কথা বিধে হয় না বৌদি।

আমার জী তখন হাত তুলিয়া ভগ্নবান্ধকে প্রাণ  
কহিতেছেন।

আমার ভগ্নীপতি বলিল: বাইতে লাগিলেন—ফেণু,

দাড়া, এই বৌদির পুণিতেই আপনাবের সংগারটা বেঁচে আছে

হাসিতে হাসিতে ভগ্নপতিকে বলিলেন বেয়ে-  
চেলেদের এতটা খোশামোদি করতে শিখলে কবে!  
তোমার সয়কারী চাকরীতে সাহেবকেই তো তোমাকে  
করতে হয় জানি!

কথাটা চাপা পড়িয়া গেল। আশাব্যবহী মুকু-  
পক বলিতেছেন তুলিলাস—পোপালের বিচ্ছিন্ন ঠেপনে  
আমি উঠিত ছিল—তার বাপ-মা, আত্মীয়স্বজন নেতদিন  
আপাত্ত হয়ে আসতে এইভাবে—

বহুখাত্তের আর সহকরক বলিলেন—বেরাই-এরও  
আমি উঠিত ছিল ঠিক এই কারণে মত কাজ ফেলে—

কথাগুলো একটু উঁচু পর্বতার উঠিতেই দেখি-  
আমার স্ত্রী কিছু শঙ্কিত হইলেন। আমি কিন্তু তাঁদের  
কণায় সাধ দিলাম। বলিলাম—হেলের আমা উঠিত  
ছিল বিচ্ছিন্ন—ভাতে তার পৌষ বাড়তো, সে গ্রাম্য  
সে নিতে পারলে না। তবে এই অপরিচিত লোকদের  
কাছে তার নিজে করে শুধু নিজেদের গারে কাগা রাখন  
হবে। আর আশাব্যবহী ছেপের কর্তব্যজ্ঞানের বাপকটি  
যখন এত ডোট...তখন বেরাইয়ের বলায় সেটা বড়  
হবে তারা নেহাৎ ছুঁচাশা হচ্ছে...

বিরক্তিতে অনেকই থান-বাহনে উঠিতে চাহিলেন  
না। সেবে কিন্তু বাহা হইয়াই সকলকে উঠিতে হইল,  
তারপ, বাইতে হইরে অনেকটা চুরে।

রোবাক যে পর্বতার উঠিয়াছিল, তাহা হইতে ছ' তিন  
বাণ নিতে নাসিয়া গেল।

লঙ্কার প্রোক্তাল।

বহুখাত্তের ব্যক্তিবার বাসার কাছে আসিতেই দেখি  
বহুবর বাসি গারে বাগার গাড়িয়া আছেন। গাড়ী  
হইতে নামিয়া তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলাম। সেই  
বুক আলিঙ্গন সকল কথা বলিয়া দিল। তাবিলাম—এই  
দীর্ঘ ভাবনে আমি আর কাহাকে এর আগে এমন ভাবে  
আলিঙ্গন করিতে পারিরাছি।...কৃতজ্ঞতা-ওরা বুক নিরে  
জীবনে আর কাহাকেও এমন ভাবে আলিঙ্গন করিতে  
পারি কি? মুখে শুধু বলিলাম—অস্বাস্তর আছে তা'

বিস্ময় করিবে কিং...কতায়বে আপনি আমার কে  
ছিলেন জানি না।-প্রান্তিমর তঁতে ইচ্ছে কইয়ে  
লঙ্কিতভাবে তিনি বলিলেন—অন্ত যে কোন নারস যা'  
করতো তার বেশী আমি কী কইয়েছি?—পোপালকে  
আমি তত্ত ভালবাসি তা' আপনি জানেন—আমি আমার  
স্ত্রী বহুখাত্তী হইতে চাওতা ঠেপনে এসেছিলাম—এবে  
তুলিলাস আপনাদের বাড়ী-বিরাটের কথা—তখন আমি  
লঙ্কিত নিরে পোপালকে গাড়ীতে কুলে নিলাম—বৈশে  
হিয়ে পণ্ড হই। তার আপন পুতো সঙ্গে থাকলে দা  
করভেন আমি তা' বেশী আর কিছু করিনি।

আমার বন্ধ পত্নী আনার স্ত্রীকে 'হিনি' বলিয়া হাত  
হরিয়া ভিতবে গটয়া গেলেন। বুদ্ধিমান—স্বামী-স্ত্রী  
হু'তাই বক্ত নহে।

পোপাল আসিয়া প্রণাম করিল। তার আমলোচ্ছল  
ললচ্ছ মুখখানিতে দেহ-চরন কবিলার—চরন আমলো  
উল্ল হইয়া গেল। বলিলাম—করকরদের সঙ্গে তোমার  
এই কালা-কাকীয়ারও পারেরে কুলো নাও ভাল করে।

সামগোছের খুন বাগিল।—বর—বহুখাত্তী সুবাই  
প্রায় একসঙ্গে প্রসঙ্গেরত। তারপর বর সাজানো—  
বিহার—আলীকর, লঙ্কজনি। আনন্দেব হিলোয় বলিল।  
তোপাল—না—রোবাক? আমি রোবাক কথাটার প্রতি  
এত আর্ন্ত হইলাম কেন? বাহা চলিয়া বাইতেছে  
তাদের রোবাক বেশী ছিল, এমন কথা তাদের শরীরও  
বলে না। দুই দেশের ছুঁতে! কথা—নানের কন বেশী  
না থাকাই সম্বয়—প্রমাপতির রতিন পাখার শব্দনের  
সঙ্গে এই ভাব-সম্পূর্ণ লকলের ননে-প্রাণে অগতপ বাধুর্বা  
ছড়াইয়া দিতেছে! আনন্দ যেন বাধন হাওয়া—

বর নইয়া বাওয়া—কতায়কের আদর অভ্যর্থনা—  
বান-বৌতুকের অপ্রাচুর্য্যে, বহুখাত্তীনের গুণন। তারপর  
কতায় লঙ্কায়ান কালে—এ' কি। বুক টিপ্ টিপ্ করিয়া  
উঠিল। পাত্র এত খুব নীচু করিয়া আছে কেন?

—ইহা লঙ্কা করিণ তার একটি অস্বস্ত বহু। সে  
আমার দিকে তাকাইল—

হু' কুল ছাপাইয়া পিরাছিল যে রোবাক—নিষেদে  
তাহা ওকাইয়া উঠিল।

পুত্রোহিতদের দক্ষিণা দইরা তলহ—বিশবৎ মনে  
হইল। অশান্তিতে কয়েকখানি নেটি যেন হাত পঃ পাইয়া  
উড়িয়া গেল। যে-সব ছোটখাট ক্রটি-বিফলতি উপেক্ষা  
করিতেছিলাম—সব এক একে চোখে পড়িতে লাগিল।

এমনিট হয়। মছিব চালে ফেরে বেশার ঘোরে—  
মহীচিৎসার পেটনে ছোটো। হাক খাইলে লবিৎ মেরে—  
হোক কারি ?—আমার, না—আবার জীহ ?

নবের দিন হোক মিহিবাহ পালা। হৈলনে বেহাই  
বে আশ্রম নাই—বত এগটা লক্ষ্য করি নাই এ লস। কিয়  
বীর ভাড়া মিহিবাহ বরন আমার বজুবাহর হৈছোব।—  
চিব-মিহিবাহী এই ব্যক্তিটি তখন অব্যাহিত কর্তে যত কিছু  
ক্রটি-দমনাধরৎ বর্ণনায় নুহর হইয়া উঠিয়াছেন

প্রাচীনা বেশিলাম, তার এ অস্ত্রমান অস্বাভাবিক চর—  
তিনি যে আমার স্থানীয় হইয়া সব কিছু করিলেন।—এ  
যেন বার্ষিকার অংকন।

ওঠে নানে নাগবের লুখ-লুখ।—নামার  
গতিটা হীর হয়।

লক্ষ্যাহীন বাহুব তবু বাচিবার অজ্ঞ বাঙাল।—সব  
লাহনার দাগ ঢাকিয়া নিয়া সে নতুন বাহুব লাকে।—যে  
আশ্রবকনা করে—আর সবাইকেও বকনা করে।

বাড়ী আসিলাম।

যেন কলে চলিয়াছে সংসার। আবার উৎসব—  
আবার আশে—খ্রীতি-ভোমের গড়াহাড়ি।

কতরা লইয়া বাইবার আগে ঠিক তার বাপ আসিয়া  
উপস্থিত।—আবার মানক হইল—অভীভূতের সব কিছুকে  
বলিলাম—হস্তির চিরশরনে অবদড় নাও—আজ আবার  
আনি হাসিব—!

ছেলে কাছে আসিয়া পাড়াইল। জিজ্ঞাসা করিলাম  
—কি বাবা ?

উত্তর করিল—ওঁরা যেতে বস্বেছেন সঙ্গে—।

বলিলাম—বাবো বই কি—নিচর বাবে—।

তার মুখে হাসি। মনে মনে বলিলাম—এই যোযাক  
চিরদিন সখী হোক তোমার।

## প্রগতি

ঐসংছাঃকুমার অধিকারী

বন্ধার হীমালয়া দিগন্তে জন্ম  
লক্ষ মুণ্ডের উজ্জল কল্যাণ।  
কথনবিশ কথনল ওঠে বসি  
বরাক বাবা—আবর্তে লাগে গোল।  
যাওলঃ ফোণের উঠেছে প্রবুল করি  
ঐর্ধ্যক্রান্তের ঐর্ধ্যতা বেছে গনি  
প্রবর্তির ছাশ গতিভাষা দাখা অজি,  
কাকজোৎস্নাঘর নিশাভাষা শরীতি।  
পথপাশে কতু বুঁকে মরে কঙ্কাল,  
শরমে বসে চিরকলত তবু  
মতন উৎসব করে যাক চতাল  
অগ্রগামী শরীত ঘনি বন্ধ

পথহারা বত পথচাষী বলে বলে,  
পথে মেঘতে মূগে মূগে পথচলে,  
কখনো মতন কখনো বেধা বনি  
কতু শিহনে তিরিষের ছায়াতলে।  
প্রগতির সব বিচিত্র মায়াভালে,  
মায়াবে মনে গোহুর্নিয় জিহ্বালে,  
যাতে কাকল ভক্ত্য অজ্ঞাতলে;  
তুকানে প্রাণী শিখা লয়ে গিট যোগ।  
কাকজোৎস্নাঘ উৎসব বার্তা ভালে,  
বনি কিংসলে গোহুর্নী বন্ধ-বাগে  
পায়ে বীহনে চক্রে পথে চাচি,  
মিনে আলোকে তবু তাই খোলা লাগে।

# সমাজতত্ত্ব ও রাষ্ট্র

শ্রীকলাশঙ্কর সোম

সমাজতত্ত্ব রাষ্ট্র ও সমাজের আত্ম পরিবর্তন কাননা করে; এবং এই আত্ম পরিবর্তনমূলক বৈশ্ববিক আদর্শ ভারতবর্ষে বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করিলে সমগ্র সামাজিক জীবনের ব্যঙ্গনা কোন পথে চলিবে, তাহার একটি স্পষ্ট ধারণা শিথিল লোকমানসেই বাক্য উচিত। ইংরাজী Socialism কথাটির বাঙালি অর্থবাদ আশংকা করিয়া থাকি "সমাজতত্ত্ব" বসিও Socialismএর চিন্তাধারা নাহলে বনে বান পাওয়ার বহুর্ন্ত হইতেই রাষ্ট্রের বসবস্তুতাবে জীবন বাগনের অবস্থাকে রাষ্ট্র "সমাজ" Society বা অর্থব্যাচক শব্দদ্বারা অভিহিত করিয়া আসিতেছে। কাজেই, সমাজতত্ত্ব কথাটি বসি Socialism-এর অর্থবাদ-মূলে ব্যবহৃত হয়, তাহা হইলে কাহারো কাহারো বনে দ্বন্দ্ব ধারণা বান পাইতে পারে। সমাজতত্ত্বের দার্শনিক চিন্তাও তাহার ইতিহাসের সহিত পরিচিতি লাভ সকল শিথিল লোকের পক্ষে সম্ভব নহে; অথচ এই সমাজতত্ত্বের সহিত জীবনের বাস্তব সম্বন্ধ বাগনের চোঁ বোতাবে চলিতেছে, তাহাতে আদ্যের এই লগ্নে নিরপেক্ষ ও নির্বিকার থাক্য সম্ভব নহে, উচিতও নহে।

এই কথাটি আদ্যের বিশেষভাবে জানিয়া রাখা ভাল যে, রাষ্ট্রের সমাজ-ব্যবহার ও ব্যাবহারিক জীবনের একটি তিস্ত হইতেছে ব্যক্তিগত সম্পত্তি। অল্প পণ্য অর্থজনের ও তাত্ত্বিক ধনবৃদ্ধির চোঁ ব্যক্তিগত সম্পত্তিকেই (Private Property) অবলম্বন করিয়া চলিয়াছে। ব্যাপারটি আদ্য একটু স্পষ্টরূপে বুঝিয়া না রাখিলে সমাজতত্ত্বের অর্থ-প্রতিপত্তির পক্ষে অস্থিবিধ হইতে পারে; কেন না আদ্যের বর্তমান সামাজিক বন ধনজনের ব্যক্তিগত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং পুঁজিত্বের (Capitalism) চিন্তাধারা গঠিত। ধনোৎপাদনের সাময়িক নীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের বরূপ আদ্য তালরূপে চিন্তাও করিতে পারি না।

জীব-বগতে বাঁচিয়া থাকার অল্প প্রাথমিক প্রয়োজন পরীক্ষা-বক্ষা। জ্বা ও তুফা বোধ মানসিক ক্ষেত্রে একটি পীড়ন বা অত্যাব-জনিত বৈশ্বানরূপে দেখা দেয় এবং এই

অত্যাব-বোধের নির্যস্ত হইলেই হয় 'জীবন ধারণ' বা বাঁচিয়া থাকা। নাহলেই অর্থজনের মূলক কর্ম-প্রচেষ্টার (activities) মূলে বহিরাগত এবং অত্যাব-নির্যস্তির অনিবার্য আগ্রহ। এই যে অত্যাব-বোধ-জনিত বৈশ্ববিক কথা বলিতেছি, তাহার অবিভাব সর্বপ্রথম ব্যক্তিগত মনের (Individual Mind) মধ্যেই হয়; এবং তাহার কলে আদি জীব ও আদি মানবের আত্মপোষণ-মূলক ক্রিয়াই ব্যক্তিগত চোঁর পক্ষে প্রবাহিত হইয়া থাকে। আত্মপোষণ-মূলক ক্রিয়াকে সমাজ গঠনের মূল কারণরূপে ধাহারা বীকার করেন, তাহারা এই কথাটাই স্পষ্টভাবে বলিয়া থাকেন যে, রাষ্ট্রের বসবস্তুতাবে বা সামাজিকভাবে বাস করার মূলে র'হিয়াছে আত্মপোষণের প্রয়োজনবোধ। জীবনধারণের চোঁ অপরিসীম সত্য নহে, একমাত্র সত্য। মাত্রের ব্যাবহারিক জীবন যখন ধনজনের-পুঁজি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তখন সমাজের গঠন ব্যাপারে ও পারস্পরিক সম্বন্ধে অর্থ ছাড়া অল্প কিছুকেই মূল তথ্য বলিয়া বীকার করা বাইতে পারে না। সৃষ্টিবাদ বা আত্মপোষণ-নীতি ছাড়া জীবনের অস্তিত্ব কল্পনাই করা যায় না। বাঁচিয়া থাকার চোঁই সকলের আপে। বৈশ্ব, প্রেম, ভালবাসা, জীবনোবা ও জনসেবা, এমন কি সৃষ্টিক্রিয়া—বৈহিকই হউক আর মানসিকই হউক—বাঁচিয়া থাকার প্রয়োজনের উপরেই নির্ভর করে।

ধাহারা অর্থনীতিকে সামাজিক জীবনের মূল তথ্য বলিয়া বনে করিয়া থাকেন, তাহারা জীব-অর্থকে বিরোধে বরুত; এই বস্তুতাত্ত্বিক দ্বন্দ্বের প্রহণ করিয়াছেন যে, "বন" বলিয়া যে বস্তুটিকে আদ্য বীকার করিয়া চলিতে বধ্য হই, তাহার বস্তু-নিরপেক্ষ কোনো বিস্তারী রূপ নাই, এবং তাৎপর্য বর্ণনিকের "Absolute Mind" একটা কল্পনা বার। তিরে বস্তুগত পদার্থের সংঘাতে বন উদ্ভূত হয় পদার্থ কখনো ধ্বংস হয় না, ইহা বৈজ্ঞানিক সত্য; কাজেই পদার্থের সৃষ্টি আদ্যের কল্পনা করিতে পারি না। পদার্থ একসময় থাকিবে না, ওড় অগত লুপ্ত হইয়া বাইবে, তখনো বন থাকিবে—ব্রহ্ম বা বৈশ্বের লীন হইয়া থাকিবে—এইরূপ চিন্তা অসম্ভব। ধাহারা

সামাজিক জ্ঞান অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা (Economic Interpretation of History) স্বাক্ষর, তাহার এইরূপ অর্থনৈতিক বর্ণনা করিতে পারে না। কালমার্গস্ প্রকৃতি সামাজিক বর্ণনায় এইরূপ বর্ণনার অর্থনৈতিক প্রাতিফল করিয়া যেগুলি প্রকৃতি দার্শনিকগণের বিরুদ্ধে জাহায্যের বস্তুতাত্ত্বিক দর্শন প্রকৃতি করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বলা বাহুল্য এই বস্তুতাত্ত্বিক দর্শনে তৎকালের কোনো স্থান নাই। কালমার্গস্-পরিবর্তিত বিবরণসমূহ সামাজিকের ভিত্তিতে গঠিত সমাজে ভগ্নস্থ বিবরণের জ্ঞান অর্থনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রগতির পরিণতি করিয়া বলিয়াই গণিত হইতে পারে।

অর্থনৈতিক সামাজিক জীবনের ভিত্তি বলিয়া স্বীকার করিলেই মার্কস-পরিণতের মধ্যে সামাজিক জীবনের ব্যাখ্যা স্পষ্ট হইয়া আসে। আদিনিয়ন আদিশোষণ বা সংরক্ষণের জন্তই প্রথমতঃ দলবদ্ধ হইয়া বাস করিতে আরম্ভ করে। এই দলবদ্ধ জীবন ব্যাপনের আকৃতি ও প্রকৃতি পৃথিবীর দ্বারা নির্ধারিত হইয়াছে। পারস্পরিক সহকর্ম, সহায়, সহায় ও সৃষ্টিমূল্য সমাজ গঠিত হওয়ার পর দলবদ্ধ বন্ধনকে দৃঢ় করিবার পক্ষে সহায়ক হইয়াছে, কিন্তু এই দৌরাত্ম্যের দ্বারা কোনো স্বাভাবিক নাই। কারণই মার্কস-দর্শনের ভিত্তিতে গঠিত সমাজে দলবদ্ধতার মূল্যবান (Value) প্রতিকরণের অর্থনৈতিক পটভূমির প্রয়োজনীয়তার দ্বারা নির্ধারিত হইবে। অর্থনৈতিক জীবন-নির্ধারণ কোনো বস্তুতাত্ত্বিক দর্শনকে বা শিল্পকার আদর্শ আদর্শ করিতে পারে না, কেন না, মার্কস-পন্থী সমাজে তাহার কোনো প্রয়োজন নাই। এখানে দলবদ্ধ করিবার বিষয় এই যে, মার্কসের মধ্যে মন বস্তুর সীমার আকর্ষণ, এখানে ভূমিও নাই, অসীমতাও নাই। 'ভাবনার অসীম প্রাণ মন মনে বস্তুদ্বারা আদি হইয়া' ইত্যাদি কথাটির মধ্যে যে 'ভাব-বিস্তারিত' নিহিত আছে, পৃথিবী সমাজে সামাজিকভাবে তাহার কোনো অর্থনৈতিক মূল্য (Economic Value) থাকিতে পারে না।

বিবরণের অর্থ ও মার্কস-পন্থী সমাজের আকৃতি সম্বন্ধে আমাদের স্পষ্ট ধারণা করিতে হইলে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও তাহার ঐতিহাসিক গতি পরিণতির কথা বিশেষভাবে

চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে। ব্যক্তিগত সম্পত্তির ক্রমাভিব্যক্তি পরিণতি হইতেছে সামাজিকবাদ। কিন্তু ব্যক্তিগত এই সামাজিকবাদ পৃথিবী জীবনের অর্থনৈতিক গতিপথে মানুষের সামাজিক ইতিহাস আলিয়া পৌছিয়াছে তাহা বিশ্লেষণ করিতে গেলেই অনেকগুলি বাস্তব তথ্য আমাদের উপলব্ধি করিতে পারি। মার্কস-এর চিন্তাধারা ও দার্শনিক বক্তব্যের সহিত পরিচিতি লাভ করিলেই আমরা দেখিতে পাই যে, জীবন ধারণের জন্ত আর্থিক বা ব্যবহারিক জীবনের আবাস-প্রদানের সম্বন্ধেই একমাত্র প্রাথমিক বিষয় হইয়াছে। মানুষের প্রকৃতিবোধ ও সৃষ্টিমূল্য দলবদ্ধ সামাজিক জীবনের বন্ধনকে আর্থিক প্রয়োজনেই অব্যাহত রাখিয়া চলিয়াছে। পৃথিবী ভাগিদে সমাজ গঠিত হইয়াছে এবং এই সমাজের সংগঠনকে সংরক্ষণ করা এই পৃথিবী জন্তই প্রয়োজন। পৃথিবীর দ্বারা সমাজের গঠন ও আকৃতি নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। জীবজগতের সর্বত্র যেমন, মানুষের মধ্যেও সেইরূপ পৃথিবী যেমন ব্যক্তিগতের প্রথম বিষয় এবং এইজন্যই প্রথম ব্যক্তিগতের চেষ্টাও ব্যক্তিগত সম্পত্তি অর্থনৈতিক মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। সমাজ ও ব্যক্তিগত আর্থিক-কাজেই প্রথমে গঠিত হইয়াছিল এবং আজ পর্যন্ত সেই উদ্দেশ্যেই সমাজ ও রাষ্ট্রে অব্যাহত রহিয়াছে। ব্যক্তিগত আর্থিক ও বস্তুত সামাজিক আর্থিক মধ্যে একটি সামাজিক বন্ধন করিয়া চলি রাষ্ট্রের (State) ক্ষেত্র বিস্তার। ব্যক্তিগত আর্থিক ও সামাজিক বা জাতীয় আর্থিক সীমা-নির্দেশক একটি শাসন দ্বারা আশ্রিত সমাজ হইয়াছে। রাষ্ট্রের দর্শনে এই ব্যাপনকে কেন্দ্র করিয়া বিভিন্ন বস্তুতাত্ত্বিক উদ্ভিগ্ন এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রে এই জন্তই ব্যক্তিগত জীবনের পরিধি-বিস্তার এক নম্বর। ব্যক্তিগত আর্থিক অসুখ রাখার জন্তই সমাজের প্রয়োজন হইয়াছিল এবং রাষ্ট্রনীতিতে এই আর্থিক অব্যাহত রাখারী কর্তব্য—এই নীতি উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বীজিত হইয়া আসিয়াছে। এই জন্তই গণতান্ত্রিক দেশ সমূহে ব্যক্তিগত বস্তুতত্তির অর্থনৈতিক স্বাধীনতা রাখার নীতি হইয়া পড়াইয়াছিল। অর্থনৈতিক নীতির মূলেও এই ব্যক্তিগত বস্তুতত্তির স্বাধীনতাই ক্রমাগত ছিল। ব্যক্তিগত বন্ধন স্বীকার করিয়া যে-সমাজ, গঠিত

হইয়াছে, তাহাতে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে বস্তুনিষ্ঠের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা অসম্ভবী, এবং এই প্রতিযোগিতার এক প্রেরণ লোক যে অল্প হনের অধিকারী হইবে তাহাও স্বাভাবিক। উনবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকে ধন শিল্প ও বাণিজ্যবিষয় ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হইল, তখন এই ব্যক্তিগত হনের পরিমাণ অপরিমিত হইয়া উঠিল, এবং দেখা গেল যে, জাতীয় ধন অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইলেও দেশের অভাবের অতি অল্প-লংখা লোকই এই বস্তুনিষ্ঠতায় সুখ-সুবিধা আহান ও বিলাসিতার অধিকারী হইয়াছে।

যেদূর শতাব্দীর আরম্ভেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, ইউরোপের বিভিন্ন জাতি-পুণ্ড্রীর নানা দেশে ধনের অধিকার আনুপ্রতিষ্ঠ হইবার চেষ্টা করিতেছে। এই সাম্রাজ্যবিস্তারের ফলে আর্থিক সুবিধা বাহ্যিক জাত করিল, তাহারা প্রত্যেক সাম্রাজ্যবাসী দেশের বনিক-শ্রেণী। এই বনিকশ্রেণীর স্বার্থ ও সমর্থনই সাম্রাজ্য-বাদের প্রতিষ্ঠা। বনিক ব্যবসায়ীর বাণিজ্য-স্তরীর পক্ষেই পক্ষান্তরে সমস্ত সামাজিক তাহাদের প্রয়োজনই চুক্তির' গিয়াছে, এবং ফলে যে শোষণ-নীতি আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে বনিকদের বনসম্ভারই বৃদ্ধি পাইয়াছে। ব্যক্তিগত সম্পত্তির স্বাভাবিক পরিণতি সাম্রাজ্যবাদ, ইহাতে সন্দেহ করিবার কোনো অবকাশ নাই। ইহা ঐতিহাসিক সত্য।

উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে কার্লমার্ক্স ইংলণ্ডের শিল্পশালান্তরিত শ্রমিকদের বৈষম্য লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহা হইতে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ব্যক্তিগত সম্পত্তি জাতীয় সম্পদের চরম উন্নতি সাধন করিলেও মানব-সমাজের সাধারণ কল্যাণ-সাধনে আর ইহা সহায়ক নহে। এক সময়ে সমাজ-ব্যবস্থার এই ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে স্বীকার করিয়া চলার একটা সার্বজনীন ছিল। কিন্তু বৈজ্ঞানিক উন্নতি বৈশ্বের আশ্রয় পৌছিয়াছে, তাহাতে ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে এখন স্বীকার করিয়া চলিলে সমাজে অযোগ্যতার পথকেই উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া হইবে। একদিকে বনিকের বিলাস-লালসা অত্যধিক পরিমাণে অস্বাভাবিকতা ক্রমিক ও

নৈতিক বৈষম্য—এই দুইইই সমগ্র মানবসমাজের সর্বজন-কর। অতএব ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর যে পুঁজিবাদ (Capitalism) রাষ্ট্রীয় শক্তির আশ্রয়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাকে সমাজ হইতে অপসাদিত করিয়া বনোৎপাদনের ক্ষেত্রে একটি নতুন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। এই নতুন প্রগতিশীল ব্যবস্থা বা হইবে, মার্ক্স তাহার স্পষ্ট নির্দেশ দিয়া গিয়াছেন। তিনি বনোৎপাদনের ক্ষেত্রে মূলধন ও ভূস্বামিদের স্বাভাবিক স্বীকার করেন না। বাহ্যিক আধুনিক অর্থশাস্ত্রের (Economics) সহিত পরিচিত জাহায়া লক্ষ্যেই জানেন যে, বনোৎপাদনের Production তিনটি মূল অবলম্বনীয় উপায় বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। ভূমি বা প্রাকৃতিক সম্পদ (Land) পরিচর্য (Labour) এবং পুঁজি (Capital)। মার্ক্স বলেন যে, কোন উৎপাদিত বস্তুর মূল্যমান (Value) নির্ধারিত হয় শ্রমের দ্বারা। শ্রম ছাড়া পুঁজি বা প্রাকৃতিক সম্পদের কোনো মূল্যই থাকিতে পারে না; পরিচর্যের সহিত যুক্ত হইলেই পুঁজি ও প্রাকৃতিক সম্পদ বনোৎপাদনের বস্তু হইয়া পড়ায়, নতুবা ইহার কোনো সার্বজনীন নাই। অতএব বনোৎপাদনের মূল ভিত্তি বা কারণ হইতেছে শ্রমের পরিচর্য। কৃষার পুঁজিশ্রমীভূত বস্তু; কিন্তু ইহা শ্রমিকের হাতে ব্যবহৃত হইলে সামান্য কাঠ প্রভৃতির উপায় বলিয়া গণ্য হয়। বৃহত্তর বয়স্কালয় বৈজ্ঞানিক উন্নতির ফলে যে যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হইতেছে, পুঁজিবাদগণই তাহার স্বত্বাধিকারী। ব্যক্তিগত বনাদিকার স্বীকার করার এই পুঁজি শ্রমিকের হাতের বস্তু হইলেও উৎপাদিত ধনের অধিকারই এই নিম্নাংশ বস্তুর ভোগ দিয়া পড়িতেছে, এবং ইহার সুবিধা ভোগ করিতেছে। মুক্তিদের বনিক সম্প্রদায়, কোম্পানীর বড় বড় অংশীদারগণ। ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহারের ক্ষেত্রেও এই মুক্তিই প্রযোজ্য। অতএব মার্ক্স বলেন যে, পুঁজি ও প্রাকৃতিক সম্পদের মালিকানার অধিকার ভোগ করিয়া দিয়া বাহ্যতে ইহাদের ব্যবহার শ্রমিকদের হাতে অব্যাহত থাকে, সমাজে এখন একটা ব্যবস্থা করিতে হইবে। পুঁজি বা ভূমির মালিকানা কাহারো থাকিবে না; শ্রমিকেরা তাহা সম্বন্ধিত ভাবে ব্যবহার করিয়া উৎপাদিত

বস্তুর জ্ঞাপনোবিত বস্তুসমূহের জ্ঞাপননাম্য কথিতে পরিবে। এই ব্যবহার বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সুবিধা। সমগ্র মানবসমাজ জ্ঞাপন কথিতে সমর্থ হইবে। ইহা কৃত্রিম সমাজিকারবার ( *artificialism* ) নহে। ব্যক্তিগত বাস্তবপ্রবাহনের তারতম্য এখন যেমন আছে, তখনো তেমনি থাকিবে। কিন্তু বিজ্ঞান-ব্যবহারের পথে বৃথা অপচয়ের হার কত হইয়া যাইবে। ইহাই মার্ক্স-এর বিশ্লেষণের সমাজতত্ত্ব। ইহার ভিত্তি ধনোৎপাদনের এই সম্পূর্ণ অভিন্ন প্রণালীর উপর প্রতিষ্ঠিত, যাহা সর্বত্র এখন “যোগ-উৎপাদন-নীতি” বা *collectivism* বলিয়া খ্যাত। ব্যক্তিগত বস্তুবিচার বিলুপ্তির উপর ইহার প্রতিষ্ঠা, এই বিলুপ্তির চেষ্টায় বা পরিবর্তনের নামই বিশেষ। মার্ক্স-এর এই বিশ্লেষণের মাধ্যমেই যেমন যৌব ও প্রকৃতির প্রেরণা হইতেই যে উদ্ভূত, তাহা অব্যাহার করিবার উপায় নাই।

মার্ক্স-এর দার্শনিক মতবার বস্তুতাত্ত্বিক। তিনি ভাগ্যতিক জীবনকে বিশ্লেষণ করিয়া তাহার মূলে যে-যেমনতার পটভূমি পাইয়াছেন, তাহার সার্বিকতা কেবল পুষ্টিক্রিয়ার ক্ষেত্রেই দাঁকার করিয়াছেন। ব্যাবহারিক জীবনে সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে পুষ্টিবাহনুলক ক্রিয়াই যে পান্ডিত্য সমাজের স্বরূপই বস্তুতাত্ত্বিক ব্যবহার প্রতি-ক্রিয়াক্ষেপে মার্ক্স-এর চিন্তার ক্ষেত্রে প্রধান হইয়া দেখা দিবে, তাহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই। কিন্তু প্রশ্ন তাহা, জীবনের মূলে পুষ্টির যেমন নাই কি সর্বপ্রধান ? বস্তুতাত্ত্বিক চিন্তাবাদী অগ্রগণ্য করিয়াই যদি আমরা জীবনকে বিশ্লেষণ করি, তাহা হইলেও তাহার মূলে একটি স্বাভাবিক যেমনতার অস্তিত্বের সন্ধান পাই। এই যেমন জীবনের বাস্তব ব্যক্তির ক্ষেত্রে দেখা দেয় সৃষ্টির যেমন, পুষ্টির যেমন ও ব্যাপ্তির যেমনরূপে। শোষণ-এর বস্তুত্বের পটভূমি পাইয়াছেন, তাহাতে আমরা সৃষ্টির যেমনের প্রাধান্যই দেখিতে পাই। জন্মের এ মূলে তাহার বস্তুতাত্ত্বিক মতবার দ্বারা এই সৃষ্টির যেমনতাই একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়াছেন। জন্মের পরে, যেহেই সৃষ্টিক্রিয়া বা যৌব আকাঙ্ক্ষার ভিত্তি। যৌব এই যৌব আকাঙ্ক্ষার উপস্থিতি পথ, এবং সেখানে ইহা

শিল্পীর যেমন, কবির যেমন বা জনসংস্কারে পুষ্টির যেমনরূপে দেখা দেয়। জীবনের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে যৌব আকাঙ্ক্ষার প্রাধান্য দিয়াছেন। গোড়া মার্ক্স-বাদী বলিবে, জীবনের ক্ষেত্রে পুষ্টিবাহনুলক ক্রিয়াই প্রধান, সমাজ গঠনে পুষ্টির প্রাধান্যই দিতে হইবে। জীবনে পুষ্টি যদি না থাকে তবে সৃষ্টি আসিবে কোথা হইতে ? পুষ্টিহীন জীবনে সৃষ্টির আগ্রহ থাকিতে পারে না। সৃষ্টিটি আপাতদৃষ্টিতে অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়, কিন্তু বাহ্যিক সৃষ্টিবাদী, অর্থাৎ জীবনের ব্যাখ্যায় যৌব আকাঙ্ক্ষার (Sex) প্রাধান্য বাহ্যিক দিয়া থাকেন, তাহারা বলিবেন যে, সৃষ্টির আগ্রহ না থাকিলে পুষ্টির প্রয়োজন কোথায় ? আগে সৃষ্টি, তার পরে ত পুষ্টি। সৃষ্টির প্রয়োজনেই পুষ্টিক্রিয়ার তারতম্য নির্দিষ্ট হয়। বাস্তব মধ্যে সৃষ্টিক্রিয়া সম্ভব, তাহার ত পুষ্টির কোন প্রয়োজন নাই। সৃষ্টিক্রিয়া বাহ্যেই মধ্যে অপেক্ষাকৃত সংঘত, যেমন সমাজী বা চিরকুমার, তাহাদের মধ্যে পুষ্টিক্রিয়ার -প্রয়োজনীয়তাও সেই পরিমাণে সংঘত। বাহ্যিক ব্যাপ্তিগামী, তাহারা বলিবে, জীবনের ক্ষেত্রে সৃষ্টি ও পুষ্টিক্রিয়ার কোন স্বাতন্ত্র্য নাই। ব্যাপ্তিবোধই জীবনের একমাত্র সত্য। জীবনের মূলে যে বাস্তব যেমন রহিয়াছে, তাহা ব্যাপ্তির যেমন, বাস্তবসম্প্রদায়ের যেমন। সমগ্র জীবজগতের যেমনবোধে উচ্ছ্বসিত রাজকুমার সিংহের প্রিয়তমা পত্নী ও প্রাপ্যপন শিশুগণের ভাগ্য করিয়া বিশ্বের রাজপথে বাহির হইয়াছিলেন। বীত বৃষ্ট এই যেমনবোধের অস্তই ক্রমে বাস্তবসম্প্রদায়ের দিগ-ছিলেন। এই যেমনবোধই বাস্তব বস্তু, জীবন-প্রবাহের ন্যূনতম সৃষ্টি ও পুষ্টি এই বাস্তবসম্প্রদায়েরই নামান্তর। একই বস্তুকে বিভিন্ন ভিন্ন ভিন্ন দিক হইতে দেখিলে যাহা হয়, এক্ষেত্রে তাহাই হইয়াছে। জীবনের স্বাভাবিক ব্যক্তন এই ভিন্নের সামঞ্জস্যের মধ্যেই নিহিত। আমরা বলি, এখানে কোন তারতম্য করিলে ভুল করা হয়।

মার্ক্স-পুষ্টির যেমনকে প্রাধান্য দিয়া ব্যক্তিগত সম্পত্তিহীন যে সমাজ-ব্যবহার পটভূমি দিয়াছেন, সেই নীতি অনুযায়ী যদি মানব-সমাজ গঠিত হওক অস্বাভাবিক হয়, তাহা হইলে তারতম্যের সমাজের গঠন অসম্ভব

হইবে—ঐচ্ছানিক চিন্তায় এইরূপ করণের স্থান নাই। কাজেই ধর্ম্মের লওয়া বাইতে পারে যে, মার্ক্সের চিন্তা-ধারার মধ্যে অশুভগত ঐচ্ছানিক সত্য; নিহিত তাহাতে বলিয়া যাচাওয়ের বিশাল, তাহারা ভারতবর্ষেও মার্ক্সের মতবাদ অনুযায়ী অর্থনৈতিক চিত্রিত্তে সমাজের সুসংগঠিত আকাঙ্ক্ষা করেন। লেনীন মার্ক্সের চিন্তাধারার অগ্রদ্বার করিয়া কপিয়ার সমাজ সংগঠন করিয়াছেন এবং তাঁহার প্রতিভাবলে কপিয়ার যাত্রা সম্ভব হইয়াছে, তাহা যদি মানুষেরে প্রগতির ধারাকে অব্যাহত রাখিতে সক্ষম হয়, তবে ভারতবর্ষেই বা তাহা সম্ভব হইবে কেন? লেনীন যে সমাজ কপিয়ার সংগঠন করিয়াছেন তাহাতে রাষ্ট্রের শাসনশক্তি কেন্দ্রীভূত হইয়াছে অধিকবেশ হাতে, যন্ত্রের অবস্থা বাহ্যাই হউক না কেন, অধিকগণই যে রাষ্ট্র-শক্তির কেন্দ্র, রাষ্ট্রনীতিতে এই তত্ত্ব কপিয়ার যন্ত্রিত হইয়াছে। ইহাই লেনীন-পরিচালিত Dictatorship of the Proletariat বা শ্রমিক-প্রভুত্ব। উৎপাদনের যৌথ-নীতি অনুসরণ করিয়া যে দেশে পুঁজিবারগণের উৎপাদন সম্পন্ন হইয়াছে, পৌরহিত-সম্প্রদায় ও ধর্ম্মিক শ্রেণীর অধিক যে দেশে নাই, সে দেশে বাহুদ্বারাও শ্রমিক। কাজেই কপিয়ার শ্রমিক-প্রভুত্ব বস্তুটি নির্ভাল গণতন্ত্র। এই গণতন্ত্রে অস্বস্তি দেশের ন্যায় ধর্ম্মিক স্বার্থ ও তাহা সমর্থনের নোংরা-ভিত্তি কোনো রাষ্ট্রীয় দুর্নীতি থাকিতেই পারে না। কপিয়ার সমাজ সংগঠনে ও রাষ্ট্র শক্তির নিয়ন্ত্রণে শ্রমিকগণের আর্থিক পটুতা বৃদ্ধির উপরই অধিকতর গুরুত্ব দান করা হইয়াছে। ব্যক্তিবিশেষের সামাজিক মূল্যমান আর্থিক পটুতা (Economic Efficiency) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, কেননা, অর্থনীতিই সামাজিক জীবনের মূলভিত্তি। জীবনের প্রগতি যদি অর্থনৈতিক পটুতা বৃদ্ধিতেই সীমাবদ্ধ থাকে, তাহা হইলে মানুষের সংগতি এই আর্থিক আদর্শকেই সমুখে রাখিয়া নিয়ন্ত্রিত হইতে বাধ্য। শিল্প, সাহিত্য, জনসেবামূলক কার্য, যৌগিক পরিচর্যা ও পরোপকারমূলক ব্যবহার প্রতিষ্ঠান এই অর্থনৈতিক সামাজিক জীবনের সঙ্গ ও সার্থক করিয়া তুলিবার জন্যই নিয়োজিত হইবে। এমন প্রসঙ্গ—ইহাই কী জীবনের পরিপূর্ণরূপ বা প্রগতির পথ।

সামাজিক জীবনে অর্থনৈতিক প্রয়োজন নির্দিষ্ট দ্বারা যদি নির্মিত ও কবির যেমন দৃষ্টির মূল্য নিশ্চিত হয়, তাহা হইলে সেই বিশেষ সমাজে শিল্পমুদ্রিত ক্ষেত্রে জীবনের জিয়াশিল্পতার সংশ্লিষ্ট চাড়া আর কিছুই আশা করা যায় না। সমাজের তাগিদে সেখানে শিল্পী ও কবির ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ। সেখানে মানুষের পারস্পরিক যেমন সহকের মূল্যও এখনকার অর্থনৈতিক। সমাজে প্রেম ও ভালবাসার এই স্বাভাবিক মূল্যই কী সমাজ জীবন। জীবনের জিয়াশিল্পতাই যদি শ্রম হয়, তবে শ্রম প্রেমেরই কী অর্থনৈতিক মূল্য ছাড়া আর কোনো মূল্য নাই। জীবনে যে ব্যাপ্তির আশ্রয়, তাহা তত্ত্ব অর্থনৈতিক জিয়াশিল্পতার পথকেই প্রাধান্য দিবে, একথা মুক্তিযুদ্ধ হইতে পারে না। সমাজ গঠিত হয় জীবনের তাগিদে এই জীবনের তাগিদকে শুধু ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ করিয়া যে-সমাজ গঠিত হইবে, সেই সমাজ মানুষের জীবনের প্রয়োজন মিটাইতে পারে না। রুইজনারের “মহাখাদ্যলভ্যতা” জনবোঝারের “অনন্ড অতীপা” বা Great Hunger এর মূল্যমান অর্থনীতি দ্বারা নিশ্চিত হইতে পারে না। এই জন্য লেনীনের শ্রমিক-প্রভুত্বমূলক সমাজের গণতন্ত্রকে সংশ্লিষ্ট উপযুক্ত সংরক্ষক বলিয়া আনয়া বনে করিতে পারিতেছি না।

কোনো ভাগবতী শক্তির অধিক যে বিষয় না করিয়া তত্ত্ব জীবনের বিস্তরণ করিলেও আনন্দ আনন্ডসংরক্ষণ-বৃত্তিকে জীবনের একমাত্র motiveforce বলিয়া ধরিতে পারি না। জীববিজ্ঞান ও রাসায়নিকতত্ত্বের দ্বারা আনন্ড-সংরক্ষণনীতিই যে সমর্থিত হয়, ইহাও বনে করিতে পারিতেছি না। বীজাঙ্কুরকণ পতিতগণের গবেষণার সম্মতি জানা বাইতেছে যে, অস্থিীকণ-বস্ত্র দ্বারা একটি বীজাণু হইতে মাত্র মাত্র বীজাণুর বতঃ সৃষ্টি তাহারা বহন লক্ষ্য করেন, তখন এই সৃষ্টিব্যাপারে আর একটি মাধ্যমিক শক্তির অস্তিত্ব অস্বাভাবিক কবিবার সম্ভব কারণ তাহারা পাইয়াছেন। জীবমুদ্রিত প্রাথমিক অবস্থার পতিতেরা অর্থনৈতিক সৃষ্টিই লক্ষ্য করিয়া থাকেন। এই যে সৃষ্টির ব্যাপার, ইহা জীবজগতের একটি অশুভগত ঐচ্ছানিক তত্ত্ব বলিয়া আনয়া গ্রহণ করিতে পারি। তাহা



হইলে এই শিষ্টাচারই কী সমস্ত নয় যে, সৃষ্টিকৃত্যের মধ্যে যে আদ্যক্ষমতার বা বাণী আদ্যের লক্ষ্য করিয়া থাকি, ইহাই তে জীবন। জীবন শব্দটি একটি সত্ত্ববৎসল অবস্থা। স্বতন্ত্রভাবে এই জীবনশক্তি স্বতন্ত্র (কেন্দ্রীভূত) হয়, তখন সৃষ্টি বা সম্প্রদায়-নীতির সার্বিকতার জন্য প্রত্যাহারই ইহা আদ্যের শক্তি আদ্যের লক্ষ্য হয়। বাক্যের মধ্যে আদ্যের একটি অর্থ আদ্যের দৃষ্টিতে, ইহাই শক্তির সংযোগের রূপটি হইয়া সৃষ্টিকৃত্যের আদ্যপ্রকাশ করে। এই জন্যই আদ্য বলিতে চাহিয়াছি যে, সৃষ্টিই জীবনের প্রাথমিক সত্ত্ব নয়; ইহা জীবনের একটি সাময়িক ক্রিয়াক্রান্ত। তারপর কেন্দ্রীভূত স্বতন্ত্রতার জীবনশক্তি প্রাথমিক সাময়িক। প্রতি দুইয়ের প্রত্যেকের উপর সৃষ্টির নবায়নই হয়। অতীতের দৃষ্টিতে। শরীরতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণও স্রেষ্ঠে মধ্যে এই স্বতন্ত্র ও সৃষ্টি মহত্বঃ লক্ষ্য করিতেছেন। মার্ক্সবাদী পণ্ডিতগণও ইহা স্বীকার করেন যে, মাত্রণ ও মানবত্বের প্রাথমিক মধ্যে জীবনের ক্ষমতাক্রান্তের একটি ধারা বর্তমান দৃষ্টিতে। মানুষের মধ্যে আদ্যই জীবন সৃষ্টিকৃত্য। সৃষ্টিকৃত্যকে পক্ষান্তে কেন্দ্রীভূত প্রাথমিক হইয়া উঠিবে, ইহা সৃষ্টিমাত্র কথ্য নহে, বিজ্ঞানও ইহা সমর্থন করে না। বিজ্ঞানের পূর্ব সমর্থন লাভ করিয়াই বলিতে পারা যায় যে, মানুষের মধ্যেও সৃষ্টির আদ্যই কেন্দ্রীভূত প্রাথমিক প্রকাশিত হয় এবং প্রাথমিক-জীবন ও আদ্যের মানুষ চায় এই কেন্দ্রীভূতকে সৃষ্টির প্রাথমিক সার্বিকতা বান করিয়ায় জন্য। ইহা না করিয়া সে পারে না। সৃষ্টি যে সৃষ্টি বা সম্প্রদায়ের জন্যই প্রত্যাহার—ইহাই সৃষ্টিমাত্র কথ্য। সৃষ্টি বা সম্প্রদায়ের স্বতন্ত্র কেন্দ্রীভূত স্বতন্ত্রতার জীবনশক্তি প্রাথমিক সার্বিক হইতে, তবে তাহাকে জীবনের মধ্য সত্ত্ব বলিয়া গ্রহণ করা অসম্ভব হইতে না, কিন্তু তাহা ত হয় না।

একই চিন্তা করিলে ইহাই স্পষ্ট হইবে যে, সৃষ্টির আদ্যের ক্ষমতার পৌরুষত্বের ব্যক্তিত্বই প্রথম আদ্যের সত্ত্ব হয়, মানুষের মধ্যে এই পৌরুষ তাহার সৃষ্টির আদ্যের পরিচালিত হইতে পারে না। মাত্রের মুখে নবজাত শিশু যখন স্বতন্ত্র সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করে, তখন ইহা তাহার ব্যক্তিগত অধিকার। তাহার প্রত্যেকের পর ইহার আদ্যের। আদ্য

মানবের মধ্যেও স্বতন্ত্রভাবে স্বতন্ত্র সংগ্রহের যে চেষ্টা। লক্ষ্য করা যায়, তাহা Collectivism-এর আদ্যের লক্ষ্য বলিয়া কল্পনা করা আদ্য-প্রাথমিক। গুরু-মানবের প্রাথমিক যুগে যে আদ্য-প্রাথমিক স্বতন্ত্রতা, তাহা যে তাহারদের সামাজিক শক্তি বা Social Capital ছিল, ইহার কোনো ঐতিহাসিক বা সত্ত্ব-সমর্থিত প্রমাণ নাই। প্রত্যেক মানুষই নিজের আদ্যের ও শিকার করিবার উদ্দেশ্যে এই স্বতন্ত্র আদ্য-প্রাথমিক করিয়া লইতে, ইহাই স্বাভাবিক শিষ্টাচার। তাহারদের মধ্যে যৌন সৃষ্টি কোনো বিষয়-নীতির মধ্য দিয়া সার্বিক হইতে কিনা, তাহা জানিবার উপায় নাই। অতীতের এই যে, পণ্ডিতগণের মধ্যে বা বাণী শব্দকে আদ্যের-প্রাথমিক স্বতন্ত্রতা করিয়া নিজে-সেই কেন্দ্রীভূতকে সার্বিক করে, সেইরূপ একটি স্বতন্ত্র আদ্যের মধ্যেও বাক্য সম্ভব। স্বাভাবিক জীবন স্বতন্ত্রের সমস্ত স্বতন্ত্র অবস্থার বিরোধ বাহ্যতে না হয়, সেইরূপ যৌনজীবনের একটি সৃষ্টি তাহারের করিয়া লইতে হইতে। ইহা চাড়া স্বতন্ত্র শিষ্টাচার উপায় নাই। মানুষের 'ব' বা Ego আদ্যেরই Collectivism এর স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অবস্থার করিয়াছিল, ইহা কেন্দ্রীভূত সৃষ্টিয়ার সমর্থিত হয় না। মাত্রণ সামাজিক জীব হইতে পারে; কিন্তু তাই বলিয়া ব্যক্তিগত সম্পত্তি "সম্পত্তি" প্রাথমিক অবস্থা নয়, ইহা কল্পনা করা মার্ক্সবাদের পৌরুষী বলিয়া মনে হয়। প্রাথমিক মনে ব্যক্তিগত অধিকারবোধের প্রাথমিক স্বাভাবিক। ব্যক্তিগত সম্পত্তিই যে সম্পত্তির সামাজিক রূপ, মনোবিজ্ঞানও তাহা সমর্থন করে। উৎপাদন বা সংগ্রহের দিক দিয়াও সম্পত্তি আদ্যের অবস্থার ব্যক্তিগত ছিল, সমর্থিত ছিল না। মানুষের স্বাধীনতা (Ego) সমর্থিত-বোধের মধ্যে সম্প্রদায়িত হইয়াছে অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালে।

কার্লমার্ক্সের সমস্ত পণ্ডিতের একটি সার্বিকতা লক্ষ্য করিয়া থাকিলেও মার্ক্স-নীতিকেরই একান্তভাবে গ্রহণ করিতে পারিতেন না। মার্ক্স জীবনের সমগ্রভাবে গ্রহণ করেন নাই। এই স্বতন্ত্র দেশীয়-প্রচারিত Dictatorship of the Proletariat-কেও নির্দিষ্ট করে স্বতন্ত্র ও সত্ত্বের নীতিরূপে গ্রহণ করা আমরা সৃষ্টিমাত্র বলিয়া মনে করি না।

বারটাও বাসেন মানুষের মধ্যে তিনটি মৌলিকক্রিয়ঃ লক্ষ্য করিয়াছেন। তাহার মতে মানুষের তিনটি প্রধান বৃত্তি—কমতাম্পূহা, কামতাম্পূহা, ও ধনতাম্পূহা,—Power, Sex and Wealth. কামতাম্পূহা ও ধনতাম্পূহা দুইটি বাহ্যিক লক্ষ্য করিলেও কমতাম্পূহাকে আমরা অপর দুইটি হইতে পৃথক করিয়া দেখিতে পারি না। কমতাম্পূহাও ওত-প্রোতভাবে এই দুইটি তাম্পূহার সহিত জড়িত রহিয়াছে। মানব-সমাজ মার্কসের নীতি অনুযায়ী গঠিত হইলেও এই কমতাম্পূহা। Proletariatদের একটি অংশ বিশেষকে অবলম্বন করিয়াই বিশেষভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে। Proletariat সমাজে Collectivism থাকিলেও বৃহৎ

অনুষ্ঠান নিয়ন্ত্রণে জনকন্ডের কমরেডের প্রাধান্য ও নেতৃত্ব তাৎক্ষণিক বানিতেই হইবে। Proletariat সমাজে বাহ্যিক বুদ্ধিঅধীশী, তাহার স্বাভাবিক নিয়মেই কতকটা বৈশিষ্ট্যের অবিকারী হইবে। যেমিতে পাওয়া গিয়াছে, Collective উৎপাদক ব্যবস্থা তাহার বৈশিষ্ট্যের প্রকাশের উপর প্রতিষ্ঠিত। বুদ্ধাদি ব্যাপারে এখানে ব্যক্তিগত প্রাধান্যের ও নেতৃত্বের নিকট বস্তুর স্বীকার করা এক অবশ্যস্বাবী ব্যাপার, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে।

এখানে বস্তু দৃষ্টিঃ সমাজের নীতি অবিলম্বেই (১৯৪০) পঠিত।

## ছায়া

ঐজগদিশ্রুত বস্তু

কার হাতে আমি বাঁধি আমার নবজীবনের স্বামী,  
হিরেছি তো নব, মনে হয় যেন তবু আছে কত ব্যক্তি !  
বত গান ছিল ছিল বত প্রাণে আশার গলাপ ফুল,  
হাসি মুখে মিছি বিহার দ্বারা তবু যে আছে না ফুল !  
নব চেতনার বিরণ বহুর গোলাপ পাণ্ডিত্যনি,  
ধবলা বায়ের মুদ্রা পরণে কণে কণে ওঠে ছলি।  
ভোরের স্বপনে যে আগার ঘোরের সে কি তবে মহামারী  
আঁখির কাঞ্চলে মিশে যায় তার তপস্বী কালোছায়া !

ভাগ্যে নয় স্বপনে শুনেছি কতদিন চায়াবানী !  
কত সহিয়াছি দিবস নিশীথে অসহ ব্যথার রানি।  
গোহুঁসি বেলার পৃথিবীতে কত বেবেছি ছোয়াছনা সব—  
কত আলোকের স্বপ্ন-প্রবাহে লুটিয়ে ছবয়ে সব।  
আলোচ্য যে কত শত বিবাদের নিষ্ঠুর শালমে গড়া,  
এক চোখে তার চপল চাহনি আর চোখে বিষ ভরা !  
সেদিন বৃত্তি নি তাই তাই আমি শোনারেছি কত গান,  
আজ বৃত্তি সব মনে হলে কীভাবে শতবার তাক প্রাণ।

তবু এ অলস নিমেষ বিহীন তাহানী ওতরাতে  
বত ব্যথা লাগে সেই বিনের শ্রুতিবীণা কেসে মিতে !  
এবীণ রয়েছে, নেতেনি ত শিখা—হয় ত পড়েনি কানি  
মনে হয় সবার আবার মৃত্যু মৃত্যুর মত মালি।  
অতীতের ব্যথা বহিরা যেটুকু পেরেছি জীবনে মন,  
হয় ত তা' হবে চিরদিন বোর ভুড়িয়া এ তালো ফুল !  
তবু সে ঘুরে, অনেক কালের পুরানো অতীত ঘেঁষা—  
তার লাগে জানি শোভে না আমার সমভাবে বেশা বেশা।

তাপসী হাতের চার বিবরি' ওঠে দত হাংকার,  
সে ব্যথা নিরত মিশে যায় বুকে ব্যথামিত লাহারার।  
বহি থাকে ব্যথা মরনের কোণে থাকে বহি রূপ মায়,  
হবি তো তাহারে বলিতে পারি না বলিতে পারি না ছায়া !  
পথের দু'ধারে জনতা আমার চলে সব পাশ ঘেঁষে,  
তাদের নিষ্ঠুর হবি ওঠে বোর মরনের কোণে ভেসে।  
ওরা হবি নয়, নিবল পথের ওরা নয় উপছায়া,  
ঘুরে বত বাই, শুভ ব্যক্তি আছে ; জ্বলিতে পারি না ব্যথা।



# দিদিবাবীত শ্রী

শ্রী নীলমণ্ডল দাস শ্রী

সাত

হাজার বছর-সদাকর্ষ, পাগড়-যেবা বাগিচা—খুশায়ে  
পাগড়ের ওপরে তেল পাড়িয়ে, অপরূপ হয়ে উঠে। আবার  
বন্দ্যোপকরণের পাগড়, যা হাতের—একটি সত্যিকার বিজিয়ে আনবা  
বল আঁধি কখনো হাতে—একটি দুইটি পাগড়ের পা বেয়ে নেবে  
আনন্দ—একটি বস-প্রশাস, নীচেই স্তম্ভ হয়ে উঠে। একটি অতি  
প্রশস্তি, প্রশস্ত—এই প্রশস্তি ছাড়াই যেতে আসছে  
পাগড়। কখনো হাত হাতে আনবা আঁধি বসে—সত্যি অপরূপ  
মনোহর দৃশ্য।

হাত বললে, “এইবার বসে হওয়া উচিত। হানটি ত  
টিক শিখিয়ে না যে জিরে হেতে ডাং পাঁচবকী সমর লাগবে।”

আবার মনে কখনো সার নিল না—এত ভাল লাগছে  
আবার সেই পাগড়-যেবা শুরু হনকুনি। কিন্তু আর সত্যি হাজার  
ক’ সত্যি হাতের জিরে হাতের বলাবল্য চল শুরু। গুরু  
পাণ্ডিত এসেছি আনবা—পাণ্ডিতের হাতের হানিকটী বৃষ্টি এটা  
সমস্ত চারপাশ—বেধেই পাঁচিলাই গুরুতল পাগড়ের গ্যার  
চাউকিতে ছুঁতে ছুঁতে বসে বসে খেতে দেখেছে। হাত চীৎকার  
করে পাগড়োপকরণ বললে পাণ্ডী ছুঁতে—অপরূপের স্তম্ভতা  
ভর করে চাউকিতে পাগড়ের পা প্রসিদ্ধি। বেলা করে বেল।  
ভিন্নমিলত শুভিতে নিয়ে আনবা সত্যি বসে পাঁচিলাই।

এ পূর্ণের কাঁচীটুকুর হাতের চর একই বলা বলাকার, সেই-  
টুকু এইবার বসি।

\*

সেদিন হাতুণীকে বাতী আনবা অনেকক্ষণ ছিল। হাতুণী  
কিছুতেই ছাড়বে না—সামান্য বসন করে আনবাক পাগড়োপকরণ।  
ডাঃ হাতুণীকে পাগড় আনবা বিবেক কখনো বসে বসে উঠল।  
এক শেষ পর্যন্ত হাতের বসে হাতের হাতের হাতের হাতের  
গঠাৎ বসে। একটা কখনো উঠে বসে আনবা সত্যি ভর করে  
উঠতে হাতী বসে। হাতী উঠে উঠে করে অনেকক্ষণ কাটল।

আবারও বসে গিয়ে পলিডের বসিষ্ঠতাও হেল বেড়ে। ডাঃ  
হাত বসন করবে কখনো ওনকে যে আনবাক বাতী মাথায় বসে  
আনবা গরম—সাত চৌকীর হেল বেড়ে—কেনন যেন একই

অন্য চলে আনবাক বিকে বসিলেন চেয়ে। একটু বিচিত্র  
কৌতুক-পুষ্টি আনবা হুশের পানে চেয়ে বসিলেন, “এতবড়  
খবরটা ত এতদিন জানতাম না।”

হাত বললেন: “খবরটা সত্যিই মজা বড়। আনবার পাগ-  
বসাইয়ের সঙ্গে আনবাকের বাগের যে কতটা ঘনিষ্ঠতা ছিল, হাত  
আনবাকের হীক জানেন না।—”

ডাঃ হাত শুধু বললেন, “আমি সত্যি জানি।”

হুশের আশ্রয় প্রদান, তাই সেইদিনই আনবা সময়ে আনবা  
করে বসে হাতের হীক হল—পরের শুক্রবার দিন বিকেলবেলা—এই  
হুশটা আনবার ডাঃ হাত হাতুণীকে নিয়ে আনবাকের বাতী আনবাক।  
পনিবার বিবাহের তাইকোট বসে বসে; তাই শুক্রবার সন্ধ্যাবেলা  
হাতের স্তম্ভতা।

পাণ্ডিতের আলতে আলতে হাত বললেন, “চমৎকার লোক ত  
ডাঃ হাত—হুশমান মিষ্টতাবী এবং ধার্য পণ্ডিত। কখনো বসে  
বিশেষ আনবাক হয়। লোকটির ব্যক্তিত্বও একটা বিশেষ হাতুণী  
আছে।”

অনেক কথা শুক হাপিয়ে উঠল—কিন্তু কিছু বসিনি।

হাত আনবা বললেন, “হাতুণী যেতেইও বসে।”

বললেন, “কিন্তু হাতুণীকে চোখাটা বিশেষ বাগ্যে চলে দেখে।  
তুমি ত আগে দেখনি—কি হুশের লাক্ষ্য ছিল ওই ডোহাড  
বসে যোগ্য হয়ে গিয়ে কেনন যেন সব শুকিয়ে গেছে।”

হাত বললেন, “হ্যাঁ, চোখা দেখলেই যেন হয় নবীর অবস্থা।  
চিকিৎসার বাগ্য ত হয়েছে।”

হাত চোক, এই হল শুরু। হুই বাতীর মধ্যে বসে বসে  
হাতাধারে বসিষ্ঠতা করবেই নিবিড় হয়ে উঠল। এক শেষ পর্যন্ত  
এটা। হুই গিয়ে আনবা সমস্ত দিন হাতুণীকে বাতীতে কাটিয়ে  
এলান হাতুণীর বিশেষ আশ্রয়। আনবাক-বসনিবিক এ বসন দিন  
আনবা ভাবনে এসেছে বলে মনে হয় না।

কিন্তু—সত্যি কথা বলতে হলে, যে গোপন অনুভূতির আশ্রয়-  
টুকুর মত আনবা সমস্ত আশ্রয়-বসন আনবাক হয়ে থাকত, তার  
কিন্তু কোনও পণ্ডিত ইতিহাসে পর্যন্ত পাইনি। আনবা মনে  
কেনা হলে যে ডাঃ হাত বিশেষ আনবাক উৎকৃষ্ট হয়ে উঠতেন, তাই

বাইয়ের প্রথমে বসত প্রস্থ হোক, আমার লক্ষ্য এতাই নি। আমি উপস্থিত থাকলে, সত্যতা কিংবা অজ্ঞতামত চিন্তাভাব্য নিয়ে আলোচনায় ডাঃ হাথের অনুশ্রেষ্টতা যে লক্ষ্যবৃত্তি হয়ে উঠত—এও আমার দ্বিধা বিবাস : কিন্তু সেই পর্যন্ত। তাঁর নিরুত অজ্ঞতের গোপন পরামর্শের পরামর্শই এখনও আমি পাইনি এবং তাই যৌবন হয় এত আনন্দের মধ্যেও যাকে যাকে মন একটা অবশ্যে উঠে চলে,—সত্যত কোনও দিনই শেষনা পর্যন্ত। বলতে থাকা কখন না—যাকে যাকে একটু আনন্দে বাতাই যে কহিনি এমন নয়, অনেক তেবে ছোটখাট পরীক্ষার মধ্যে ডাঃ হাথকে বেশদূর চোঁটও করেছি কিন্তু পরীক্ষা বিতে তিনি যেন নাযাক এই ভাবে প্রতিবেদন—পান-কোলেব প্রায় গুঠে নি। একটা উদাহরণ দি।

মাদুরীনের বাড়িতে সমস্ত মিনটা থাকতে বাগ্যার আপট মনে মনে ভেবে গ্রীক করে নিবেদিত্যর বেড়া : বাগ্যের সঙ্গে মাদুরীনের অনুশ্রিতিক্তে হুঁ-একটা কথা বলে তাঁর মনোভাবটা একটু বুকে নেওকারে গুঠা করব। ডাঃ হাথের সঙ্গে সন্তক ভাবে কথা বলতে আমার আর যাবে না—তাই কি বলব সেটাও ভেবে গ্রীক করে নিবেদিত্যর। ডাঃ হাথের সঙ্গে নির্বিধি কথা বলার প্রথমে সন্তে বেরী হ'ল না। ওয়েষ বাড়ীর গোতালার এককোণে ডাঃ হাথের নিরুত একটা ঘর আছে—একটি ইকিডোষ, পাশে একটি ছোট টেবিল এবং চারিদিকে বই দিয়ে সাজান। এ ছাড়া সে ঘরে লম্বাঘাট আর বিশেষ কিছুই ছিল না। ওয়েষ বাড়িতে বাগ্যার কিছুক্ষণ পরেই আমি ও মাদুরী দুটো ছোট ছোট মোড়াল নিয়ে ডাঃ হাথের ঘর দিয়ে তাঁর সঙ্গে গর হুক করলাম। ডাঃ হাথ ইকিডোষের ওপর ওপরে একটা বই পড়ছিলেন তাই নিয়ে আলোচনা হিসেব হুক করে।

কলসেন, "মাদুরী আনন্দলভ কবি পেন্সির বিবরণ যা বসেছেন, কিছুতেই আমার মন সে কথায় যায় বের না।

অগ্রহে মাদুরী শুভাল, "কি বলেছেন তিনি ?"

এই নিয়ে কথা চল হুক। কিন্তু কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর আমার দিকে চেয়ে শুভাল, "তুমি যাচল জাই ?"

আমার হাতে থকি ছিল। বললাম, "সান্তে লগটা।"

তাড়াতাড়ি উঠে বললে, "আমি জাই বাই। বোকায়ে হুক বাইরে আসি—হাথ হাতে থাবে না।"

আমিও সঙ্গে সঙ্গে উঠে পাঁড়ালয়। মনে মনে একটু আশা যে ছিল না, এমন নয় যে ডাঃ হাথ হয় ত বলবেন, "আগনি মনন না।" কিন্তু তিনি কোনও কথাই বললেন না।

মাদুরী বলল, "তুমি যোগে না জাই, বাক্যের সঙ্গে গর কথ—মামি একটু পরেই আসি।"

ডাঃ হাথ কিছু বলেন নি, তাই আমি গরত কিছুতেই বলতাম না—কিন্তু হাথের আমার নিবেদন সংক, হয় ত এ দ্বিধা নিয়ে আর না হস্তেও পারে, তাই বলে পড়লাম। মাদুরী বলে গেল।

মাদুরী চলে বাগ্যার পর ডাঃ হাথ নিজের মনেই কেমন যেন চূপ করে বলে বসেছিলেন—কথা বহু হয়ে গেল। আমিই কথা হুক করলাম।

বললাম, "সত্যি বহু ভাল মেয়ে মাদুরী।"

ডাঃ হাথ সে কথাব কোনও জবাব না দিয়ে একটু হেসে আমার মুখেব দিকে চাইলেন।

আমার বললাম, "মনেত মেয়েব সঙ্গে ত জীবনে নিবেদিত্য, মাদুরীর বস্তন মেতে আর একটাও পাই নি।"

ডাঃ হাথ বললেন, "মাদুরীকে বহু ভালবাস, জাই মাদুরীকে তোমার বহু ভাল লাগে।"

বলতে ফুলে গেছি—ইতিমধ্যে লম্বার অনুশ্রেষ্ট ডাঃ হাথ আমাকে "তুমি বলতে শুরু করেছিলেন। হাতের ওপরে ত গুঠ-শিখের সম্পর্ক।

বললাম "ওহু তা কেন হবে—মামিও হুঁ-একটি মেয়েকেও আমি বিশেষ ভাবে ভাল বেশেছিলাম। কিন্তু তখন বুলশাম ভালবাসা গ্রীক গোপা নয় তাহা—জাই বলে বসে।"

বললেন—"চবিত্তের প্রীতি প্রথা না থাকলে ভালবাসা হুঁই হওয়া কঠিন।"

বললাম "গ্রীক বলেছেন। বুলনা বলে একটা ছেলেব সঙ্গে আমার কি ভাবট না হয়েছিল। অবশ্য বুলনা কিছু ছায়াব মেয়ে নয়।—কিন্তু তবুও—"

বললেন "লকসের সঙ্গে ত লকসের মনেব খাপ খাবে না।"

বললাম "বুলশাম সঙ্গে একসঙ্গে ফুল পড়তাম। তা আমার সঙ্গে মনেব মিলও হয়েছিল যুব। কিন্তু তখন বেশলাব ওর মনটা বহু লম্বা—অর্থাৎ বহুত অল্প মুশোটি কিনে নেওয়া যায়। আমার ভাল লাগল না।"

ডাঃ হাথ যৌবন হয় আমার বখার একটু কৌতুহল অনুভব করছিলেন। বহুত অল্প একটা চেয়েছিলেন, তবুও বেশলাব চোখে মুখে একটা চাপা হাসি বেশা করে রাখে।

কলসেন "লকসের মনেব মুশ্য ত এক নয়—সুপ্রী-লীলার এও িয়ে বহু বহু একটা বলা।"

কোন শিক গিরে কি ভাবে কথ্যটিকে এগিয়ে নিয়ে যায়  
ভাবছি—আরও কথ্যটি যে এখনও বলা হয়নি ।

বললাম, “যদুনার প্রতি আমি রক্ত অক্ষর কল্যায়—আমনি  
যদুনায়ে কুল বৃন্দবন না ।” কল কি, কুলে শব্দেতে পড়তেই তার  
খিতার পক্ষের একটি চম্পি বহুবেশ লোকের সঙ্গে বিয়ে করে  
গেল । আমার ভয়ানক বন ধারণ করে গেল তার ভক্ত ।  
বিয়ের পর সে কি ভাবে আমাকে উৎসাহ করে উঠল, সেখান থেকে শুধু  
আবার উঠল, এতটা দুঃখও হল তার ভক্ত ।”

সেই একটি ভাষা অল্প দিকে চোরে শুধু প্রশ্ন করলেন  
“কেন ?” এইভাবে প্রত্যেক হল ।

সেই জোরেই সবে বললাম “একটি চম্পি বহুবেশ বুড়োর  
সঙ্গে বিয়ে হল, উপায় নেই বলে সেটাকে মেনে নেওয়াটা  
বৃদ্ধের পক্ষে, কিন্তু তখন আমাকে উৎসাহ দওয়া যে কি  
আছে—আমি শুধু সেটা কিছুতেই বুঝতে পারি না ।”

তাই বুঝতে চাইলাম ভাষা: আমার দুঃখ পান: যেমন  
বা হতাশার কোনও আশা বহু বুঝে উপর ওঠে তেলে ।  
কিন্তু কৈ ? সেই একটি ভাষা—সেই ভাষা রাসি বেন আরও  
বলীভূত হয়ে উঠল যখন-তখন, আর কিছুই নয় । উত্তরে  
কোনও কথাই বললেন না । কলে ভাষা: সবার কাছে কথ্যটা  
বলায় নিলজ্ঞতার নিজেই বেন সচ্ছিত হয়ে হাউস লয়ে  
মিলে দেলাম । উঠে যেতে পারলে বাকি—কিন্তু উঠবার  
শক্তিই বেন গাফিলতি । ক্রমে এতটা হতাশায় বন উঠল  
ভয়ে ।

মাধুরী চুপস্বরে:—

যেহে শুধাল “কি গল্প গল্পিল?”

ছি: ছি:—ভাষা: তার বহু কথ্যটা বলে বেন । মাধুরীর কথ্যে  
কেন জারি না, ও কথা বলতে আমি কিছুতেই হতাশা নই—  
বিশেষত: তারই অসাক্ষাতে ভাষা: সবার কাছে শুধু কথ্য  
বলেছি শুধু বল মাধুরী ভাষা:ই বাকি । বোধ হয়, আমল  
চোখে একবার ভাষা: সবার দিকে চাইলাম ।

ভাষা: তার আবার মনের কথা ঠিক বুঝতে পেরেছিলেন কিনা  
জানি না, কিন্তু শুধু বললেন “তোমার কথা নিয়েই কথা হচ্ছিল ।  
তোমার মতন কেনে বুঝা আশা পর্যন্ত পারিনি—তাই তোমাকে  
এত ভালবাসে ।”

ভাষা: সবার কাছে বেন পবাক্ষরে বোল কলা পূর্ণ হল ।

শুধু বাঙালি হাওয়ায় পর মাধুরী ও আমি মাধুরীর

পোষাও গুরে বিজ্ঞানায় শুনে শুনে গল্প করছিলাম । কথায়  
কথায় আগেই বুঝেছিলাম মাধুরীর মনটা তার স্বাভাবিক প্রেম  
কতপূর্ণ—স্বাভাবিক বিয়ে কথা কইতে শোনে মাধুরী বেন আর  
কিছুই চায় না । মাধুরীর স্বাভাবিক আমি কখনও দেখিনি,  
তবে তখনইলাম সিনি স্বীয়ই ভূমি নিয়ে কলকাতায় আসলেন ।  
মাধুরী তার কটী দেখিলেই আমাকে—হতাশাটা ভালই, তবে  
মাধুরী চুপ এত পাতলা যে, ছবি বেখালে হঠাৎ মনে তার ঠাক  
পড়ে গেছে । লোকটিকে দেখবার কৌতূহল ছিল আমার মনে ।  
শুধালাম, “তোমার মাধুরীর কলকাতায় আসবার আর  
কত বাকী ?”

মাধুরী বললে, “প্রেম ত ছুটি বাকী নেই । পূজার  
আগেই সিনি গল্প বাকী ছুটি নিয়ে আসবার কথা আছে ।”

শুধালাম, “এসেই, সেই সঙ্গে তুমি পাতি দেবে নাকি ?”

বললে, “না ভাই, তাকুত তা যত নয় । আমার স্বাভাবিক  
ত সম্পূর্ণ স্বত্ব হয়নি । ছুটি গলে আমারই হাওয়া বললাম  
কিন্তু কোনও স্বাভাবিক জায়গায় নিয়ে যাবেন—এই কাকুর  
ইচ্ছে । তারপর কাকুরই আমাকে মোহনাবাস দেখে আসবেন ।”

শুধালাম, “তা মাধুরী বাকি তোমাকে যেতে যেতে গানী না  
হয় ।”

বললে, “তা কেন চান না—সে বাকুর লোক মোটেই  
নয় । আমার স্বাভাবিক তত তাঁর বিশেষ ভাবনা ।”

শুধালাম, “তা লোকটি এসে আমায় করিয়ে দেবে ত ?”

বললে, “তা ত দেখেই । কিন্তু ভাবী দুঃখটোয় ভাব  
কথা বাকী কইতে একবারেই পাকেন না—বিশেষত: বাইরের  
লোকের কাছে ।”

বললাম, “অবশ্য লোকের সঙ্গে কথা কইতেই সব কথা বার  
ফুরিয়ে—বাকির লোকের ভক্ত যে থাকে না কিছু ।”

মাধুরী হেসে বললে, “তোমার মতন অল্পবয়স্ক কথায় ভাঙার  
ত সকলের হয় না ।

বললাম, “তা তোমার কাকুর বাহাদুরী আছে ।”

মাধুরী শুধাল “কেন ?”

বললাম, “এই একতরফ জগৎটাও মধ্যে মধ্যে তখন তোমার  
মনের মতন মাধুরীরই পক্ষে বাকি রয়েছে ।”

মাধুরী হেসে উঠল ।

বললে, “কাকুরই ত পছন্দ করে দিয়ে গিয়েছেন ।”

বললাম, “তা তুমি বুঝে একটি কাকুর বাকি বাকুর  
না । আত্ম তোমার একটি কাকুর বাকুর কি বাকি হত  
বল ত ।”

কলসে "সতি। ভাই। এই দিক দিয়ে বাতীর সকলের মনে একটা গুণ আছে। কান্থ যে কিছুতেই ঘিরে কলসে বাতীর মেনে না।"

তথালায়, "কেন, কাথটা কি?"

বললে "ভানি না ভাই।"

তথালায় "ভাল সবছ পাওয়া যায় নি বুঝি?"

বললে, "তা কেন? কত ভাল ভাল সবছ এসেছিল। একটা মেয়ে ত সকলের পছন্দ হয়েছিল, তাহি প্রথম বেগুতে—কিন্তু কান্থ কিছুতেই মত দিলেন না।"

তথালায়, "মেয়ে কেমন নি?"

বললে, "বিয়ে করতেই বাতীর মন—তাই মেয়ে দেখার কথা উঠাই না।"

বললান "তা কেন বিয়ে করতে বাতীর মন—সে কথা তথাওনি?"

বললে "খা একদিন ঘোর করে হয়েছিল—বিয়ে করতে বাতীর না হওয়ায় কান্থ বলতেই হবে। কিন্তু বিশেষ কিছুই হলেন নি। শুধু বলেছিলেন—নিষেধ ভাইই বইতে পারি না, তা বিয়ে করে কি হবে।"

তথালায় "তা তোমার মা কি বললেন?"

বললে "কি আর কলসেন।"

বললান "আমি হলে বলতাম—সেই বক্তাই ত বিয়ে করা উচিত, ভাত বইতে পারে এমন একটা লোকের যে প্রণোদন।" বাতীর হেসে উঠল। "একদিক দিয়ে আমার মনে মতাই একটা প্রবল কৌতূহল আছে—ভায়েও মন শিউরে উঠে, ভাল লাগে না সে কথা মনে করিওর তবুও তাঁই দিতে।"

কবে এল পুজোর ছুটি। বাতীর বাতীর ইতিমধ্যে এসে সাত আট দিন থেকে চলে গিয়েছেন। একদিন লোকসম্মেলন লোক আশায় আলাপ হয়েছিল—সতিই তাহি লাখু লোক। বিশেষ কিছু কথা হলেন না, শুধু কথাবার্তার দক্ষর একটু হাসেন—ঐটি হুটতে একটা হাসি কেন সর্বজনই লেগে আছে। চোখ হঠাৎ বেশ—একটা খিটখিট সন্দেহ চাহনি। ঘোড়ার উপর লোকসম্মেলন আমার ভালই লাগল—কদা, একতারা বড়ন, পাতলা পাতলা চুল টেনে পিছনে দিকে আঁচড়ান, বেশ ভিটকাটি, পিছনের এক চটপটে।

দিকের মেলায় ছোট একটা গ্রাম, গালুতী—বিশেষ নাকি বাতীর হান। কলকাতায় হু-চাষ জন জরাজীর্ণ দেখান

বাতীর করেছেন—হাওয়া বলাতে গিয়ে কাথার প্রতি সকলেই নাকি বিশেষ আকৃষ্ট হন, এত সন্মোহন হান গালুতী। ভাত হায়েন একটা অধ্যাপক-বন্ধুর একখানি বাতীর আছে সেখানে, হুইভাসে ভাল ভাত—অর্ধেক অংশে তিনি ছুটীর সময়, নিজে গিয়ে থাকেন এবং অর্ধেকটা ভাতা কেন। সেই অংশ ভাত যার ভাতা করেছেন—মাতুরীর পুজোর ছুটিতে হাওয়া বলাতে গিয়ে যাবেন। বাতীর আমাকে গবে বলল।

"চলনা ভাত তোমারও এবার গালুতী।"

কথাটা আমার মনে আগেই উঠেছিল কিন্তু আমি মূখ্য হুটে কিছু বলিনি।

মাতুরীকে বললাম "ভালই ত, হুই, সেখি, থাকাক কলস।"

মাতুরী বলল "কান্থ বলছিলেন যে ওঁর এক উকীল-বন্ধুর একখানি বাতীর আছে—তারা নাকি এবার যাবেন না। তাঁরা শব্দ ভাতা দেন না, তবে তোমার বনি বাও ত কান্থ তাঁকে বলে চোঁর করতে পারেন। ওখানে সাধারণতঃ বাতীর পাওয়া নাকি তাহি কষ্টের।"

আজ্ঞে হল। বললাম "ও! তোমার কান্থর সঙ্গে আগেই কথা হয়েছে দেখছি।"

বললে, "হাঁ—কান্থই কথাটা জুলাছিলেন।"

তথালায় "কেন?"

বললে "বলছিলেন—ওঁরও গিয়ে চলনা গালুতী। বেশ জড়িয়ে থাকা যাবে।"

মন আনন্দে নেচে উঠল। মনেভাব চেয়ে বললাম "আমরা প্রত্যেক বছর পুজোর সময়ই যে বাইরে বাই এখন নয়। তবে সেখি থাকাক বলে।"

মাতুরীর বাতীর বেড়াতে গিয়েই এই সব কথা। আমি ও মাতুরী বাতীর ভিতর কথা কইতলাম—বাইয়ের গবে বসেছিলেন লাল ও ভাত হায়ে। মাতুরীকে দিয়ে নীচে মেয়ে এসে বাইয়ের ঘরে চুকতেই লাল বললেন

"কুলা। এবার হুটতে গালুতী যাবি?"

আমাকে কিছু বলার আগেই মাতুরী বললে "হাঁ, তাই চলুন, যেন হুই যাব। আমি কুলাকেও বলছিলাম সে কথা।" মাতুরী ভাবে লালকে তথালায় "এবার পুজোর কি বাইয়ে যাবে, ভাবছ?"

লাল বললেন "ভাত হায়ে বলছিলেন গালুতী পাওয়ায় কথা। ভাল বাতীর নাকি টিক কত দিতে পারেন। তাই তাহিলায় খেলতে হুই।"

যেন গান্ধী বাওঁৰ বিদেহ টেকে নেই, এই ভাবে বললাম  
“তা যদি বাওঁ ত পিন্ধুতলা চলো। দেৱাৰ দেওৱা থেকে  
পিন্ধুতলা যেভাবে গিৰে কাপোৰটি ত পুৰ ভাল দেখেছিল  
তোমাৰ। অশ্লিষ্ট—একাধ এলেকাধাৰ।”

ভাঃ বাবেৰ সিকে, কথাতো হলে এক নজাৰে চেৰে নিৰেছিলো।  
আজ্ঞা লোক বা চোক। কথা শুনে দুখে ভাবেৰে তেটুহুত  
পৰিহৰণ চলো। দুখে বললো “তা পিন্ধুতলা ত পুৰ কল  
জাৰণ।”

হাহুৰী বলল “এই নাক, আঁহাৰ পিন্ধুতলা কোবেৰে এস।  
গান্ধীট চলো না থালা।”

হাঃ বললো “দেলে গান্ধীট যেতে চাই। কে আঁহাৰ  
পিন্ধুতলাৰ বাতী ঠিক কৰে দেৱ। এই ভঙট ত বেলেলা চৰ না।”

উলানী ভাবে ওলালো “গান্ধীতে পাহাৰ আছে?” ভাঃ  
হাঃ যেন উলানী ভাবেই বললো “ওনেই ত আছে—তবে  
পোনা কথাৰ বিপাক কি?”

হাহুৰীৰ বোৰ হাঃ হৈবোৰে বাঁহন একটু ভাঙল। উৰু উত্তেজিত  
ভাঃই কাককে বলল “এই যে আমাকে ত বললো—চাৰিতিক  
পাহাৰ বেয়া, দাকখানো সুৰ্য্যবোৰা মলীট এঁকে বৈকে বৰে  
সিদ্ধে। সেই মলীৰ বাওঁট পাহাৰেৰ পাৰে আঁহাৰে বাতী।”

ভাঃ হাঃ একটু চেলে বললো “সবট ত আমাৰ পোনা কথা।”

হাই চোক, শেষ পৰ্য্যন্ত গান্ধী বাওঁট এক হৰাৰ ঠিক চল।

হাঃ ভাঃ হাঃকে অহুৰোৰ ভাৰিৰে এলো—বাতী ঠিক কৰে দিতে।

হাতীতে আসতে আসতে আমাকে বললো “গান্ধী পুৰ কল  
জাৰণ, একথা আঁহাৰে আসেও তনেছি। চল, গান্ধীট হাই।”

বললাম “বাতী ঠিক চৰ কৰে ত?”

বললো “ভাঃ বাৰে বৰে ভাবে কথা বললো—উনি একটু  
কলমেই বাতী ঠিক হ’বে হাবো। বাৰ বাতী তিনি ভাঃ বাৰে  
বিলেৰ বহু।”

বললাম “ওঁৰ আঁহাৰ চোৱা কলৰ তেনে কি পৰা।”

বললো, “উনি ত সোৱে কথাতো কুসেছো—একটু পৰা  
আছে বৈ কি।”

কথাতো শুনে একটু অসোহাৰি অলুতৰ কললাম।

সৰে সৰে হাঃ আঁহাৰ বললো, “বিলেৰ এককল কল-বাহাৰ  
বাহলে ভালই ত” চৰ।”

কথাটোৰ বৰ বৰিও হালকা হ’ল, তবুও কথাতো ভাল লাগল  
না।

বাৰে আঁহাৰ গান্ধী এলো পৌছিলো। হাঃ ভাঃ  
থেকে লকাল হোলা। এটা আমাৰ কলপাতো চতেছিলো, বিকেল  
হিনটো আমাৰ গান্ধী এলো নামলাৰ। হাহুৰীৰ চাঃ পাঁচ দিন  
আপোঁট বগানা হৰে দেখে। আমাৰেৰে ঠাঃ এলো পৌহচেই  
বেগৰে পোলাৰ হাহুৰী ও ভাঃ বাৰ ঠাঃৰে ঠাঃৰে  
আমাৰেৰেই নিৰে বাওঁৰাৰ চৰ। হাহুৰীৰ বাৰাৰ তিনিপৰা  
চাঃৰে হেঁটে আমাৰ ঠাঃৰে থেকে বগানা চলো।

ঠাঃৰে থেকে অহা একটু হেঁটে গিৰেই একটা হেঁটে পাহাৰেৰ  
উপৰ কলমে উঠে চ’ল—এই পাহাৰটো পাহাৰেৰে পিন্ধে  
আমাৰেৰে বাতী। এইটোই পোনা হাঃ—নিলে লৰা হাঃ  
যেত দেলে, অলোচকো নাৰি যুগতে চৰ।

ছোট পাহাৰটোৰ উপৰ উঠে, হাঃ হাঃৰাৰ জাঃ আঁহাৰ একটু  
ঠাঃলালো। মেলা বিকেলবলো—আমাৰেৰে বোত ছিল না।  
চাঃৰিৰে চেৰে পাহাৰ—কী অৰ্পৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য আমাৰ  
দিয়ে হৈৰ হৈৰ কলমে, এখন ত’ৰ পূৰ্ণ কলমেৰে পাহাৰ।  
অলিৰেৰে মেলা অলিৰেৰে চাঃৰিৰেৰে মেলা পাহাৰেৰে পাহাৰে  
পাহাৰীল হাঃৰে অৰ্পৰ প্ৰাকৃতিক—চোৰ জুৰিৰে বাৰ। হাঃৰে  
কিছু হুৰেই পাহাৰেৰে কোল দিয়ে কলমেৰে তল কলমেৰে—  
অৰ্পৰেৰেৰেৰে—হুৰে হুৰে বিভিন্ন পাহাৰেৰেৰেৰেৰেৰে  
দিলে। হুৰেৰে হুৰেৰে পাহাৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰে  
হাঃৰে—একটু হাঃৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰে  
চাঃৰিৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰে  
বাহাৰ বাতী হাঃৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰে  
পাহাৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰে  
পাহাৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰে  
পাহাৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰে

“এই হুৰে বোৰা বাৰ বন বন-বন

এ-বন দেলেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰে

আমাৰ বেলালটোৰ চাঃৰিৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰে  
লৰাৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰে  
হাঃৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰে  
সেইবাহেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰে  
বললো, “বিকলে এইবাহেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰে  
অৰ্পৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰে  
এলো বসি।”

হাহুৰী বলল, “কল এ আমাৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰেৰে  
হুৰিলা।”

গুণালম, “আমাদের বাড়ী কোনটা ?”

ডাঃ বাহ বললেন, “কোনী ঘরে নয়। পিছনে খানিকটা মেঝে দিয়ে—ঐ যে পাগড়টা বেধা থাকে—ওই তলায়।”

গুণালম, “ও পাগড়টা ‘ত’ বেশ উঁচু—ওটাকে কি পাগড় বলে ?”

নাহুদী বলল, “এ-বেশের লোক বলে—একড়ে তুণী। এককালে নাকি ভয়ানক একড়ে বাধ ছিল পাগড়টায়, তাইব নাকি অমলও ছিল তখন। এখন শু আছে অমল নেই, তাই কানু ওর নাম দিয়েছেন—নরকুট।”

হাল বললেন, “ডাঃ বাহ বৃষ্টি চাবিটিকে নামকরণ ক’রে বেড়াচ্ছেন।”

নাহুদী বলল, “হ্যাঁ, সব নামই ঠিক হয়ে গেছে। ঐ যে ঘুরে ঘুরেওখান ও-পায়ে বস পাগড়টার চূড়া বেধা থাকে—ওর নাম ‘সিঁকেবর’। তার পনের নীচু চূড়াটির নাম ‘মহাবের’। পশ্চিম-কপিন কোণে ঐ যে বিঘাট উঁচু পাগড়টী, ওর নাম ‘বনুকা’। পিছনে দিকে ঐ ছোট ছোট চাষী পাগড়-চূড়া ফেন কে সূক্ষ্ম ক’রে সাজিয়ে রেখেছে—ওর নাম দিয়েছেন ‘চতুহর’। এ-বেশের লোক বলে ‘কুকিনী’। পিছনে উত্তর কোণে যে বিঘাট পাগড়টী ঝাঁকিয়ে আছে ওর নাম ‘লেনাশাল’।”

ডাঃ বাহ বললেন, “তুই যে এক মিথ্যেপন একেবারে পূর খুঁজু বলে বেলদি।”

তারপর হাজার দিকে একটু চেষ্টা করলেন, “সব নামই

আমার বেওয়া নয়। সিঁকেবর, মহাবের, বনুকা, কুকিনী, লেনাশাল—এ-বেশেরই নাম। স্থানীয় পাটনাটার সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে, এখানকারই অকথাপন লোক—চমৎকার লোকটি। তাঁর কাছ থেকেই আমর বর পেরেছি।”

বড় বৌদি একটু ঘুরে ইক খোদটা টেনে ঝাঁকিয়ে ছিলেন। একটু ঘের বিকল হ’য়ে করলেন, “এইবার সেলে হ’ত না।”

হাল বললেন, “হ্যাঁ—চল।”

আমি নাহুদীকে জিজ্ঞাসা করলাম, “তোমাদের বাড়ী কোনটা তাই ?”

নাহুদী আগ্রহে বলল, “ঐ যে বেধা থাকে—”

যে পাগড়টার উপর আমরা ঝাঁকিয়েছিলাম তারই খানিক পশ্চিমে নীচে গাছের কাঁকে কাঁকে একটা ব্যালোয় ছায়া বেধা থাকিল—নাহুদী সেইটে দেখিয়ে দিলে। চলতে চলতে গুণালম, “শাক বাড়ী নয় ?”

বলল, “শাক বাড়ী ‘ত’ খটেই, তবে ছায়াটা হাশীলর টাইলেয়। ছোট বাড়ী, তবে বেশ খটখটে।

আমাদের বাড়ী এলায়। শাক বাড়ী, তিনখানা ঘর। বাড়ীর ঠিক পিছনেই নরকুট—নামে এসে বাড়ীর প্রাঙ্গণেই শেষ হয়েছে। নাহুদী ও ডাঃ বাহ আমাদের বাড়ী পৌঁছে দিয়ে চলে গেলেন। বলে গেলেন যে, খানিকটা পরে আমার আসবেন—একসঙ্গে বেড়িয়ে যাবেন। [ ক্রন্দ:

## সংযম

ঐতুলতা সেন

ব্রহ্মপুত্র চিত্ত আয় স্পর্শাত্মক যের  
অভিধান ভাষাক্রান্ত দিত্ত ত’নধন :  
ধননীত অচেতন, জাগে নাথ, রেহ,  
তর্জিত অধর-ওষ্ঠ কে কবে শালন ?

প্রাণে প্রাণে বা জাগে নিবিল-কুবল  
অকৃতি আছের কবে সজীত, ভবিত,  
মুহুর্তে হৃদিগে ওঠে নাথের কীবন,  
অসংখ্য এ-প্রলোভন কে পারে গমিত ?

যা কিছু বাহিত তাব কতইহু পাবে ?  
সম্পূর্ণ বসন চোরে মিসিরে কবিকা,  
শেষ হবে কয় হোক, কুখি কেন যাবে—  
টানিতে আলোব যুকে কুক স্বমিকা।

সংঘে কান্নারে কত ? সে জো নতায় নয়,  
সে জো শুধু হৃদয়বশ, সে তো অভিময়।



# শিল্পের মুক্তি

ত্রিবিংশতম সেনগুপ্ত

সামান্যিক সাহিত্য শিল্পীরা একটা পথের সঙ্গে পৌছতে যখন নতুনতর বৈচিত্র্যের অগাধ তার মধ্যে প্রতিফলিত হচ্ছে এবং যে কারণগুলো এখনকার দিনে শিল্পীর অন্তরায় হয়ে পড়ছে, সে-সব কারণ কী করে দূর করা যেতে পারে—তা নিয়েও আলোচনা অনিবার্য হয়ে উঠেছে। সাহিত্যের ইতিহাসে অনেক বারই এ রকম সময় এসেছে যখন সাহিত্য স্বতন্ত্র শিল্পপ্রচেষ্টার মত হিসেবে প্রাণবান হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। আবার যেহেতু সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পের স্বাধীনতার হাতে থাকে, সে-হেতু সাহিত্যের ও শিল্পের মূল্য বিচার করতে বসে, বিবর্ত-বস্ত্র প্রকাশভঙ্গী ও আঙ্গিকের বিচার যেতন অপরিহার্য, সেজন্য সামাজিক পরিস্থিতির বিশ্লেষণও আবশ্যিক নয়। সাহিত্য ও শিল্পের ক্ষেত্রে নতুন কিছু যে হচ্ছে না, এটা সম্প্রতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। অবশ্য সেই সঙ্গে এটা স্বীকার্য যে নতুন ধরনের শিল্প-প্রচেষ্টাও পাশাপাশি চলছে—যদিও সে-শিল্পপ্রচেষ্টা অনেক ক্ষেত্রে উন্মোচনই পর্যাবসিত হয়েছে। একথা বোধ হয় অস্বীকার করা যায় না যে দশা-ভীষনে স্বতন্ত্র পথের না এঁকটা ভারসাম্য বা স্থিতিস্থাপকতা আসছে, ততক্ষণ পর্যন্ত বহু শিল্প-সাহিত্য-সৃষ্টি সম্ভবপর নয়। ছাত্রজন এমন শিল্পী হওয়া থাকতে পারেন যারা একদিকে লাঞ্চার করেন অপর দিকে শিল্পগড়ে ভোলেন; কিন্তু ব্যাপকভাবে শিল্প-সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভবপর কিনা সন্দেহ।

এক সময় ছিল যখন শিল্প নিছক ভাববিলাসীদের আনন্দবিনোদনের বস্তু ছিল না; ব্যাপকভাবে জনগণের জীবনব্যবহার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র ছিল। আনন্দের বাঙলা দেশে আপেকার দিনে বাজা, পাঁজালী, কথকতা পরী-শ্রুতির মত দিয়ে উচ্চাঙ্গের সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব না হলেও ব্যাপকভাবে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার ও পুর্ন-পোষকতা সম্ভব হয়েছিল। শিল্প উচ্চাঙ্গেরও হওয়া চাই আবার সর্বজনভোগ্যও হওয়া চাই—এখনকার দিনে এই দিকটার ঘোঁর পড়ছে। পূর্বকার গ্রাম্য-সাহিত্য উচ্চাঙ্গের ছিল না; কিন্তু বহু ব্যাপক জনসাধারণ

তার হল আশ্রয়ন করতে পারতো। এখনকার দিনে সাহিত্য উচ্চাঙ্গের হয়েছে ও হচ্ছে কিন্তু জনসাধারণের বিরাট অংশের সঙ্গে তার সংযোগ জনশয়ই আলগা হয়ে পড়ছে। শিল্পের এই যে অচল অংশ—এ-অংশের সমাধান না হওয়া পর্যন্ত এ-খণ্ডের সাহিত্য-শিল্প মূল্যবান শ্রাণস্বত্বের অভাবে দীড়িত হবে বলে মনে হয়। এলিকাবেবীর যুগের নাট্যসাহিত্য যে অমিত্রী ব্যরণ করেছিল, তার মূলে শুধু নাট্যকারের শ্রেষ্ঠ স্বজনী-শ্রুতিভাই নিহিত ছিল না, জনসাধারণের, নাট্যাঙ্গারগাহী অগণিত দর্শকশ্রেণীর পূর্ণপোষকতাও অন্যতম কারণ, এ-সত্য বিস্মৃত হলে চলবে না। সেদিনের দর্শকদের মধ্যে জগদ্ব্যবহারের তুলনার বুর্জোয়া ও ধনহুয়েলশ্রেণীর লোকের সংখ্যা ছিল সাবান্যই। এবং চতুর্থ শ্রেণীর আসনে উপবিষ্ট অগণিত সাধারণ দর্শকের অবিদ্যায় করতালির মত দিয়েই প্রদানত: যে কোনো নাটকের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণীত হতো। তখনকার দিনের শিল্পপ্রচেষ্টার মধ্যে অগণিত সাধারণ দর্শক নিজেদের বৈদম্বিন অভিজ্ঞতার শিল্পরূপকেই বুঝে গেলো বলে নাট্য-সাহিত্যের প্রসার এতো অধিক এবং প্রভাব এতো গভীর হতে পেরেছিল। মুকুটিন যে নিরতিবাদ ‘কিং লিয়ার’ ‘ম্যাকবেথ’ নাটকে প্রতিফলিত হয়েছে, সামান্যিক ইংলণ্ডের জনসাধারণ সে-নিরতিবাদে শুধু যে আশ্রয়ান ছিল তাই নয়, নিজেদের জীবনেও তার প্রভাবকে সর্ব্বা-যেনে নিতে তৎপর ছিল। এলিকাবেবীর আমলে ধনতন্ত্রের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বুর্জোয়া-সত্যতার প্রসার জাতীয় শিল্পকে যেতন একদিকে সমৃদ্ধ করছিল, অন্য দিকে তেমনি দুই সাধারণ লোকও অপেক্ষাকৃত নিশ্চিত ও সংহত চিন্তে জাতীয় শিল্পকে উপলব্ধি করে শ্রদ্ধা ভাবনাত: বরবান হয়েছিল।

পৃথিবীতে ধনতন্ত্রের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এবং বিশেষ করে উৎপাদন ব্যবস্থার জটিলতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এক-দিকে যেমন বাস্তবের দ্বারা বাস্তবের পোষণ ব্যবস্থা জীবন্ত হতে উঠতে লাগলো, তদীয় উৎপাদনকারী শ্রমজীবী বা কৃষকের হাত থেকে নতুন মালিকের হাতে

চলে এলো কবির মালিকানা—অন্য বিকে ভের্নান শিল্পে  
সেখা দিল করিকৃতা বার ফলে সিংগোস দুপের শিল্পের  
প্রাণবন্তির প্রকাশ এ দুপের শিল্পে আর সম্ভবপর হলো  
না। সমাজতান্ত্রিক যুগ থেকে ধনতান্ত্রিক যুগে উৎপত্তি  
হবার কলে যে নতুন ধরণের প্রাণবান শিল্প সম্ভব হয়ে-  
ছিল—স্বল্প আয় ও দুপের সাহিত্যশিল্পে খুঁজে পাওয়া  
গেলো না। শেষ পর্যন্ত সেখা গেলো অনসাধারণের  
সঙ্গে শিল্পের সংযোগ ঘেন আর হইলো না। এর কারণ  
কি? একটা কারণ অর্থ এই যে, যন্ত্রসজ্জার প্রসাধের  
মকন সহ ও প্রাণের দুঃখ বৃত্তি শেখতে; সহরের  
যান্ত্রিক জীবনের আবহাওয়ার যে শিল্পী মালিত হয়েছেন,  
তার শিল্পরূপেও যন্ত্রমতাত্ত্বিক এক ধরণের জটিলতা  
অনুপ্রকাশ করা অসম্ভাবিক নয়। গ্রাম্য কবির যে  
অভিজ্ঞতা—কবি গান কিংবা পল্লী সঙ্গীতের মধ্যে যে  
শিল্পধর্মের প্রতিকলন—এক সময়ে তার যন্ত্রজাতীয়  
অভাব দুই হয়নি। কিন্তু সময়ের আবহাওয়ার মালিত  
যে শিল্পসাহিত্য, তার পাঠক সংখ্যা ক্রমশই বিলম্ব আকার  
ধারণ করিতে লাগলো এই জন্যে যে শিল্পী বা  
সাহিত্যিকের যে বিশেষ ধরণের উপলব্ধি বা অভিজ্ঞতা  
তা পরিণত হয়েছিল তার নিজস্বই ব্যক্তিগত অধুত্বভূত  
—যার সঙ্গে ব্যাপক অনসাধারণের অভিজ্ঞতার ভেদ  
কোনো দিল খুঁজে পাওয়া সম্ভবপর হ'লো না। শেষ  
পর্যন্ত তাই সেখা যেতে লাগলো এ দুপের স্মৃতি ও কুস্মি  
একটা সঙ্গীত গীতে আবদ্ধ হ'য়ে পড়েছে এবং মানা  
সত্যবায়ের চাপে কণ্ঠকণ্ঠ হ'য়ে পড়েছে বেন।

উনবিংশ শতকের শেষের দিকে ও বিংশ শতকে  
শিল্প সম্পর্কে নানা ধরণের মতবাদ শোনা যেতে লাগলো।  
এবং এক-একটি শিল্পী-সাহিত্যিকের মনকে কেন্দ্র করে  
এক-একটি আন্দোলন মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে লাগলো।  
ইমপ্রেসন, বনর্ভান, জুস্কার এলেন পো, ভোলা, টি, এল.  
এলিয়ট—এই সব নাট্যকার, গুণনামিক ও কবির  
কেন্দ্র করে নতুন ধরণের শ্রমশীলপ্রচেষ্টার সম্ভাবনা বিংশ  
শতকের প্রথম তিন দশকের পৃথিবীর সাহিত্যকে উন্নয়ন-  
যোগ্য পঞ্জিগঠনেই দিকে এদিয়ে আনলো। কিন্তু  
শিল্পে ও সাহিত্যে এই শ্রমশ্রুতি জোয়ার খুব বেশী দিল

হইলো না; শীগিরই অল্পজন কয় যেতে লাগলো যে  
সাহিত্য ক্রমশই কোণঠাসা হ'য়ে পড়ছে। শেষ পর্যন্ত  
সেখা গেলো সাহিত্য নন ছেড়ে মস্তিষ্ক-প্রধান হ'য়ে  
উঠলো; জীবনের স্তর শিল্পরূপের পরিকল্পে সেখানে  
এলো যন্ত্রপ্রধান ও বিতর্কপ্রধান চিত্রকৃত্তির প্রবলণ;  
বিশেষ বিশেষ বিয়েরী, বিশেষ বিশেষ বিতর্ক-  
মূলক প্রবন্ধ—এ সমস্তই এ দুপের সাহিত্য-শিল্পকে দাক-  
ভারী করে তুললো। বর্ণিত শ'দ নাটকে, অয়েল ও  
নরেশের গল্প উপজ্ঞান, এলিয়টের কবিতার বিশেষ করে  
মস্তিষ্ক প্রধান চিত্রিত্যের মনুনা পাওয়া সম্ভবপর হ'লো।  
কিন্তু মনোবিশিষ্ট ও স্বেচ্ছাচার প্রেরণী এক বিশেষ বংশ ছাড়া  
সমাজের বাকী অংশ পিড়িয়েই রইলো, শিল্প শতকের  
মতি বড়ো বহা-স্বীকৃতির স্তর শিল্প-সাহিত্য ও তারের অধ-  
ভূতিকে প্রভাবিত করতে সমর্থ হ'লো না। স্মৃতিই  
উপলব্ধি করা যেতে লাগলো যে, মাধবন মানুষের এবং  
বিশেষ করে সমাজের নীচতমার অস্বাস্থ্য অংশের লোক-  
দের প্রাত্যহিক জীবনের কোনো অভিজ্ঞতা এই সাহিত্য-  
শিল্পে নেই বলেই ব্যাপকভাবে অসংগত বোধে বিশেষ  
শতকের সাহিত্যের আবেদন খুব কার্যকরী হ'তে পারেনি,  
কাজে কাজেই অসুস্থমান চললো আসল গল্প কোবার  
তা খুঁজে বার করার ভজ্ঞে এবং এ সিদ্ধান্তে আসা  
অনিবার্য হ'য়ে উঠলো যে, বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার পরি-  
কল্পন না ঘটলে শিল্পের সত্যিকারের বৃত্তিও আর সম্ভবপর  
নয়। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার গবেষণা দেখিতে মিলেন  
যে, পূর্ব-পূর্ব যুগে সমাজ-জীবনের অগণ্যকৃত সমস্তার  
যুগেই শিল্প অনসাধারণের ব্যাপকতম অংশের দ্বারা অভি-  
নমিত হ'য়েছিল। কালক্রমে যে শিল্প ক্রমশই লক্ষ্যভিত  
হ'য়ে আসছিল তার কারণ সমাজ-বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে  
বিশেষ-বিশেষ শ্রেণীর পুণ্ড্রগোষ্ঠতার বিশেষ বিশেষ  
শ্রেণীস্বার্থবজার রাখার উদ্দেশ্যে শিল্পকে ব্যবহার করার  
চেষ্টা সেখা দিতেছিল। শিল্পের ইতিহাসে দেখতে পাওয়া  
যায়, আদিম সাম্রাজ্যের স্তরে শিল্পের অধিকারী ও উপ-  
ভোগকরী ছিল জনগণই। শিল্পের মধ্যে পুণ্ড্র সাম্রাজ্য  
লোক ও খুঁজে গেতো তার অভিজ্ঞতার, তার বৈশিষ্ট্য  
জীবনসংগ্রাম ও আশা-আকাঙ্ক্ষার শিল্পরূপকে। তারপর

সমাজ বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এলো সাবলভ্য ও বাস্তবতা । হঠাৎ ও সাময়িকের পূর্ণিলাসকতা একদিকে যেমন শিল্পীর কীমনতে বস্তু ক'রে তুলুশো অসম্পূর্ণকে তেমনি জন-সাধারণের কী বহুধারা থেকে শিল্পকে অনেকখানি বিছিন্ন ক'রে আনলো । তাৎপর্য স্বপ্নে সামান্য হাতাবের হাত থেকে বুর্জোয়া স্বমতী কেড়ে নিতে সর্ব্ব্ব হুগো, তখন তার প্রভাব দিয়ে, সাহিত্যেও অব্যবহৃত হ'লো । গোড়ার দিকে বুর্জোয়া বনতন্ত্রী সভ্যতা বিপ্লববাহী ছিল বলেই সাহিত্যে নতুন বিপ্লবী প্রচেষ্টা আত্মপ্রকাশ ক'রেছিল । ইংলণ্ডে সমাজী এতিমাক্ষেপের আমলে যে সাহিত্য-শিল্প সৃষ্ট হ'য়েছিল তাতে এই বিপ্লবী স্বভাবী প্রচেষ্টা আত্মপ্রকাশ করে । কিন্তু ধীরে ধীরে দুঃপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবী বনতন্ত্রী সভ্যতা ক্রমশঃ সামাজ্যবাদের আকার গ্রহণ ক'রতে থাকে । পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে-দেশে ও বীপে-বীপে সামাজ্যবাদের চররা ছড়িয়ে পড়ে এবং নানা ছলে-বলে-কৌশলে দেশ-ব্যপার সামাজ্যবাদী পন্থাকা উদ্ভাবিত হয় । বিভিন্ন দেশকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ধরনের সামাজ্যবাদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে থাকে এবং প্রতিদ্বন্দ্বী সামাজ্যবাদী শক্তিসমূহ মধ্যে মারাত্মকত্ববোধের সংঘর্ষ চলতে থাকে এবং শিল্পকে যাতে সামাজ্যবাদের দীন উদ্ভেদ সাধনের ব্যবহারে ব্যবহৃত করা যায় তার জন্যে বিভিন্ন দেশের শিল্পীদের গণহুগ চাপ দেয়া হ'তে থাকে । রিনেসাঁসের যুগে ইতালীতে মাইকেল এঞ্জেলো ও লিওনার্দো দা ভিঞ্চি বড়ো শিল্পী, পেট্রার্ক ও বোকা-সিওর বড়ো কবি হয়েছিলেন, ইংলণ্ডে ওয়াটসন, চসার, ল্যাটামাওর বড়ো কবি আবির্ভূত হ'য়েছিলেন, আর প্রাচ্যভাঃ এরূপ অগ্রগ্রেহণার ইউরোপের দোকেয়া চার্জের প্রচারিত নির্জনবাস ও সমসার-বিভাগের আদর্শকে বর্জন করতে শিখেছিল, পুঁজিবাদের সমাজ-কীবাদের বুক থেকে পীড়ার ধর্ম্মসংসারের শুভ্রতার অপসারিত হ'য়েছিল কিন্তু বনতন্ত্রী সভ্যতা কালক্রমে যখন তার বিপ্লবী স্বভাবী-শক্তি হারিয়ে প্রতিক্রিয়াপন্থী হ'য়ে পড়লো, তখন তার হাত থেকে পৃথিবীর বাহুবল হস্তা করা এক মহাঅন্যায় হ'য়ে দাঁড়াগো ।

তারপর এই সিদ্ধান্তেই অনেক বলেন যে শোষণযুক্ত সামাজ্যতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা যেমন হ'লে সেটা সমাজ

ও উৎসাহের দৃষ্টি ক'রেই পাবে তেমনি শিল্পেও নতুন সম্ভাবনার বৃদ্ধি ক'রে দাত্যত্ববাদের সৃষ্টি পথে শিল্পকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে । শিল্প শোষণের ব্যক্তিগত সম্পত্তি এখনো শোষণ ও চরমসাধারণ উন্নতির পক্ষেই কতিকর । শিল্পের স্বাধীনতা অপক্তিব এবং শিল্পী নিজেই যেমল পুঁজী মতো শিল্প সৃষ্টি করতে থাকবেন এখনো গায়গা উগ্র ব্যক্তিগতত্ববাদী লেখক-সম্ভাব্যের মধ্যে বিশেষ শক্তিকেও লক্ষ্য করা যায় । যে শিল্পী সামাজিক দাবির গ্রহণে পরাভূত, সে ধরনের শিল্পকে উদ্দেশ্য ক'রে একদা ম্যাক্সিম গর্কী সাবলভ্যবাদী উচ্চারণ করেছিলেন । আধুনিক ব্যক্তি-সামাজ্যবাদী শিল্পী আসলে বনতন্ত্রবাদের সর্ব্বাঙ্গ সম্মুখে সোনার বাজার পাখী, সোনার বাজার থেকে ভাবিয়ে এই যে, বাট্টেরই অঙ্গ থেকে বিছিন্ন হ'য়ে থাকে এটাই সৃষ্টি সৃষ্টি । কিন্তু বাইরের দৃষ্ট আকাশ ও আন্দোল-বাস্তবের কোনো বোঝাই এই পাখী রাখে না, সূত্র সমুদ্র বাইরে যে কিছুমাত্র গণপ্রবাহের তরঙ্গমালা তার স্পর্শকে এড়িয়ে থাকবার প্রচেষ্টায়, তাই এ যুগের শিল্পীকে এতো অসহায় দেখায় । এই অসহায় অবস্থানে যেমন এ যুগের কাব্যে তেমনি উপভাস ও মটকের পার-পাতীরের মধ্যেও প্রতিফলিত হয় । তাই সমাজ-কীবাদের বর্তমান কাঠামোকে বদলাবার প্রচেষ্টা বড়ো হ'য়ে দেখা যায় । শিল্পী ও সাহিত্যিকদের প্রথম কর্তব্য হয়ে পড়ে সমাজবিপ্লবকে স্বপ্রাণিত করা, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের যে সুশীল মাতবের সৈন্যসৈন্য সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এখানে-সেখানে মতের পড়ে, তাকেই আরও সুসংযত ব্যাপক-রূপ দেওয়া । ম্যাক্সিম গর্কীর দৃষ্টান্ত এ প্রসঙ্গে যেন পড়া স্বাভাবিক । একমাত্র সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জরুরি ক্ষেত্রে শিল্পীদের শিল্পীকীবাদের সংযোগপন্থে স্থলানক'রে বিপ্লবের ও বিপ্লবের পরবর্তী কালের সমাজ-ব্যবস্থা সন্নিবিষ্ট ক'রে পকীভাবে দিয়ে দেয়া যে, সমাজতান্ত্রিক সমাজশাসনের ব্যাপারে শিল্পের দায়িত্ব-বোঝা স্বাভাবিক বর্তার চেয়ে কম নয় এবং শিল্পের সৃষ্টি একমাত্র সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্য দিয়েই সম্ভব, কারণ, সমাজতান্ত্রিক সমাজেই শিল্পের সর্ব্বাঙ্গ জন-সাধারণের কীবাদের ঐক্য অঙ্গুষ্ঠ থাকে এবং শোষণযুক্ত প্রত্নবীহীন সমাজেই শিল্পের প্রকৃত সৃষ্টি সম্ভব হয় ।

# দোল-পূর্ণিমা

স্বিমতী বীরা দেবী

এক

প্রাচ্যাতিক চাঁ পানের পর ভূট; হঠাৎ বসে সেদিনকার বলসক-  
কাগধানা শব্দছিল—সন্ধ্যা—অপর্ণার বিরক্তি-প্ৰচলিত কঠোর  
চকিত ভয়েই, হঠাৎ এসে—হাঁঃ—কিছুক্ষণ—এ তোমার কি  
অজ্ঞান বল, আমার। এমন বাকী ভাষণানা নই। কবে ছিলে ?  
তুমি জান, আমি কবেই ঘোটেই ভালবাসি না—তবু কি যে  
অসত্যতা ছি—বিরক্তি ও ক্রোধে অপর্ণার পুঙ্খ নুখানা  
গোলাপের দড়ি বন্ধিত হঠাৎ উঠিয়াছিল। আমার খুঁড়ুতা তাই  
স্বর্ণের বঃএ পিতৃস্বামী হতে হাতুড়ুতে বলিল—“আপনি  
ব্যক্তিগত-পত্নী, ধনী কত্তা, সামান্য একটা কাগজের তত বোক  
কত্তা আপনার অন্তঃস্রোতা পার না—যৌরী।”

উত্তেজিত হয়ে অপর্ণা বলল—“হঃ, ঠাকু লামের বাড়ীতে  
বলহ তুমি সামান্য—ঠাকুদানা, বসন্তে পার তোমার বৌ হলে  
কটা এই বকম বাড়ী গের ?”

অবিকৃত মন্ত স্বর্ণের তত অতি তত নুখানা ব্যথা হ’বে  
উঠলো, পরে চালিয়াই কবাব দিল—“একটা চিতে পাঠগো না  
যৌরী, কেননা আপনার কাছে ওটা সামান্য কিছু আমারে মত  
হয়িত্রের শব্দ ওটা নুলাবান—আমি একজন সামান্য কেমাই  
আমার বৌ কি নুলাবান বাড়ী পর্যন্ত পাবে ? আমি লেগলাম  
ব্যাপারটা ক্রমেই যোগাল হ’বে উঠছে—তবু ত্রিভাষ্য ক’রে  
বললাম—“আঃ পার্য কি কত্ত, মোলের যিনে বা সন্ধ্যাই হেবেই,  
আমার বাপ ঠাকুদান—”

একটা সালা সাধাব বাড়ী পর্যন্তে তা পাঠক আজ—আর  
সাহু আর আর তাই—পর্ণা সন্ধ্যাটা লাও—”

অপর্ণা উত্তর হ’বে বলল—“তোমার ভাই যে বাগ্গে বঃ  
কলে বাগ্গীরা—এছাড়া—আমার, সেটা আমার জানা ছিলো না,  
তা হলে একটা সাগ্গেই পুত্ৰতায়—” স্বর্ণের নুখানা  
জান হ’বে উঠলো, তবুও কৌতুক কলে একটু চালি এনে বলল—  
“বাক আর একদিন এসে যৌরীর হাতেই তা বঃএ, আজ অনেক  
কাজগার যেতে হবে—বুলা তুমি আমারে লু।” মৃদুস্বরী পোলাক  
কলে আঁচ হুড়ু, না কি—যৌরীর শাবদিয়েন চাই—সেই মুহূর্তে  
আমার পুঙ্খ নুখী পুত্ৰ শিবসুত্ৰ তার হেই ছাঁ হতে নুখানার  
ক যৌরী এনে আনববে বলল—“খঃ-মি, লু গুণে এসে” মীল  
লাল নানা বঃএ বন্ধিত তাঁর স্বর্ণের চেলাখানানা আরও স্বন্দর  
বেখাছিল। অপর্ণার কোথাকিত্তি ত্রিভাষ্যের এমন অবস্থার ত্রিভ

অলে উঠল—সন্ধ্যাবে তাৎ কোমল স্রবণে সন্ধ্যাবে যা বেবে  
ভাষ্য—“আঃ” খোকাব মাগা নুশিত অন্তরে এসে বাগ্গলো  
তি—সন্ধ্যাবে খোকাব নুশিত সাধাব হেইটা লেচনী হঃ বে বিলা  
হুত্ব—

উত্তর কটে অপর্ণা বলল—“উমতী তুমি ঠাকু গিয়া যা উমু,  
অতি ইগকে: আজি তরসে মাফা ক’বে।” মাগা ক্রন্দনহত  
শিবকে নিমু সাধবে ত্রুকে পালিয়ে বাগ্গলো। যেম সাধবেব  
যেগাও তাইই তাম্—কিলা—“অপর্ণা” কিং হানিবে  
বলল—আমার উপরে মাগা। কতি মাগাব উপর না  
কাড়লেই ত’ত যৌরী, না তাৎ আমাকেই হু বা হঃগেহন—অপর্ণা  
তার কবাব কর্ণপাত্রে না কয়েই স্রিগাবে-নম ক’রে সাধবেব  
দিকে চলে গেল। আমি কিছুই বললাম না। বিবাহ হ’বে  
অবধি আর এঃ বঃএ অপর্ণার এই বকম উচ্চত বঃএ কেব  
আসছি স্বর্ণের মন্ত হুত্ব লু। যেহাঃ মোলি যিনে আনল  
কহতে এসে অপর্ণাভিক্ত হ’বে কিংক শুল, বঃএ আমি নিমুপাত্ৰ,  
অপর্ণা ধনী কত্তা, আমি বঃগেহন মুল, বঃগেহন পুত্ৰতা বিমুত  
গিরে ব্যক্তিগত হ’বে কিংকি। অপর্ণা উঃ শিক্ততা—শিত্যে  
আবিক্ত কন্মা—মিগেব হেত কবাই সে ভঃগে ন, এবট্টেই  
উত্তর হ’বে হেই, অতিক্তি হেগলো—লক্ষ্য বঃগে প’ত—অবগ  
যেগা-মেগা—অঃগেহন আনুগিতা সে, বাবীন, লগাবীনতার মুখল  
সে মানতে হাকী নঃ ক’বাই। তাৎ শিত্য কনাকে সন্ধ্য  
বাবীনতা বিগেহিলেন—শিকারও কোনকণ তটী ক’বাই নি—  
কি-এ পাপ কঃ বেগে, নাঃ, গান হুঁতশিত, ত্রিঃগেহন ত্রিঃত বঃ  
যাইনি। তাগেও সে অমুসলীতা—অতিক্তত সন্ধ্য অপর্ণার  
নামতাক হু—এ হেত অপর্ণা আমাট পত্নী—ক’বাই ক’বে  
সেটা সঃব হ’ল তাই বলি।

দুই

প্রাচ্যাতিক আকাশের পর পরম-বকত বিলাহ কহতে কহতে  
আজ অতীতের অনেককাল ঘটনায় মনে পড়ে গেল। তখন  
আমি জানেই এট-ই ফুলের ফোঁটা হলে কি বাড়ীকঃসেব হুত্ব।  
এখনই এক কাগজের যিনে পূর্ণিমা ত্রিখিতে হোলীর বঃএ গঃগে  
পথে ঘাটে বঃএ মাভাভাঃ—আবীর গোলাব মালে লাল  
চারিতিক। গ্রামের নীলবেত নীল হীং কঃম গঃগেহন ডালে  
গোলমার বঃগে বঃগে মাগাঃগে সেঃ আমঃগে কঃবন বঃগে-  
উৎসব। কঃম, কিগোব, কঃগঃগ, মাঃগু, মঃগিকা, সঃগিতা,

বিজয়, বিকাশ, বাকল, শ্রামনী, সখ্যা, লব্ধ হইবে যেন পড়ে বাসভীতে। প্রবক্তা স্তম্ভ হইবে এতটুকু স্থিতি ছিলো না। অতি দ্রুত চক্ষুঃচন্দ্রা, চৌকতা কালে চুলকায় আঁচের কাছ অবধি এসে পড়তো—আত্মীয় মীল চৌর ছুটী হাফ, উচ্ছল শৌর্যবর্ষ, দ্বিগু ছিলে পোতাগা গঠন, গুটি ছুটী এত লাল অন্ন ভরত। সন্ধ্যাই পাতা খেতে থাকে ও। হেলো আমায় বললে বসু, তুমি শ্রম আন বাস ভাণ্ড। চমৎকার মানস, নারী ভাণ্ড? আমায় নাম বললুঃ বাঃ পাতার আমায় কৃতজ্ঞতা—বাসুই একদিন বললেনঃ “জ্ঞেয়তার কালো বাট কিয় চোখাঃ ভাণ্ড চমৎকার—চোখাঃ কৃত জ্ঞেয়তার মতোই ছিলেন।” আমি বললাম হৈলে বাণ্ডও নিষ্ঠর ভাণ্ড বসু ছিলেন বাণ্ড—শ্রীতা গায়ন করে দেখি—হ্যাঁ, শ্রীক হুহু হুহুই মত এমনই মীল চোখ ছিল বাণ্ডকাণ্ড। বাসভী হৈলে ফেলতোঃ—“আমি মুক্তি তার বলছি, আমি মুক্তি প্রকৃত” বলতাম অথচ উদ্ভাণ্ডে নিষ্ঠরই অল্প আমায় যেন হুহু শ্রীগায়ন রণ হোঃ খেঁক একটুও বোধি ছিলো না। বাসভী বিশ্বাস তরল সে কথা, সংলব্ধ হইবে প্রাণসার দূর হতে ফেলোঃ—“তুমিও বুঝ প্রকৃত, হুহুই কৃতজ্ঞতা শ্রীক যেমন দেখি, তুমিও শ্রীক তেমনি।”

আমি এক ভাণ্ডন হিমে—

চৌক পতাকা শেষ হইবে গিরিছে আনন্ডঃ, মাতৃক পতাকা আনন্ড। বাণ্ড মাঝা গিরিছে, মা বললেন, “বুঝ ভাল ক’বে পড় বাণ্ড বাণ্ডে কল্যাণশিল পড়ে পারিবা।”—যনি যনি লুচ লুচ ক’বে ফেললাম—“যত্নে শাশন বিধা পতীর শ্রম”। সমস্ত কুলে সেলাম, বাটেরে কোন কিছুই প্রবণ থাকতো না—মান, মাওরা কিছুই না। বাট ছুটী হিনটে পথান্ত পড়ে পূর্ববার বাট ৫০টা উঠলম, বাট ১০টা মুখাচাষ। মা পড়িত হইতে উঠলেন—“এমন করল যে তুমি পতাকার আশেই অল্পবে পড়িবা লুচ” বললাম কল্যাণশিল যে নিতেই চলে বা—নটলে কেমন ক’বে তুমি পড়াবে? মা মাঝাকাতর জন্ম বললেন,—কি-মিউ, মামুনী-মিউ ক’বেও চোকে পড়াবে বাণ্ড, তবু এক পরিচয় তোকে করত দিবা না। বাট আট বৎসর পর স্বর্গীয় জননীও ভবে ফেরবার চিত্র ভাবে উঠলো—তবু বৈদ্যনী-জননী আমায়, কোথায় মা তুমি? পতাকার বলল, তাই কাগজের বস্ত্র-উপরে সেবার আমায় যোগ দিগি। প্রপূর্ণবলসে, স্নেহবায়িবাণ্ড পর একই গুণেছিলেন, জ্যাতিভা একটা ভালি লম্বাঃ বসুবাণ্ড ককৃত-কুট পড়ে সেবেছিলেন। পড়বার যাবৎ বসুবাটী জেজামই ছিল, এদনিই প্রবণ ছিলাম যে, বসুবাটী বলল লম্বাঃ

পাইনি। বাসভী নিগদে পা দ্বিগু চিগে চুতছিল—এক বাসভী ললল কুলে হুহু হুহু হুহু, ছিল সে চোখে চি, চি, হুহু, কেমন বসু অত ক’বে বললাম জ্যাতিভে পড়া বাণ্ড, তা আমায় বাণ্ড হ’ল না—বই খাটা সমস্ত বই ভিত্তে একাকার, যাবে আমি জলে উঠলাম বল হিমে পাতার তার মাঝার মাঝার কল্যাণ। বাণ্ডের মাঝার মাঝারটা একই ঘোরেই সেগেলি। কিনিব গিরে, বস্ত্রবাণ্ড ওব সমস্ত মুখামাঃ লাল ক’বে ছিল—বাসভী ভাণ্ড আনন্ডনার ক’বে উঠল—“ও মাগো।” ওব চৌকাবে যাবে যনি ভেবে গিরেছিলো—ছুটে এসে বললেন কি হ’ল বসু? ও কি। বাসভ কল্যাঃ কাটলো কি ক’বে? বাসভী কল্যাণে বসু বোধই হুগ আমায় অস্তিত্ব হইবে গিরেছিল—বাসভী বলল কেঁবে—হুগ মাঝল জ্যাতিভ মা—আমি মস্তান্ত হইবে বললাম—“তুমি হু গিরি কেন হইবে, জ্যাতিভ আমায় অত লব মাঝল জ্যাতিভ হুই, লব মই হইবে সেল।”—চোখে আমায় বল এসে ফেল—সেখতো ককৃত ক’বে অস্তিত্ব জ্যাতিভে ক’বে মেরিলাম—মা বললেন—“হু গিরিলাম এতটুকু ছিল মরি, আমায় বলিদি কেন মা, আমি যোব ক’বে ওকে পাঠাতাম।”—হু। তুমিও বসু বাণ্ড হুজ, মাঝাটা কাটিবে গিরি, এত বাণ্ড ও লম্বিত হ’লাম হুহুই। মা বাসভীর ককৃতাম যুগে আটভিন জ্যাতিভে গিলেন—বাসভী বাটী হ’লে গেল। সেদিন আম পড়তেই পফোব মা। হাঃ বাসভের বাটী সেলাম, মুখাচাঃ বাসভ কথা মিচ্চালা ককৃত ভিত্ত ক’বে বললেন—আমায় বাসভ যোজ কেন? লকলে তো মাঝাটা কাটিবে গিরি, আমা যুগে হুগে তুমি তো বসু। অমনি ক’বেই কি বাসভে হু হু হুহু, গিরি ফক যোবা হ’লে কল্যাণ আমি, বসুবাণ্ড বাসভ লসে জ্যাতিভে ককৃত তুমি যেটেই গিরিবে মা—বসুবাটী দিকা হ’ল আমায়। সন্ধ্যা দেখি বাসভী চমকে উঠতে বাটের এসে বলল নাক—“মা, গিরিবা গিরি বসু তুমি মা হুহুকে ও মুখি ঘেরবে আমায়?”—হুগা তুমিও তো বেশ ফেল, হুগ ক’বে বসুদী হুহু ককৃত?”—হুগা মা বললেন “লকলে তুমি যে বলিবা কি গিরিছিল বলে বসু তোকে কল্যাণ বাটী কেহে? —“হ্যাঁ।—ও বাসভে কেন চুটে পালাতে গিরি পা আটক পড়ে গিরি বাণ্ডা কাটল, আম যোব তো আমায়। ওব পড়ে হু গিলুম পড়ে—সেলাম, ও হৈলেছিল তাই বাস ক’বে তোমায় বললাম।”—

“বসু ঘের মা, ককৃত ককৃত ক’বেই যে গিলি।”—

ভিন

আমি এক পূর্ণিবার ফেলা-উৎসবে—

কাঠে হুহু হুহু—বোলল মুক্তি বাটী গিরিছি—কল্যাণ



সার্টিকট শুলেও তোমার ছাত্র আবার কাছে পাবে না, কেননা  
একবার অসামাজিক, একবার উচ্ছ্রাস, তখন না, জামি সেবে কথা  
কইলান, অব্যবস্থাপন ছিল না।—প্রকৃতভাবে আবার একটা বড়  
শিকারী হয়েছিল জুজিও, পূর্বে কতবার নিজে নিজে সেবে  
বলেন, এই আগেও কখনও এখানে আসিনি এবং পরিচয়  
পূর্ণকর্তৃক জুজিওকে অগ্রসর করে নেলেছিলাম, তাই একটা অগ্রসর  
হচ্ছে। বহুখু খু ভাগ সেতার বাজার জামি হই। তাই ও  
কাজে নতুন গল্প কতকগুলো লিখে নিল। প্রকৃতভাবে কেবল  
শিকারীর সমস্ত বড় টুকু নিলেও তবে হুঁচকিলাম ওর মুখে—  
হ্যাঁ। তুমি আজ বেগে গেলি হ্যাঁ—তখন এক চুটে ভেঙে  
পালিয়ে গেল এবং কানীর কোণেই এনে সমস্ত গোল্ডের  
কলসিটুকু বিল আবার গাতে হুঁচকি—কেননা কলসি এখানে? দুখটা  
একবার কেন আসিতে। বাপী, তোমার ছাত্রের দুখটা কেব  
একবার—ও তাহলে বাপী কিবাব? ভয়! তবে কিলান শুধু  
আবার আর উনি কিলান ছদ্ম বাপী কি, কানসটা গেল একবারে  
নষ্ট হয়ে। সেদিন বেগেছিলো কি একগুলো মেয়েটা, কাননা  
একজন পুত্র নাহিরে মনে বি কলসি মনে কলসি পাবে—  
প্রকৃতভাবে ইতন—হ্যাঁ, তুমি যেতামকে ভাবি অগ্রসর করে নেলেছি,  
কোতো আগে আসাপ করে উচ্ছ্রাস ওর, তবে তো যা বলেছি?  
হ্যাঁ, কলসিটুকু বাবকর লিখে বড়—কানস-কানস বি  
এসে। হ্যাঁ। আজ এখানেই তুমি পাবে।

১৭ কলসি পূর্ণকর্তৃক এনি এক বসন্ত-বহু কলসি বড়  
সেদিন বর্ষান চাষিখান—সমস্ত সমস্ত সেদিন উৎসবে মন—জামানে  
অগ্রসর সেইদিন সোপান হুঁচকি মনে অগ্রসর প্রথম প্রথম  
আলম নাম বাবু চক্রিমা, এটা ওর ব্যবহৃত নাম—ঠাকুরমা  
ওর নাম কিলান—বাবাওয়াই। আমি ভাবি তুমি “বাপী” হল।  
চক্রিমা কলসি সহর কর্তে—এল, লক্ষ্যে কলসি নেই, বড়ও তোমার  
এই প্রথম সেখান চোখে, পরিচয় কিছু হয়েছে প্রথম হুই বসন্ত,  
সেদিন থেকে তুমি বসন্ত ছাত্র। বাবার বাবান তোমার বড়  
কলসি কলসি বসন্ত—সমস্ত কর্তে কলসি, আবার লক্ষ্যে সেবে  
না, সমস্তই তো পলসি আসি প্রান—প্রান তাঁর সেবে  
আজিগুণে তা তো, বেবীই কলসি কলসি, স্ত্রী বড় ওর। “বাক  
অত দিনে কলসি নেই।” বাপী বা হুইসেই। বাবু কলসি  
কিছুদিন পলসি তাঁর বড়। কলসি কলসি প্রকৃতভাবে  
বাপীকে গানে কলসি কলসি, হ্যাঁ, কলসি সেই বসন্তের গান  
বাবাওয়াই। বড় অগ্রসরবাবার সাধনে কলসি পলসি চক্রিমা,  
কলসি কলসি কলসি? ও কলসি পলসি—

আজও এই পুনিবাসে

খেলব তবু তোমার খেলা,

শিকারীকে বড় ভাবে আত

বড়িবে তোমার তোমার কলসি

ইত্যাদি ইত্যাদি—

আজও সেদিনকার প্রথম বসন্ত অগ্রসর করে নেলেছি, চক্রিমা  
আজও আবারও সেতার বাজাতে হুইছিল। তার উচ্ছ্রাসিত  
প্রকৃতভাবে বড় প্রথম তোলা সেদিন আবার সার্বক গবে উঠেছিল।  
আজও কতকগুলি সেই ভাবে কাটতে। বলা বাহ ন—বাবাওয়াই  
হাতে একখানা বর্ষান কাট নিল। “ওটা সাধবে কো বাবোওয়াই  
আজ ছাত্র হুইবে—”

কর্তে লেখা—

‘হু, বসন্ত-উৎসব বাবু অগ্রসর, জুজি আসবেই, না’ এলে  
কলসি হুই। —বিলম্বিত

সেবেই আবার অগ্রসর কলসি উপার ছিল না।

বলে কিলান বলে,—সেদিন সমস্ত কলসি—“কি কলসি”

সেদিন করে বেগেটা চাল গেল—পলসিই সেদিন সার্বক  
অগ্রসর আবার কলসি কলসি প্রথম প্রথম কলসি প্রথম  
কলসি—সার্বক কলসি কলসি কলসি কলসি কলসি কলসি কলসি  
সার্বক, সার্বক আসি! “তা আবার কলসি, হুই কলসি?”  
এসে বি: সে, কলসি? এই বসন্ত, সেবেই কলসি সেবে,  
কলসি সেদিন সার্বক আতা—আটা চা বড়ী কলসি সে আটা।

বিলম্বিত পলসি বেগেটাওয়াই কিংবদন্তি করে এলে বলসি—  
এবারকার উৎসবে প্রোগ্রাম কি? নির্ণয় পাইপটা হাতে  
নিবে বী-চাতে চমকটা খুলে বলসি, এবার একটু বৈধি কলসি,  
কলসি কলসি অত নেই—আবার বসন্ত-বসন্ত ওর কলসি, পলসি  
ইত্যাদি কিলসি প্রথম একদল “বাপি” কলসি কলসি—“বো”  
একটা কলসি। অত আছে—কলসি, বসন্ত সাধবে অপরী—  
নির্ভরই অগ্রসর সাধবে অপরী। বসন্ত-বসন্ত অপরী বসন্ত  
পাই নেবে। কলসি আসি তো যেতে পায়না না বি: সে,  
আবার কলসি কলসি ভাবি, আবার একটা অগ্রসরকর্তে আছে—  
সেখানে না সেসেই বসন্ত—“কলসি কলসি?” স্ত্রী হাতে  
কলসি,—বি: সে, সার্বকই হুইবে কলসি হুইবে এই আছে  
—সার্বক আতা হুইতে পাইনি—নির্ভর বী-চা বসন্তে কলসি—  
বসন্ত না বসন্ত? সেবেই হুইবে কলসি কলসি। কলসি—  
আজও বসন্ত হুইতে পাইনি কলসি—আবার কলসি বসন্ত  
সেবে—অপরী কলসি কলসি কলসি কলসি কলসি কলসি কলসি

ভায়ে টেবিলে কথামার্গী করে।—পূর্ণ হুই একই বোণা হ'য়ে  
সেহিস সেরি? —আমরা যে বাসে সার্ভিসি বাসে, হুই  
চলনা—আমাদের সঙ্গে—কি বিপদ? তোমার মত আছে কো?  
উত্তর দিল অশূর্ণ—বর্তমানের বিশেষ প্রয়োজন হবে না লস—  
তব ইচ্ছা হয় থাকে, না চর থাকে না ও কোনো বাস—আমার মত  
নেই কি? অশূর্ণের মুখ তার হয়ে উঠিলে, বুঝলান উইকেনে  
নির্মলের লক্ষ্যে যে কথা চিন্তিল তা অশূর্ণের অগোচর নেই।  
—নির্মল থাকবেই স্রেষ্ঠা সূরিতে দিলে, এই মাত্র পেরে বেকসি,  
ওটা সবার পূর্ণ—উনেহিল পূর্ণ, আমাদের উইকেনে ব্যাটিন  
এবার অশূর্ণের থাকবেই—অশূর্ণ বললে কি ব্যাকুল  
জনি? কোণ-কটাকে একবার আবার হুইটা দেখে নিয়ে—  
দিয়েপুরে বললে—আর কিছু আবার কাছে। চা-পূর্ণ শেষ হলে  
নির্মল বললে হুই একই চলে পূর্ণ, তোমার বৌদি বললে অশূর্ণ  
না চলে কিছুই যে গ্রীক কলত পারছি না—হুই একই উইকেনে  
হবে নে।—অশূর্ণ চলে গেলো—নির্মল পাইপটা চোখে নিয়ে  
বলল “সত্যিই তুমি বাসে না তাই?” “না তাই আমাকে বেগাই  
কেন—আমি নিরপাণ, সেখানে ফেরাই হবে। চোটা কলো  
বাংলা কিছু বুঝে সন্তব ফেরে পারব না। আর আমি না গেলো  
তোমাদের উল্লসের অসহানি হবে না। কেননা তোমার কোন  
তো বাজে!

দেখকের মাতারী সাতীর সপালী চরিতে চোখ কলসির  
হিল—তোলা জুতার বটবট গতে—আমাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেই  
পুণ্ড ভগিতে বিটগাচের ব্যাপ্তি। গীতের বাজতে এসে অশূর্ণ  
হাভাল। চলে গেল, বৌদি হ'য়ে থাকে—

আজ্ঞা চলি নি: চার, তুমি চোটা কোথো আসবার—নির্মলের  
সঙ্গে অশূর্ণ চলে গেল—একটা বাবু আবার বললে না বাবার  
কথা—সীতাল একই ও উল্লসের কথা একবারও আমার জেনি  
—অশূর্ণের উপকার মন বেশ অভিমানে ভাবি হয়ে উঠিল—  
মনে পড়ল যে মিন রায়েত তার হ'তে আবার মর্মেতি চিত্রি এলো  
বিবাহের সব গ্রীক করে ফেলছেন—বনীক ভাষাতা হ'ব আমি,  
অথবা নাকি বিবাহের পর আমার উত্পাদক ভক্ত বিলম্বিত  
পাঠাবেন।—এম, এ, তে প্রবর সেরি প্রবর কীন জবিভার  
কবেই ইংল্যান্ড-পাত্রে। আসেওই পূর্ণি পড়েছিল—চলানই  
বা বসিত। এক বিবাহের পূর্ণ, হুইজানিটিং এমন একজন হ'ব।  
—বাসীকে বলাদ—“না আমার বিবাহ গ্রীক করেছেন”—বলয়  
ভয়ে বললে চিন্তা “কি একবারে পড়িত কাক করেছেন।”  
“একবারে পাকা করবার পূর্বে আবার বটটা—কীর নেওকা

উচিত ছিল না কি? “সত্যনের সত্যত নাতাপিতা বুঝ  
ভালই বোঝেন—না হুই হ'ব যেন তাতে সত্যনের অশূর্ণই  
হবে—ঠাখুলা ঠাখুলাদের আমলে ঠাখাই ছিলেন প্রত্যেকে  
বিবাহিত জীবনে প্রকৃত হুই: এর কারণ তাঁরা সুলসেই বাবা  
নাও মত এবং ইচ্ছাযুগারী বিরে কলতেন—কি বর্তমান কালে  
এই যে হুইলে মেয়েদের নিজেরা পছন্দ করে বিয়ে করা করেছ,  
এতে আশ্চর্য হুই কাউকেও দেখি না—আর হুই পুত্রে  
অবার হুইলেন: হুই কলতে হুইলে নেইহো এক সঙ্গে পূর্ণ  
এর মল বটই বিবাহ আরও হ'জের দেখতে পারি।—

“আমার বিবাহের ভক্ত তোমার হ'বে বৌদি কোন?” “হুই”  
কেন, কিসের ভক্ত—না নবাই, তুমি মনেই জানি বিয়ে কর—  
তোমার আবার বহু অশূর্ণ থাকবে, অজ্ঞাত আমি থাকবে,—  
তুমি থাকবে কিনা বলতে পারি না—চলেই বললে—হাভাও  
বাংলাকে বহুগী বিরে আমি ও স্ত্রী থাক হ'য়ে গেল—জানি না ও  
চোখেই কোন অন্য অল গোপন করবার ভক্তই আমার প্রহু  
থেকে পারিয়ে গেল কিনা।

আমিও কবি, হুই হ'ব অশূর্ণ! প্রেক্ষার একই বিব  
ভাবে বললে এসে।

বলাদ—না আমার না জানিয়ে সবসই গ্রীক করে ফেলছেন—  
আমার একবারেই ইচ্ছা নেই “সত্য”—কেন তুমি স্রেষ্ঠে স্রিতে করে  
কল হুই হুই হুই পূর্ণ, সে হুই হুই কেন হাভাবে ব্যক্ত?  
তনলায় ঠাখা তোমার বিবাহে পাঠাবেন উক্ত শিকার ভক্ত, আমি  
আশ্চর্য হ'বে কলসি, “আমি একটা কলম করে জানলেন?”  
প্রেক্ষার আমার প্রক্রে একই চলে গ'য়ে উঠিলেন—বাস, আবার  
বট সাব ছিল—তবাই আর সম্পূর্ণ বলা হুই নি—অল তাঁর  
কঠোর করে দিয়েছিল। পরে রায়েত হুই উনেহিলান  
প্রেক্ষার ও প্র হুই সঙ্গে আমার বিবাহের প্রস্তাব করে  
কি দেখিলেন, কিন্তু না তাঁর প্রার্থনা গানতে পারেন নি। তনলায়  
হুই বহু পূর্বে আমার ভাবী বুঝবাভার সঙ্গে না পরিচিতা হুই  
এক বিবাহের হুইলে মেয়েটিং দেখে মার বুঝি শরক হ'ব—  
তনলায় জালানের এবং বিবাহের কথারীতি স্থির চওড়ার পর  
শেকেই ঠাখাই আমার পুত্রেতনের বক্তব্য স্রিতে জালান এবং  
আমাকে ব্যাটিনারী পড়বার ভক্ত বিলম্বিত পাঠাবেন। হা  
বলেছিলেন—তোমার জালানি ব'ল, পাছে হুই হাভা না চ'ল।  
আমার একবার আকাশ হুই হ'ব হুই ব'ল জালান একজন চ'ল।  
এ বিবাহ হুই হুই না কলি জালান কাছে আমি মিথ্যাবাদী হ'ব  
এক সত্যজনের শাপ আমার হবে।—আরও চোখেই অল আমার



মন স্থির করে দিল—বাণী না এঁকে না মা, তোমার সত্যত্ব হবে  
না।—তোমার আদেশে তোমারই কথামত ওখানেই গিয়ে বসব  
না—অতীতের চিত্তের দম্ভা যেন কোথায় গিয়েছিল চাওনি।  
কোথায় থাকে কিংবা কোথায় থাকবে। “সব পাঠ্য ঠিকানা”  
যেনই আদেশে নিজের গৃহস্থ মত কুটী-গাওর পথে গেলাম। মায়  
সম্মতি বহু কষ্টে গেল, মাঝে মাঝে অধিবেশিত। এত এখনও  
তার কদমিনে বসন্ত-উৎসবে প্রান্ত বেগে আমার নিমন্ত্রণ কর্ত।  
চন্দ্রিমাও ইতিহাস-পাঠে এম এ পণ্ডিত হয়ে বেলেরে অধ্যাপিকা  
করিতেছেন।—ওসব পাঠ্য-পাঠ্যের আদ্যে পাঠ্য যখন। ঠিকাই  
বাণী এম এ পণ্ডিতে—“এম এম, ঠিকি শুকর সেজেব বহু”  
কৌতুক বাক্য নেই?। জুতলে বসন্ত এই জুবনোত্তম সাহেব  
তোমার বেতনে স্বেচ্ছা ন—সত্যি কষ্টে, অর্পণা থাকলে কিছুই  
কষ্টেই পড়েন না। “চট্ট বক্তাকে বললে কষ্ট—ও নামে আর  
কেনো না বলুন—এলো তোমার মত সবলে অশ্রুত করছেন।

তোমার গান কি করে শেল হাটী—না বলুন, তুমি আজ  
শ্রমেই পড়বে বাজাবে। বসন্তের ব্যবস্থা হয়েছিল ওসব দিল্লের  
বড় চন্দ্রিমা—এম এম চন্দ্রিমা বেলেরে, তখনও কয়েকজন  
ছিলেন।—তখনইও দায়ী, বাঁধী সকলেই বিবাহিত। তাঁদের  
স্বামীরাও সকলেই এসেছিলেন। আমি তুমি বাজা সকলেই  
বলে উঠেন, বাজা—আজ সাহেবের বৃত্তি এককণে আসবার সময়  
হল। আমি ভাত কোব করে বললাম, বিক্রেতার তত লজ্জা  
ভরিত আমি। প্রথমে গীতি চোটে মনে নাগেলো—খিচাঝু “মহু-  
সকে ভুজ” নামের মতো, নামটি গাইলে খুশি।—অত্যা ততই  
একটি-গাইলেন, হাটী অমর গান গাইল। সাহেবের পয় আদ্য-  
পূর্ণ—ভাষার বিবরণ—আমি-কুতূহল পূর্ণই সঙ্গীতের পানে  
নিরে গিলে। পুনরায় হাটীকে সকলে সোলপুনিয়ার একবানা  
গান গাইতে “অমৃতের ভরণ—বাণী তার অশ্রুটি ভিত্তি করে দুই  
নিরে সমস্ত প্রাণের আবেগ দিয়ে গাইল—

কে সোলে সোলে-পুনিয়ার

সোলে সোলে মোহন সোলায়।

সকলেই বিস্ময় নিয়ে চলে গেলেন গান শেষে। আমিও  
বিদায় চাইলাম—ককে কেহই ছিল নাই।

হাটী বললে একই পথে যাবে বহুনা—কথা আছে কিছু—  
প্রেক্ষাগার শুভ বসলেন—আমিও এবার হাটী। তত হাটী বসে, হাটী  
বাকি ভাগলে আমার পতীর ভাল থাকে না—হাটী, আমায়ের  
কলকাতা ছাড়াই কখনো কখনো অশ্রুতে অশ্রুতে কাল তুমি একবার  
কেনো যেও।—

হাটী বলে গেল আমি বললাম হাটী কোথায় যাব হাটী?  
—স্বিত্তাহতে বাণী বললে—আবার পতীর দিনের দিন ব্যাধ  
হাটী, হাটী মনে করছি পতীরে কোম সতর্কই পাতি দেখো।  
কাজও আর ভাল লাগছে না—ওসবই এবার থাকবে,  
কলকাতার আর ভাল লাগছে না—বহুনা, তুমিই আমায়ের  
লেনদান করলে—বহুনা বহুনা—এম এম কি আমায়ের ভাল  
লাগে? কোথায় একটা ছোট্ট সলোয়েন করো হব, তা না, কারি-  
করটি অধ্যাপিকার জীবন, অশ্রু হলে উঠি—হাটী সব বেড়ে  
ভুতে গিয়ে পালানি—আমায় তুমি জলে বাও বহুনা, আমায় একান্ত  
অনুরোধ, বিবাহিত জীবন তোমায়ের প্রথমে হব। হাটী একদিন  
নিষেধ জুল বুঝতে পারবেন। আমায় অনুরোধে বহুনা, তুমিও  
তাতে অধ্যাপিত হও না। আমাকে তুমি অধ্যাপিত যদি ভালবেসে  
থাক, সে ভালবাসা তুমি তাকেই দিও—সাথে না কি দিতে?  
আমায় আশীর্বাদ কর বহুনা, তোমায় প্রেমের সাথে কৃষ্ণপ্রেম যেন  
এক হয় আমায়—কৃষ্ণের মাঝেই যেন তোমায় বেধি আমি।  
আজ আনুগত্য চন্দ্রিমা সাধারণ শিক্ষার্থীর মত আমায় পরোয়  
তমার পুষ্টিতে প্রাণমি করো—আমি চোখের তত অশ্রু করে  
পড়ল আমার পানে। “এ কি হাটী। তুমি কীভাবে? কই হাটী  
কীদিন বেশভূষার তো ভ্রমতে পারবে কোমদিন তুমি আমায়  
এক ভালবাসা—আগে যেন জানাও নি হাটী?—সকল কষ্টে  
বললে হাটী—আমি তখন বৃত্তি বহুনা—তোমায় হামায় যখন  
এক পূর্ণকর হবে, অমরমৌর হবে—ও তোমায় প্রতি আমার পতীর  
প্রেম আর আমায়, আমায় পুষ্টিতে ততই তুমি ত্যাগ করছে।—  
হাটী, যখন বহুনা বিবাহিত হাটী পুষ্টিতে যেন বহুনা—তোমায় পুষ্টিতে  
আমায় হার পূর্ণ হাটী—অমর হাটী হাটী হাটী—এবার  
বাঁধী বাও। কাল প্রেমের বৈদিকের নিয়ে যেও।—“কিছু তুমি  
তো বললে না হাটী আপাততঃ তোমায়ের সন্তান হাম কোথায়?  
—সে বসব না বহুনা, চন্দ্রিমা প্রেমের আমায়-প্রেমের হবে না—  
আমাকে তুমি সম্পূর্ণ জুলে যেও বহুনা—আমায় প্রেম তুমি  
বৈদিক হিও—হাটী ১২টা বাজল এবার বাও—বাও—বললাম  
অলসার ভাবে—“তোমার কই হাটী আমায় হাটী?”—হাটী  
মুখেই ও উত্তর দিলে—নইলে উত্তর কোথায়?—পুণিয়ার হিন  
হামকক-মাঝে আমি কীকা নিজেই। আমায় তুমি আশীর্বাদ  
কর যেন জীবনভার্যায় আমি ভরাই হই।—পরোয় বাণীকে প্রতি  
আশনার করে যেন পাঠ, এ-প্রথম আর হল না।—ই-বহুনা কই  
প্রাণনা, তোমায়ের লালসাজীবন যেন গণের হয়। বললাম—  
“তোমায়ের পক্ষ চলেই হাটী, তদন্য তোমায় পূরায় যেন, সকল



আমার বিয়ের সব ঠিক চলেছিল, বিশেষ থেকে কিয়ৎ এল বিয়ে  
হবার কথা, হঠাৎ উনি যেন যিহে করবার মত যেতে উঠলেন—  
বাক্য তখন হাস করে তোমার দিকে বিয়ের ঠিক করলেন, বললেন  
কলকাতার হেলেনাই এ-ককম হই।— তখনহিলাম যেমন্নি বিয়ে  
করবার পর মাত্র দুইবৎসর ছিল, তখনপর ছাড়াছাড়ি করে চলে  
গিয়েছিল, এখন আর বিবাহই কখনো—আজ হঠাৎ বলে ফেললেন—  
“অপি, আরও তোমার আমি চুলতে পারিনি—তুমি বোধ হয়  
বিয়ে করে প্রবী হওনি—তুমি চলে এসো জিয়ার, তোমার আমি  
জাজও পেতে চাই, গিয়েশুকে ওর বাবার কাছে পাঠিয়ে দাও।”  
“উঃ ! হল ত কি শ্রদ্ধা ! কি সাহস ! ও নাচো আদ্যের কো-ডালায়  
ছিল, ওর মত নাচতেও দুগা বোধ হইছিল আদ্যের—বললাম দিখ্যা  
করে—“যে বার একটু পংখি আসলেন, তাঁর একটু শরীর ব্যাধাণ  
না আসিলে তো আমি এখন চলে যাব।—বিয়ে বধে প্রবী  
হইলে কি তব নি সে প্রদানটা কিঃ দায় এসে পাবেন—ওঃ ! আদ্যের  
মতই ইচ্ছা করায় গো—ওকে আরও কাছে টেনে নিয়ে বললাম  
“তোমারই চুল হয়েছিল পূর্ণা, নাচের সূচী ওকে নাই বা করতে ?  
হাৎ—আমি তোমার শপ চেষ্টে ছিলাম পূর্ণা—ভাল, ভাল হাইয়া  
কলকাতা ছেড়ে চলে যাবে, চল, আদ্য চাইমনে ওদের বিদায়

নিয়ে আসবে। ঐশেনে যাবে অপরী ? অস্তমন্ত ভাবে ও বলল  
“কোথায় গুণ্য যাকেন ? পেটা আমায় বলেনি—এবার তোমার  
মনটা নির্ভিত্ত হ’ল তনে। তুমি তো জাননা পূর্ণা—হাই তোমার  
কত ভালবাসে, তবু তোমার চোখে যেনেনি—তুমি তাকে  
একটুও ভালবাস না”—অপরী যেনে ফেলে আমায় ঝাঁপে  
মাথাটা ছেঁবে বলল “কে বললে হাইকে ভালবাসি না ?”  
“তোমার মুখে থকা গড়ে। সে আমায় চুল থেকে পছন্দে  
করেছে পূর্ণা—চল এবার তব গড়া বকু—হাই হাটা বাবল।”  
অপরী উঠে হাঁড়লে—“তুমিই তো দেবী কখনো”—বিদ্যানার  
জোছনার আলো এসে পড়েছিল—বললাম “কি পুণ্ডর আমাকে  
হাইটা পূর্ণা—আর তেরনই তব্বর আমায় পূর্ণাশ্রী—হোলীর  
বক্তে বেনা/খিনি যুগে উঠেছে সবায় অস্তর—মাথাস্থায়ে/বিলন-  
উৎসব জাত, কোল-পূর্ণিমা, সব বেন পূর্ণ হতে পেরে—আজ  
তোমারও বেন অপরীতা নেই, বলতের চুল, কোঁকিলের শান,  
চোলীর লালিয়া কত রঙে ফিলন বরা—বীর লীলায়  
হলং লীলায় এস আমায় আজ দেই লীলন স্ত্রায় প্রেমিক  
ঠাকুরের চবনকে প্রবতি জানিয়ে বলি—“ত বেতক। চিখিনি  
এমনি পূর্ণতার ত’র খেণে অস্তর আমায়ের—কোণার বেন  
অপরীতা না থাকে ঠাকুর।”—

## স্মৃতি

### ঐশান্তির বসু

বিদায়ের তব যে বাগিনী বাক  
আমায় ছত্র-তাবে—  
সেই পুরে মোর সব দিশাইয়া  
লইতু বসিলা রাখে ।  
অকালে তকালো জীবন-সুখ,  
নিজে গেল মোর জীবন-ভাতি,  
অসীমের কোলে তুবে সেলে তুমি,  
তগে: দাড়াইনি—কলিক-সাবী ।  
( কিত্ত ) কেত নাহি মেবো প্রেত,  
অসীনের হায়ে বাগিন তোমার  
সঙ্গীরেব স্মৃতি বিদা ।  
হে মোর প্রেমসী, তগো চিরসাবী—  
কোথায় লুকায়ে তুমি,  
পুতি-পিরয়ে বাগি হিয়া তব,  
অল-সুখের পাঁখি মালা সব,  
বপনের মাকে সে মালা পানাব  
নিবে লগত আমি ।  
হে মোর বশনসাবী—  
তোমারই বিহ-হুগে পাঁখি  
আমায় কবিতাপানি ।

নীলবতা ভরা হমনী আমায়,  
নিষ্ঠুর হলনা হালি আলোয়ার  
তাবি মাকে বেন পশব তোমার  
তগো মোর সুবসিনী,  
মলয় আনিছে বিদায়ের গানে  
তোমার চকরগনি ।  
তগো মোর মেদাসাবী—  
জীবন-পোড়ানো এ হৌব-অরল  
জালব গো দিয়ারতি ।  
জীবন-নিশার বিহুত ঝাঁপে,  
সেই অলসের লীপ-নিধা মোরে  
বোঝাব নিভা আমায় ভিতরে  
তোমার উলস ভাতি ।  
যব পাবে না দাপিতে তাহারে,  
ছত্র আমায় সুবিহুে রাখায়ে,  
তবির আবার এ যত-ঝাঁপারে  
বহাদিকনের স্রীতি,  
সে প্রবের রোপ কোথা বার ভেলে  
তুমি দান বন সাবী ।

# চুঁচুড়ার ইতিবৃত্ত

ঐশ্বরীর কুমার মিত্র

চুঁচুড়া হুগলী রেলার সম্বর, কলিকাতা। হইতে যাত্রা  
তেইশ বাইশ ঘুরে অবস্থিত। ওলন্দাজগণের ভারতবর্ষে  
বাণিজ্য করিবার ক্ষমতা বাট্টেতিয়ায় ১৬১১ খৃষ্টাব্দে 'ভাচ্  
ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী' গঠিত হয় এবং উক্ত বৎসরেই  
তাহারা ব্যবসা করিবার ক্ষমতা বঙ্গদেশে স্থাপন করেন।  
Hooghly District Gazeteeer নামক সরকারী গ্রন্থের  
লেখক মিঃ এল. এম. এল. ওমালী (Mr. L. S. S.  
Omalley) উক্ত পুস্তকে লিখিয়াছেন—“The earliest  
record of the arrival of watchships in the North  
of the Bay in 1615.” দিল্লীর বায়নাহ সন্ন্যাসী তাহারী  
ওলন্দাজদিগকে ৬-৮ খৃষ্টাব্দে একখানি ‘ফরমান’ বেন  
এবং উক্ত ‘ফরমানের’ সর্বাংশবাহী চুঁচুড়া তাহারীর সম্পূর্ণ  
অধিকারে আসে। ব্যবসায়িকরিত ক্ষমতা চুঁচুড়ায়  
উপনিবেশ স্থাপন করিবার পর হইতে এই স্থানটী বঙ্গদেশে  
বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে।

আধুনিক চুঁচুড়া সম্বর প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে এই স্থান  
একটা সামান্ত পরী ছিল এবং এতদ্ অঞ্চলের বাবতীর  
ব্যবসা-বাণিজ্য ও রাজকার্যাদি সপ্তগ্রাম হইতে নির্ভা  
হইত। মোড়ল শতাব্দীতে সন্ন্যাসী আকবরের রাজত্ব-  
সমিতি চৌদুর বর এক, বিহার ও উড়িষ্যা রাজ্য নির্ভার-  
করে সুবা বাজনায়ে কয়েকটা সরকারে এবং উক্ত সরকার-  
গুলিকে আবার কতকগুলি পরগণায় বিভক্ত করেন।  
এই স্থান তৎকালে ‘সরকার সাতমাগ’-এর অন্তর্গত  
‘আরাধা’ পরগণার অন্তর্ভুক্ত ছিল। Pargana Araha of  
Satgaon) এবং ‘হুসিহাটা’ বলিয়া এই স্থানটী পরিচিত  
ছিল। বহু প্রাচীন বলিলাসিতে ‘হুসিহাটা’ নামটী  
অজ্ঞানি দেখিতে পাওয়া যায়; পরবর্তী কালে হুসিহাটা  
‘বরগুড়’ পরিণত হয় এবং হুগলী, চুঁচুড়া বিভাগসি-  
প্যালিটির চার নম্বর ওয়ার্ডের মধ্যে ‘বরগুড়’ বলিয়া একটা  
পরী এখনও বর্তমান আছে। এই পরীতে মধ্যে প্রাচীন-  
মৌর্য প্রায় বিশ হাত উচ্চ একটা প্রাচীন স্মারি আছে  
এবং ‘বিবির-গোর’ বলিয়া উহা বর্তমানে অভিহিত হইয়া  
যাকে। ইহাই এই স্থানের প্রাচীনতম স্থিতি।



চুঁচুড়ার আর্থেনিয়াম স্ট্রাণ্ড

চুঁচুড়া নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে বঙ্গীয় অক্ষরচক্র  
সরকার বলিয়াছিলেন যে, ‘চুচু’ হইতে চুঁচুড়া নাম  
আসিয়াছে, কিন্তু ইহা সমীচীন বলিয়া নহে হয় না।  
ওলন্দাজগণ এই নাম বিহারিণ, কিন্তু কেন এবং ইহার  
অর্থ যে কি তাহার কোন পূর্বের ইতিহাস পাওয়া যায়  
না।

ইংরাজদিগের বঙ্গদেশে বাণিজ্য বিস্তার করিবার বহু  
পূর্বে ওলন্দাজগণ এই দেশে বাণিজ্য করিয়া বহু অর্থ  
উপার্জন করেন। তাহারায় সম্বর চুঁচুড়ায় উপনিবেশ  
স্থাপন করেন, সেই সম্বর ফরাসীগণ চমকনপরে ছিল;  
ছইটী স্থান পাশাপাশি বলিয়া সীমা নির্দেশ করিবার ক্ষমতা  
তাহারা একটা বাল খনন করিয়াছিলেন। এই সীমানা  
‘ফরাসীগড়’ বলিয়া অজ্ঞানি অভিহিত হয়।

১৬৫০ খৃষ্টাব্দে সন্ন্যাসী লাকাহানের নিকট হইতে এবং  
১৬৬২ খৃষ্টাব্দে সন্ন্যাসী আওরাজখানের নিকট হইতে  
ওলন্দাজগণ আরও দুইখানি ‘ফরমান’ পাইয়াছিলেন।

১৮২৫ খৃষ্টাব্দে বেদিনিপুর জেলার একজন নামাক্ত কুমারিকারী শোভা সিংহ বর্ডমানের জমিদার রাজা কৃষ্ণরাম রায়ের সহিত নামাক্ত বিবাহ উপলক্ষ করিয়া বর্ডমান আক্রমণ এবং রাজারার বোগল অধিকার উচ্ছেদ করিবার চক্র অবলম্বন হন এবং বর্ডমানের রাজপ্রাসাদ অধিকার-পূর্বক বিক্রোহীয়া রাজা কৃষ্ণরামকে নিহত করেন। কৃষ্ণরামের কণ্ঠ পুত্র জগৎরাম রাজ্য কোন একাধারে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করেন। নবাব ইব্রাহিম খান এই সময় রাজারার নবাব এবং নুরউল্লা খাঁ হুগলী, বর্ডমান ও বেদিনিপুরের 'ফৌজদার' ছিলেন। বিক্রোহীগণের উপক্রমে বঙ্গদেশে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। নবাব ইব্রাহিম খাঁ ফৌজদার নুরউল্লা খাঁকে বিক্রোহ দমন করিবার জন্ত নির্দেশ দিলেন। তিনি সশস্ত্র সৈনিকের অধিনায়ক হইলেও কৃষি বাগিচাদি অত্যন্ত অর্থব্যয় ব্যয়সায়ে লিপ্ত থাকার সৈন্তাচালনা ঠাহার পক্ষে অসম্মত ছিল। বাহা ইউক, নবাবের চক্ৰব পাইয়া তিনি হুগলীর দিকে অগ্রসর হইলেন।

১৮২৬ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশের এইরূপ অবস্থা যেখিয়া ইউরোপীয় বাবদারিচক ঠাহারিদের উপনিবেশ ও বাগিচা রক্ষা করিবার চক্র দুর্গ নিৰ্মাণ করিবার অল্পবতি নবাবের নিকট হইতে প্রাপ্ত হন এবং সেই সুযোগে হুঁচুড়ার ওলন্দাজগণ 'ফোর্ট গ্যাস্টেভিস' (Fort Guelawas) দুর্গ নিৰ্মাণ করিলেন। নবাবের নিকট হইতে দুর্গ নিৰ্মাণের অল্পবতি পাইবার পূর্বেই ওলন্দাজগণ প্রাচীর নিগ্না হুঁচুড়াকে মুহুরিত করিয়াছিল। কারণ ওলন্দাজদের উত্তরমুখে "১৮২৭ গুঠাক" এবং দক্ষিণ দিকের কটকে "১৮২২ গুঠাক" এই গাল ছইয়া লিখিত ছিল। উক্ত দুর্গ যতদূর হইতে ব্যারাক পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল; পরে ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে ইংরেজগণ হুঁচুড়া অধিকার করিয়া পূর্বোক্ত দুর্গ ভূমিহীন করেন।

• বর্ডমানে রাজা কৃষ্ণরামের নামানুসারে 'কৃষ্ণরামার' নামে একটা যুদ্ধ পুস্তকই অত্যাধি বিজ্ঞান আছে।

The Fouzdar was the chief Police Officer and judge of all crimes not capital—Field's Regulations.

বাহা ইউক, কৌশলার নুরউল্লা খাঁ বিক্রোহ দমন করিবার জন্ত হুগলীর দিকে অগ্রসর হইলেন এবং শস্ত্র আশ্রয়-সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া হুগলী-দুর্গে আলিহ প্রবেশ করিয়া হুঁচুড়ার ওলন্দাজ বন্ধি-সম্প্রদায়ের সাহায্যপ্রার্থী হইলেন। অন্তঃপর দুর্গবধ্যে বাধা নিরূপণ নহে তাহারা তিনি ককিরের বেশে পলায়ন করেন এবং হুগলী শোভা-সিংহের হস্তগত হয়। পরে নবাব ইব্রাহিম খাঁ হুঁচুড়ার ওলন্দাজদিগের সহায়তায় হুগলী পুনরুদ্ধার করেন এবং বিক্রোহীগণ সপ্তগ্রামে পলায়ন করে। বর্ডমানে রাজ-পরিবারের যে সকল ব্যক্তি বন্দী হইয়াছিল, তন্মধ্যে রাজার এক স্ত্রী কুমারী বজ্রাও ছিলেন। শোভা সিংহ তাহাকে বলপূর্বক অস্ত্রধারিণী করিবার চেষ্টা করিলে, তিনি শাপিত ছুঁড়িকার দ্বারা তাহাকে হত্যা করিয়া পরে নিম্নে 'কলকিত বেহ বহন করিব না' বলিয়া আত্মহত্যা করেন। (Narrative of the Government of Bengal By Francis Gradwin)

শোভা সিংহ বর্ডমান জেলের সুবিচার-বরূপ হুগলী জেলার অন্তর্গত নামাক্ত নামক স্থানে যে হুগলী ইলমাইলের দরগা আছে তাহা নিৰ্মাণ করিয়া দেন। (Midnapore District Gazetteer, Page 167)

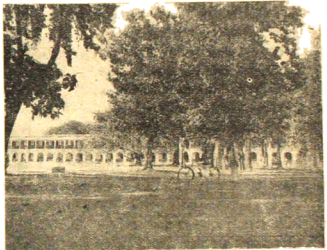
হুঁচুড়ার যে-সমস্ত স্থান ওলন্দাজদিগের অধিকারভুক্ত ছিল তাহা হইতে তের হাজার একশত বাইশ টাকা (১৩,১২২) তাহাযের রাজস্ব আদায় হইত। বাক্ত-ভিত্তির উপর তাহারা বিধা প্রতি লাঞ্জে বাইশ টাকা বাজনা আদায় করিত এবং হুঁচুড়ার শুকালে বাক্ত-ভিত্তির পরিমাণ ছয়শত আটাই বিধা ছিল। বোগলদেবের নিকট হইতে হুঁচুড়া ওলন্দাজদের অধিকারে আসিবার পর, তাহারা বাজনায দ্বার কিছু বৃদ্ধি করে নাই। তখনে নষ্ট জমি বা জমি হস্তান্তর করিবার সময় তাহারা রাজস্ব বৃদ্ধি করিবার জন্ত বাজনা আদায় করিত। হুঁচুড়ার কোথাবাখ মিঃ হার্কলোটো (Mr. Herklotto) ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে হুগলীর কালেক্টার সাহেবকে বলেন যে, তিনি বিগত চল্লিশ বৎসরের ওলন্দাজদের দলিলগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, প্রত্যেক জমির বাজনা শুদ্ধবৎ বৈধ ছিল এবং সেইরূপ আছে।

গুলশাভবনের সময় এরূপ ইকি মাগে সাধারণতঃ এক হাতে থাকা হইত ; কিন্তু ইংরাজী মাগে আঠারো ইকিতে এক হাত হয়। জন ডিক্‌স (John Dicks) নামক একজন গুলশাভবনের হাউসের মাগে জমি মাগা হইত এবং এরূপ ইকি লম্বা তাহার হাত ছিল। চুয়াশী ইকি লম্বা একটা লাঠির দ্বারা জমি মাগা হইত এবং উক্ত লাঠিটা চারিটা ভাগে ভাগ করা ছিল। পরে উক্ত লাঠিটা তিন ইকি কুয়াইয়া দেওয়া হয় এবং সমগ্র লাঠিটার মাগ সাড়ে চার হাত দাড়ায় ; এই মাগকে 'রাইনল্যান্ড' (Rynland) মাগ বলা হইত। ইংরাজগণ হুঁহুড়া অধিকার করিয়া গুলশাভবনের প্রদত্ত পাট্টা পরিবর্তন করিয়া আঠারো ইকি হিসাবে মাগিতে আদত করেন কিন্তু হুঁহুড়ার ঈল-বংশ উক্ত পরিবর্তনে বিশেষ আপত্তি জ্ঞাপন করেন। উত্তর পাড়ার জমিদার জহরক মুখোপাধ্যায় উক্ত পরিবর্তন করিবার তার গ্রহণ করেন এবং হুগলীর কালেক্টার মিঃ এইচ. বেলী (Mr. H. Balli) কর্তৃক তিনি এই কার্যে নিযুক্ত হন।

গুলশাভবনের হুঁহুড়া উপনিবেশ  
[ ব্যাটালিয়ার অধীন ছিল এবং হুঁহুড়ার

কোন পদ সূত্র হইলে ব্যাটেলিয়ার হইতে উক্ত স্থানে কর্তৃত্বাধী নিয়োগ হইত। একজন গভর্নর ও সাতজন কাউন্সিলের সম্বন্ধে উপর হুঁহুড়া-উপনিবেশ পরিচালনের ভার ছিল। উক্ত সাতজন সম্বন্ধে মধ্যে সাত পাঁচজন সমস্ত ভোট দিবার অধিকারী ছিলেন ; বাকী দুইজন সদস্য ভোট দিতে না পারিলেও হুঁহুড়ার গভর্নরকে সমগ্ৰ দিতে পারিতেন। গুলশাভ গভর্নরগণ বিলাসিতার জন্য বিশেষ কসিদ্ধ ছিলেন এবং বার্ষিক এক লক্ষ টাকা তাহার্য্য সংগ্রহ-বরচ করিতেন। হুঁহুড়া গভর্নরের 'ভালায়' নামে একটা পাকী ছিল; উহার দ্বারা চোরাগে বিলাস ব্যবস্থা ছিল। এইরূপ 'ভালায়' একমাত্র গভর্নর ব্যতীত আর কাহারও ব্যবহার করিবার

কমতা ছিল না। গভর্নর যে সময় নগর সম্মুখে বাহির হইতেন সেই সময় বাদ্যকরণ বাদনা বাজাইয়া অগ্রে বাহিত। হুঁহুড়ার গভর্নর-কর্তৃক টানা-পাখার প্রথম প্রচলন এই বেশে হইয়াছিল এবং বড় বড় ভাদিপাতায় পাখাও তাহার্য্য প্রথম ব্যবহার করিত। তৎকালে ক্রীড়ার শাসিত প্রচলন না থাকিলেও হুঁহুড়ার গুলশাভ-বনের বাড়ীতে বেস্তের জাকি লগান হইত। গুলশাভ গভর্নরগণের মধ্যে 'আল-উ', ভিনসেন্ট, সিদ্দাহনান,



হুঁহুড়ার ব্যালাকে একমুখ—বলেন স্বীয়তম অষ্টালিগ

ওভারব্রিকের নাম পাওয়া যায়। এতদ্বির গুলশাভ-বনের প্রতিষ্ঠিত হুঁহুড়া সীক্সার মধ্যে বহু গভর্নর এবং তাহারদের সহধর্মীণী ভৈলগিত রক্ষিত আছে।

গুলশাভ কাউন্সিলের সাতজন সম্বন্ধে উপর হুঁহুড়া পরিচালনের ভার প্রাপ্ত ছিল। তদ্ব্যতী একজন উপর বিচার ও শাসনের ভার ছিল, তিনি জজ-ম্যাজিষ্ট্রেট বলিয়া অভিহিত হইতেন। তাহার অধীন কমতা ছিল এবং বেজাবাত হইতে আরম্ভ করিয়া বেগ ও জিন হাজার টাকা পর্য্যন্ত তিনি ধনী ব্যক্তিগণকে জরিমানা করিতে পারিতেন। এতদ্বির নগরব্যাপক ও বোঝাব্যাপক প্রকৃতি আশ্রয় করেকটি উক্ত পদ ছিল। জমি হস্তান্তর করিবার ক্ষত্র গুলশাভবনের দুইটা আদালত ছিল ; একটি দেশীয়

বা জমিদারী আদালত এবং আর একটি ইউরোপীয় আদালত। (খ্রীষ্টকাল উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হৃৎকৃত ইতিহাস' নামক গ্রন্থে)

ইংরাজদিগের সহিত, গুলশাকদিগের বিশেষ প্রীতি ছিল এবং ইংরাজগণ গুলশাক-রসদীঘের সহিত রক্তা-পিত্ত করিবার জন্য হুঁচুড়ার প্রায়ই বাইতেন। প্রথম ইংরাজ পতনের উইলিয়াম হেজ ১৬৮২ খ্রীষ্টাব্দে তখনীতে আসিয়া গুলশাক পতনের প্রতিধ্বা গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরে হেজ লাহোরে সহিত ইষ্টেটওয়া কোম্পানীর প্রেসিডেন্ট মিঃ গাইফোর্ডের (Mr. Gyford) বনোমালিঙ্গ হইলে তিনি কিছুদিন হুঁচুড়ার অবস্থান করেন। এই সময়ে তাহার ভাইবোঁতে বাহা লিখিত আছে, নিম্নে তাহার কয়েক লাইন উদ্ধৃত করিলাম।

"I went to visit Duch Director and give him thanks for his kindness in so readily in his quarters." Hedgoc Diary, Part 1, By Col. Yule,

গুলশাকরা এই স্থান হইতে বহুবিধ জিনিষ ইউরোপে চালান দিয়া যত্নবশতঃ ইউরোপীয় জাতিগণের মধ্যে তাহারাই প্রবান হইয়াছিল। তন্মধ্যে জাতীয় অধিকেন রপ্তানি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। গুলশাকগণ পাটনা হইতে অধিকেন কিনিয়া জাতীয় উহা চালান দিয়া বৎসরে চারিলক্ষ টাকা লাভ করিত। এতযাতীত বাগানের তাহারদের বিশেষ সব ছিল এবং কড়াইচাঁদীর চাষ তাহারাই এই স্থানে প্রবন করিয়াছিল। 'গুলশাকগুটী' নামক কড়াই আজও তাহারদের স্মৃতি স্মরণ করাইয়া দেয়। হুঁচুড়িতে তাহার্য্য এক শাক-সল্কীর বাগান করিয়াছিল যে, উহাও বিশেষে রপ্তানি করিয়া তাহার্য্য বহু অর্থ লাভ করিত।

পলাশীর যুদ্ধে ইংরাজগণ অসমর্থ করিয়া মিরজাফরকে বাকসার নবাব করেন কিন্তু তাহার পাসনকালে বঙ্গে মিরজাফর পরাজিত, নির্যাস করে। একদিকে ইংরাজের প্রকৃত ও অল্পদিকে মীরকাসেমের বড় হয়ে মীরজাফর আর একটি ইউরোপীয় জাতিকে ইংরাজের বিরুদ্ধে গাভ করাইতে সচেষ্ট হন। গুলশাকগণ এতদিন ব্যবসা

লইয়াই বাস্ত ছিল কিন্তু মীরজাফরের সহায়তার প্রতিজ্ঞিতে তাহার্য্যও রাখাশ্রমনে উত্তেজিত হয়। বাটোতিয়া হইতে গুলশাকগণ সাতখানি রত্নতরী আনাইল, উহার তিনখানি তাহার্য্যে ছদ্মিগণী করিয়া কামান, আর তিনখানিতে ছাশ্রিগণী করিয়া কামান এবং একখানি আহার্য্যে যোগলী কামান বসান ছিল। এতযাতীত সমস্ত আহার্য্যগুলিতে দেড় হাজার গুলশাক সৈন্য ছিল। তাহার্য্য বাহিরে প্রকাশ করিল যে, আহার্য্য-গুলি কয়মতল উপস্থানে বাইবে, কোন বিশেষ কারণে কেবল একবার হুঁচুড়ার বাহিরে। রুইও বিচক্ষণ ব্যক্তি, তিনি অল্প দূরের বিষয় চিত্রা করেন নাই, তথাপি ইংরাজদিগের প্রভাব ও প্রতিপত্তি ঐ করিবার ক্ষমতা আহার্য্যগুলি আসিয়াছে সে বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ হইয়া কর্ণেল কোর্ডকে উক্ত নৌবহর লসে করিবার আদেশ দিলেন। ফরাসীদের দ্বারা গুলশাকগণের সহিত ইংরাজের যুদ্ধ হইল এবং এই যুদ্ধ পরাজিত হইয়া তাহারদের বাবতীর উল্কাচা ক্ষয়ভুগেই নিদান হইল।

১৭২৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে জুলাই ইংরাজগণ একবার হুঁচুড়া অধিকার করিয়াছিলেন এবং ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে সেপ্টেম্বর উহা প্রত্যর্পণ করেন। এই বাইশ বৎসর মিঃ আর ব্রিচ (Mr. R. Brich) হুঁচুড়ার কমিশনার রূপে কার্য্য করেন। উক্ত সময় তিনি ইংরাজদিগকে ৮৪৭ টাকা দাতব্য আদায় করিয়া দিলেন। গুলশাকগণের ব্যবসারে বখেট লাভ হইলেও 'ডাচ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর' কর্ণ-চারীসের অসামুত্তার সমস্ত অর্থ কোম্পানীর নিকটে পৌছাইত না। গুলশাক কর্ণচারীসদের অসামুত্তার ক্ষয় লগ্যাবের দ্বারা হুঁচুড়া ইংরাজগণকে ছাড়িয়া যেন। ইংরাজদিগেরও সুস্বাস্তার লোকসান হইতেছিল বলিয়া ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে উভয়ের মধ্যে একটি সন্ধি হয় এবং উক্ত সন্ধির সত্যস্বারা গুলশাকদিগের একশত আদী বৎসরের উপনিবেশ হুঁচুড়া সহর ইংরাজদিগের অধিকারভুক্ত হয়। উপরোক্ত সন্ধি অনুযায়ী গুলশাকগণ ইংরাজদের নিকট হইতে সুস্বাস্তারীপ ও কোর্ট রাল'বো প্রাপ্ত হয় এবং ইংরাজগণ হুঁচুড়া, বালকাপুর, পলতা, বাসেবর এবং বালোতা বীপ প্রাপ্ত হয়। এই হস্তান্তর সম্বন্ধে ১৮২৫

পৃষ্ঠাখের ১৪৫ নে “সবাচার-দর্পণে” যে সংবাদটা প্রকাশিত হইয়াছিল, নিয়ে তাহা উদ্ধৃত হইল।

### ইংরেজের হস্তে চুঁচুড়া সমর্পণ

“এই যে চুঁচুড়া নগর ইংলণ্ডীয়দের হস্তে সমর্পণ করিবার দিন হির হইলে অশ্রুজল বেলাই সাহেব ও অশ্রুজল সাইব সাহেব অশ্রুজলের অজ্ঞানতায় তৎকর্ত্তে নিযুক্ত হইয়া ঐ দিন অতি প্রত্যুষে চুঁচুড়াতে গিয়া ঐ সহরের বড় সাহেব অশ্রুজল বোমন সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। যেহেতুক চুঁচুড়া নগর ইংলণ্ডীয়দের দিগন্তে সমর্পণ করিবার কারণ চুঁচুড়ার বড় সাহেব হলগাভীর অধিপতি কর্ত্তক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। অন্তঃ। হারাহারারে সকল কর্ম হইলে এবং তাবৎ কাগজপত্র ঐ হই সাহেবের হস্তগত হইলে পর চুঁচুড়ার নিশান-কাঠের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত উঠিত যে হলগাভীর নিশান, সে নিশান নীচে নামান গেল। তখন ইংলণ্ডীয় সাহেবেরা সকলের সম্মুখে এই পাঠ করিলেন যে, এই স্থান এতদিন পর্য্যন্ত হলগাভীর অধিকার ছিল, কিন্তু এক্ষণে ইংলণ্ডীয়দের হস্তে হইল। ইহা প্রকাশ হইবামাত্র যে স্থানে হলগাভীর নিশান উঠিত সেই স্থানে ইংলণ্ডীয় পতাকা উত্তীর্ণমান হইবামাত্র প্রত্নতত্ত্ব সিপাহীরা ভিন্‌ভাবন বসুন্ধর দেওড় করিল।”

ওলন্দাজগণ খুব বিতর্ক ছিলেন এবং দেশীয় ব্যক্তিগণের সহিত তাঁহারা খুবই বৈশা-বৈশা করিতেন। বহু ওলন্দাজ বঙ্গ-মহিলা বিবাহ করিয়া চুঁচুড়ার বহু বংশের বাবৎ বংশবাস করেন। তাহাদের বংশধরগণ হলগাভীর কালেক্টরের নিকট হইতে পেন্সন প্রাপ্ত হইতেন। চুঁচুড়ার হিন্দুদিগের প্রাচীন বিশ্রাম ঘরের ভীতির যে পিতলের ছবিটা ঢাক অজাপি সেবিতে পাওয়া যায়, তাহাও ওলন্দাজ গভর্নর করিয়া দিয়াছিলেন। ওলন্দাজগণ ইংলণ্ডীয়দের চুঁচুড়া অর্পণ করিলেও ওলন্দাজ গভর্নর ভারতবর্ষ এবং আটলান্টিক নিরপেক্ষ কর্ত্তাধীরা হাখিয়ার এক তৃতীয়াংশ পেন্সন পাইতেন। প্রথমে পায়ার ওও কোম্পানী পেন্সনের টাকা দিতেন। পরে হলগাভীর কালেক্টার উক্ত পেন্সন দিতেন।

ইংলণ্ডগণ চুঁচুড়া অধিকার করিয়া ১৬২৭ খ্রীষ্টাব্দে

ওলন্দাজগণ কর্ত্তক নির্ধিত “কোর্ট” গ্যান্টোভাস” দুর্গ তাকিয়া ফেলেন এবং উক্ত দুর্গের কড়ি, বহুগা প্রভৃতি লইয়া ১৬২৭ খ্রীষ্টাব্দে সৈন্তদের অস্ত্র ব্যাগ্যক নির্মাণ করেন। এই ব্যাগ্যক নির্মাণ করিবার অস্ত্র ইংলণ্ডগণ বহু প্রকার বাস উদ্ভেদ করেন এবং সেইজন্য তুন্দুল আবেলান হইয়াছিল। এই দীর্ঘ অট্টালিকার মধ্যে এক হাজার ব্যক্তি বাসিবার উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হয়। ইহাই বহুদেশের দীর্ঘতম অট্টালিকা এবং প্রত্যেক তলায় ৬৫ টি কবিতা বহুৎ খিলান আছে। ব্যাগ্যক নির্মাণের পূর্বে ১৬২৫ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই অক্টোবর “সবাচার-দর্পণে” এই সম্বন্ধে যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল নিয়ে তাহা উদ্ধৃত হইল।

“চুঁচুড়া—সকলই জ্ঞাত আছেন যে, চুঁচুড়া ইংলণ্ডীয়দের হস্তগত হইয়াছে। স্মৃতি তদা গেল যে, অশ্রুজল কোম্পানী বাহাদুর সেখানকার প্রজাতিদের উইয়া দিয়া সেখানে সৈন্তের বিভিন্ন কারণ ব্যক্তি বসাইবেন।”

এই অট্টালিকার বিস্তার ইংলণ্ডী ও বাঙ্গলা ভাষায় নিম্নলিখিত লিপিবদ্ধ খোদিত আছে—This Barracks work commenced December 13/29. The foundation and plinth of the whole and superstructure of the lower storey were wing by Lt. J. A. Crommelin. Executive Engineer, the remainder of the structure and entire finishing by captain Wm. Bell of Artillery Ex Officer.”

বহুভাষার লিখিত আছে—“অশ্রুজল কোম্পানী সাহেবের বাহাদুর হুমতসিহি অধিবাসি সরকার, সাং চক্রবেড়ে এবং শ্রীশেখর তত্ত্ব দফাদার, সাং চক্রবেড়ে, ইং সন ১৬২৭ বাঃ সন ১২৬৬।”

বহু প্রকার উদ্ভেদ এবং বিপুল কর্ম ব্যয় করিয়া সৈন্তদের জন্য এই ব্যাগ্যক নির্ধিত হইলেও গর্ভ উইলিয়াম বেটিক বাগিয়া এই স্থান হইতে ব্যয়সংকোচ করিবার জন্য সৈন্ত-হানাতত্ত্বের প্রভাব করেন। কিন্তু জর্জী-লাট তাহাদের বিরুদ্ধাচরণ করিলে বিলাতে এই ব্যাপার নিশ্চিন্ত অস্ত্র



যায়। বিলাত হইতে লৈজ্ঞানীয় করিবার প্রস্তাব  
পূর্বীত হয় এবং চুঁচুড়ার বাবতীর কলিকাতার লৈজ্ঞান  
আসে এবং ব্যাংক বাসি পড়িয়া থাকে। পরবর্তী কালে  
সরকারী অফিস এবং 'ফোর্ট' উক্ত ব্যাংককে প্রতিষ্ঠিত  
হয়।

চুঁচুড়ার প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক হিসাবে ১৬২৪  
খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত আরমেনিয়ানদের গীর্জাটি বিশেষভাবে  
উল্লেখযোগ্য। খ্রীষ্টানধর্মের উপাসনা করিবার ইহা  
বঙ্গদেশের মধ্যে দ্বিতীয় গীর্জা বলিয়া প্রসিদ্ধ। বোম্বা  
জোয়ানিষের পুত্র মার্গারি এই গীর্জার ভিত্তি স্থাপন

করেন এবং ১৬২৭ খ্রীষ্টাব্দে তাহার জাতা বোসেফ বর্জুক  
ইহা সমাধি হয়। প্রতি বৎসর ২৬শে জাছুয়ারী এই স্থানে  
আরমেনিয়ানদের 'জন্ম-দি-ব্যাপ্তি'র পূর্ণবার্ষিক উপাসনা  
করিয়া থাকেন। মার্গারি-বংশের কয়েকটি প্রাচীন সমাধি  
এই গীর্জার প্রাঙ্গণে রক্ষিত আছে। এতদ্বির চুঁচুড়ার  
পঞ্চলোকপত্নের জন আরমেনিয়ানের সমাধি এই গীর্জার  
প্রাঙ্গণে আছে। এই প্রাচীন গীর্জা সম্বন্ধে ১৬২২  
খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই মার্চ তারিখের "সমাজ-বর্ষিক" যে  
সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত  
করিতেছি। (আগামী সংখ্যায় সমাপ্ত)

## গীতা ও হিন্দুধর্ম

ঐতিহাসিক রায়

গীতা সম্বন্ধে গ্রন্থের অভাব নাই। প্রাচীনকালে বহু  
পণ্ডিত ও সাধক গীতার ভাষ্য ও টীকা রচনা করিয়া  
গিয়াছেন। গীতার অর্থ বুঝিতে সেই সকল ভাষ্য ও  
টীকাই আবশ্যিক প্রদান অবলম্বন। বর্তমান যুগেও  
তিনক, অরবিন্দ প্রভৃতি দ্বন্দ্বী ব্যক্তি গীতার ব্যাখ্যা  
করিয়াছেন। তবু মনে হয়, গীতার ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ হয়  
নাই। এখনও অনেক স্থল চর্কোধ্য আছে। তাই সুবী  
ভাঃ শ্রীমত যজ্ঞেশ্বর ঘোষ মহাশয়ের "গীতা ও হিন্দু ধর্ম"  
গ্রন্থের সহিত পাঠ করিয়াছি। গ্রন্থকারের দৃষ্টিভঙ্গী ও  
আলোচনা-প্রণালী প্রচলিত গীতাভাষ্যগুলি হইতে  
কণ্ঠস্থ ভিন্ন। গ্রন্থে গীতার অবলম্বিত দার্শনিক মতের ও  
আত্মবিশিষ্ট ভাবে সাংবাদ্যের ব্যাখ্যা আছে; গীতারক্তা  
ঐক্যের অবতারণা সম্বন্ধে আলোচনা আছে, এবং গীতা  
বে সম্পূর্ণভাবে বেদসংহিতা ও উপনিষদের অঙ্গগামী,  
তাহা প্রতিপাদনের চেষ্টা আছে। ইহা ভিন্ন আরও অনেক  
বিষয় গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে। গ্রন্থকারের জীবন-  
ব্যাপী বর্ণনামোচনার ফল ও তাহার বাক্য অজ্ঞতা  
গ্রন্থে প্রতিফলিত। বাংলা দেশে বর্ণনের চর্কা ক্রমশঃই  
স্থাপিত হইতেছে। সমস্ত চতুষ্পাশ্রিয় সংখ্যা দৃষ্টিবের।  
নবদীপে যে কয়েকটি চতুষ্পাশ্রি আছে তাহাতে প্রাপ্য নাই।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্ণনের প্রবর্তিত বৈধি হয়  
না। জীবনে বর্ণনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বাঙ্গালীর  
ধারণা পরিবর্তিত হইয়াছে। দার্শনিক আলোচনাকে  
"বর্ণনের কচকচি" বলা হইতেছে। ভৌতিক বিজ্ঞানের  
চর্কা সাংসারিক উন্নতির সহায়ক বলিয়া দার্শনিক আলো-  
চনার স্থান অধিকার করিয়াছে। বাহীনতার অন্ত প্রচেষ্টা  
অন্ত বাবতীর প্রচেষ্টার উপর স্থান লাভ করিয়াছে। এ  
রকম অবস্থার ডাঃ ঘোষের গ্রন্থের পাঠক বেশী হইবে, সে  
আশা করা যায় না। তবে প্রাচীনতা লাভের সঙ্গে  
বাঙ্গালীর চিন্তা-স্বাভাবিকতার বন্ধন হইতে কণ্ঠস্থ দৃষ্টি  
লাভ করিতেও পারে, এবং মানব-জীবনের উদ্দেশ্য ও  
পরিণতি সম্বন্ধে চিন্তার আবার বাঙ্গালীর চিন্তা অবিকার  
করা অসম্ভব না হইতেও পারে।

দ্বিতীয় ভাষায় উপক্রমণিকার আচার্য্য শঙ্কর গীতাকে  
সুগ্রন্থ-বেদের সার-সংগ্রহ বলিয়াছেন। গীতা-মহাশ্রোত্র  
বলা হইয়াছে, সর্বউপনিষৎত্রয়গীতা গীতা বোধ্যন করিয়া  
গোপাল-নন্দন গীতামৃত বাহির করিয়াছেন। সকল  
উপনিষদে কিং একই দার্শনিক মত প্রতিপাদিত হয় নাই।  
আচার্য্য শঙ্করকে অবৈতনিক স্থাপন করিবার অন্ত যে  
কষ্টকল্পনার আশ্রয় লইতে হইয়াছে, তাহা চৈতন্যের

ভিন্ন আরও অনেক বলিরাছেন। হুতরাং গীতার দার্শনিক মতের সহিত সমস্ত উপনিষদের ঐক্য আছে—এ কথা বলা যায় না। এই প্রসঙ্গে সুব্রহ্মণ্যাকের বৈশেষী ব্রাহ্মণের কথা উল্লেখ করা যাউতে পারে। অমৃতবার্হি-লাদিত্বী হৈতেরীকে যাজ্ঞবল্ক্য বলিরাছিলেন “অমৃত-আত্মা অনন্তরো অব্যাহঃ ক্রমঃ প্রজ্ঞান-বনঃ এবং এতেন্তোঃ ভূতেভ্যঃ সমুখার তানি এব অহু বিনশ্চতি। ন প্রেভা সংজ্ঞা অস্তি তিষ্ঠি।” অর্থাৎ “এই আত্মা অনন্তর অব্যাহঃ ক্রমঃ প্রজ্ঞানবনঃ এবং সমুখার ভূত হইতে (জীবাশ্মারূপে) উৎপত্তি হইয়া গেই সমুখারেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। মুক্তার পরে আর সংজ্ঞা থাকে না।” বৈজ্ঞের বচন বলিলেন “ভগবন্, আত্মকে গভীর বোধের মধ্যে ফেলিলেন, আমি ইহা বুঝিতে পারিতেছি না,” তখন বলি বলিলেন “বোধ-জনক কিছু আমি বলিতেছি না। এই আত্মা অশিনানী ও উচ্ছিন্নবিরীন।” অর্থাৎ দেখা যাউতেছে, এই শেখরাজ আত্মা, যিনি অশিনানী ও অমুক্তি-বর্জিত, তিনি পরমাত্মা, এবং যিনি “ভূতেভ্যঃ সমুখার তানি এব অহু বিনশ্চতি” তিনি জীবাত্মা, পরমাত্মার অব্যাহত। তাহার পারমাণবিক অস্তিত্ব নাই, থাকিলে কৃত্রান্তে তাহার বিনাশ হইত না, থাকিলে “মুক্তার পরে আর সংজ্ঞা থাকে না” এ কথা বলা চলিত না। কিন্তু এই মতের সহিত গীতার “বাসাঃসি জীর্ণানি বশা বিহার” শ্লোকের সান্নিধ্য বিধান করিতে হইলে গীতাকে মার্যাবান মতে ব্যাখ্যা করিতে হয় (বাহা অর্থাৎ নষ্ট করিয়াছেন), তাহা কতটা যুক্তিসংগত তাহা বিচার্য।

“বিশ্ব কি ব্রহ্মের বিশ্বরূপে বর্তমান থাকিবে?” এই প্রশ্নের উত্তরে ঐশ্বর্যাক বলিরাছেন,—“জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার ভেদ যে বাবহারে বর্তমান, তাহা স্বীকার করি, কিন্তু ব্যবহারের অতীত স্বভাব এই পার্থক্যের অভাবে জ্ঞানভাণ্ডার যে আত্ম-প্রত্যয়ে সঞ্চিত হয়, ঐতি তাহা স্বীকার করেন নাই। বৈজ্ঞেরীকে বলা হইয়াছিল, আত্মকে জানিলে সকলই জানা হয়, কারণ বাহা কিছু আছে, সমস্তই আত্মার অন্তর্গত, অতঃ তিনিই প্রকৃত জ্ঞাতা। হুতরাং এ বিষয় ও বিষয়ীতে ভেদ অনিত্য ও আপেক্ষিক, মুক্তিতে তাহা থাকে না—ইহাই ঐশ্বর্য অভিন্নত। বিষয়ের বিলোপ

এককের প্রতিষ্ঠা হয়, ইহা তাঁহার উপদেশ নহে। তিনি বলিরাছেন যে, যতদিন ভববোধ থাকে ততদিন আপনায় অতিরিক্ত রূপ বিষয়কে দর্শন-স্পর্শনাদি সম্ভব হয়। কিন্তু ইহাও বলা হইয়াছে যে, আত্মবিজ্ঞান ব্যতীত ভাবত বস্তু, ব্যক্তি ও জ্ঞাতার ভাব অনিশ্চিত ও অব্যাহী হয়, কারণ, সর্ববিধ জ্ঞান এই বিজ্ঞানের অন্তর্গত। “ব্যবহারাতীত অব্যাহ জ্ঞানভাণ্ডার আত্মপ্রত্যয়ে সঞ্চিত হয়,” এ কথা ঐতি স্বীকার না করিতে পারেন, কিন্তু বিষয়-বিষয়ীর পার্থক্য-জ্ঞানের অভাবে মুক্তি ও মুক্তিতে জীবাশ্মার কোনও প্রত্যয়ই থাকে না। এ কথা স্পষ্ট বলিরাছেন। (ভাষ্যোপা ৭২-৩) বিষয়-বিষয়ীর ভেদ যব অনিত্য ও আপেক্ষিক হয়, তাহা হইলে জ্ঞানও অনিত্য ও আপেক্ষিক, বিষয় অভাবে আত্মার জ্ঞাতৃত্ব থাকে না বলিতে হইবে। তবে থাকে কি? জ্ঞেয়হীন জ্ঞান, বাহার যথেষ্ট আনন্দ কিছুই জানি না, তাহার অস্তিত্বের প্রমাণ নাই, আত্মা বচন আত্মাকে জানেন, তখন নিজেই নিজের নিকট বিষয়-রূপে প্রকাশিত হয়। আমাদের সাধারণ জ্ঞানেও পরমাত্মা যিনি তিনিও বিষয়রূপে জীবাশ্মার নিকট আপনাকে প্রকাশিত করেন। “বিজ্ঞেয়ো-নঃ প্রত্যোদয়ঃ,” ঐশ্বর্যাকের সনাতনিকালীন অমৃতত্বি বদি ভাণ্ডার বৈজ্ঞবশতঃ প্রকাশের অব্যাহ হয়, তাহা হইলে দার্শনিক আলোচনায় তাহার মূল্য কি? তাহা বদি জ্ঞানের প্রকাশবিশেষ হয়, তাহা হইলে তাহার মধ্যে বিষয়-বিষয়ীর ভেদ নাই—এ কথা বলা চলে না। ব্যাকবক্তার মতের সহিত ছাকোপার প্রকাশিত-ইত্র সংসারের, ও কৌণীকাকতে প্রতর্দনকে প্রবৃত্ত ইন্ত্রের উপদেশের মধ্যে ভূতমাতা ও প্রজ্ঞামাতার পরস্পর সম্বন্ধের আলোচনার যে বিপুল বিবোধ বর্তমান, তাহা স্বীকার করা যায় না। এই বিবোধের বীমাংসা কোথায়?

ঐশ্বর্যাকের প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিরাছেন যে, ব্যক্তিত্বের নান সর্বজন্য নহে। এ কথা সত্য যে, আমার ব্যক্তিত্বের নামে বাবতীর পরার্থের নাম হয় না, কেননা, বাহার সত্য বাবতীর ব্যক্তিত্বের সত্য, তাহার নাম নাই। কিন্তু বাহাকে “আমি” বলি, আমার ব্যক্তিত্বের নামে, সেই “আমি”

আর কিছু ভাষা অসম্ভব থাকে বলিয়া প্রেরিত পাঠ না।  
আমার ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য অপসারণের অর্থ আমার  
ব্যক্তিত্বকে যে বাহ্য-বস্তুত্ব, তাহার বিনাশ। সে শৈল্পী  
ধমন ছিল, তখনও পরমোচ্চা ছিলেন, যে বৈশিষ্ট্যের অবশেষে  
তিনি থাকিবেন। কিন্তু “আমি”র কিছুই থাকিবে না  
—ইহা সত্য। “আমি”র যদি কিছুই না থাকিল, তাহা  
হইলে আমার সর্বনাশ কিরূপে হইল? বহিল কি?

ঐবাস্তব পরমাত্মার লয়ের অনেক কবিরূপে মোহময়  
কর্ণনা আছে। তাহার মূল কথা এই যে, ব্যক্তির অর্থই  
সীমাবদ্ধ (limitations) সীমাবদ্ধ হ্রস্বের কারণ (“নামের  
সুখবন্ধি”)। সীমাবদ্ধ (limitation) হ্রস্ব হইলে তৎকাল  
হ্রস্বের নিরুতি হয়, ইহাই সত্য। এই অসত্যবাদ  
(negative) লাভ ব্যক্তিত্বের ব্যক্তিত্বের সঙ্গে অসত্যবাদ  
(positive) লাভ কিছুই নাই। অসত্যবাদকে সনাক্তিতে  
অনির্বচনীয় আনন্দ লাভ করেন, শোনা যায়। আনন্দ  
পরমাত্মার স্বরূপ, তিনি তাহা সর্বদা ভোগ করিতেছেন।  
সাধক যখন সেই আনন্দ উপভোগ করেন, তখন যদি  
ঐহিক ব্যক্তিত্ব না থাকে তাহা হইলে সে ভোগ “তাহার”  
বলিবার কোনও কারণ নাই। ব্যবহারিক জীবনে প্রত্যা  
বর্তনের পরে সে হ্রস্বের দ্বিত্ব যদি থাকে, তাহা হইলে  
সম্বোধনের সময় ঐহিক ব্যক্তিত্ব ছিল না, তাহা বলা যায়  
না।

ঐহিকার অভাব বসিয়াছেন “গঙ্গা যেমন সাগরে খাঁর  
নাম-রূপ বিসর্জন দেয়, ততদ্বারা সাধকও তদ্রূপ বিকারী  
চিত্ত ও সংকীর্ণ জ্ঞান বর্জনপূর্বক পরম পুঙ্খবে অন্বেষিত  
হ’ন। এই ব্রহ্ম-সামুদ্রই অবরহ, কেননা, ব্যক্তিগত  
প্রত্যয়-প্রত্যয়ের অবশেষে খণ্ড-লগ্নে আত্মার উদ্ভব হয় না।  
এখানে “আত্মা” শব্দে যদি “পরমাত্মা” উদ্ভিষ্ট হইয়া  
থাকে তাহা হইলে ব্যাকারী নিরর্থক, কেননা, পরমাত্মার  
অবরহ আলোচ্য নহে। যদি “ঐবাস্তব” উদ্ভিষ্ট হয়, তাহা  
হইলে ব্যক্তিগত প্রত্যয়ের অবশেষে ঐবাস্তবের কি  
অবশিষ্ট থাকে যে, যদিও তাহার উদ্ভব হয় না, এই প্রশ্ন  
আসিয়াও পড়ে। জ্ঞান ও প্রত্যয়ের আধার বলিয়াই  
ঐবাস্তব পরিচিত। ব্যক্তিগত প্রত্যয়ের অবশেষে ব্যক্তিগত  
সকিত জ্ঞান যদি অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে ব্যক্তিগত

প্রত্যয় কাণ্ডাতঃ বর্তমান না থাকিলেও, তাহার শক্যতা  
(possibility) বর্তমান থাকে বলিতে হইবে। কিন্তু সেই  
শক্যতা যদি কখনও বাস্তব প্রত্যয় শক্যরূপ গ্রহণ না করে  
এবং সকিত জ্ঞান যদি প্রত্যয়াকারে অবস্থিত না হয়, তাহা  
হইলে সেই জ্ঞান ও শক্যতার অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব সন্দেহ।  
সুতরাং ব্রহ্ম-সামুদ্র ও ময় একার্থক হইয়া পড়ে।

পুঙ্খবোধ-তত্ত্বালোচনার প্রথমবার “অন্ধর” শব্দ শুদ্ধ  
“অন্ধিতা” অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। মোকো কৃত্যকে অন্ধর  
বলা হইয়াছে। অত্যাচার শব্দ কৃত্য অর্থে ভগবানের  
মহাপ্রতিজ্ঞা সংসারবীজকে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু  
“অন্ধিতা” অর্থঃ মাতাশক্তিকে পুঙ্খ বলা যায় কিনা,  
বিচার্য। ব্রহ্মের যে রূপ আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে, অগত  
ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ব্যবহার্য পরার্থ বাহ্যের প্রকাশ, সেই নির্ভর  
অবস্থাই যে অন্ধর ও কৃত্য-শব্দবাচ্য, ইহাই আমার  
ভাবনা। অষ্টম অধ্যায়ে ৩ শ্লোকে আছে, “অন্ধরঃ  
ব্রহ্ম পরমং”। কিন্তু ব্রহ্মের সত্ত্ব অর্থবাও আছে।  
তাহাকেই পুঙ্খবোধ বলা হইয়াছে, সেই পুঙ্খবোধ  
নির্ভরও প্রতিষ্ঠাভূমি এবং (ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহং)।  
বস্তুত্ব বৈশিষ্ট্য-শাস্ত্রে তাহার স্থান নির্ভর উপর। নির্ভর  
ব্রহ্মকে তাহার “তত্ত্বতা” বলা হইয়াছে। উপনিষদের  
গহন অরণ্যে দিশাহারা হইয়া আমরা নির্ভর অর্থবা  
সত্ত্ব ব্রহ্ম বাহার উপাসনা করিব বৃত্তিতে পারি না।  
সর্বোপনিষৎসার গীতা তাই সত্ত্ব ব্রহ্ম পুঙ্খবোধকে  
আমাদের উপাস্তরূপে নির্দেশ করিয়াছেন। বলিয়াছেন,  
তিনি অন্ধর হইতেও উত্তম।

এহে বর্ণিত আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করিয়া  
আলোচনা শেষ করিব। অবতারবাদ আলোচনা করিয়া  
ঐহিকার নিষেধ করিয়াছেন—ঐহিক অবতার ছিলেন না।  
ঐহিকার আলোচনার ঐহিকের বিশ্বব্রহ্মের আলোচনা অপ্রা-  
সঙ্গিক নিশ্চয়ই নয়। কিন্তু যে যে কৃত্য উপর তিনি তাহার  
অবতারত্ব অধীকার করিয়াছেন তাহা দুই বলবত্তী নহে।  
এই সত্ত্ব ব্রহ্ম এই, ঐহিক ব্রহ্মত্বত্ব ঐহিক আনন্দকে  
বিশ্বের বলিয়াছেন, তাহাতে অসঙ্গতি নাই। অর্জুন বিশ্ব-  
ব্রহ্মে তাহার অব করিয়াছেন—ইহাও সত্য। গীতা যদি  
প্রমাণ শাস্ত্র হয়, তাহা হইলে এ সমস্ত আভ্যন্তরীণ প্রশ্ন

অগ্রাহ করা যায় না। সাধারণ প্রচলিত অর্থে অবতারণ হইতে অসম্ভব। কিন্তু ইহাও বলা যাবেন ইচ্ছা থাকে, তিনি যদি কতকগুলি সাধারণ নিয়মের সমষ্টি মাত্ররূপে কল্পিত না, হন কেবল একটা Concept মাত্র না হন, তাহা হইলে 'বিশেষ বিশেষ কার্য' সম্পাদনের জন্য তাহাও নবরূপ অথবা অন্তরূপ পরিগ্রহ অসম্ভব বলিয়াই বা মনে করিব কেন? ইচ্ছা নিয়মের অধীন হইলে তাহাকে 'স্বাধীন' বলা যায় না। 'স্বাধীন' ইচ্ছার বলে তিনি যদি এই জগৎ সৃষ্টি করিয়া থাকেন—যে জগতে হাত্তাঙ্গা পশুস্রব না করিলে জীবিকার্জন করা সম্ভব হয় না; যে জগতে অশ্বশ্রেণীর অধিপত্যে বর্ষ প্রায়ই অগ্নির হইয়া পড়ে, তাহা হইলে সেই জগতেই প্রয়োজনের তাড়নায় তাহার রূপ-গ্রহণ কেন অসম্ভব বিবেচিত হইবে? যুগে যুগে বর্ষ সংযোগনের জন্য জগৎগ্রহণ তিনি নিজেই স্বাভাবিক অর্থাৎ একটা নিয়ম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। 'অতিবাস্তি-

হাচার' (Evolution) mutation রূপে অতি অগ্রত্যাগিত ভাবে যে নূতনের আবির্ভাব ঘন, তাহাও সাধারণ নিয়মের অন্তর্ভুক্ত। আর এই অতিবাস্তিহারা যদি দেশ ও কালে তাহারই প্রকাশ হয়, তাহা হইলে mutation-এর আবির্ভাবও তাহারই প্রকাশ। তাহার বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই অতিবাস্তির সাধারণ নিয়ম ভঙ্গ করিয়া mutation-এর আবির্ভাব। এ ভাবে হেঁচলে বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিশেষ রূপ গ্রহণ অসম্ভব মনে না হইতে পারে।

ঐশ্বর্য্যবাদের ভাষা দার্শনিক আলোচনার উপযোগী। প্রত্যেক শব্দই তিনি ওজন করিয়া ব্যবহার করিয়াছেন। তাহার গীতার অদ্বৈত ও আলোচনার সাধু প্রণালী অনেক দূরত্ব শুদ্ধকরণ করিয়া বিদ্যাহে। আশা করি, গ্রন্থের বিত্তীয় স্বত্ব প্রকাশিত করিয়া তিনি বাঙ্গালী পাঠকের জ্ঞান বিপাশা পরিতৃপ্তির সম্ভাব্যতা কথিতে বিলম্ব করিবেন না।

## পরিব্রাজক কাম'নীত

শ্রীভক্তোদধন সেন

ভক্ত

গঙ্গার কুলে

আমার নাম কাম'নীত। বৃহৎ বক্ষিৎ পূর্ণতাম্রিত বৈশেব উজ্জ্বল (উজ্জ্বলিনী) নগরে আমার জন্ম হয়। আমারে যশের বিশেষ কোন প্রতিভা বারী করা যায় না। স্মৃতিশক্তি আমার পিতা ছিলেন বিশেষ বনী এবং বনিক। তিনি আমার হৃদিকা দিয়েছিলেন; বহু-যুগে যখন কথায় বলসই আমি উচ্চবাসী বালকের উপযোগী গ্রামে সর্ববিধার পারদর্শী হয়ে উঠিছি। আমার জন্মের পঠিত শেবে লোকের বলাবলি কহত আমি নিস্তর তরুণীলাহ (তরুণীলাহ) শিক্ষাগত হয়েছি। স্মৃতি ও অসিদ্ধে সর্বশ্রেষ্ঠের আমি সমকক্ষ ছিলাম। আমার লাব কঠ ছিল হুমি; কঠী শিবীর কৌশলে আমি বীণার আলোচনা কহতে পারতাম। ভক্ত—(মাতাপিতা)-এর সকল লোক আমার কঠ ছিল; কঠ ছিল আরও কত কার্য। হুঃশাস্ত্রে আমার বিশেষ অধিকাংশ ছিল আমি নিজে প্রতিভার ও পতীর অদ্বৈতপূর্ণ কাব্য রচনা কহতে পারতাম। অতন

ও ভিত্তি-বিভার আমার সমকক্ষ ছিল বৃহৎ কন। পূর্ণবাসী বসনার মাঝে মৌলিকতা সর্বত্র উচ্চ প্রকাশিত হ'ত। স্মৃতি বন্ধনে আমি অসাধারণ কৃতির অর্জিত হয়েছিলাম। বৈশ্যবাসী বন্ধনে পারতাম; কোন যদি কোন কৌশল। আমার চক ও মনকে এমন পড়িয়েছিলাম যে, তাহাও মত পড়তে আর কারও পারা পারত না। এ লব্ধে লব্ধে বাবা, পিতা, সকল প্রকারে কল্ম-কৌশল, বাঁবা ও পূর্ণকৌশলেও আমি কৃতিত্ব লাভ করেছিলাম। এই ভক্ত, যে আগন্তুক, উজ্জ্বলীতে প্রকাশ্যতা ঠিকিয়েছিল—“কাম'নীত মত প্রতিভাবান।”

আমার জন্মের বসন্ত বর্ষ হইল পিতা একদিন কালে ডেকে বললেন—

“হুত, তোমার শিক: এখন সম্পূর্ণ। অগতঃ কিছু কিছু সেবার এবং বনিক জীবনের পূর্ণতা কথায় সম্বন্ধ হয়েছিল। উপস্থিত একটা অযোগ্যও উপস্থিত। বৃহৎ উত্তরে অবস্থিত কৌশলি বৈশেব অসিদ্ধিত উত্তর—(উত্তর) এর শিকট আধাংশের বাগা তথাকথিতের মধ্যেই হুত প্রেরণ করবেন। লেগেলে পূর্ণ নামে আমার এক বন্ধু আইন; এই শব্দে

আমি বহুবার আভিধানবিনয় করিয়াছি। তিনি বহু পুঙ্কেই আমার বলেছিলেন, আমারই দেশোৎপত্তি পুথোর উত্তর বাৎসর সেখানে চলতে পারে, বিশেষ করে, পার্শ্বাত্য কৃতিক, চন্দ্র চূর্ণ, কোমল পুণ্য আর উত্তর কান্যোত্তর। পুণ্যের নামা বিপদের কথা ভেবে এতাবৎ কাল আমি একশ বর্ণিত্যন্তর এতিয়েই এসেছি; কিন্তু বাস্তবতায় অল্পের সমভিবাগারে বাত্যাগেই কোন বিপদই থাকতে পারে না। তোমার বর্ণিত্যে বাত্যাগের ভয় আমি বাস্তবানি গাভী। এবং তদুপযোগী পুণ্য প্রস্তুত করে রেখেছি; এখন চল, সেগুলি বেখে নাওগে। এই সত্যের নিমিত্তে তোমার জানতে হবে বাগবলীর মঙ্গল আর স্মিতকামিত চাইল। আপা করি, এই হ'তেই তোমার বর্ণিত্য-ভীনের ভয় হ্রাসপাত হবে। বিভিন্ন বর্ণের বিভিন্ন বীতি-নীতি, প্রত্যেক বৈচিত্র্য, প্রত্যেক দেশের সঙ্গে তাদের পার্থক্য, এ সব জানবার তোমার সৌভাগ্য হবে; বর্ণিত্যের সঙ্গে প্রত্যেক সঙ্গে পরিচিত হওয়া প্রয়োজন; তা'ছাড়া কতকগুলি ঘটনাসমূহ, পল্লব ব্যক্তি ও ব্যক্তিবানবের সহিত পরিচিত হ'তে পারবে—আমার মতে এ মহাপ্রাপ্ত।

আনন্দোজয় নব্য বিধে শিতকে বহুবার জানালাম। কয়েক দিন পরে মাতাপিতা ও গুরু-পরিচয়ের নিত্যক বিস্ময় নিয়ে যাত্রা করলাম।

কী আনন্দে বুক গুলে গঠে। বিপুল গোতাধারায় অস্তিত্ব হ'য়ে আমার গাভীগুলির আগে আগে আমি মনঃ-সত্যের অন্তিম কল্যাণ—সঙ্গে সঙ্গে সন্ধ্যা বিহীন হ'ল বিপুল্য বসন্ত। গভীর প্রতিষ্ঠা দিন আমার কাছে উৎসব বোধ হ'ত; সন্ধ্যায় তাঁর পড়ত; চিত্রক ও বাব তাভাবার উচ্চেষ্টে প্রমলিত আঁকু-ওর চতুর্ধিক আমার বসন্তান, বাস্তবতায় এবং বহু ও পল্লব স্মিত্যের পাশেই ছিল আমার স্থান। সবটী নিলে আমার মোহ হ'ত, আমি শব্দলোকে অবস্থান করছি।

বেশিয়া (বিশিয়া)-র বিপুল অধ্যায়ের মধ্য দিয়ে, ক্রমোচ্চা-মান বিজ্ঞানের ওপর দিয়ে আমার উত্তরাংশের বিশাল প্রান্তরে উপস্থিত হলাম। এ আমার এক নতুন অভিজ্ঞতা; আমার বৃত্তির সন্ধ্যা এক নতুন ভগ্নত উৎখাটিত হ'ল। বহুপুণ্যের এত সমস্ত, এত বিস্মিত, এমন কল্যাণ আমি কখন করি নি।

বাস্তব, পর একবার কেটে গেছে। এক গোপুদি-পরিবী-সন্ধ্যায় ঐশ্বর্যের তাগবন হতে প্রবে দ্বিটি বর্ষবলর দেখা দেল; কিন্তু একে কুলাগা-অবস্থায় স্থানিত হ্রাসকালে এরা এগিয়ে যায় সীমান্তীয় সন্ধ্যার ওপর দিয়ে; শেষে প্রবে মিলে এক হ'তে বাত; চতুর্ধায়ে পুঠি মনঃ একটী দেখা।

স্বপ্নে কার চিত্রলক্ষ্য অস্তুত তথি।

ইনি বাস্তবত। আমার বিদ্যুৎ অবস্থার আমার অভ্যন্তরে কখন সত্যপত্রী হ'য়েছেন।

"কাম-নীতি, বৈদ্যক্য আনন্দের বৃত্তির সামনে কেনই পরিচীত হনুনা আর বৈদ্যক্য জলধারা একত্রে মিলেছে।"

প্রত্যেক আপনা হতেই আমার বুক তার কপাল লক্ষ্য করে।

আমার পুঠিপোষক বললেন, "এ প্রকারে তোমার মঙ্গল হবে। বৈদ্যক্য আভিভূতা হ'য়েছেন বৈদ্যক্যে মিস্রকামিত পরিতপ্ত হতে; পুঠি বর্ণিত্যের প্রবাহিত হ'য়ে শান্তির আলো হ'তে। আর ঐ হনুনা—প্রান্তীয় বীরাবলিত হুগে এর উত্তর; এর পুঠি বর্ণা-প্রবাহ একদিন প্রতিধ্বনিত করেছ হস্তিনাপুণ্যে ধনসাম্রাজ্য; এই ভয়ঙ্কর একদিন অভিশপ্ত হ'য়েছে সেই প্রান্তব—বৈদ্যক্যের ভীষণ ও পাণ্ডব একচ্ছত্রাধিপত্যের ভয় মহাসমুদ্রের মত হ'য়েছিলেন, যে-প্রান্তব কর্তব্য বজ্রবাল হতে উত্তিত বর্ণকামিত প্রতিধ্বনিত হ'য়েছিল, যেখানে কুক স্বয়ং অর্জুনের সারথী গ্রন্থ কর'য়েছিলেন...

"প্রান্তীয় গৌরবিক দ্বারা তোমার সুপরিজ্ঞাত; তোমার এ সব বলবার প্রয়োজন নেই। কতবার আমি উত্তরের দিলন-চুতির মধ্যে ঠাঁড়িয়েছি—বহুবলর নীল জল, পল্লব বৈদ্যক্যের পাশাপাশি আমার আগুন বৈদ্যক্য নিয়ে হুগ হুগ করে বয়ে চলেছে, কেউ কাছের মধ্যে নীল হয়ে যায় নি। নীল আর বৈদ্যক্য, যোদ্ধা আর প্রাণ, নবীপর্বে উজ্জ্বল দ্বিটি উজ্জ্বল তাগেই অন্যতর বাস্তবতায় পল্লবের সাহিত্যে এসেছে, আলিঙ্গনে বন্ধ হ'য়েছে—চিরকাল এরা চলেছে পাশাপাশি—কিন্তু চিরকাল এরা দুইই থেকে গেছে। যেখানে যেখানে ঐ নীল বায় হ'তে আমার মনের কানে ভেসে এসেছে আমারই মনঃবায়, প্রত্যেক কল্যাণ, সূক্ষ্মকমি, মনঃ সন্ধ্যা অর্ধের প্রাণ, বহুদত হতীয় হুহতী। ক্ষণ তাগে আমার স্বয়ং রেতে উঠেছে। কেন কখন।—

"আমারও পূর্ণপুণ্য ঐ মহাকোরে উপস্থিত ছিলেন। সুকোকেই কুচিত বাস্তবতায় বৈদ্যক্য বক্তব্য পান করেছেন।"

কল্পিত্যের প্রথম সন্ধ্যার পর আসে; বিস্মিত বৃত্তি নিয়ে আমি আমার কল্পিত্য সারী বকে চাইলাম।

তিনি আমার হাত ধরে পূর্ণাভিভূত নিয়ে চললেন; বললেন "এস বৎস, তোমার প্রথম বাস্তব পল্লব হল বৈদ্যক্যের এস।" অল্পক কপাল-ভাঙের মধ্য দিয়ে কল্পিত্যের অগ্রগতি হতেই পূর্ণবিক্রে আনন্দের বৃত্তিপথ উজ্জ্বল হল।

চোখের সামনে পড়ায় বড় বিস্ময়; তাইই ওপর দৌলচোখের  
বিশুল লীলাক্ষেত্র কোণারি নগরী; নিজেও ভ্রমোভেই ভ্রমার  
দুখ দিয়ে বিদ্যে-কামি যেখানে আছে। প্রাচীর, বর্ণনাগর্ভে,  
গুহাশ্রয়ী শব্দ গুহাশ্রয়ী, ভবন, ভেটি আর অশ্রুপাত ঘাট—সমস্তই  
সুখের শব্দ বর্ণিত প্রাচীর—বর্ণনা পূরী বলে ভ্রম ভ্রম—বর্ণনা  
এক কালে বাহ্যিক বর্ণনায় ছিল (কিন্তু বাহ্যিক বর্ণনার পাশে  
পরে প্রত্যক্ষ ও সত্যিকার পরিচয় হয়েছে)। এদিকে নিখাদ সোনার  
পটীত গম্বুজগুলি শত মার্ভেলের মত বর্ণনাগর্ভে বিকশিত হয়ে  
ঠেঁ। অতীতের আকাশ অতীতের উদ্ভিত হই মন্দির-অঙ্গনের  
কক্ষ, সোড়িত, শিল্প সোম-দুর্গ, উদ্ভিত হই মনীষীয়ে চিত্রায়  
হতে নীল ধূমস্তম্ভ। এই সকল কল্পের ওপর বর্ণনা মৌলিক  
শ্রেণীর আধার বর্ণ দিয়ে বোনা একটা চিত্রায়ণ, একটা ঘোড়া  
কৃষ্ণের দেওয়া হয়েছে, আর ওদিকে পদ্মভবন প্রস্তুত উদ্ভিত  
হচ্ছে নিখাদ সর্পবর্ণের প্রাচীর-উৎস—বর্ণিত সর্পবর্ণ বর্ণ জলে  
ঠেঁ। নীচের পবিত্র ভ্রমভ্রমে প্রতিবিম্বিত হয়েছে আকাশের  
বর্ণবিম্বা, প্রতিবিম্ব আশ্রয়িত সত্য ওপে ছাড়িয়ে গেছে—বীচিত্রিত  
ভ্রম-নীলায়; ভ্রম আলোক-বোধ্যগণি ওপে দিয়ে ভেসে  
চলেছে বহু-বর্ণবিম্বিত গাল ও পতাকা সোড়িত ভ্রমীয়ে বর্ণ। বহু  
বর্ণে অর্জিত হলেও আদ্য বর্ণ দেখতে গাছিন্দ্রিয়, ঘাটনীর  
বিশুদ্ধ অর্থহীনিকার অধ্যাত্ম বানানীয় সমাবেশ; তাইব  
অনেকই পূর্ণ অর্থহীন উদ্ভিত হয়েছে; বাহু ভাঙার বাহি-  
প্রবাহ হতে হতে বর্ণিন্দ্রিয় ভেসে পড়ে। কণ্ঠস্থ বোঝাই  
দুই ভ্রমের মত বাহুপ্রবাহে ভেসে যায় সুখোবিত কলঙ্কন।

আবার তখনকার অল্পকৃতি আশিন হয় তো অল্পতব কল্পে  
পারবেন না; আবার বোধ হচ্ছিল, মাহুয়ের তৈরী কোন নগর মন,  
কেন্দ্রিত কোটা বৈভবায় পূরী বর্ণিত কল্পি। আদ্য পার্শ্ব  
অঙ্গনের অধিবাসী, আদ্যের চোখে উৎসাহ-সমুদ্র গাছের  
উপত্যকা। বর্ণ বলেই প্রতিভাত হয়েছিল। আদ্য, যেহে এই  
বান্দীই আদ্য বর্ণে পরিণত হয়েছিল।

সেই যাত্রেই আশি পিতৃবন্ধু অধিবাসণ্য পণ্যের দ্রুত নিষ্কা-  
শ উপভোগ করল।

পরদিন প্রত্যুষে নিকটতম ঘাটে এক বকম দুটাই উপস্থিত  
হল। আদ্য সৌন্দর্য্যের বনোভাব এখন বর্ণনা কল্পার  
চোঁও কল্প না। পূর্ব বিশ্বাস নিয়ে সেই জলে অর্থহীন  
কল্পেইলাহ—সে জলে শুধু গাছের দুটি বোঁত হয়ে না,  
জীবেদের শাপও বোঁত হয়ে গিয়ে। তবু তখন আশি কল্প—  
শাপপুণ্য বিশেষ কোন কল্প তখনও আদ্য কাছে ছিল না,

কিন্তু বিশ্বাস! পিতৃবন্ধের মত একটা বোঁতল পূর্ব ক'রে পড়াল  
ভবে নিলাম!... কপাল!...

সে মল পিতৃবন্ধের কাছে পৌঁছানি। না পৌঁছানর কারণ  
অধিবাসীই জানতে পারবেন।

পরদিন দুপুরেই সৌন্দর্য্য পূর্ণ পাবে পিণ্ডিত আদ্য  
নিয়ে গেলেন। কল্পকল্পের মধ্যেই আদ্য সমুদ্র পূর্ণ বিশ্বাস  
হয়ে গেল। লাভ বাবল প্রভৃ। আদ্যের বেশ লাভজনক  
হয়ে—উত্তরাংশের এমন পূর্ণ উপস্থাপনা পূর্ণিত কল্প করল।  
যাত্রার কাল সন্ধ্যা কাল পূর্ণিত আদ্য বাহিলাকৃত্য  
সম্পন্ন হই গেল। পাবে প্রত্যাহারের এখনও কিছুদিন  
বাকী। সত্যকাল সন্ধ্যা আশি নগর-পরিভ্রমণ ও এদেশের  
আদ্য-প্রাচীরে প্রবৃত্ত হলাম। আদ্য-প্রাচীরে আদ্য সন্ধ্যা  
হলেন পণ্যের পূর্ণ প্রদর্শন।

তার

### কন্দুকক্রোড়িতা তরুণী

এক নন্দার বৈকালে আদ্য পূর্ণ উৎসাহবর্তী বিশ্বাস  
এক পণ্ডিতানে উপস্থিত হল। উদ্ভান্তি সত্যই নন্দার  
কোণে ছাড়াইল কল্পকল্প, কোণে পণ্ডিতিত বীর্ষিক,  
কোণে বা বৈভববর্ণে নিখিত বীর্ষিক। বীর্ষিকগুলি নীচে  
নীচে এই সমস্ত জীবনের কল্প কল্পনিত ভর্ত হই। আদ্য  
হুঁত্রে নিখাদ বর্ণ-বোধ্য সোম বাহি; বহু কোন  
পত্রকল্পিত প্রেম-কাল কালিন তার প্রাচীরে প্রেম বিবরণ  
কবে; পান গাছ সমুদ্র জীব। সন্ধ্যা... উদ্ভল নুপুংগমি ঠেঁ।  
উৎকর্ষ সৌন্দর্য্য বোধ্য হতে লাগিয়ে নন্দে আদ্য  
ডাক—

“বেশ কামনীত, কোণারি সন্ধ্যের সন্ধ্যী তরুণী  
আদ্যে, বেশ। বিদ্যে অধিবাসী সন্ধ্যার সন্ধ্যার কন্দুক-ক্রোড়িত  
অধিবাসী হই; কোণারি সন্ধ্যার সন্ধ্যার সন্ধ্যার সন্ধ্যার  
সন্ধ্যার এক মত নিখাদিতা সন্ধ্যা; তাইই এতে বোধ্যন  
কল্পন। তুমি ভাষণান, তে বহু তুমি ভাষণান। এতে  
সোম চোখে চাইবো গাণও অধিবাসী। বীর্ষিকের কেন? এ।  
কল্প যে বাহু!”

বুঝেই পারছেন, বিদ্যে আদ্য আদ্য প্রাচীরে পূর্ণ  
পাণের গতি আদ্য হইতেই বেড়ে গেল।

ক্রোড়িত মত প্রবৃত্ত হই কল্পিতা বিদ্যে একটা একে  
‘প্রাচীর’ করলেন। নন্দী লাভান হইছিল কল্প-বান্ধিতা।  
আদ্য সে মত ভাষণান নই। বেশ-অধিবাসী, বীর্ষ-বান্ধিতা

লক্ষ্য। ততশীল রূপ স্থাপিত ওঠে। তাগের লক্ষ্যকে । আর সে  
নৃত্যের কথা কী বলব ? প্রত্যেকটী মোহনর প্রত্যেকতীত বহু-  
বৃত্ত নানী লোকবোধে বোধাত্মকি স্মৃতি হ'তে ওঠে ; প্রতিটি পরিভেদে  
সে লক্ষ্য-কাহ্নে তামরা উল্লসতার ছাঁড়ের পথে বিপুল সম্পদ ।  
কিছু সৌন্দর্য, শ্রীক বলতে কি, অস্তুর আদার কাহ্নে, প্রস্তাবনা  
মাত্র । বহুগত বহুপ্রকারের স্তোত্রা লেখিত একজন ব্যক্তির অস্ত  
তত্বের 'প্রদ্বান' করেন না। লক্ষ্য-বর্তিত মনের মধ্যে—আমার  
জগতের কেন্দ্রস্থলে প্রতিবেদিত থাকেন একজন—মাত্র একজন—

বন্ধু, কী আর বলব ? সে বর্ণের বর্ণনা কথোত বাতচাই এক  
মহা উৎসাহ ; সে বর্ণের কীর্তন কথোত প্রদূর্ত কথোত হ'লে  
স্বয়ং ভগ্নের কবিত্ব-পত্রের প্রয়োজন । তবু এইটুকু বলা যায়,  
সে সৌন্দর্য নির্মিত ; সে বর্ণনে চ্যামিা তখন মাঝিরে বিদ্যে  
তার প্রবাহায়া ; প্রতি আর বিদ্যুতের ক'লে পূর্ণ যৌবনের  
লক্ষণ । কী বলব বন্ধু, আমার বোধ হচ্ছিল, এ যেনে সৌন্দর্য ও  
সৌন্দর্যের স্তম্ভিত হইতেন । বসন্ত সে কখনো রূপ গেলি,  
ততই অদৌর আনন্দে আমার প্র'তি সোম শিরেও হ'ত ।

এই সময় তিনি যে যৌবন প্রতিনাশকণ, স্তোত্রই সম্মানার্থে  
নৃত্য কাহ্নে করলেন ; অতি বিপুল শিতা না হ'লে এমন নৃত্য  
সম্ভবে না । অবলীলাত কল্পকটীক নক্রে ফেললেন, তাবৎ  
কল্পকটীক বহন আমার উর্দ্ধদ্বারী হ'ল কুমারী তাঁর আনিয়া পুষ-  
পেলব হাতের অঙ্গুষ্ঠিত বিদ্যুত ও অঙ্গুষ্ঠ ইতরত করে কল্পকটীকে  
সজোর আঘাত করলেন ; কল্পকটীক লক্ষ্য করে প্রোস্থাপিত হ'ল,  
অমনি কুমারী হাত ঘুরিয়ে আঘাত করলেন ; কল্পকটীক  
আকাশে, আকাশেই তিনি কল্পকটীক লক্ষ্য লেন । কখন চকল,  
কখন কোমল তালে কল্পকটীক নক্রে ; কখন তার গতি চক  
ক্রত, কখন শান্ত । লক্ষ্যিকের প্রতিটি কোমল লক্ষ্য করে কল্পকটীক  
লক্ষ্য হ'তে থাকে, ফিরে আসে আর বৃত্ত হয় ।

একোভাব যাহা আপনি জানেন কি ? আপনাদের বুদ্ধিগত  
বুদ্ধিমত্তা যেনে যৌবন হ'ল আপনি জানেন । তা'হলে আপনাকে  
তবু এইটুকু বলতেই হবে যে, কর্ণব ও স্তম্ভিত-নৃত্যে আপনি  
এমন মৈশূর্য্য প্রকাশ করল যেনে নি ।

আর কুমারী যা ফেললেন তখনটী আপনি এর পূর্বে কখন  
সেখিনি ; তনিও নি । তিনি ছুটি লক্ষ্য-কল্পকটীক নিয়ে নৃত্যের তালে  
তালে মূগুণের অঙ্গুরগত কল্পকটীকে এমন তাঁর তড়িত-পত্রিতে  
লক্ষ্য ও প্রেত কথোত লাগলেন যে, কল্পকটীক হ'লে গেল,  
তবু সেবা গেল অসদ্য বহিঃপ্রবাহ শিখরে অঙ্গুষ্ঠ এক পানী  
নাগিল ।

সেই দুহুর্থে আমাদের চ্যামিা স্মৃতি হ'ল ।

যে অস্ত্যবৃত্ত, অস্ত্য পৃথক আনি বৃত্তে পাই নি, কেন সেই  
দুহুর্থেই শান্তির ঘণ্টা পুনরাবিবৃত্ত হ'ল যাহা অস্ত্য আমার দুহুর্থে  
নি । এও হ'তে পারে পূর্ববর্তের বৃত্ত কর্তৃ, যাহা অস্ত্য একমুখে  
আমার ভোগ করতই হ'ল, তখনও নিশেবে হ'ল নি । সেই  
কর্তৃর অবশিষ্টাংশই হ'ল তো আমা পৃথক বহিঃপ্রবাহের যথা  
হ'তেও আমার উৎসাহ করে এলো ; আমাও বিবাহ, এ কীর্তনের  
অবশিষ্ট বিমললি সেই কলভোনের অস্ত্য এমন ভাবে চালিত  
করবে ।

চ্যা, যা বলছিলাম । স্মৃতি-বিলন হ'ল স্মৃতি স্মৃতি তাঁর  
এতকালের অতি-বাধ্য এদটি কল্পকটীক একমুখে একবারে মনের  
বাইরে এসে পড়ল । বহু বৃত্ত সেটি বহুবার অস্ত্য একমুখে  
ছুটলেন ; আনি আর আর একটি বহুবার সম্মান লক্ষ্যিত হ'ল  
একই সঙ্গে কল্পকটীক লক্ষ্য করলাম ; কেউ ছাড়তে বা হাত  
বীকৃত নই, কাজেই আশঙ্ক হ'ল অস্ত্য । স্মৃতির পাঠ আমার  
অস্ত্য ; স্মৃতিবাঁ কীক শান্তি কথোত আমার বিলম্ব হ'ল না ।  
তখনকার তিনি আমার কঠোর বধ্যকবর্ত লক্ষ্যিত স্মৃতিবাঁকি  
তানলেন ; তার ছিন্ন হ'ল, তিনি পড়ে গেলেন । সেই অযোগে  
কল্পকটীক আনি বহুগত করলাম । কোথাও লক্ষ্য আমারই  
পাথের তলে আমার তার লক্ষ্য করলেন । কথটি ছিল বাহ্য-  
চক্ষুগত । বাহ্য যুব বেনী নহ ; কিন্তু দুহুর্থে হ'তে বস্তু কথোত  
এমন ততক মাঝ নেই ; এমন দুহুর্থে দুহুর্থে আমার ওপর পড়ল,  
কিছু আর বস্তু হ'ল না ।—এই মাত্র যে-কল্পকটীক কুমারীর গন্তব্য  
লক্ষ্য করছিল, আমার হাতে কি সেই কল্পকটীক ? প্রবলীলাত  
নৈশূর্য্যে আমি কল্পকটীকে লক্ষ্য লক্ষ্যবর্তী কোণে এমন ছিন্ন  
লক্ষ্যে লক্ষ্য করলাম যে, প্রোস্থাপিত হ'লে কল্পকটীক কুমারীর  
হস্ত-লক্ষ্য করল ; এত ঘটনার মধ্যেও কুমারী এক নিশেবে  
অস্ত্য তাঁর কীক বন্ধ করেন নি ; বিস্তারিত কল্পকটীক আসতেই তিনি  
পুনর্বার বহিঃপ্রবাহ শিখরে আপনাকে আশঙ্ক করলেন । লক্ষ্য-  
বর্তনী হ'তে উত্তিত হ'ল উত্ত প্রবাহ-সামানি । এর পর কীক  
সম্ভাব হ'ল ।

আমায় পৃথকিতুধে অঙ্গুরগত করলাম ।

পূর্বে বন্ধু বললেন, যে কল্পকটীক লক্ষ্য কল্পকটীক নিয়ে আমার  
প্রতিযোগিতা হ'তেছিল, তিনি সামান্য ব্যক্তি নহ—কোণাধির  
বহুশ্রী-সচিবের পুত্র ; স্মৃতিবাঁ প্রবাহতর কেন উল্লেখই যে  
আমার উপস্থিত হ'তে হ'বে না, এটা নাকি আমার সৌন্দর্য্য ;  
কারণ, দুহুর্থে স্মৃতি হ'তে লক্ষ্যই লক্ষ্যকলেন, তিনি আমার





## ডাক-চুরি

ঈশ্বরচন্দ্রমোহন দাস

( এক )

ভাত্র মাস। কিন্তু কয়েক দিন ব'রে অতি অচভ্রভাবে অবস্থায় বসি বর্ষক চন্দ্রে,—সকাল থেকে দুপুর, দুপুর থেকে সন্ধ্যা, হারপার আবার সন্ধ্যা থেকে সাংঘাত্য-বাণী কুপকাপ রুটী। ঘর থেকে বেরনোই একটা কঠিন ব্যাপার। সেদিন দুপুরের পর কয়েক ঘণ্টার পর বেয়ের আভাল থেকে ফেরেন একটু উকি দিয়েছিলেন বটে কিন্তু আভাল থেকে ফেরেন একটু উকি দিয়েছিলেন বটে কিন্তু আভাল থেকে ফেরেন একটু উকি দিয়েছিলেন বটে কিন্তু

এমন দুর্ভিক্ষেও আমার মাংসখল থেকেই হবে কর্তব্যের তত্ত্বনা। আজ কয়েক দিন হল একটা বড় রকমের ডাক-চুরির সাংঘাত্য এসেছে। আজ একতর কাক্তে বাপুত ছিলাম ব'লে এই ব্যাপারের তত্ত্ব-নিয়ন্ত্রণের পর এখনও ঘটনাক্রমে সিকে যেতে পারি নাই। যেতে হবে আরি সাত আট ফোঁস পথ। হাতা-ঘাতি তরফে, ঘনি-বাহনও তদন্তস্থ।

এই বাপুতবটি দিনাপুর জেলার একটা লব-ভিত্তিক। মহাকুনার দিকিও কতলোকের সংখ্যা খুব কম। জ'মদার-হুজুর কয়েক ঘর প্রাঙ্গণ ও ফুলদান ব্যতীত অধিবাসিগণের বেশি ভাগ লোকই নির প্রেষির বুনদান, কৈবর্ত, কুয়কার ও সাংগতাল, তুরি, ওড়ো প্রভৃতি অনাধা ভাতি। কয়েক দিনব্যাপী অবিরাম চুরিপাতের ফলে রাজার অধিকা অতি ভয়ঙ্ক হ'তেছিল। বুন-ভরা জল নিয়ে আতাই চণ্ডী প্রবল বেগে বয়ে বাজিল। এমন ধর-প্রোতে অবস্থান নৌকা গেলে অনধিক তিন ঘণ্টার মধ্যেই আমার গরবা ঘানে পৌঁছানো সম্ভবপ হ'তো, কিন্তু এটি এমনই ভয়ঙ্ক যে এখানে একরূপ একঘানা জল-বানের বাবস্থা করা একবারেই অসম্ভব। কাজেই রাজার আমলের সনাতন রীতি হুকাকরে ধেন-কালোপাণী একঘানা গো-শকট আমার বরংগল প্রমণের একমাত্র বাহনও অবলম্বনরূপে রাজি পট্টার লবর আমার বাঙ্গোর দ্বা-বেশে উপস্থিত হ'ল।

লগা আনন্দক, পিগত একবৎসর কালের মধ্যে অনুন্ন একশো বার আমি একরূপ ঘানে চলাফেরা করেছি, সুতরাং যুক্ততে হবে এতে আমি প্রীতিবন্তো অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। বর্তমান দুপুরের মোটরগাড়ী চড়া বাঁধের অভ্যাস জারা গো-শকটে চড়বার কথা তখনই নিশ্চয়ই আঁৎকে ওঠেবন এবং বলবেন—ওরূপ ঘান শুধু বাল টানবার জন্য অতিশ্রেষ্ঠ, বাহুব বহন করবার জন্য নয়। কিন্তু আমি যে সবদের কথা বলছি তখন সেখানে গর বা মোব-চালিত বি-চক্র ঘানই ছিল একমাত্র সখল। সুতরাং বিধা-বিরহিত চিত্রে আমার গো-গাড়ীতে উঠে এক গাধা খড়ের উপর আত্মীয় শয়্যার গুয়ে পড়লাম লগা টিক হয় না, লম্বারমান হ'য়ে পড়ে রইলাম। তখনও ভাঙি ভাঙি রুটী পড়ছিল, তাই গাড়ীর দুই দিকটা একঘানা চট বিরে ঢেকে দেওয়া হ'ল। এই নির্জন বীথ পথে নিশীথ রাতে একমাত্র গাড়োরান ভংগার যাতায়া নিয়ন্ত্রণ নয় বলে একজন কন্ট্রোল ও একজন চৌকিদার পরত্রে আমার সহযাত্রী হয়েছিল।

চৌকিদারটি ছিল অসভ্য তুরিভাষী, আর সিপাইজী মির্জাপুর জেলার—নাম মনে নাই—এক পাঁড়ে। গরুর গাড়ীতে চেপে একটা পাশ-বাশি বকে নিয়ে একদম চুপ ক'রে প'ড়ে থাকার অভ্যাস ক'রে নিয়েছিলাম ব'লে বলা, নচেৎ গাড়ীর অবিরাম উত্থান-পতনের দাক্তর বাকানিতে হাড়-গোড় ভেঙ্গে প্রাণ বেরিয়ে যাবার মতো অবস্থা হ'তো। গাড়ীতে চুপ ক'রে পড়ে থাকতাম বটে কিন্তু ঘুম হ'ত না, তবে গাড়ী-চলার ক্যাচ, ক্যাচ, শবে কেমন বেন শব্দের আবেশ হ'তো।

অবশেষে প্রার ভোরের বিকে আধো-ঘুম আধো-জাগ্রত অবস্থায় পরীতলার ডাকবাংলোর আদিনার পৌঁছলাম। বৎশয্যা ছেড়ে এবার উঠতে হ'ল। বাংলোর বারান্দার উঠেই জানতে পারলাম তার ছাতি কানরার একটিতে আছেন—পোতাল সুশাখিতৈওক্ট। আমি অপর কানরার প্রান্তর নিলাম। আবার দলী হুঁজর সামগ্রিক তাবে বাংলোর বারান্দা অধিকার ক'রে বসলো।

তারি তোর হ'তে বেশী বিলাস ছিল না। খটা নেড়েক পরেই ভোরেই পানীটা কলরব ক'রে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে আমিও শয্যাভাগ করলাম। আমার শিশিহী একটু আগেই আমার গিরে আমার আগমন-সংবাদটা দিয়ে এসেছে। ডাক-বাংলো থেকে বাংলা রাজ্যে স্থিতি নিশিটের রাজ্যে বাব্বাংলো।

আমি বুঝ-হাত বুঝে মাঝের বসবার ঘরে একটা চেয়ারে টেনে মার ব'সেছি এমন সময় পোটেল সুপারিটেণ্টেণ্ট ব্রেনেনবার্গ পানের কামরা থেকে বেরিয়ে এলেন। তাঁর সঙ্গে পূর্বাগণি আমার পরিচয় ছিল। স্তব্ধ এই সাক্ষাতে উত্তরেই যথেষ্ট আনন্দ অনুভব করলাম। তিনি তখনই হাসিখুশি এসে আমার পানের চেয়ারে উপবেশন করলেন এবং কথার প্রথমেই জানালেন, তিনিও ডাক-চুড়ির তত্ত্ব সম্পর্কেই এ বিবে এয়েছেন এবং অধিকন্তু ঘটনাবলির 'বকে' বসনা করেন।

ঘটনাবলি এই ডাক-বাংলো থেকে আর নয় মাইল দূরে। ব্রেনেনবার্গ বললেন, "প্রথম এংলার অতিরিক্ত কোনো সংবাদ এখন পর্যন্ত জানতে পারি মাই, ঘটনটা যেমনই অকৃত তেমনই গুরুত্বপূর্ণ। বাইসিকেলটা একটুখানি সেয়ে গিরে ঘটনাকালেকের মধ্যেই আমি ঘটনাস্থলে বসলাম। হ'রে বাবা, আপনিক বস ম'গিরে দৃষ্টব আসতে চেষ্টা করবেন। আনাদের ইন্সপেক্টর নতিবাবু আজ চারদিন বাহ্য ঘটনাস্থলে 'মিকটবর্তী' ঘটনগর গ্রামে বসে অধুলাতন করছেন। আপনি সেল পর সবাই নিলে পদ্যদর্শ ক'রে কাজ করা বাবে। সেটাই ভালো হবে না কি?"

আমি বললাম, "তার আর সন্দেহ কি? আমি এখানে অথবা সময় মই করবো না, তবে এখনেই অবস্থানটা ভালো। ইকম বুঝে এবং আশ্রিতগুলো যথেষ্ট ওংলো পর্যন্ত ঘটনগরে পৌছাবো।"

"বেশ, আপনাক প্রতীকার থাকবে," বলেই তিনি তাঁর বাইসিকেল মেডামন্তের তক্ত চলে গেলেন। বহুক্ষণে পটীগ্রামে এ ইকম ছোটখাটো মেডামন্তের কাজ নিজেদেরই করে দিতে হয়।

অতঃপর পড়েই পটীগ্রামে বসে।

উপবেশনাব্যুত্থানসঙ্গে দেখা করতে এলেন। এই ডাক-চুড়ি মানসার ঘটনা সন্ধে 'তিনি' যা বললেন তার মর্ম এইরূপঃ—

"আজ চর দিন হল অর্থাৎ গেল রূপান্তরিত হ'লে আগন্তু তারিখে থানা-ঘরে বসে কাজ করছিলেন,—তখন অপরাহ্ন প্রায় তিনটা—এমন সময় ডাক-পিয়েন হঠাৎকণ খুব ব্যস্তভাবে এসে আমার কলমে যে, পোট-মটারবাবু খুব একটা তক্তবী কাকে তাঁর আশিমে তুমি বাবার তক্ত আমার অধুরোধ ক'রে পারিয়েছেন। গিরন আরো বললেন—একটা কি ভয়ানক ব্যাপার হচ্ছে, আমার তখনই বাওয়া দরকার। হাতের কাজ রেখে আমি অমনি উঠে পড়লাম এবং ছোট বাবুর কাছে চার্কি দিয়ে ভাববের চলে গেলাম। গিরে দেখলাম পোট-মটার বাবুর খুব শুকিয়ে গেছে এবং তিনি ভরে কাপছেন। আমার পেছাই তিনি বলে উঠলেন,—"আমুন বারোগো বাবু আমুন, সেগুন কি সর্জনশ হয়েছে," বলেই তিনি একটা ক্যানভাসের ব্যাগ হাতে করে তুলে আমার ঘেরিয়ে বললেন,—দেখছেন তো এই ব্যাগটা, এই ব্যাগ এসেছে নিতপুর পোটাকিস থেকে—এই যেখান তার বেবেল আর এই তার শিল,—যেখান এটা পোটাকিসের শিল নয়। আমি ভালোমতো পরীক্ষা না করেই শিলের বাধন-মটীটা কেটে ফেলেছিলাম। তারপর এই ব্যাগের ভেতর থেকে বেরুলো এই সব জিনিষ—কার্টের টুকরো, বাগের টুকরো, আর কতকগুলো বাজে নোংরা কাগজপত্র। যেখান ঐ শিলটাতে একটা আধ-পরলার হাল দেওয়া। কি সর্জনশ! 'এই তো মেল এই ব্যাগের অংক।' নিতপুর থেকে হোচ হুটো ব্যাগ আসে, যিত্তীর ব্যাগটা এখনো জ্বলি—এই সেই ব্যাগ।' বলেই ব্যাগটা আমার সামনে ধরলেন, দেখলাম তত্ত্ব লেংলটা টিক আছে কিন্তু তার উপরেই শিলটা দেওয়া হয়েছে অপর ব্যাগের মতোই একটা আধ-পরলার দিয়ে। তারপর পোটমটার বাবু বললেন, 'এই ব্যাগ আপনাক সামনে থলকো বলে আপনাকে ধর দিচ্ছি। এখন আপনি বললেনই ব্যাগটা খুলে দেখতে পারি।' আমি খুলতে বললাম। শিলের মজি কেটে ব্যাগ খোলা হ'ল,—এর ভেতর থেকেও বেরুলো ঐ ইকমেরই পোকার কাটা,

কাম-মাথা বাজে কাপড়-পত্র, আর কাঠের টুকরো, বাগের টুকরো ইত্যাদি। পোষ্টমাস্টার বাবু এতে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ হয়ে কাপড়ে কাপড়ে বসতে লাগলেন, 'এই সাতাশ বছর হ'লে চাকরী করছি ধারোগাথাবু, ডাংহি'ম আর তিনটে বছর কোনো বকনে কাটিয়ে দিতে পারলেই হয়, কিন্তু কি সন্ধানেশে ব্যাপার হ'ল ধারোগাথাবু, এবার আমি গিয়েছি, সহকারী বাগ্‌ চুরি! হাহ, হাহ, আমার সন্ধানেশ হ'লে গেল মশায়, একেবারে সন্ধানেশ হয়ে গেল।' ততক্ষণে প্রকৃতই পূর্ব অধির চমকে উঠিলেন। আমি তখন তাঁর কাছ থেকে একটা এজাহার খিষে নিলাম, তারপর ডাক-রাগার (Runner) নন্দন সাঁওতালকে জিজ্ঞেস ক'রে জানলাম যে, প্রতিদিন এই পোষ্টফিস থেকে দু'টো ব্যাগ্‌ নিয়ে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের হাওয়ার—চাউ-নগরের কাছাকাছি চলিমপুরের পুল পর্যন্ত গিয়ে নিকটবর্তী একটা বড় পাখুড় গাছের নীচে অর্থাৎ পল্লীতলা ও নিতপুরের মাঝানারি পথে নিতপুরের ডাকের প্রতীক্য করে এবং নিতপুরের হাওয়ার গুদিকের ডাক নিয়ে এলে তার সঙ্গে ব্যাগ্‌ বদল ক'রে তখনই আবার ঐ ব্যাগ্‌ নিয়ে ফিরে বসনা হয়ে আসে। ঘটনার দিন নন্দন হাওয়ার চলিমপুরের সেই নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছানোই যেখানে নিতপুরের হাওয়ারকে দেখতে পার। ঐ লোকটি নন্দনকে দেখেই বলে উঠে, 'অতো দেরি করলি কেনে রে? বাজিষ্ঠর সাহেব ডাকের জন্ত ব'লে রইছেন, অসুবি ডাক দিয়ে যা।' আমি তো অনেকক্ষণ মাগার ব'লে রইছি।' নন্দন তাড়াহাড়ি তার কাঁধের ব্যাগ্‌ দু'টো ঐ হাওয়ারকে দিয়ে দিলে, আর সেই হাওয়ারও তার ব্যাগ্‌ দু'টো নন্দনকে দিলে। ডাকবাবু বললেন, এই দু'টোই নিতপুরের সেই ব্যাগ্‌।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'এ দু'টোই যে নিতপুরের সেই ব্যাগ্‌, সে সম্বন্ধে নন্দনের উক্তি ছাড়া আর কোনো প্রমাণ আছে কি?'

'না।'

তা হ'লে নন্দন সাঁওতাল নিজেই যে দু'টো কৃত্রিম ব্যাগ্‌ তৈরি ক'রে সেগুলোকে নিতপুরের ব্যাগ্‌ বলে চালিয়ে বের নাই তা কি বলতে পারেন?'

'না, পারি না এবং পারি না হ'লেই সম্ভবতঃ তাকে প্রেষার কথা হ'য়েছে এবং তার ঘর-ভালাসিঙ ক'রেছি কিন্তু সম্ভবতঃ বা অপরায়জনক কিছু পাওয়া যায়নি।'

'ঘর-ভালাসিঙে সম্ভবতঃ কিছু পাওয়া যায়নি বলেই যে সে সন্দেরের অতীত হয়ে গেল, তা বোধ হয় আপনি মনে করেন না?'

'তা করি না বটে, তবে পোষ্টমাস্টার বাবু তাকে বহু দিন থেকে কানেন এবং গ্রামে নন্দনের ব্যাতিত আরে খাটি মানুষ ব'লে, এই তত্ত্ব তিনি তাকে বোটেই সম্ভব করেন না।'

'এ সম্বন্ধে পরে আবার আলোচনা করা যাবে। এখন চলুন একবার ডাকঘরে।' আলাবতগুলো আপনার মালখানায়ই আছে তো?'

—'আজ্ঞে হাঁ।'

ধারোগাথাবুকে সঙ্গে ক'রে তার পর ডাকঘরে গেলাম এবং পোষ্ট-মাস্টার বাবুর ঘরে ঘটনার বিবরণটা আবার শুনলাম। তিনি যা বললেন, তা থেকে নূতন কিছু জানা গেল না। নন্দন সাঁওতালের সন্ততার উপর তাঁর প্রগাঢ় বিশ্বাস।

সমস্ত কথা শুনে আমি পোষ্ট-মাস্টার বাবুকে অবশেষে জিজ্ঞেস করলাম, 'যে ডাক-ব্যাগ্‌ দু'টো চুরি গেছে তার মধ্যে টাকা-কড়ি কিছু ছিল কি?'

ডাকবাবু বললেন,—'ঐ ব্যাগের ভেতর টাকা-পয়সা ছিল কিনা এবং থাকলে কি পরিমাণ ছিল, এটা অবশ্য দেওয়া আমার পক্ষে বৃহৎ কষ্টের এক সমস্যা।'

'সে কি, আপনার অক্ষিপ্ত দৃষ্টি ব্যাগ্‌ দু'টো বেরিয়ে গেল, আপনি ওতে দিল ইত্যাদি দিয়ে ব্যাগ্‌ বন্ধ করে দিলেন, অথচ আপনি তার Contents এর খবর রাখেন না, এ কেমন কথা?'

'ব্যাগ্‌ দু'টো এই অক্ষিপ্ত থেকেই বেরিয়ে গেছে এবং এখানেই বন্ধ ক'রে দিল-মোহর দেওয়া হয়েছে—এ কথা ঠিক, কিন্তু আপনি এখনই দেখতে পাবেন তার ভেতরের তিনিবের সঠিক বর্ণনা দেওয়া আমার পক্ষে কেন অসম্ভব। বললে ব'লেও এই ছোট ব্যাগ্‌ ও বড় কভারগুলো যেখান—এগুলো বাবুঘোড়া ও অস্ত্রাঘ্রিণ থেকে দিল

বন্ধ হ'য়ে এগেছে, স্তব্ধতা—এই সব ব্যাপের ভেতর কি আছে আমার তা আমার কোনো উপায় নেই। এখন নিতপুত্র আফিসে ডাক পাঠাবার সময় এগুলো এবং এগনিবার স্থানীয় চিত্রপত্র, পার্শ্বল ইত্যাদি সব এড়াতা বড় ব্যাপের ভেতর পুরে খ্রিস্ট-বাহর করে পাঠাবো। কাজেই আমারই শিন-কণা ব্যাপের Contents লম্বকে পুরোপুরি জানি কখনই আমার থাকতে পারে না এবং থাকে না। আমি বলতে পারি শুধু আমার আফিস থেকে যত টাক' পাঠানো হয় তার খবর।”

“আপনার আফিসে কতগুলো খালি ব্যাগ আছে এবং ক'টা অল্প অ'ল্প থেকে এখানে আসে বা অল্প আফিসে এখান থেকে বার তার কোনো নিষ্ট বা হিসাব আছে কি?”

“না, তেমন নিষ্ট বা হিসাব আমারেই নেই, কোনো আফিসেই তা থাকে না, আর সে তরফিক হিসাব রাখাও সব সময় সম্ভবপর হয় না।”

“ব্যাগগুলো সবকারী জিনিষ,—তার একটা হিসাব নেই, এটা অস্বস্তি নয় কি?”

“স্বস্তি হ'লেও খাঁটি দস্তা কথা। তবে প্রত্যেক আফিসেই মোটামুটি হিসাব একটা—বাকি না এমন নয়, কিন্তু সেই হিসাব নিতুণ নয়।”

“সুদ হিসাবের কোনো হুদাই নেই,—তা রাখা না-রাখা একই কথা। তা বাব, এখন বলুন দেখি, আপনার আফিস থেকে কেউ যদি একটা ব্যাগ আপনার অফিসে সরিয়ে ফেলে, আপনার যৈনকি—কাজ-কবের দখল দিয়ে তা টের পাবেন কি?”

“টের পাওয়া পুইই কঠিন হয় যদি আফিসেরই কেউ তা করে, কারণ আফিসের লোক বস সহজে চোখে পুণো বিতে পারবে বাইরের লোক তেমন সহজে পারবে না।”

“আপনার কি সম্ভেদ হয়, এই আফিসেরই কোনো লোক এই ব্যাপেরে অভিভূত থাকতে পারে?”

“সম্ভেদ আর কি হাই করবো, এই সাতাশ বৎসর ব'য়ে চাকরি করছি, এমন সর্ববিশেষ ব্যাপার গোপনও ঘেঁষি, তুলিও নি। শেখ কালে হুজি বা আমার চাকরিটা

যদি। নগার নগর করে এ গরীব বেচারার চাকরিটা থাকে থাকে তার বাবদ? বকুন।”

“একবার বাবদ? পরে হবে, এখন আমার কথায় অবার দিন। কোনো দিকে কারো উপর আপুনার সম্ভেদ হচ্ছে কি?”

“থাকে না, আমি তো কোথাও সন্দেহের কারণ দেখতে পারছি না।”

“খাচ্ছে, আপনি আমার সঙ্গে একটিবার অফিসের লক খানায় যেতে পারবেন কি?”

“ই, পারবো।

“তা হলে আবদুন আমার সঙ্গে।”

হুই

ডাকবাংলু'ক লুকে ক'রে খানার এগে এই বোকামদার আলানত অবাং কুজিন ব্যাগ হুঁটো বের করবার লজ দাওয়াদা'বুকে বললাম। তিন দশখানার তালা খুলে এ হুঁটো ব্যাগ তাদের ভেতরের মালামালা সম্বন্ধ এনে আমার কাছে ছাড়িয়ে করলেন।

এ হুঁটো যে মোটামুটিসেরই ব্যাগ তাতে সম্ভেদ করবার কিছু ছিল না, তবে এটাই লক্ষ্য করবার ছিল যে, একটা খুব বড় আকারের ব্যাগ সমান হুঁটো কেটে এই ব্যাগ হুঁটো তৈরি করা হয়েছে। ব্যাগের Contentsগুলো বের করলে পর দেখা গেল কয়েক ছুকরো বাণ আর কাঠ, আর কতকগুলো খুলো-কাবানামা পোকার-কাঠি অতি ভারী ও পুরুগো কাগজ-পত্র—যেন cardboard থেকে তুড়িয়ে আনা হয়েছে। ডাকবাংলু'ক জিজ্ঞাস করলাম,—“এই ব্যাগ হুঁটো আপনার আফিসের কিংবা লক খানায়ের বগতে পাঠেদেণ কি?”

ডাক-বাংলু ব্যাগ হুঁটো বার কয়েক নড়ানো-কাড়া ক'রে বললেন, “সুভেদ বগোই একবার টিক'ক'ব দেওয়া শক্ত—এ সব ব্যাগে কোনো আফিসেরই নাম লেখা থাকে না, কিংবা এমন কোনো চিহ্নও থাকে না, যা থেকে কোনো আফিসের কোন ব্যাগ তা বগতে পাঠা যায়।”

“সরকারী ব্যাগ শিখে আপনাদের অনেক রকম প্রাইভেট কালজ হ'য়ে থাকে তখনো, যেমন বকুন, বিজ্ঞানার তদার সতর্ককের মতন বিহিয়ে রাখা, বাজার

থেকে চাল, ডাল, তরকারী ইত্যাদি আনি—কেনন, এ-রকম হয় না কি ?”

“তা খুব অস্বাভাবিক হ'লে যে না হয় বশত পারি না—হয়তো কোনো আফিসের কেউ সদর সমর এক্সপ ব্যংকার ক'রে থাকেন, তবে সর্ব্বদাই যে এক্সপ হ'য়ে থাকে তা নয়।”

“ডালের বড়ি দেবার জন্ত এ-সব ব্যাংগের ব্যবহার হয় কখনো দেখেছেন কি ?”

“ব্যাংগের উপর ডালের বড়ি বেঁধে ?”

“হী, আশ্চর্য্য হলেন নাকি ? এ কি ভেত ক'রে না ?”

“আমি তা কখনো দেখিনি, ভনিও নি।”

“বেশ, এই ব্যাংগ দুটো তাঁ-টেরে পরীক্ষা করে দেখুন দেখি, ওরূপ কিছুই প্রমাণ পাওয়া যায় কি না ?”

ডাক-বারু তখন একে একে দুটো ব্যাংগেই তেতর দিকটা বাইরে টেনে বার ক'রে দেখলেন এবং বিস্ময়ের সহিত বলে উঠলেন—“তাই তো, ব্যাংগের উপর বড়ি দেবার স্ট্রট ছাপ রয়েছে যেখতে গাছি। আশ্চর্য্য, আপনাদের দৃষ্টি কিছুই এড়ায় না যেখছি।”

“তা এড়ালে আমাদের কাজ চলে কি ? বাক্ সে কথা। এখন বন্ধন দেখি, এই বড়ি দেওয়াটা আপনাদের আফিসের কারো ব্যাক্তিতে কিংবা নম্বন সাওতালের ব্যাক্তিতে হ'তে পারে কি না।”

“হ'তে পারে সর্ব্বত্রই, তবে আমি যেতোটা জানি, সাওতালের ব্যাক্তিতে বোধ হয় বড়ি দেওয়া হয় না।”

এর পর নম্বন রাগারোগে লম্বচে খানায়রে বলেই স্থানীয় লোকদের অনেককে নানা ভাবে প্রশ্ন করলেন, কিন্তু তার বিকছে একটি কথায় কেউ বললে না বরং সে যে সংশোধক এক-কথাই সকলে বলে গেল।

প্রাপ্ত দুটো খানার প্রাণ-খানায়ই সাবধানে রাখবার ভক্ত দায়োগ্য ক্ষমকে উপলব্ধি দিয়ে সেই দিনই অপরারে ঘটনাস্থলের দিকে রওনা হয়ে গেলেন।

এ বলে ক্যাঁ আবশ্রুক—পরীক্ষণার প্রার অঠায়ো নাইর্শ পশ্চিমে নিতপুর পৌহফিল এবং পরীক্ষণা থেকে নিতপুর যেতে হলে প্রথমেই বেয়া-লোকায় সাহায্যে আস্রাই নদী পার হ'তে হয়—তার পর ডিষ্ট্রিট বোর্ডের

কাঁচা বাগা বরাবর পশ্চিম দিকে নিতপুরের বলর পর্য্যন্ত গিয়েছে। এই বাগার নাক্সানাক্সি স্থানে গুই দিকের ডাক-ঘরের দুই রানার প্রতি দিন ডাক নিয়ে এসে ব্যাংগ বদল ক'রে থাকে। এক্সপ বদল না করলে একজন রাগারোগের পক্ষে অতো নির্ধরণ প্রতিনিয় বাতায়াত করা সম্ভবপর নয়। নিতপুর ডাক-ঘর যে খানার এলাকার তার নাম পোর্শা। পোর্শা খানি ও নিতপুরের ডাক-ঘর দুই পৃথক্ স্থানে হ'লেও পরস্পর নিকটবর্তী। সন্ধ্যার কিছু পুজ্জই আনি খাটনগর গ্রামে পৌছতে পারলেন, কারণ পরীক্ষণা থেকে এই নর মাইল পথ আসবার জন্ত একটা ভালো খোড়া পেয়েছিলেন। ঘটনাস্থল এই গ্রামের মাত্র দু'মাইল পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। আসবার সময় ঐ স্থান দিয়েই এসেছিলুম কিন্তু তখন স্থানটাকে ভালোভাবে দেখার সুবিধা হয় নাই।

খাটনগর গ্রামটি নিকটবর্তী অন্ত্য গ্রামেরই অধ্বগণ, তবে এইটুকু নাত্র প্রত্যেক যে, এখানে এক জমিদারের একটা কাঠারী-বাড়ী আছে ব'লে কতিপয় তত্ত্বলোক কর্ণচারী এখানে বাস করেন এবং সে-অন্ত এই গ্রামের রাস্তা-ঘাটের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভালো। তা চাড়া, পূর্ব্ববঙ্গের একজন কর্তৃক তত্ত্বলোকি করেক শো বিধে খানার-জমি কিনেষ্ঠাতে চাব আবাস ক'রে বেশ ভালো অবস্থায় আছেন। সরকারী কর্ণচারী মাইই এই দিকে এসে তাঁর আভিগ্য গ্রহণ ক'রে থাকেন। গোষ্ঠাল স্পারিগেটেন্টেট স্থরেন বাবু এবং তাঁর ইলপেটের সতিবাবু আবার পূর্ব্বই এ-বাড়ীতে আস্রান্য নিয়েছেন স্তত্ত্বরাং আবারও যেতে হ'ল সেখানে।

গৃহবর্তী শ্রীত মনীন্দ্রনাথ বোধ বোধ হয় করিবপুত্র জেলার লোক। তিনি সকলকে পরম সমাধারে তাঁর গৃহে আস্থান ক'রেছিলেন এবং নিম্নে নিম্নত উপস্থিত থেকে আদর-আপায়ান ক'রেছিলেন। মনীন্দ্রবাবু বেশ লম্ব সকলদেহে মধ্যবস্ত্র লোক,—একটা নির্ম্মল প্রসরতার তাব তাঁর সুব-চোখে পরিমুট। করেক বৎসর পূর্ব্ব এ-দেশে পূব্ সন্ধ্যা মধ্যে জমি পাওয়া যেতো। মনীন্দ্রবাবু সেই সময় কিছু জমি কিনে রেখেছিলেন এবং সেই অবধি এ-দেশেই প্রায় স্থায়ী ভাবে বাস ক'রে আস্রছেন। তাঁর

হানের গোলায় অন্তত পাঁচ হাজার মন ধান নিরুত  
মজুত থাকে। অনিতে ধান, ডাল, ভিল, সর্ষে,—বাগানে  
নানাপ্রকার শাক-সজী, তরকারী, পুত্রে বাছ এবং  
গোদোলে পরম্বিনী গাভী,—বাছালীর ভীষন ধারণের এই  
করটি গ্রহণ উপকরণ হাতের বুঠোর মধ্যে থাকলে আর  
ভাবনা কি থাকে? মণীশ্রবাসু ভাই এমন প্রশ্ন।

রাত্রির আহারের পূর্বে ছরেনবাবু, নতিবাবু এবং  
শোশা: ধান্যার দারোগা বেবেনবাবুর সঙ্গে এই চুরি সম্পর্কে  
আমার অনেকক্ষণ আলোচনা হ'ল। বলা অবশ্যক, এই  
চুরির ঘটনাবলি পোর্শা ধান্যার এলাকাধীন স্রুতরাং এটা  
ঐ ধান্যাই case এবং পোর্শার দারোগাবাবুই তার প্রকৃত  
ভদ্রতরকারী অফিসার। এই দারোগাবাবুর নিকট জানা  
গেল, নতিপুর পোষ্টাফিসের রাণার বখাসমত ডাক-ব্যাগ  
নিরে ভলিমপুরের সেই নির্দিষ্ট পাহাড়গাছের তলায় এসে  
পত্নীতলার রাণারের জন্ত প্রায় দু'ঘণ্টা অপেক্ষা ক'রেছিল  
কিন্তু ভদ্রতরকারী পর্যন্ত কোনো রাণার এলো না দেখে সে  
তার ব্যাগ-ছুটো আবার নতিপুরের ডাকঘরে এনে  
কিরিয়ে দিচ্ছে। নতিপুরের পোষ্ট-মাস্টার সেই ব্যাগে  
কোন রকম কৃত্রিমতা পান নাই এবং তিনি যে ব্যাগ ঈল  
ক'রে দিচ্ছেছিলেন ঠিক সেই ছুটো ব্যাগই ফেরৎ  
পেরেছেন, স্রুতরাং ঐ রাণারকে এই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট  
ব'লে সম্বন্ধ করা চলে না। তবে সে যে নতি বুঠতা ক'রে  
তার আসল ব্যাগ ছুটো গ্রহণকৃত: চুরিরে রেখে তার  
পরিবর্তে ছুটো কৃত্রিম ব্যাগ পত্নীতলার রাণারকে দিয়ে  
সেখানের ব্যাগ ছুটো আত্মসাৎ ক'রে থাকে এবং  
তারপর ভালো বাছুর লেখে, সেই আসল ব্যাগ  
ছুটো এনে ডাক-ঘরে ফেরৎ দিয়ে থাকে, সে  
স্রুতর কথা। কিন্তু এ অসম্মান সত্য বলে গ্রহণ করতে  
হ'লে নন্দন নাওতালেকের উক্তিই একটা গ্রহণ বিঘ্নের  
সঙ্গে বিরোধ উপস্থিত হয় এবং তার উক্তিটিকে সম্পূর্ণ  
নিষা বলে ধরে নিতে হয়। নন্দন তার ভবানবন্ধীতে  
বলেছে, যে রাণারের সঙ্গে সে ব্যাগ বদল ক'রেছে ঐ  
লোক নতিপুরের পুরাতন রাণার নয়—সম্পূর্ণ নতুন একজন  
লোক যার চোখারার সঙ্গে পুরাতন রাণারের চোখারার  
কোনো সাদৃশ্যই নেই। স্রুতরাং নব্বনের উক্তি

অল্পদায়ে নতিপুরের পুরাতন অর্থাৎ বরাবরের  
রাণার এই ব্যাপারে অথবা সংশ্লিষ্ট নয়। এখন  
প্রশ্ন এই, এ রকম অজানা-ঘটনা নতুন রাণারের হাতে  
মকর তার ব্যাগ ছুটো দিলে কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে  
নন্দন পত্নীতলার দারোগা বাবুর নিকট বলেছে, এই ডাক-  
লাইনের রাণারটা প্রায়ই ম্যালেরিয়া-অগ্রে কষ্ট পেয়ে  
থাকে, এ জন্য দু'টার বাস অস্তব এমন কি কখন  
কখন এক মাসেও ছুতিনি বার অস্থির হওয়ারের  
পরিবর্তে তার কোন আত্মার বা অনিত লোক এসে  
ঐ কাজ করে দিয়ে যায়, কাজেই অপরিচিত রাণার  
যেবে নন্দন কিছু সম্বন্ধ করে নাই, নির্ণেয়: ঐ  
লোকের বহন, চাপরাশ ও ডাক-ব্যাগ ইত্যাদি  
যখন সরকারী জিনিষের ঘটনই ছিল। পোষ্টাল  
ইন্সপেক্টর নতিবাবুও ঐ কবার সম্বন্ধ করে বলছেন,  
“অস্থির হলে তো কবাই নেই, অস্থির ছাড়াও নিজেদের  
কোনো অকুরি কাজ থাকলে, রাণাররা মনর মনর তাদের  
চাচা, ভাই, শালা, স্রুচিকের দ্বিগে সংকর: কাজেটা  
সাময়িক ভাবে চালিয়ে নেয়—এটা তাদের প্রাইভেট  
বন্দোবস্ত। ইচ্ছা তাদের ছুটির প্রবেশন হ'লে তখন  
তাঁরা সেটা পেতে পারে না, কাজেই এ রকম বলে  
ইচ্ছা বচা outstaged দিয়ে কাজ চালিয়ে নেওয়া ওদের  
বরাবরের অভ্যাস। এ জন্যই ঘটনা নতুন রাণার বেথলে  
তার সম্বন্ধ করতে পারে না। আমি নন্দন নাওতালকে  
এ জন্য মোব দিতে পারছি না।”

রাণার ছ'ঘরের উক্তিই বহি অসত্য ও অবিবাক বলে  
ধরে নেওয়া হয়, তাহ'লে যেন করতে হবে এই ডাক-  
চুরিটা গ্রহণের দু'ধনের বড়-বড়ের নয়। আর যদি ওদের  
কথা বিশ্বাস করা যায় তাহ'লে কোনো ক্ষুত্রীয়া বাকি  
রাণারের পোষাক প'রে এসে এই কাজে যিকোনো-কোনো  
অসম্মানই মুক্তিপ্রাপ্ত। দমত অবস্থা আলোচনা ক'রে আমরা  
ঐ শেষের অসম্মানটাই সত্য বলে ধাপাভিত: গ্রহণ  
করলাম।

প্রায় এক সপ্তাহ ধরে এই চুরি ব্যাপারের স্রুতর  
গলেছে কিন্তু তখন পর্যন্ত জানতে পারা যাবনি কত  
টাকা চুরি পিছিয়ে কিংবা অথবা কোনো টাকা চুরি

হয়েছে? টোকা কিংবা কোনো দুর্ভাবনা  
দলিল-পত্র হস্তগত করা এই চুতির উদ্দেশ্য—তাও এখন  
পর্যন্ত অনিশ্চিত। মোটের উপর চুতির ব্যাপারটো তখনও  
রহস্যে ঘেঁষা।

পোষ্টাল ম্যুনিষ্ট্রিয়েটেট ছুতেন বাবু বললেন, “এ  
ধরনের ডাক-চুরি আমার চাকরি-জীবনে এই প্রথম।  
বাহাদুর চোর বটে! কিন্তু তাকে trace করার  
কোনো সম্ভাব্যতা থাকে না।”

আমি বললাম,—“কিন্তু তখন হয়, চোরের সন্ধান  
পেতে হ’লে প্রথমতঃ প্রয়োজন কি চুতি দিয়েছে তা  
নিশ্চিতরূপে জানা। তদন্তে এ পর্যন্ত সে সম্বন্ধে কিছুই  
জানা যায় নি, তবে অব্যবস্থাপিত সন্ধান মিলে একটু  
ক্রম করলে চোরাই ব্যাপ হুটো উদ্ধার করা যোগ্য হয় খুব  
করুন হবে না।”

বতিয়াবু বললেন,—“ঐ ব্যাপ হুটো পেলে তো  
অর্ধেক তদন্ত শেষ হয়ে যায়।”

আমি বললাম,—অর্ধেক না হ’লেও অনেকটা এগিয়ে  
যায় বটে কি। অন্যায় তো নহে হত, ব্যাপ হুটো ঘটনা-  
কালের নিকটেই কোথাও পাওয়া যাবে। চলুন, সকাল  
বেলা কতকগুলো লোক নিয়ে এবার থেকে ঘটনাস্থল

পর্যন্ত এবং তার পরেও বাসিন্দা দুই রাস্তার দু’ধারে  
তর তর করে খুঁজে দেখি।”

বতিয়াবু একটুখানি হেসে বললেন, “আপনি কি  
মনে করেছেন রাস্তার ধারে ঘোঁষা হয় নি? চোর ব্যাটো  
ব্যাগ ছুটো রাস্তার পাশে ফেলে চলে যাবে এবং নিশ্চিন্তে  
যুঁচুবে, তাও কি সম্ভব?”

—“রাস্তার ধারেই ফেলে যাবে, তা না হ’লে পারে,  
তবে রাস্তা থেকে কিছু দূরে কোণে-কমলে কিবা পুকুরের  
কপে ফেলে যাওয়া সম্ভব নয়। প্রয়োজন হ’লে আপন  
পাশের প্রত্যেক পুকুরে ও জোবা-নালায় ভাল ফেলে এবং  
লোক বাড়িয়ে সন্ধান করতে হবে। আমার তো মনে হয়,  
কাল নিকটেই ব্যাগ উদ্ধার করতে পারবো।”

ছুতেনবাবু বললেন,—“বেশ, তা’হলে সে ভারে খুঁজে  
যেবা যাক। আপনি কেবল আয়োজন করুন।”

“আয়োজন তেমন বেশী কিছু করতে হবে না, শুধু  
৩০০০ জন লোক সংগ্রহ করা চাই। আনাদের সাহায্যের  
কম। নগাঁও বাবু হস্ততো লোক যোগাড় করে বিতে  
পারবেন।”

এই পরামর্শস্বরূপী বনীষ বাবুকে বিভ্রান্তা করা হয়।  
তিনি আজ্ঞাবাহক সহিত সে তার ছিলেন।

## লহ ধরণীর নমস্কার

### ঐনজাশ মুখোপাধ্যায়

কার কলম চমিকা বহে, মেলিয়ারলে ও কুঁচুটি,  
নাগের বাহন বাঁধে সবার—অত্যাচারের স্রষ্টা টুটি?  
অবজ্ঞিতা বন্ধিনী কোন্—স্রষ্টা হ’বে বহু প্রাণে,  
জগা বেবুত, বেনারাস গান পাঠিয়েছিল সে কী অভিমানে!  
সেদিন সে-নাগা গোনে নাই কেহ, গোনে নাই কেহ সে-স্বাধিকার,  
কোন নিস্তিত গুরু মেলিয়া চারুনি খিমে ন্যায় প্রতিকার।

সহস্রা তখন তেঁপল পদক মস্তক তব শব্দনাম,  
জগা সৈনিক, অগ্নিত শিবে লভিলে রত্নের আশীর্বাদ,  
তোমার আলোকে—লভিয়া পলোক, ত্রুটিত চলে অন্ধকার,  
তোমার আঘাতে হলো চূর্ণিত—সত্যের বহুধার।  
চকল হ’তে বন্ধন মাতে—পত বিধি হুহু প্রাণে,  
হায়েব অক্ষ মুহুরার তব কবে ভাঙ্গলেন আধার।

তোমার স্রষ্টা দেশল তাগার বন্ধিনী হা’র উপায়াস,  
বীণা ভূগণে পবিত্র সবার কবিল—“লহে দ্যাকবু!”  
নামত কার বরিলে তুমি—হে বহি শবক, লতাচাণে—  
অস্ত্রা! তাই যদি বহা বুলতে প্রাণি তোমার ব্যবহার।

জাগিলে সৌর্য উদয়-নিধরে—ভেলিয়া তিমির রাগিণ্য,  
আল হ’তে ভায়া বহনিল দুঃ, চলে গেছে তব স্বপ্ন-রথ।  
যানে নাই তব, যানে নাই তার—দুর্য্যাস-পতি, পদব্যাণ,  
পিছলি দিগছে জ্বর বানের ব্যাধার বে ভায়া শুভনাম।

শতবর্ষের পশ্চাতে বহি, গুণো, বহুধর অস্ত্রত!  
প্রাণি তোমার দুঃখ পাবে প্রান্তে চইয়া ভক্তিভূত।  
আমো! গুণে স্রুতি কাননে কুতন, প্যাবীরা গায়েছে বিভাস-পীতি,  
তব পদব্যাণ ভবিষ্যৎ সুখের কতো গানে কত পবিত্র নিতি।  
উপরে পদে আলিও প্রভাত বাতায় ধারণা নবীন গান,  
কিন্তু ভাবিত হয় নাই শেষ—ওগো স্বপ্ন, তব সে-অভিমান।

এসেব হাকারে ভক্তি—তোমার বিষ্ণু-মায়ের পূজা-স্মৃতি,  
আমো! স্রুতি আছে পথের, হুঁ-বাবে—দিশত তোমার পূণ্য-স্মৃতি।  
তাই তো আলিও নবীন পবিত্র তোমারে জানায় লজ্জাকান্দ,  
ওগো বাকিম, হে, বহি-শবক, লহে বহুধর নমস্কার।

# খেলার ছলে বিজ্ঞান

ঐশ্বরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

## ফুটবল

আমাদের দুর্ভাগ্য, বিজ্ঞান লম্বন্ধে বেশের অব-  
সারগণের অজ্ঞতা এবং বিজ্ঞানের প্রতি বিতৃষ্ণা আমকের  
দিনেও অপরিণীত; অথচ ক্রীড়া, শির ও বাণিজ্যের উন্নতি  
বিধান করে' যের পরে বাঁচতে হ'লে বিজ্ঞানের শরণাপন্ন  
হওয়া ক্রি়া পত্য়ান্তর নৈই। এতটা অজ্ঞতা নিয়ে কোন  
বেশই এই বিজ্ঞানের যুগে, প্রতিযোগিতার টিকে বাঁচার  
আশা করতে পারে না। মানুষের মত বাঁচতে হলে  
বিজ্ঞানকে আমল দিতেই হবে।

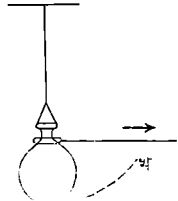
বিজ্ঞান-শিক্ষার আরো একটা মন্ত দার্ঘিকতা রয়েছে।  
সে হলো আণ্ডিক সত্যসমূহের অমুসন্ধানের ওর পথ-  
নির্দেশের কন্যতা। প্রকৃতির রহস্ত উন্মকটনে মানব-চিত্তের  
একটা স্বাভাবিক প্রগুতি রয়েছে। এটা কি, ওটা কি,  
কেন এমন হলো, কি করে' হলো এই সকল প্রশ্নের উত্তর  
দানের জন্য তেতর থেকে সে একটা প্রেরণা পাও। এরি  
জন্ত মনুষ্য মানুষ। মানুষের এই স্বাভাবিক সত্যানুসন্ধান-  
প্রচেষ্টার বিজ্ঞান যথেষ্ট সহায়তা করে।

শিক্ষা লম্বন্ধে ২য় মনোমম হর যদি পরীক্ষা ও  
পর্যবেক্ষণকে ত্রিতি করে মানুষভাবার ভেতর দিয়ে হাতে  
কলমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা যায়। বর্তমান আলো-  
চনার আমরা সেই পদ্ধতিই অমুসরণ করবো। পতি-  
বিজ্ঞান, শব্দ-বিজ্ঞান, তাল ও আলোক-বিজ্ঞান, জড়িত  
ও চৌম্বক বিজ্ঞান প্রভৃতি পর্যর্ক-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়-  
গুলি আমাদের আলোচনার অধর্গত করতে চেষ্টা করবো।  
আমাদের উদ্দেশ্য বিজ্ঞানের 'ক' 'খ' থেকে পাঠ আশ্রয়  
করা। এখানে যে-সবল পরীক্ষা উন্নয়ু করা যাবে  
তার জন্য বড় বড় বহুপাঠিঃ বা বিশেষ কোন যোগাড়-  
যন্ত্রের আবশ্রক হবে না। বিনা মূল্যে বা হ'এক পয়সা-  
ব্যয়ে এবং অল্প আয়ালে বা যোগাড় করা সন্ধান তা'  
নির্য়েই কাজ চলবে। আমরা দেখবো যে, ২য় মনোমম  
বুদ্ধির সাহায্যে এপ্রণে ছোট খাটো পরীক্ষার ভেতর দিয়েই  
বিশ্বপ্রকৃতির অনেক গুঢ় রহস্যের আবিষ্কার সম্ভব হ'তে  
পারে।

## গতি-বিজ্ঞান

### জড়ের কথা

যত্নের কড়িকাঠ বা পাঠের ভাল থেকে হড়ি দিয়ে  
একটা ভারী জিনিষ স্থাপণ। নং চিত্রে যে ভারী  
জিনিষটা রাখান হয়েছে সে হলো একটা অমপূর্ণ কলসী।  
কলসীর গলায় নমন হুতা বেঁধে, পর চিহ্ন বরাবর ওর ওপর  
একটা হেঁচকা টান দাও। রাখান হুতাটা ত্রি'তে থাকে  
কিন্তু কলসী বিশেষ নড়বে চড়বে না—যেখানে ছিল প্রায়  
সেখানেই রয়ে যাবে। পরীক্ষাটা পুনই লম্বক কিন্তু  
এর থেকে শিক্ষার আছে অনেক।



ক.

এই পরীক্ষা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, অমপূর্ণ  
নিচল কলসীটা নিচল অবস্থাতেই থাকতে চায়। নিজের  
থেকে কলসীটা চলতে ত চাইই না, অধিকন্তু জোর করে'  
চলতে গেলে কবে ঠা'ড়ার। জোরের অমন্ত বলবে এ আর  
মুতন কথা কি? হাড়ি-কলসী, ধড়ি-বাটি, জোতা-টোবিল,  
বাক্স-ডেক্স, কেউ যে এরা নিজের থেকে চলতে চায় না  
তা ত চিরদিনই অমরত' হেঁধে আসক্তি। এতে আশ্চর্য  
হবার কি আছে? অমরতাও তাই বলি, অমরতা হবার  
কিছু নৈই; কিন্তু ঐ হেঁচকাকেই একটু তলিঃ বেংতে  
হবে—যাতে করে ঐ সবল পর্যর্কের আমল প্রকৃতি আমরা  
প্রিকমন্ত বুঝতে পারি এবং কলে ওদের সঙ্গে কাঁচবার



কহতে গিয়ে বুঝে বসে না যায়, — বসক ওদের চাল-চলন দ্বিধমত কোন দিবে ওদের মধ্যে আমানতের ভাবনা-যাত্রার লক্ষণগুলি কিছুটা স্মরণ করে নিতে পারি।

বিজ্ঞানও তাই বলে। ঘণ্টা কলসী, ইট-কাঠ কাঠীর পদার্থগুলি আপনাকে যেতে কেউ চলেতে চায় না। কিন্তু চালিয়ে দিলে ওরা আপনাকে থেকে যেতে দায় কিনা তা জানা এখনো জানতে পারি নি। সে কথা পরে বলবো। বর্তমানে আমরা এইটুকু অস্বস্তি বসতে পারি যে, সাধারণতঃ যে সকল পদার্থ নিয়ে আমাদের কারবার কেউ তবঃ আপনাকে থেকে চলেতে চায় না বা চলেতে পারে না। এই সকল পদার্থকে বলা যায় জড় পদার্থ এবং ওদের এই অস্বস্ত্যাকে বলা যায় নিশ্চেষ্টতা। ইংরেজিতে একে বলা হয় Inertia.

আবার নিশ্চেষ্টতা বললেই যথেষ্ট বলা হয় না। এই পদার্থকে থেকেই থাকে যায় যে, নিজেই অচল অবস্থাতাকে বজায় রাখার পক্ষে যেন কলসীটার একটা তেঁক বা ভিত্তি রয়েছে যার জড় কোর করে চালানতে গেলেও ক্রমে ধাক্কাবার কর্তব্য থাকে। কলসীটা যেন চলতে চায় দৃঢ় হেঁড়ে ছিঁড়ুক, আমি কিন্তু দড়'ছনে—হিরে ছিলাব হিরেই থাকবো। স্তব্ধতা বোঝা থাকে, পদার্থের যে নিশ্চেষ্টতা-বর্ণকে আমরা ওর অস্বস্ত্য বলে বর্ণনা করতে চাই। আর একটিকে থেকে দেখলে তাকে আমরা ওর একটা বিশিষ্ট প্রকৃতি বা ক্রমতা বলেও বর্ণনা করতে পারি। বাই বলি, পদার্থের এই যথেষ্ট মান গ্রহণ করেছে ওর জড়তা।

আর একটা পদার্থ কয়াকে। ওদপূর্ণ কলসীটাকে ধুলিয়ে দেওয়া যাক। কলসীটা ধুলিয়ে একটা বৃত্তাকার পথে (অর্থাৎ চির) যায় প্রায় ছুটা হলো 'ক' ও 'খ' এবং মহাবিশ্ব হলো 'গ'। ওর বোলম-গতি একটু কক্ষ্য বহলেই দেখা দাবে যে পথের এ প্রান্তে বা ও প্রান্তে পৌঁছিতেই কলসীর গতির দিকটা উল্টে যায় এবং তখন তাকে দুইবারের ওর গতির দিকে দাঁড়ানতে হয়। ওর বেশ সব চেয়ে বেশী হয় যখন ভাটানে বা বাঁধে চলতে গিয়ে তাকে পথের ঠিক মাঝখানটা 'গ' বান। অতিক্রম করতে হয়। এমন কলসীটা বেই—বা দিকে দাবার পথে—ঠিক মাঝপথ শেরিয়ে থাকে। ওদন ওর ওদার বাঁধা নরন

দৃষ্টাও থকে। আগেকার মত আবার ডান দিকে খুব জোরে একটা হেঁচকা টান দাও এবং এইভাবে তাকে ধামাতে চেষ্টা কর। দেখবে এখানও দৃষ্টাও ছিঁড়ে বাবে এবং কলসীটা ওর গন্তব্যপথে, যে দিকে বাড়িল সেই দিকেই এবং প্রায় সমান বেগেই চলে যাবে। এ কি অস্বস্ত প্রকৃতি জড় পদার্থগুলির। আগের পদার্থের বোঝা গেছিল হিরে কলসী হিরেই থাকতে চায় এবং জোর করে চালানতে গেলে দৃষ্টাও ছিঁড়ে যায়। এ পদার্থের বোঝা থাকে—চলমান কলসী চলতেই চায় এবং জোর করে ধামাতে গেলেও দৃষ্টাও ছিঁড়ে চলে যায়—অস্বস্তি যেতে পারলেই খুশী হয়।

এই থেকে আমরা শিক্ষা করতে পারি যে, জড় জ্ঞান-মাত্রেরই আভাবিক প্রকৃতি হচ্ছে হিরে অবস্থার থাকলে চিরদিন হিরে তাই থাকে, আর চলত অবস্থার থাকলে গতির দিক বরাবর আপন বেগে চলতেই থাকে।

এই শেষের কথাটার মধ্যেও গুরুত্ব রয়েছে। তোমাদের হয় ত ধারণা, যেহল হিরে থাকতে পারলেই জড়জ্ঞান খুশী হয় এবং চলটা ওর প্রকৃতি-বিশিষ্ট। সত্য কথা এই যে, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণও যতদিন পর্যন্ত এই ধারণাই পোষণ করে এসেছিলেন। দু'হাজার বছরেরও আগে ক্রীস্টের দার্শনিক পণ্ডিত অ্যারিস্টটল—শিখিয়েছিলেন যে, যথাস্থানে থাকাকাই জড়ের স্বভাব এবং জোর করে চালিয়ে দিলেও আপনাকে থেকে যেতে যায়। কিন্তু প্রায় তিন শো বছর আগে ইস্টাণী দেশের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক গ্যালিলিও (১৫৬৪-১৬৪২খ্রঃ) শিক্ষা দিলেন যে, হিরে পদার্থ যখন আপনাকে থেকে চলেতে শুরু করে না, চলত পদার্থও সেইরূপ আপনাকে থেকে থাকতে পারে না। চলত পদার্থ থাকে যখন বাইরের থেকে ওর ওপর, অন্ততঃ কিছুকণের জড় একটা বল প্রয়োগ হ'তে থাকে—যেমন ঘর্ষণ-বল। তাঁর পদার্থ থেকে বুঝতে পারা গেল যে, যদিও সমস্ত ভূমির ওপর একটা তাঁটা গড়িয়ে দিলে তাঁটাটা একটু বাড়েই থেবে যায় তবু আপনাকে থেকে ও থাকে না। যদি দাঁড়ায় দান-পাতা না থাকে এবং তাঁটির ও তাঁর পথটা বেশ পরিষ্কার করে দেওয়া যায় তবে বায়বীয় আগে তাঁটাটা আড়ো অনেক দূর গড়িয়ে যায়—যেন আপন বেগে জ্ঞানগত দোষা চলে যাওয়াই ওর স্বভাব, আর তা যে

গেবে ওঠে না; ও তত্ত্ব বাটীর সঙ্গে ঘর্ষণের ফলে গতিটা ক্রমাগত বাধা পায় বলে।

তোমরা যে পরীক্ষা ছুটি সম্পন্ন করলে তাও তোমাদের এই কথাই আরো স্পষ্ট করে জানিয়ে দেবে। ই পরীক্ষা ছুটি থেকে তোমরা এখন নিশ্চিতরূপেই বলতে পার যে, অভ্রম্যের অভ্রম্যের ছুটি দিক প্রদেছে, যার একটিকে বলা যেতে পারে ওর স্থিতিসম্পন্নীয় অভ্রম্য (Inertia of Rest) যার এক স্থির পদার্থ স্থিতি থাকতে চায়, আর অপরটা হলো: ওর গতিসম্পন্নীয় অভ্রম্য (Inertia of Motion) যার অল্প চলমান পদার্থ আপন বেগে ওর গতির দিক বদলাব ক্রমাগত চেষ্টাই চায়।

কিন্তু একটু চিন্তা করলে বোকা বাবে যে, স্থিতি ও গতির অবস্থার মধ্যে প্রকৃতিগত পার্থক্য নেই; কারণ স্থিতিতে আমরা পূর্ণ বেগের গতি বলতে বর্ণনা করতে পারি। যন্ত্রের উত্তর অবস্থাকেই গতির অবস্থা বলে যেমন নিয়ে আমরা বলতে পারি যে, অভ্রম্য নাকিই ওর বেগের দিক ও পরিমাণকে—ঐ বেগ খুব ছোট, এমন কি শূন্য পরিমাণেই হোক, কিবা খুব বড়, এমন কি সেকেন্ডে হাজার বা লক্ষ মাইল পরিমিতই হোক—নিষ্কণ সম্পন্ন রূপে স্বীকৃত থাকতে চায় এবং এতে করেই ওর অভ্রম্য। এই প্রকৃতি বা এই পণ লব্ধ পদার্থের পক্ষে সমান নয়। এই প্রকৃতি যার বস বেনী। তার অভ্রম্যের নাজাই সেই অপর্যাপ্ত বেনী হয়ে থাকে। কিন্তু বেশ ছোট হোক বা বড় হোক প্রান্তে করে পদার্থবিশেষের অভ্রম্যের নাজার ভ্রাম-বৃত্তি ঘটে না।

তোমরা অবশ্য বিজ্ঞাসা করিতে পার—অভ্রম্যের নাজা ছোট পদার্থের পক্ষে বস, বড় পদার্থের পক্ষেও তাই হয় কি? কিবা লোহার পক্ষে বস, সমান আয়তনের সোনার পক্ষেও তাই কি? এর উত্তরেই অল্প তোমাদের আবার আগের পরীক্ষাটা সম্পন্ন করলে চলবে কিন্তু তার পূর্বে কলসীর বামিষ্ঠা ওল ঢেলে ফেলতে হবে। কলসীর যার আনা আশাও ওল ঢেলে, যার পূর্ণা করলে যেখানে পাবে, এবং আগের বস হেঁচকাটানে স্থি কলসীটাকে বেশ একটু সোলানো যার এবং সোলায়মান কলসীকে থামানোও যার। কলসীটা আসে ভ্রমি ছিল,

এখন ওর ভ্রমের, যারতন কমে গেছে, সঙ্গে সঙ্গে ওর ভ্রমের বেগ বদলায় যার প্রকৃতিও কমে গেছে। এর থেকে বোঝা যায় যে, পদার্থের উপাধান দিক থাকলে কন আয়তনের পদার্থের পক্ষে অভ্রম্যের নাজাও কম হয়ে থাকে, বস পদার্থের বস এই যে, বেনী আয়তনের পদার্থের পক্ষে ওর অভ্রম্য এই অপর্যাপ্ত বেনী, এবং কন আয়তনের পক্ষে ঐ অপর্যাপ্ত কন হয়ে থাকে।

আবার উপাধান ভেবে পদার্থের অভ্রম্য বাড়তে কমে কিনা তাও তোমরা অন্যান্যেই পরীক্ষা করে দেখতে পার। কলসীর নাজা ওল ঢেলে দিয়ে বাট দিয়ে ওকে ভ্রমি কর। এর ফলে কলসীর ভ্রমেরকার ভ্রমিঘটায় আয়তন বদলানো না কিন্তু ওর উপাধান (ও বসন) বদলে গেল। এখন দেখা যাবে আবার এই কলসীটাকে হেঁচকা টানে সোলাতে গেলে কিবা হুসে-কলসীটাকে থামাতে গেলে এই অভ্রম্য এখন আগের চেয়ে শক্ত হুতা হুতিতে পাবে। এর থেকে বোঝা যাবে যে, ভ্রমের কলসীর ওর সমান আয়তনের বাটীর অভ্রম্য বেনী। পদার্থবিশেষের অভ্রম্যের নাজাকে বলা যায় ওর বস। বস এই সংজ্ঞা নির্দেশ করেন নিউটন (১৬৪২-১৭২৭ খৃঃ)। ইংরাজীতে বসকে বলা হয় Mass। যে পদার্থের বস বস বেনী তার বেগের ভ্রাম-বৃত্তি ঘটতে বসও প্রয়োগ করতে হয় সেই অপর্যাপ্ত বেনী নাজার।

তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে, একটা সামান্য পরীক্ষা থেকেও অনেক কিছু শিখতে পারা যায়। পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ যে দুইই প্রয়োজন, তা তোমাদের জানা আছে কিন্তু আরো একটা বড় প্রয়োজন হলো পরীক্ষার সত্য-গুলির ওপরে বৃত্তিও প্রয়োগ করে তার থেকে একটা সাধারণ তথ্য আবিষ্কার করা—এমন এক-একটা তথ্য—যা লব্ধ বেশে, লব্ধ সত্যের, সত্য পক্ষে সমান ভাবে থাকে। প্রকৃতির সর্বব্যাপী ওমতে হলো যেমন বাইরের ইঞ্জির-গুলিকে সূর্য্যো হাফার প্রয়োজন-ওর অর্থ বৃত্তিতে হলেও সেইরূপ আমাদের সত্য বিচারবৃত্তিকে সত্য-সত্যের পক্ষে এমিয়ে দেবার প্রয়োজন। যার তাহ চিরদিনই বাটতে পড়েছে এবং বাহুব ও পণ-পক্ষীরাও তা চিরদিনই বেগে আসছে কিন্তু সব দিক ছেড়ে সবাই

ওরা মাটিতেই পড়ে কেন তা নিয়ে মাথা খাচিয়ে মর্দপুণ্ডরম  
একটোর একটা মুক্তিলাভ উত্তরদানে সন্ধান হলেন নিউটন।  
এই হল নিউটন নিউটন।

বসন্ত: বিজ্ঞানের দুগ আদর্শ হয়েছে মাঝে পেরিয়ে—  
গ্যালিলিও ও নিউটনের সময় থেকে এবং হয়েছে তা  
কড়ের হৃদয়-ধ্বংসে ভিত্তি করে। এ কথাগুলি কতকটা  
নিরপ হলো বিজ্ঞানের গোড়ার কথা। স্তব্ধতা বা পদে ওরা  
চলে না। কিন্তু তারা বা বলে গেছেন তাতেই ভয় সহজে  
সব কথা শেষ হয়নি। বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকক্ষেত্রে  
আইনস্টাইন ভয় সহজে আদ্য অনেক নতুন কথা  
বলেছেন। বড় হল তোমরা তার অর্থ বুঝতে পারবে।  
বর্তমানে গ্যালিলিও এবং নিউটন বা: বিবর্তিত আদ্য  
ওরা তাই নেন চলো এবং আদ্যের পরবর্তী আলোচনা-  
গুলি সেই পথ হয়েই অগ্রসর হবে। তার আগে  
তোমরা নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে চেষ্টা করবে:

১। গাড়ী হঠাৎ চলতে শুরু করলে আরোহীর মাথা  
গেলে দিকে এবং হঠাৎ থেমে গেলে সামনের দিকে খুঁকে  
পড়ে কেন?

২। চলন্ত গাড়ী থেকে মাটিতে লাফিয়ে পড়লে  
আছাড় খেতে হয় কেন? কেন দিকে আছাড় খেতে  
হয় এবং না খেতে হলে বিস্তর সন্তোষ অবলম্বন করতে  
হবে?

৩। সৌভাগ্যে সৌভাগ্যে ঠিক উপরের দিকে একটা ডিম  
উড়ে দিলে ডিমটা আবার হাতেই এসে পড়ে কেন?

৪। পৃথিবী ওর অক্ষরেখাকে বেঁটন করে ২৪ ঘণ্টার  
এক পাক ঘুরে আসছে। অতএব উর্দ্ধদিকে লাফিয়ে উঠে  
এবং মাটিতে পড়তেই আবার লাফ দিয়ে জ্ঞানগত ওরা  
নানা করতে থাকলে পৃথিবীর ওপাশে গিয়ে উপস্থিত হতে  
পারা যাবে। এ কথা সত্য কি? যদি মিথ্যা হয়, তার  
কারণ কি?

৫। একটা খুব উঁচু স্থপারি গাছের মাথা থেকে একটা  
স্থপারি ছেড়ে দিলে স্থপারিটা গাছের ঠিক গোড়ায় না  
পড়ে ওর একই পাশে পড়ে। কেন, এবং কোন দিকে  
পড়ে?

৬। ট্রেপটা চলছে খুব বেগে, উত্তর দিকে। ভেতরে  
সুটবল খেলা হচ্ছে। একটা গোলা-গোষ্ঠী উত্তরে, একটা  
দক্ষিণে। বল ছুটা সর্বাংশে সমান হলে কোন বল জিতবে  
কি জিতবে না?

৭। একটা কাঁচের মাসের ওপর একখানা পোটকাউ  
হা। তার ওপর একটা টাকা রাখ। কড়িটার এক  
পাশে ওর তল বরাবর খুব জোরে একটা টোকা দাও।  
কড়িটা সামনের দিকে উড়ে গেল কিন্তু টাকাকটা মাসের  
ভেতর পড়ে গেল কেন?

## খুলনা-ষড়্যন্ত্র

ঐশচাঁদ্র নাথ মিত্র

খুলনা জেলা হাইর সনিত্তি

কলিকাতার ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন আরম্ভ  
হইবার অনতিবিলম্বে খুলনা জেলার হুঁসিয়ার তেজুমিয়ার  
অধিনায় কাকী বৌলজী বিজ্ঞানজ্ঞা বা সাহেবের  
সভাপতিত্বে একটি বিরাট সভার আয়োজন হয়।  
কলিকাতা হইতে আগত বৌলজী আবুল হোসেন ও দিগ্বি  
কলেজের অধ্যাপক ললিত মোহন দাস মহাপ্রবোধের বক্তৃতা  
গুলিবার কত প্রায় দশ সংখ্যে দোকের সভাপন হইয়াছিল।  
উহার মধ্যে প্রায় দেড় হাজার বোদ্ধাসেবক ছিল।

উহার কিছু পরে নাওয়ার বে বদেখী প্রচার-সভা  
হয়, তাহাতে বেশপূজা বিপিন দাস ও মহাপ্রবোধ শিলাকত  
হোসেন বক্তৃতা করেন। এই সবত বেশনেভাদের  
বক্তৃতার প্রভাবে বোদ্ধাসেবক গঠনের কাঙ্ক্ষা ও সেই  
প্রচার কাঙ্ক্ষা চলিতে লাগিল। সেখান অধেশীর প্রভাবে  
বিলাতী ব্রাহ্ম ব্যাবসারীদের মধ্যে আতঙ্ক বেগা দিল।

ইহার কিছু পরে অমূল্য সনিত্তির খুলনার শাখার  
কেন্দ্র আলফা-মূলভঙ্গ হইতে কর্মীরা বাইরা হুঁসিয়ার  
বিদ্যাবিদ গঠন করিলেন। ঐ দল হইতে কোন কাঙ্ক্ষা

হইতেছে না বেথিয়া তাঁহার। সংগ্রেসকর্মী শতীজ লাল নিজেই সহিত আলাপ-আলোচনা চালাইয়া তাঁহাকে সত্যকর্তা ও খুলনা নগর মহাত্মার তিরস্কারের সংগঠনের তার বিধা আশিলেন। তাঁহাদের সহিত শতীনবাবুর স্থির হটল—এই কেসের কোন দফার উপর তাঁহাদের কোন কর্তৃত্ব থাকিবে না, যা তাঁহারা যাঁহা কিছু জানিতে চাহিলে শতীন বাবুর নিকট হইতে জানিবেন। এই নগর হইতে এইদিকে গুপ্ত-সমিতির কাজ আরম্ভ হইল।

১৯০৬ সালে “খুলনা বেলা রাষ্ট্রীয় সমিতির”

দ্বিতীয় অধিবেশন কপোতাক্ষীতীবর্তী ইসলামাবাদী পরীতে হয়। তখন কপোতাক্ষীর উত্তর তীরস্থ পল্লীসমূহ যশোরের প্রভাবে দ্রাবিত হইয়া গিয়াছে। এই বেলা-সমিতির অধিবেশনে তিন হাজারের উপর যেক্সাসেবক উপস্থিত হয়। খুলনার পুলিশের ডেপুটি সুপারিন্টেন্ডেন্ট ও বানী নকীব উহা চক্ষুশূল হইয়া উঠে। প্রায় ৪০ জন শস্ত্র পুলিশ প্রহরী এবং নিকটবর্তী বানাসমূহ হইতে আগত বহু পুলিশ ও অফিসর নগরী তিনি কক্ষায়েশ্বের অনতিদূরে আসিয়া আচ্ছা স্থাপন করিলেন।

অধিবেশনের প্রথম দিনে বিখ্যাত যশোরী গায়ক হেমচন্দ্র সেন, বিখ্যাত বক্তা গীর্ষাচন্দ্র চৌধুরী, ভক্তার আব্দুল গফুর প্রকৃতি কলিকাতা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের বাকী ত্রিনিতে হাজারে হাজারে লোক যতণে মনবেত হইতে লাগিল। যেক্সাসেবকেরা যতণে, রক্ত ও আহাতির স্থানে, অকস্মে এবং তাঁড়ারের স্থানে লাঠি হস্তে দক্ষতা ও সূক্ষ্মতার সহিত কার্য্য করিতে লাগিল। এদেশবাসী পূর্বে আর কোন দিন এই প্রকার বৃহৎ লোকসংগে এমন সূক্ষ্মতার সহিত পরিচালিত হইতে যেনে নাই। উৎসাহ, উদ্দীপনা, কর্তৃত্বপরতার মধ্যে অকস্মে বিস্ময়ভা আসিয়া দেখা দিল। যশোরী সলীতের সহিত হাজার হাজার যেক্সাসেবকের শোভাযাত্রা, সহস্র সহস্র দর্শকের আগমন এবং শত শত প্রতিনিধির সূক্ষ্মতার সহিত সভানগরে প্রবেশ বেথিয়া নকীব মহাশয় হুত্ব ভাঙী করিলেন—“লাঠি হাতে করিয়া কোন যেক্সাসেবক যতণে কাজ করিতে পারিবে না।”

কক্ষায়েশ্বের কর্তৃপক্ষের সহিত পুলিশের বোঝাপড়া

চলিতে লাগিল; কিন্তু দেখা গেল, শস্ত্রবাদী পুলিশ ইতিমধ্যে যেক্সাসেবকদিগকে ‘চার্জ’ (charge) করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছে। বিপর্য্যস্তবাদী বেথিয়া যেক্সাসেবকদিগকে লাঠি ভাগ করিয়া; কাজ করিতে বলা হইল—তাঁহারা লাঠি ভাগ করিতে অস্বীকার করিয়া কার্য্যক্ষেত্র হইতে সরিয়া গেল। বশ মিনিটের মধ্যে দুই হাজার টাকার স্বাভাবিক গুণীন হইয়া গেল। চারিদিকে বিদ্রোহমতীর উপর বিদ্রোহমতা যেন দৃষ্টি পরিগ্রহ করিয়া ঘুরিতে লাগিল।

অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি মাহারানিবাসী সৌম্যদৃষ্টি হুত্বের বোধ, সন্দাবক ত্রণাল বোধ, শতীজ লাল দ্বিজে প্রকৃতির অংশে চোঁয়া কিছু সূক্ষ্মতা আদিলেন—সত্যর কাজ আরম্ভ করা হইল। কিন্তু সে আশা, আকাঙ্ক্ষা, উৎসাহ-উদ্দীপনা আর কিরূপা আদিল না। পুলিশ ও গভর্নমেন্টের উপর জনসাধারণ বিক্ষোভ প্রেরণ করিয়া প্রস্তাবের পর প্রস্তাব আনিতে লাগিল। কিন্তু তাহারা বৃষ্টি—তাঁহারা কত নিরুপায়। শান্তি ও সূক্ষ্মতার মধ্যে আসিল অশান্তি ও উপভব। যেক্সাসেবকেরা যতণে মনে মানান্ধানে সভা করিয়া ইহার প্রতিবিধানের উপায় নির্দেশ করিতে লাগিয়া গেল।

এই ঘটনার পর হইতে গুপ্ত-সমিতির কাজ নগোৎসাহে চলিতে লাগিল। পরী পর পরীতে সভা সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে নীচা বেওয়া চলিতে লাগিল। কেন্দ্র হইতে অস্ত্র শস্ত্র সংগ্রহ হইয়া আসিতে লাগিল, সমিতির উপকৃত সভ্যদিগকে অস্ত্র-শিক্ষা বেওয়ার ব্যবস্থা করা হইল। ষত দিন বাইতে লাগিল সমিতির কাজ ততই বাড়িতে লাগিল—আর সঙ্গে সঙ্গে টাকার অভাবও সেইভাবেই অস্বস্ত হইতে লাগিল।

কম্প্রদেব বাতায়নের খরচ, তাহাদের সামান্য হস্ত-যন্ত্র, অস্ত্র-শস্ত্রের যান, তাহার ব্যবহার-শিক্ষা ও আহাতির খরচ বাবদ যে ব্যয় হইতে লাগিল, উহা যত চাপ আসিয়া পড়িল সুবিচার কেন্দ্র-সমিতির উপর।

পরীকর্তৃপক্ষ কাজের তার যখন কম্প্রদেব উপর বেওয়া বাইতে লাগিল, তখন দেখা গেল বহু কম্প্রদেব তার যখন করিতে যত্ন। ইহাদিগের নৈতিক চরিত্র গঠন

ভাগ শিকা বেওয়ারি অর্থাৎ একজন বেনাফের পণ্ডিত আদিগা বঁচিব চক্রেঃ স্বর্গভব, কৃষ্ণ-চরিত, দেশের কথা, নীতি, চর্চা ও খেদাৎ প্রভৃতির পঠন-পাঠন চলিতে লাগিল। এই সঙ্গে হুগলির প্রিয় নেতা শ্রী অরবিন্দের ইচ্ছাও বৈদিক 'ব্রহ্মেনাভ্যাস' বৈদিকভিত্তিক মনোরঞ্জন গুরু ঠাকুরদার 'নববজ্র' ভাগ্যী উপাখ্যায় বর্ণনাচরিত সন্ধ্যা এবং হুগলির ভাষ্যসিদ্ধান্ত পড়িতে প্রেরণা হইত। ইহাও যাহা কাজ বেশ অগ্রসর হইল। কিন্তু বইয়ের অভাবে এই সময়ে কাজে সাহায্য পাওয়া যাইতে লাগিল। উপযুক্ত সংখ্যক বিভিন্ন প্রকারের বই সংগ্রহ করা কঠিন হইল। অর্ধের অভাবে আট নয় মাস বাবে পণ্ডিত মাসিক বিহার বেওয়া হইল। এ পণ্ডিত যেন-সমস্ত বই হইয়াছে তাহা শতান বাহুরে বহন করিতে হইয়াছিল। রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনের উদ্দেশ্য লক্ষ্য হইতে সামান্য কিছু পাওয়া সিদ্ধাছিল। বেশবালীর নিকট হইতে সমিতি পরিচালনা করিবার বস্ত্র অর্থ পাওয়া গেল না। তখন কর্মীদের অবস্থা দুঃস্থতার চরমে আসিয়াছে। তখন পণ্ডিতের চিকিৎসা হইতেছে না। কর্মীর আহাির ক্ষুধিভেদে না। কেহ একটা প্যান্ট পরিয়া দিনের পর দিন কাটাইতেছে।

উপায় নির্ধারণের জন্য নেতৃস্থানীয় কর্মীদের এক সভা আহূত হইল—মূল্যবান সন্মতনয়। যে কোন উপায়ে টাকা সংগ্রহ করিতে না পারিলে সমস্ত মলকে তামিগা কেল্লাই শাস্ত হইল। তখন কলিকাতার কেন্দ্র-সমিতির পরিচালক ছিলেন—বারিষ্টার মিঃ পি. হিঙ্গ। তিনিও উহাই অনুমোদন করিলেন।

এই সময় একজন কর্মীর ঐকান্তিক চেষ্টায় প্রায় হাজার টাকা সংগৃহীত হইল। সমিতি কিছু সময়ের জন্য বাঁচিয়া গেল। কয়েকজন কর্মীর চেষ্টায় ইহার কিছু পথে অর্থাৎ ১৯০৮ সালের আগষ্ট মাসে সুখ্যাত নাগের ভাষ্য হইয়া গেল। বাহার বাড়িতে এই ঘটনা ঘটিল—সে "শাইলকে" বড় ভাই। তাহার মুক্তিকা-প্রোথিত টাকার কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। লোহার সিদ্ধান্তে চাবি স্রীলোকের কাছে থাকার তাহা সংগৃহীত হইল না। ইহা একটা ব্যর্থ অভয়ান যাত্র।

পুলিশ ইহার অংশদানে বস্ত্র হটল, কিন্তু কিছুই করিয়া উঠিতে পারিল না। এই সময় বাংলা রায় নামক ফুলতলা কেন্দ্রের একটা কর্মী পুষ্কতারের দোরে ও নেতৃবৈর বিকল মনে ইচ্ছাযিত হইয়া পুলিশে সাংবাদ বৈদ, তাহার কল—কাহাকেও বেনাফস হইতে, কাহাকেও হুগলি-কেন্দ্রে বিভিন্ন ান হইতে এবং কাহাকেও সুবিধা হইতে বৃত্ত হইতে হয়।

এই সময় বঙ্গীয় রাষ্ট্রীয় সমিতির (Bengal Provincial Co-terence) বার্ষিক অধিবেশন হইতেছিল হুগলিতে; 'মেন্টো মর্লে'র রিফর্ম আইন (Mento Morley Reform Act) সমস্ত বাংলা দেশকে আলোড়িত করিতেছিল। মধ্যমণ্ড (moderates) ও চরমপন্থী (Extremist) ভেদে বেশ হাইরা গিয়াছে। হুগলিতে বাংলার শ্রেষ্ঠ নেতারা ও কর্মীরা সমবেত হইয়াছেন। একদিনকে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের বয়মপন্থী মল। আর অপরদিকে দেশভক্ত বিপিন পাল ও অরবিন্দ চরমপন্থী মল কন-কারোলের অস্ত্র হুগলিতে উপস্থিত।

সাতকীয়ার উকীল স্রমলাল ঘোষ ও বৈদ্যনাথ চক্রবর্তী, সাতকীয়া মহকুমা-সমিতির (Subdivisional Congress Com.) কর্মদার শ্রীমন্তলাল মিত্র প্রভৃতি বহু কর্মী বহন হুগলিতে উপস্থিত হইয়াছেন—সেই সময় বোম্বাইয়ের হীনমুন্ডির সংখ্যা চারিদিকে প্রচারিত হইয়া পড়িল। হুগলির অর্থী ভূষণ চক্রবর্তীকে প্রেষণার কারণে তখন আনা হইয়াছে হুগলি জেলে। এই সময় সংবাদ পাওয়া গেল যে, শতীনবাহুর নামে ওয়ারেন্টে বাহির হইয়াছে এবং তাহাকে সঙ্গে লইয়া এখনই যাত্রা হইবে।

অধিবেশনের পরে শতীনবাহু কলিকাতায় আসিয়া অস্ত্র-পত্র ও কর্মীদের সন্মার বাধ্য করা দিগেন। তাহার ২ দিন পরে বাড়ী আসিবার পথে সংবাদ পাইলেন তাহার বাড়ী ঘিটারবার ভাঙ্গায়া করা হইতেছে। একদিন বাড়ী থাকার পরে জনৈক পুলিশ-অফিসারের পরামর্শে তিনি বাড়ী ত্যাগ করিয়া অজ্ঞাতবাসে চলিয়া গেলেন। সেখান হইতে সংবাদ পাইলেন—নিরাপত্তা কর্মীরা বৃত্ত হইয়াছেন।

শ্রদ্ধার্থীরা কুহারে যে—আলকা—মূল্য, বিধুবৃদ্ধ পণ—

পাইকচাঁদা—ঘণোহর, অবনী ভূষণ চক্রবর্তী মূলগ্রাম—  
ঘণোহর, অম্বিনী কুমারী—ব্রহ্ম-ব্রহ্মা-ঘণোহর, কানি-  
বাস ঘোষ—মূলপুর—ঘণোহর, নগেন্দ্র নাথ সরকার—  
মূলপুর—ঘণোহর, নগেন্দ্র নাথ চক্—মূলপুর—ঘণোহর,  
প্রিয় নাথ পাই—মূলগ্রাম—ঘণোহর, সত্যীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,  
মোহিনী বোহন মিত্র—মূলপুর—ঘণোহর, কানাই লাল  
চক্রবর্তী—সাকিরাড়া—খুলনা, মন্থন নাথ মিত্র—কুমারী—  
—খুলনা।

এই কথোঁদের মধ্যে সত্যীন্দ্র বাবু বি, এ, পড়িয়েছেন ছিল।  
অম্বিনী বাবু ই, বি, রেলওয়ের ষ্টেশন-মাস্টার  
ছিলেন। নগেন্দ্র সরকার প্রবেশিকা পড়িয়েছিলেন।  
মোহিনী বাবু ছিলেন শিক্ষার কোম্পানীর ম্যানেজার।  
অবনী বাবু ছিলেন 'খুলনা' পত্রিকার ম্যানেজার।

পুলিশ-ভদ্রজ শেখ হওয়ার পথে যখন খুলনার  
ম্যাজিস্ট্রেট-কোর্টে প্রাথমিক ভবন আরম্ভ হইল, তখন  
শতীনবাবু খুলনার উকিল ইন্সপেক্টর বহুমুখার ও নগেন্দ্র নাথ  
সেন মহাশয়ের সহায়তায় আদালতে হাজির হইলেন।  
অদালতের মধ্যে এই নামলা হাইকোর্টের 'পেশাব ট্রাই-  
বুনালে' পাঠান হইল এবং কানাইলালকে মুক্ত দেওয়া  
হইল।

এখন হইতে আরম্ভ হইল 'হরিণ বাড়ীর জেলের'  
পালা। একদিন মৃত্যুভাঙে এই একাধক জনকে জেলের  
ভিতর উলকাবহায়ে তন্নানী লওয়া হইল, এবং পৃথক পৃথক  
অভকার নির্দ্ধন কক্ষে এক এক জনকে আবদ্ধ রাখা  
হইল। পরাম্পরের মধ্যে কথা বলা নিষিদ্ধ হইল।  
১০১৪ মিলের মধ্যে কাহাকেও কোন বই পড়িতে  
দেওয়া হইল না। সকালে খটার সময় ওজনকে একটা  
একটা দলে বিভক্ত করিয়া একটা উচ্চ আটীয়ে  
বেষ্টিত 'বর-পরিদর' স্থানে কিছু সময় ঘুরিতে বিয়া  
এক এক টিন ওলে বান করা হইয়া আবার সেই নির্দ্ধন  
কক্ষে আবদ্ধ করা হইত। সকালের আহার—লপ্ধী।  
উহা ঘুবে তোলা বাইত না, খাওয়া শু' ঘুরে কথা।  
উহাতে ছিল ভাঙ্গা চাউল, ভাইল ও উহার কণিকা, কিছু  
ইছুরের মিঠা ও কিছু কাঁকর ও প্রকারে কুচি। ১১টার  
মিত্র—ভাত, খোসা সমেত মুহুরীর ডাল, একটা শাকসবী

মিষ্ট—ইহাতে ব্যক্তি হরেক রকম পোকা-মাকড়, ঘাস,  
পাতা ইত্যাদি উঠা খোকাতেও খাইত না। খেলা  
এটার মিত্র ঐ প্রকারের আহার। কোনদিন মুহুরীর  
পরিবর্তে অল্প ভাগ বেখা মিত্র কোমলিন বা পোকা  
সংযুক্ত ভেঁতুদগোলা এবং লেঠা বা দিল্লি মাড়ের খোল।  
কিছু বাছ বেখার ভাজ বরকার হইত অল্পখণ্ড-বাপ্রদ।

হুটাত একদিন হাইকোর্টের 'পেশাব ট্রাইবুনালের'  
জজ ডাক আসিল। বিচারপতি 'উডব্রুক' ও বিগবর  
চট্টোপাধ্যায় মহাশয়দিগকে শইরা উঠা পণ্ডিত হইয়াছিল।  
নাংলা ভালাতি নামলার বিচার আরম্ভ হইল।  
গভর্ণমেণ্ট-পক্ষে ছিলেন—'এডভোকেট বেনারেল মিঃ  
কেনরিক' প্রভৃতি ৫ জন 'কন্সট্রিক্টর' ও 'এডভোকেট'।  
আর সিগুরীভমিগের পক্ষে ছিলেন মিঃ জে, এন, রায় ও  
মিঃ এন্. মি, সেন ব্যাট্রিয়ার

যোগী রায় প্রেরিত গুপ্ত সংবাব ও পুলিশ কর্তৃক সাহিত্য  
দুই এক জনের নিকট হইতে মানক কিছু সংবাদ সংগ্রহ  
করিয়া পুলিশ এক বিবরণী তন্ননা করে। উহা দেখিয়া  
অবনীবাবু বিভ্রান্ত হইয়া পড়েন। পুলিশ প্রকাশ করে  
যে, কিছুকাল বে প্রবুর করেবলন একবার করিয়াছে।  
তখন পুলিশকে শর্ততায় অস্তিত্বন করিয়ার উদ্দেশ্যে  
অবনীবাবু 'রাকসাকী হইতে' বীকৃত হইলেন।

হাইকোর্টের তিনজন বিচারপতির নিকট এই নামলা  
আরম্ভ হইলে পর অবনীবাবু সাক্ষা নিতে উঠিয়া যখন  
উহার পূর্ণ বীকটোক্তি প্রত্যাহার করিলেন—তখন  
পুলিশ হইতে আরম্ভ করিয়া সরকারী মহলের যে অবস্থা  
পাড়াইল তাহা বর্ণনাতীত। সরকার-পক্ষের আর  
মিত্রী সাক্ষী ছিল না যে, বাহার দ্বারা এই নামলার  
প্রমাণ হইতে পারে। বিচারপতি 'উডব্রুক' যখন  
আসামীদিগকে মুক্তি দেওয়ার কথা তুলিলেন—তাহার  
পূর্ণ হইতে সরকারী পক্ষের উক্তিগণের সহিত পুলিশের  
বড় কথোঁদের পরামর্শ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। সত্যার  
সমাধান না হওয়ার এবং নতুন সাক্ষী উপস্থিত করিয়া  
নামলা গণনা করার কোন উপায় না থাকায়—আসামী-  
দিগকে মুক্তি দেওয়া হইল। কিন্তু পুলিশ ইংলিশকে  
গনরার হরিণবাড়ী জেলে আনিয়া পুলিশ। কিন্তু ইংলিশের

বিক্রম কোন ওয়ারেন্ট না থাকায় সন্ধ্যা কিছু পূর্বে আবার ইহাদিগকে লালবাড়ীর পুলিশের গায়ে আনিয়া রাখিল।

পরদিন ভোরে ট্রেণে পুনরায় খুলনার আনা হইল। বেলা ১১টা হইতে সাতটা পর্যন্ত পুলিশের ও তাহাদের উদ্দেশ্য উদ্ভিগনের চেষ্টায় "পাঃ কেসের" এক ওয়ারেন্ট হাট্টন করিয়া ইহাদিগকে পুনরায় খুলনার জেলে আনা হইল। প্রায় ৪টা, ৫২৩ দিনের পরে মান, আহার ও বিশ্রাম মিলিল। তাহার পর হইতে আরম্ভ হইল আবার জেলের নিয়ামক জীবন।

তিন, চারি বাস বাসে পুনরায় জাক পড়িল—ম্যাগিষ্ট্রেট-কোর্টে। এখন হইতে "গণ জনানি" (Carn hearing) আরম্ভ হইল। আসামীর পক্ষে কোন উক্তি নাই। সরকারী পক্ষে বলিত্যক্তা হইতে আসিলেন প্রতীকোষ চট্টোপাধ্যায় এডভোকেট তাঁহার সহিত ছুটিগুন খুলনার লোকের উক্তি, আর আসিলেন স্বনামধন্য পুলি শামসুল আলম। সোনার সোহাগা নিলিল। নাকী তৈয়ারী করিবার জন্য আসামীরে গরীতে পন্নতে "পিউনিটিং পুলি" বসিল। বাহার: নাকী দিতে স্বীকার করিল, তাহাণে আর পিউনি পুলিশের ট্যাক্স দিতে হইল না। সরকারী বায়ে জামাই-আসরে তাহাদের কলিকাতার আনিয়া গালা হইল। এই বিশ্রবীণিককে কিছুদিন বাসে ১২। (ক) গায়ের অর্ধাৎ সন্ধ্যাতের বিকালে দুই ঘোষণা করিবার বধ্যর করার মধ্যমে আবার হাইকোর্টের "শেষশাল টাইবুনাল" বিচার হইবে বলিয়া হরিণবাড়ী জেলে পাঠান হইল। হরিণবাড়ীর সেই নিয়ামকর কঠোরতম জীবন আবার আরম্ভ হইল।

দুই হইবার পর হইতে ১০ বাস অতীত হইয়া গেল, আবার বিচার আরম্ভ হইল। এবার জম হইলেন বিচারপতি মি: হার্ডিটন, মি: হোমউড ও স্ট্রীলানবোহন দাস। পূর্বের ন্যায়কার শ্রুত ব্যাখ্যিষ্টার ও উকিলেরা স্বাক্ষরে করিয়াসী ও আসামীর পক্ষে দাড়াইলেন। এবার অবনী বাবুর পক্ষে নিযুক্ত হইলেন নূতন ব্যাখ্যিষ্টার মি: এস, কে, সেন। ৩১ দিন পরিয়া বিচার চলিবার পর মোকিলী ও মধ্যমে মুক্তি দিয়া নাকী আসামীর দণ্ডায়ে দেওয়া হইল।

শত্রু, অবনী, বিধু, নগেন্দ্র চক, অম্বিনী, কালিদাস বাবুর ৭ বৎসর সশ্রম বীণাক্তর হইল। নগেন্দ্র নার সরকার ও অম্বিনীরে হইল ৭ বৎসর করিয়া, আর লতীল, প্রিন্সাব ও ব্রজেন্দ্র নরর হইল ২ বৎসর করিয়া।

বঙ্গাধেশের পরদিন প্রভাতেই প্রত্যেকের পায়ে দাণ্ডাবেন্টি পরাইয়া দেওয়া হইল এবং জেলের পোষাক সহ দণ্ডাধেশের কাল-পরিমাণক কাঠের চাক্সি সহ লোহার হাঙ্গুলি গলায় উঠিল। প্রত্যহ ১৮ শত খুইনাইনের চৌদা তৈয়ারী করিয়া দেওয়ার কাজ দেওয়া হইল। এই কাজ পাইয়া এই কঠোর বন্দী জীবনেও একটু শান্তি আসিল।

ইহার কিছুদিন পরে ইহাদিগকে পাঠান হইল আলিপুর সেন্ট্রাল জেলের চুচাপি ডিগ্রীতে। জেলের এই ব্যাধাক্ষী ৪৪টা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুঠীতে বিভক্ত। এক একটিতে এক এক জনকে রাখা হইল। এখানে কোন কাজ দেওয়া হইল না; বা বই দেওয়া হইল না। তবে নির্জন কারাগারকে বসিয়া আকাশ দেখা যাইত। ইহাই ছিল গভীর দুঃখের মধ্যে একটু শান্তি। সবত দিন-রাত্রে মধ্যে ও তার রাজ বাহুণে মুখ দেখা যাইত বটে; কিন্তু কাহারও সহিত কথা বলিবার হুকুম ছিল না। সকলে আসিত খেবর ও ওয়ার্ডার। শয়ন-কক্ষে মধ্যে যে মনুষ্যের পায়ে থাকিত তাহা পরিষ্কার করিবার সময় বন্দীদিগকে বাহির করিয়া প্রাণীর বেষ্টিত ক্ষুদ্র উঠানে মুখ-হাত দুইতে দেওয়া হইত। এই চতুর্দিক বেয়া উঠানের মধ্যে হইতে জেলের ব্যাধিত আর কাহাকেও দেখা যাইত না। এইভাবে প্রায় ২০ দিন কাটাঁইবার পর একদিন শেষ রাতে বন্দী গাড়ীতে সশস্ত্র প্রহরী পরিবেষ্টিত করিয়া ইহাদিগকে পাঠান হইল বিধিরপুর ডকের "বহাখালা" কাহাণে। তিন দিন তিন রাত্রি চলিবার পর ইহারা আসিলেন আসামানোর পর্ণিত্রিয়ারে নির্দাসিত জীবনবাণে করিতে।

এই আধাতে ইহাদের সঙ্গে আসিলেন লাহোরের এক থাকতনামা ব্যাখ্যিষ্টারের পুত্র মন্সপোপাল ১০ বৎসরের বীণাক্তর বাসের শান্তি লইয়া। আলিগড় হইতে আসিলেন ঘটনাল বর্ধা ৭ বৎসরের লাল লইয়া আর উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ও পাঞ্জাব হইতে নেপথ্যন রান-পোপাল ও রামবর্ধ ৭ বৎসর হইতে ৭ বৎসরের লাল লইয়া, ইহারা সকলে আসিয়া আলিপুর জেলেই ছিলেন।

# সোহাগিনী দত্তদার

ঐযানিনীমোহন নতলাল

( প্রথম অঙ্ক )

অষ্টম দৃশ্য

হীরেনের গৃহঃ হীরেন ও বিকাশ ।

হীরেন—ভারপর ভারী বক্স—আবার তো হাট-পা  
ঠাণ্ডা—ভাবলাম, এই মুক্তি ভাঙার ব্যবস্থা হ'ল—একবারে  
কোলাপ হবার জোগাড়—একগুণে কাপড়ের নীচে খেঁচ  
মেয়ে উঠেছি, একটু শব্দ নেই। স্বামী যেচায় হুঁকখার  
একবারে জল—সবই খুঁজে দেখলেন, কিন্তু আসল জায়গা-  
টাই দেখবার কোন প্রয়োজন বোধ করলেন না। তারপর  
আর আশাপ জমলো না—এত কাণ্ডের পর আর কি ভাল  
লাগে—বিবাহ নিতে হ'ল—আজ আবার বেলা দুটোর  
ব্যবহার নিমন্ত্রণ। বেশ, আজ যদি প্রেম বিবেচন করতে  
পাড়ি—কাল হবে ভগিনী। করছি, এমন সময় এই  
ব্যাপার—

বিকাল—বটে, তাই তো (বগত) উঃ কি পরজানী...  
হুঁহু কিছু কিয়ত অল্পের বিশেষ ছুরি (একাত্তে) আচ্ছ। কখন  
বললে—

হীরেন—আজ্ঞে ঠিক দুটো—

বিকাল—(বগত) আজ সঙ্গে সঙ্গে বাব, যেহি কোথায়  
লুকায়—ভারপর একবার যেখানে সেখানে—এই আধুনিক  
নারী—এই ভালবাসা, এই সত্যি। (একাত্তে) দুটোর  
ব্যবে তো ?

হীরেন—বাব বৈ কি Sir, নিশ্চয় বাব—

বিকাল—তা বৈকি খাওয়া তো চাই, আরও যখন  
করছো, সেব তো—করা চাই—

হীরেন—শুধু তাই নয় Sir, আপনাকে বলতে কি  
আমি Sir তাঁকে—মানে সেই মনোভাটিক ভালবেলে  
ফেলছি—মানে I love her—ভালবাসি—

বিকাল—(অর্ধবগত) তা আর বাসবে না—যেমন তপ  
ভেবনি শুণ আছে হেঁই মইলে আর প্রেম দিববে কি  
করে—

হীরেন—আপনি Sir, আপনি জানেন না যে, কি

যেমনা তিনি বয়ে বেড়াছেন—যদি জানতেন, আপনিও  
তাকে—

বিকাল—না; না কুল করছো হীরেন, আমি তাকে  
হাটোচাষুক হাঁকাতাম—

হীরেন—সে কি Sir, আপনি যেহেন 'ম, দেখলে আর  
এ কথা বলতে পারতেন না, আমার ব'ব সাবা হয় আমি  
তবে এই যেমনা তাঁর দূর করে দিতে চাই—আপনি যদি  
একটু সহায় চ'ন।

বিকাল—মানে—

হীরেন—মানে, আমি Sir তাঁকে বিয়ে করতে চাই—

বিকাল—সে কি ! বল কি ! স্বামী বর্তমানে ?

হীরেন—আমাদের Divorce আইনটা Sir পাশ  
করিয়ে দেবার চেষ্টা করা আপনার উচিত—আপনারা  
পাঁচমানে লেগালেগি—agitation করলে গভর্নমেন্ট এ  
আইন পাশ করে দিতে বাধ্য হবেন। এইটে পাশ হলই  
আমার বিবাহের আর কোনই বাধা থাকবে না Sir—

বিকাল—চমৎকার—Excellent Idea কিন্তু তোমার  
দাদা—হা—

হীরেন—যদি একে পাই, সব ছাড়তে রাজী আছি  
যার—আপনি একটু—

বিকাল—বটে, এতদূর, আপনি দেখছি তোমার বাবাটা  
বেগাম। না না হীরেন তা হয় না—এ সব একবারে গ্রাহ্য  
করবার মতন নয়—বুঝতে পারছো না, যে যেহে স্তার এ  
বহরের স্বামীকে ঠকতে পারে, তার পক্ষে তোমাকে  
ঠকানও কিছু বিচিত্র নয়—একে প্রেম বলে না হীরেন—  
যোহ—মোহ—

হীরেন—কিন্তু Sir Divorce না হলেও তো  
কাল বিয়ে হচ্ছে—

বিকাল—অর্থাৎ তুমি তাই করবে না কি—

হীরেন—না—জিজ্ঞাসা করছি—দে বিয়ে কি valid  
মানে আইনসম্মত—

বিকাল—valid হোক আর নাই হোক—তোমার



সহকারী সেই কোনে। তুমি আমার কথা জানে—একদিন  
যেহে তুমি এমন করে গেলে—এ কথাকে বিবেচনা করে বলে  
ফেলে ঐশ্লে—আর আমি—[ mean ] আমার  
বিবাহিত্রী—এই এত কাল হবে যাদের ভালবাসার  
কোনই পাড়া পাই না—তুমি কখনো এর সহ্যই করনা—  
করনা—

হীরেন—না যাঁর ভালবাসা—এই ভাল—[ real love ]—  
আজ্ঞা সাব তিনিও কি আমার ভালবাসেন নহে হয়?—  
বিশ্বাস—[ পণ্ডিত ] এই সহ character-এর মেয়েদা  
[ বলাব] কাকে বলে হতে কোনে না।

হীরেন—না সাব, কোনে জানে নতুন আমার কেন  
সব ব্যাপার আছে এত অসুখের—

বিশ্বাস—[ just a fancy ]—a whim [ খেয়াল ]—খেয়াল—  
চীরেন—[ সেখান ] [ খেয়াল ]—[ খেয়াল ]—  
ভালবাসা—

বিশ্বাস—[ all right ] আগে দেখে পড়িয়ে দেব—[ let us  
see ]—তারপর এ কথার ঠিক উত্তর পাবে—নানে প্রেম  
কি—

হীরেন—আজ্ঞা—তাই দেখা যাবে—

বিশ্বাস—[ good ] আজ তা বলে যাক

হীরেন—[ নিশ্চয় ]—

বিশ্বাস—[ যাগত ] উঃ কি সহ্যানী—[ how she  
doped me ]—কিন্তু এই ছেলেরা—আগে কত সাধুতা—  
এখন কি পরিবর্তন—আজকালকার ছেলেরাও যেহি

মেয়েদের ভালবাসার কালের চণ্ডী—[ প্রকারে  
তা হলে ঠিক বুটো—

হীরেন আজ তাই আগেই গাব

বিশ্বাস—[ যাগত ] আজ একবারে হাতে নাতে ধরে  
এই বাণীরের একটা চরম বীমাংশ করতেই হবে।  
দীর্ঘকাল মাঝার চুল কেটে বাড়ী থেকে ভাঙিয়ে দেব,  
আর হীরেন যে রকম কেপেছে—তারই বা দেখা দেব কি  
করে—আমারই প্রেরণার তার এই দশা—[ poor soul ] I  
pity him [—দুটো class আছে—তা বাক, লজ কাক  
ফেলে রাস্তার ঠিকিরে থাকবে—সবে সবে যাব—  
লুকোবার chance ও পাবে না। ( প্রকাশে ) আমি তবে  
চললাম হীরেন—কাল—কলেজে—দেখা হবে—

হীরেন—আজ্ঞা—নমস্কার—

( বিশ্বাসের প্রস্থান )

কিন্তু সত্য কি ভাগবাসে না—তাই কি—[ just a  
fancy ]—খেয়াল—না কখনও নয়।—কিন্তু পাঁচ বছরের  
খানী—[ দুই খানী ] নামের অযোগ্য—অনন খানী—  
তাকে ঠিকানই স্বাভাবিক।—যুগ হোক। যা হয় হবে  
কিন্তু আমি তাঁকে ভালবাসি নিশ্চয়ই।—সবর আর  
কাটতে চার না,—কি করি—আজই তাঁকে বিজ্ঞাসা  
করতে হবে—[ final ] একটা জবাব চাইই চাই,  
—বিশ্বাস যাবুর্ ধারণা ছল নিশ্চয়ই ( তাবিত্তে তাবিত্তে  
হীরেন ভিতরে চলিয়া গেল )।

( ক্রমশঃ )

## যতীন মুখোপাধ্যায়ের পূর্বকথা

জিগলিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

আজ আমার মন অনেক-সাগরে ভাসিতেছে। আজ  
আমার বন্ধু যতীনের সম্বন্ধের জন্ত আমি আপাকে বক্ত  
মনে করিলাম।

আমি আজ ৪০ বৎসর বঙ্গদেশে বহিয়াছি; মধ্যে  
মধ্যে সেখানে যাই; কিন্তু এই ৪০ বৎসর বাহ্যে আমি আমার  
বঙ্গদেশের বহুদেশের বহুদেশের বহুদেশের যতীনের বহুদেশ-  
প্রীতি ও শাস্ত্রিক ও মানসিক বহুদেশের কথা বলিয়া  
আনিতেছিলাম।

আজ দেখিতেছি যে, সারা ভারতবর্ষ বীরের পূজা  
করিতেছে। যে দেশ যত পরিমাণে যথার্থ বীরের  
যথোচিত-আদর অভ্যর্থনা ও পূজা করে, সেই দেশই তত  
ঈশ্বর সন্তোষের বহুদেশের পথে প্রতিষ্ঠিত হয়।

যতীনের শুধু পদাঙ্কজ্ঞার বিবেকে যে অসাধারণ সৌন্দর্য  
ছিল তাহা নয়। তাহার বহুদেশের মনো বাণ ছিল না।  
সন্তোষের অত্যাচারের বিরুদ্ধে যতীন যুদ্ধ করিত।  
যতীনের বহুদেশের পথে যুগ যুগী ছিল।

আদি নিম্নে এক অত্যন্ত বড় ঘন করিতেছি যে, ১৮৯৭-১৮৯৮ ও ১৮৯৯ (কলকাতা) এই তিন সাল বতীনের সঙ্গে একত্র ক্রন্দন করলেও বঙ্গবাহনপায়ে ব্যায়াম করিয়াছিলেন।

আমার সঙ্গে বতীনের গাঢ় প্রণয় ছিল, সেই জন্য সে আমার সঙ্গে এক সঙ্গে ব্যায়াম করিবার অত্র তখনকার অধ্যক্ষ (Principal) W. Billig সাহেবের কাছে বেসে বিশেষ অমুখতি সহ্য করলেও ব্যায়ামপায়ে (Gymnastic class) এ জড়ি হইয়াছিল। বতীন A.V. School-এর ছাত্র ছিল বলিয়া এই অমুখতির প্রয়োজন হইয়াছিল।

তখনকার ব্যায়াম-শিক্ষক (Gymnastic master) ছিলেন শ্রীমত যুগেন্দ্র নাথ বঙ্গোপাধ্যায়। তিনি যে কত যত্নে অধ্যাপনিকের ব্যায়াম শিক্ষা বিস্তারিতেন তাহার কথা আর বলিতে পারি না।

তখনকার বিখ্যাত স্ট্রিক ক্লাসে শ্রীমত যুগেন্দ্র নাথ বঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীমত অনাথ নাথ চট্টোপাধ্যায় (বতীনের বাহুল্য), শ্রীমত মলিনকুমার চট্টোপাধ্যায় (বতীনের বাহুল্য) শ্রীমত কালীদাস ভট্টাচার্য্য, শ্রীমত চারুচন্দ্র বসু, শ্রীমত ভবিনী কুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমত চিত্তরঞ্জন যুগোপাধ্যায়, শ্রীমত শিবদাস ভট্টাচার্য্য (গোরাঙ্গী), শ্রীমত শিবদাস ভট্টাচার্য্য, (নন্দীপ) শ্রীমত সুসিংহ ভট্টাচার্য্য, শ্রীমত চুনীলাল যুগোপাধ্যায়, শ্রীমত কিতীশ চন্দ্র বঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীমত গঙ্গেশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমত নরেশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমত কলিচন্দ্র বঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীমত বেবেজনাথ বাগচি (পরে হাইকোর্টের উকিল), নরেন্দ্র পাল, বিদ্যুতি পাল, সত্যীন্দ্র পাল, হরিপদ যুগোপাধ্যায় (হুইটম), যোগেশ পাল, শ্রী পাল, বন্দু পাল, বন্দু গাতিডী, ক্ষেত্রব্রত চৌধুরী, মলিন ব্রত চৌধুরী, জ্ঞানেন্দ্র ব্রত চৌধুরী, নন্দীপোপাল ভট্টাচার্য্য, কেদারেশ্বর ভট্টাচার্য্য, পকানন ভট্টাচার্য্য, পকানন চট্টোপাধ্যায়, বিশেষ যুগোপাধ্যায়, হরি যুগোপাধ্যায় (উলা), বঙ্গোপাধ্যায় (উলা), জ্যোতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, কাব্যাপদ চন্দ্রকান্তী ইত্যাদি ছাত্র ছিলেন।

বতীনের যৌবন-কীরতের হুইট উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলিয়া উপস্থিত বতীনের পূর্বকথা শেষ করিব।

বতীনের বয়স তখন আশ্রয় ২২, ২৩ বৎসর, তখন সে Governor এর Sponographer দ্বারা কলিকাতা হুইটে ডাক্তারিং বাইতেছিল। শিলিগড়ি ট্রেনে বতীন platform-এ ধাক্কাইয়া পরীবার যুগোপাধ্যায় জীবন অবলোকন করিতেছিল। হঠাৎ তিন জন ইংরেজ-সৈনিকের মধ্যে একজন তাহাকে Black Nigger বলিয়া ডাকিয়া তাহার দরুণে দিয়া অসহ্য করে। তখন বতীন কথিত ধাক্কা ও তৎক্ষণাৎ তিনজনই এককালে বতীনের উপর আক্রমণ চালায়। তৎক্ষণাৎ বতীন তাহাদিগকে জলদ-গল্গলি করে বলে—“Come one by one” তীব্র বল এক এক করে এল। গোরাঙ্গী লঙ্ঘিত হইয়া একে একেই বতীনের সঙ্গে লড়াই করে ও অত্যাচার করেই তিনজনই পরাজয়ী হয়।

এই গেল তাহার প্রথম লড়াই বঙ্গবাহনের সঙ্গে।

অপরটী হুইটেতে বাঘের সঙ্গে। নদীয়া রেলস্টেশন কোম গ্রামে ১১ী বছর বাঘ গ্রামের মানুষ ও গরু-বাছুর হত্যা করে। সেইখানে প্রতিকার করিতে না পারায় বতীনের কাছে আসে। এক দল লোক সহকারে বতীন বাঘের সহিত লড়াই করিতে যায়। একজনের হাতে একটী গাড়া বসুক ছিল, বসুক ছোঁড়া হইল, বাঘের গায়ে লাগিল না। তখনই বঙ্গবাহনী সহ বতীন বাঘে সবসঙ্গে পরাভব করিল। বতীন পরাভব করিল না বেবিয়া বাঘ বতীনকে আক্রমণ করিল। বতীনের হাতে একখানা বেগানী তোলা ছিল, তাহার সাহায্যে আর আঘাতী ক্ষত-ক্ষতির পর বাঘটী নিহত হয়। বতীনের সর্বাস্ত-বিস্ত হত, উক হুইটী বিশেষ আহত হয়। এক ঘণ্টার মধ্যেই ১০৬ ড্রিগি অর হয়। পরে কলিকাতা বেডিকেল-কলেজে ৩ মাস থাকার পর পুনরাবস্থান হয়।

উপরোক্ত হুইট ঘটনাই আমি বতীনের মুখেই শুনিয়াছি।

# বিদ্যাম্ভত।

শ্রীবিজ্ঞানব্রহ্ম মজুমদার



ভরত বই, খাতা, পেনসিল, কলমখণ্ডা উইলকট ইণ্ডিয় টেলিফো  
লগাইয়া দিয়া বলিয়া উঠিল, বোজ-বোজ-বোজ আঘাত পড়ায় সদয়  
আশ্বাসন করবে তোমরা, আমি লেখাপড়া করবে তখন ?  
হাও, আমি পারবো না।

মা তালিয়া বলিলেন, তা বললে চলবে কেন বাবা ? ঘরে  
এক হস্তি করল নেই, উলুনে আঙন দিতে পারছি নে, আঙনের  
ভাত লোক কি ক'বে বল ? লক্ষী মার্কি আমায়, সোনা আমায়,  
খলোটা চাতে ক'বে একটুবার হাও বাবা, মশলের পাঁচদেব হা  
লেব এমন দাড়, চান আমায়, ঘন আমায়।

হেসে ফেঁদে ক'রা উঠিল, মুখ বিকৃত কথিয়া বলিল, চান  
আমায়, ঘন আমায় !—বল ত' বলি খালো, এদিক আমায়  
সমস্ত সবাকটাই দাখি। পরত ছুঁতটা করলার দোকানে ডিউটি  
দিয়েছি, কাল সবস্ত সকাল কাপড়ের দোকানে ডিউটে দাঁড় করিয়ে  
কাটালে, আজ সকাল না হতেই খলে ঘাড় করলার দোকানে  
দাঁড়াই বে। আমায় আর পজাঙনের তান নেই। আমি  
কেন কবি এইতো তোমরা চাও ?

হেসে একটু খামিয়া পুনর বর্ধিতরোয়ে বলিতে লাগিল,  
হাফ, ইজারির বেজাট সেবে বাবা বলছিলেন, ভরত যে  
এত খাবার করবে তা আমি জানতুম না ! কই, সেদিন ত'  
তুনি বলতে পারলে না, ভরতকে দিয়ে সিমসাত বাড়ীর বাঘায়  
করাই, ও পড়বে তখন ? তখন ত' তুনিও পড়ীকভাবে চিতোপাশনে  
দিলির দিলে, আগছে বাবে ভাল ক'বে পড়ীকা দিও ! মা'র চাত  
চাইতে করলার খলোটা ছিনাইয়া লইয়া সেইটা বেবাইয়া বলিল,  
ভাল পড়ীকা সেবাইই বাব্বা হচ্ছে। বলিতে বলিতে এক বলক  
আজ ভায়ার চোখে ধার এক বলক তাহার কণ্ঠে লাফাইয়া উঠিয়া  
ভরতকে বিজ্ঞান করিয়া দিল। কাপড়ের খুঁট জবে করলার  
বস্তিতে দুখ চাকিয়া কোঁকটিতে কোঁকটিতে সে চলিয়া গেল।

ভরতের পিতা ভরতর অধ্যাপ্যাব্য বোয়াকের বাবে বলিয়া  
হুগারি প্রকাশন করিতেছিলেন, উঠিয়া আদিয়া পড়ীকে জিজ্ঞাসা  
করিলেন, ভরতটা অমন কীভাবে কীভাবে বিড় বিড় করছে করছে  
কোথায় গেল পা ?

পুত্রের ব্যাখ্য তন্ননীত ত্রিত ভবিষ্য পিয়াছিল, তিক্তকণ্ঠে  
করিলেন, কোথায় আবার বাবে ? করলার দোকানে ডিউ দিতে  
গেল। সত্যি ত', বাবা আমায় পজাঙনো ক'র তখন ?

একটি দিনও কি বাবা আমায় কিব গাধে পড়তে গেলতে পারব ?  
যে ছেলে আমায় মীচু কাণ থেকে বখাব দ'খি' হবে এসেছে,  
কত খেললে, কত বই প্রাইজ পেয়েছে, সেই ছেলে আমায় পড়িতে  
ফেল করলে। ওব কোথ কি, আমবাই ত ওব মাথা বাড়ি।

হঁ, বলিগা ভরতর বাবু প্রোথানোভ চইবাছিলেন, পড়ী  
প্রভামণী বলিলেন, মডালা আর কত কাল মানুষের এমন পরতক  
খোচাব করবে বলতে পারে ?

ভরতর করিলেন, কি ক'বে বলবে বল ?

প্রভামণী বলিলেন, আগে বলতো ইংরেজ পরতানী করছে ;  
ইংরেজ বিয়ের চ'লে বাঘ-বাঘা হবে ; বাঘবেধ হুর্দিকা বুন হবে।  
তা' ইংরেজ ত অনেকদিন বন চলেছে, বাঘবেধ হুর্দিকা ক'বে না  
বাড়ছে, হুগোভায়া বেগেত পাচ্ছে, না পাচ্ছে না ? হস্তম্ভাকার  
এখন কি বলছে ?

ভরতর অধ্যাপ্যাব্যও অধমিশ আপনরক আপনি ঐ প্রায়  
করিয়া থাকেন, উত্তর পান্ন না ; লম্বা অমীয়াসিতই থাকিয়া  
হাও। একপেও সেই কথা বলিলেন, কি ক'বে বলবে বল ? ও  
সব হচ্ছে খাটীর ব্যাপার, বড় বড় কথা, আমায়ের কি লাগে যে  
বুঝি।

তবে ছাই বোজ আকিল-কে-ত পার্কে পার্কে বাঘানে বাঘানে  
বাঘচক্রেয় কণিষ্টক্রেয় মত ভর ম'র বেড়াও কি করছে ?  
ভর বাবীরতাবে ভর, ভর পাতী মহারাজাব ভর, ভর বেহেবকীর  
ভর, ভর কংগ্রেসের ভর, ভর নর, নীল, পখাশের ভর, ক'বে  
হাততালি দিয়ে বেজাতে লম্বা ক'বে না তোমায়ের ?

ভরতর হস্তানতাবে করিলেন, তা বা বলছ ! তবে কি জান  
দিখি, হাততালি বলা হওয়া ত সম্ভব নয়।

আজ্ঞে মশাই, সেটা আদিও জানি। তিন মাস দুখ মুখে সব  
কবি নি ? তুনিই বল, একটু কথাও কি বলেছি কোন দিন ?  
হাততালি বলা আভব্যাপ্যগুলোই হতে থাকে, সেটা আমায়ের  
জানা আছে। কিন্তু তিন মাসের ওপর গোয়ে গেল তোমায়ের  
হাসরাজা হয়েছে ; বল তুনি, কাপড়ের দোকানে একখানা কাপড়  
পেয়েছ ? একখনি একসঙ্গে বন সেব করিয়া পেয়েছ ? একটি  
পরগা মাছের দাব হয়েছে ? বল বল, টাকার এক সেধ দুখ পাঁচ  
পোয়া হয়েছে ? লম্বা কুঁবে না তোমায়ের জাতাবেধ, লগা-ভঙকা  
বকুতা দিতে ? মর্দনরাজা সেবা করবে, নিরকরার হুর্দিকা

হুতাশ, হুত্বাশ সৈন্য হুত্ব করত। পত্নীর কণ্ঠে যিহায়েল কহত।  
এই সব ব'লে ধাত্রা দিয়ে বোকাতে তাহের সন্মার কান্দার হয় না ?  
আর তোমার কি, তা'ও বল ? তোমার কি আশুপ, না ভোজ্য  
পাল ? ওহা ব'ল দিয়ে তা'ওতা বাড়বে, তোমার তত সুকের  
হাতি সুদিয়ে 'বন্ধ-বন্ধ' লয়ে 'কর কর হুত্বাশ বন্ধ' ক'রে  
বেড়াবে ? হিঃ হিঃ ! তোমাদের পলার সেবার বাড়ি জোটে না  
কেন, আমি শুধু তাই ভাবি।

কল্পা প্রিয়বলা কোথা হইতে বলিয়া উঠিল, না, তিনদিন মাথার  
ভেল দিয়ে পাইনি, আর নারকাল তেল না হ'লে কি তাল  
হবে না, তা বলছি।

ঐ যে জঘন্য ঐরাবকে বল না ! যেহে উদ্দেশ্যে এই  
কথাগুলি বলিয়া প্রভাবতী বৌ ভাঁড়িয়ে-খুঁচু ঢুকিলেন। জঘন্য  
কন্যাকে দিভাগ্য করিলেন, হ্যাঁ যে প্রিয়, তোমার কলহ ব'ল হবে  
করে ?

১৩ই কলহ হয় ছুটি হবে। বাগ, একটু তেল খোপাত ক'রে  
বাগ না বাক : এক বাগ চুলে যে কট পড়ে গেল।

কত লোককে ত ব'লে খেপেছি না ! সাগ্নাই-আলিঙ্গ  
লোকের হাতে পাবে বহুতর কহর কবি নি : কিছ না—

যেহে বলিল, বাগা আঘাতের ইতিহাসের শিক্ষক শুধু ব'ল  
কিছ একটা মন্তব্য প্রবন্ধেই।

কি ব্যাপার ? শিতা প্রবন্ধ করিলেন।

প্রিয়বলা কহিল, তিনি খুব বাক লোক। ইতিহাসের  
চরিত্রের চরিত্রের পর বলতে তাঁর আর জোড়া নেই ! তাঁর  
খটোটা স্নায়ু খুব আঘাতেরই কাটে আঘাতের। এখন তিনি  
বললেন একটা বাঁধা বলবো, যে মেয়ে বাঁধার উত্তর দিতে পারবে,  
ক্রিয়ামগ্ন পত্নী না বিলেও তাকে তিনি পুরো উত্তীর্ণ-সম্মত  
দিয়ে দেবেন। বাঁধাটা হোল এই :

“বোকানে বামানে একটা বোকা নারকাল তেল পাওয়া যায়  
না। মাথা খুঁড়ে মরলেও না। কিছ বাসালী জাতি একমাত্র  
এক নরকপ্রের শির-নির্ঘর্ষ কোকো-লো ও কোকো-পুত্ৰী থেকে  
কোকো-হুঁড়ি, কোকো-হুত্বাশ, কোকো-কটাকাশি, কোকো-  
হাশমজারী পর্যন্ত হাজার হাজার বকমের নারকাল তেল  
বোঝ যায় হচ্ছে, বোঝ বামানে আছে ; কিছ কোথা থেকে ?

প্রভাবতী হুত্বাশ প'ল কবিত্তে কবিত্তে কবিত্তে প্রকাশনানা হইয়া  
কহিলেন, প্রিয়, তুমি তোমার বাঁধার মনটাকে জিজ্ঞাস করিল আবার  
যায় ক'রে—কলার বোকানে কিট দিয়ে মাসের পরমো দিন  
একসের ভাঁড়ো আবার কিনতে পাইনে। জঘন্য পত্নী পাত্তী,

বোমের পাত্তী, ঠোকা পাত্তী খোকাই করল। বিনগত পাত্তার পাত্তার  
চার পাঁচজন বাম হেঁকে হেঁকে, লোক লোক লোক বিক্রী ক'রে  
বেড়াচ্ছে কি ক'রে ?

তত লম্বা লম্বা বহুতর পাত্তী পাত্তী পাত্তী পাত্তী পাত্তী  
পাত্তার কান্দে বাকি কলার খলো ! কলিয়া দিয়া উপরে উঠিয়া  
গেল ; বলিয়া কল, আবার একটা খটোই নষ্ট হোল। বহুতর  
কল্যা পেল, তিন না লোক আবার মত দিবে গেলো।

তিন চার বা পাঁচ বিলিট কাহারও মুখ দিয়া বাক্য বাহির  
হইল না। পলিগবে বহুতরমিতী কহিলেন, কাড় দাও, কাড়  
দাও পাত্তীমতায় মাথায়।

কল্পা পিতার মুখপানে চাহিল : পিতা বহুতর পানে চাহিলেন  
কিছ সাহস করিয়া বৃত্তিই ব'লে পানে চাহিবার সাধ্য কাহারও  
হইল না। তিনি অপ্রতিহত প্রকাশে প্রকাশনানা বাকিয়া  
কহিলেন, নাও, মাথায় জল দিয়ে একবার বোকানে দিয়ে তেল  
তাড়া হোক চর্চি তাড়া হোক বাবার কিছ তিন দিয়ে এসো।  
হেলে মেয়ে হুটোর হুত্বাশ-লোক আছে, হিঃহিঃ আশি বহুতর  
হবে ত।

কর্তা সন্তর প্রবন্ধ করিলেন,—জল টুপ—

পুষ্টি করিলেন, না, বাক্যায় লগো প্রভা-বামনীর হাত-পা  
ভলো আছে, কল ব'লি তাই দিয়ে উত্তর বহাও। বলিয়া চলিয়া  
হাটেতেছিলেন, কলিয়া আশিয়া পুনরায় বলিলেন, কের ব'লি তুমি  
সন্তর উত্তর হাবে কি ব'লেবো বাগতে লর বান ঐরাব সীতাম  
কববে, তোমার সঙ্গে আমার গোলাপজা আছে !

অকল্যাগ্রে পত্নী বাগা ছিল, প্রবন্ধ পুষ্টি একটাকার একমাত্র  
কর্তা মেটে কলিয়া বিলা বলিলেন, আবার জগে হুত্বাশের মুতী  
বৌ ব'লি কিছ জানবে, ভাল হবে না বলছি। তোমাদের বাম-  
হাত্য বহুতর বাকবে আমি ব'লি শুধুনা বৃত্তি হুত্বাশ আর কিছ  
হুত্বাশ ব'লি, আমি পত্নী হুত্বাশের মেয়ে নই। পুষ্টি প্রবন্ধ  
করিলেন।

এই প্রতিজ্ঞা যে কি ভীষণ পুষ্টির দ্বারা পলিগবে উচিত হইলে,  
পলিগবে জাহ্নবীমল পোক : পলিগবে, চোমাক্যবায়ী ল'লু হুত্বাশ  
বলিলে, আমেরিকা ও কলিয়া কোলাকুলি করিলেও এই প্রতিজ্ঞা  
যে ভল হইবে না, এ বাড়ীতে তাহা মতান ছিল না। উপরে  
বাহ্যায় পাত্তীমতায় ভল ও নীচের বোকাগে পিতা-পুত্রী বিলিয়া  
বহুতর পলিগবে বিশেষ প্রকাশনানা বাকিয়া যে বৃত্তিভিন্ন করিলেন,  
পলিগবে কলবিগে কের বোকাগে ট্যাগবু বিলিগবে দিবেনা কলিয়া  
লইত।



দুইটুকি কহিলেন, না, পায় নি। আর, ওর পেরেও বরকর নেই।

কেন, কি চোল ?

অবত, আর ওর ক'মন বন্ধু কাল 'কুড়' হুঁতে হুঁতে না পেতে এক চাকরিখানার লোকের সঙ্গে এসেছে, আজ হাট না নেয় তা' হ'লে চাণ্ডের সোকাশ লুট্, কড়বে।

অচল চকু কপালে তুলিয়া প্রস্থ করিলেন, লুট্, কড়বে ?

তাই বলে ত শাসিয়ে এসেছে। ওরা বলে, কুড়িউতলো তাগি ব্রাহ্ম-মার্কটে বেচে, নিবীৰ ভ্রমশোকের বলে,—নেই। তা আমি অনেক ক'রে ডবরকে বাধন ক'রে দিয়েছি। তুমি একটা 'কুড়' কিনে এসে।

যেহ, বলিয়া অচল সম্বন্ধজনক ভাবে হাত নাড়িলেন।

দুইটুকি জিজ্ঞাসা করিলেন, কি, হাড় নাড়ছে যে ?

অচল বলিলেন, ভক্ট-এ ট্রাইক্, জায়েছে মাস খালাস বক, ওসব ভালো আসছে না। তাবশ মেলের মাস-খাড়া চললে বক, ত্যেতবে—

মালগাড়ী বক কেন ?

সে জান না বুঝি। পাটগানের শব্দে মেলের হাইভার, কাগজখানা সব হুলস্থলানই ত বেনী, তাগা পাতিজালে চলে যাওয়ার লোকের অভাব, উঠিল অচল। অর্ধেকের বেনী গাড়ী কহাতে হয়েছে। কল্যা-বিজ্ঞাতেরও ঐ কাল। কলিয়ারিতে কলসার পাঠ্য-পুস্তক তবে ও'ই পড়ে আছে, গাড়ীর অভাবে কল্যা আসতে পারছে না।

দুইটুকি পল্লীরভাবে প্রস্থ করিলেন, মেলের অধিনায়—  
হোমো-চোমো—যোটা খাটনের অধিনায় সব মেল ভোমায় ?  
কলসার অস্ত্রে দেহজ্ঞ ভাঙে গোড়া ভাত ভা'ও খেতে পাচ্ছে না  
অনেক তাগা টেমিল আলো ক'রে বলে আছে ? কেন তাগা  
যেহিবে কল্যা এনে দেবে না ? ইংরেজের হাফিবে না হব তাগা  
যা কহতো তাই শোভা পেতে, স্থানীন দেশের নগরিক হয়েও  
যাযেব এতটুকু কণ্ডোজান কখাত নি, কেন ভায়েব দু'ক'রে  
কোথা হব নি ? তুমি যাযেব জব জব ক'রে মলাব বই বসিয়ে  
বাড়ী কেহ, ভোমায় সেই কই গুটিক, ভ্যাপবীর মতী মশাইবাই  
যা কি কয়ছিলেন মস্তুরে ব'লে ? তাঁরা কেন হুঁটো করে  
গাফালাব দুখা হলে সমে করে মেলের একটা ক'রে অধিনায়  
নিরে মালগাড়ী চড়ে কল্যা পলিতে যান নি ? চক্রে কুলী-ট্রাইক  
হজরে, ভোমায়ের মালী দিবে কেন বাফালাব মেলেরের ভেবে

বলেন না, এসে তাই, আমায় মাল খালাস করি। দেশের লোক  
কই পাবে, এস, আমায়ই কিনি কুলী লাভি। মদ্যমালী মেল  
খাটতেই শিখিয়েছেন আর কিছুই ত দেখান নি। গাড়ী-  
মচাওয়াল বলেছেন, চলো, মেলে খেতে হবে। মেমপালকের  
নির্দেশ, আমরা মেমের পাল চক্রে কোলে। আবার যেদিন মেল  
খালাস হয়েছে, ভ্যাপবীর বীকপুস্তকবদন চক্রে ক'রে যেহিবেছেন।  
ইংরেজও আসিয়ে ব'লে খাটিল শিখতো, গাড়ীমচাওয়ালের  
চোলাখও কাটিল মতো কহছেন। লোকের মক্ক, বাচুক, গাছুক,  
পচুক, তাঁয়েব এইটী—বলিয়া বুঝাচক্রে মকাদিত করিয়া দ্বিতীয়  
ভবনকে ভাত দিতে চলিয়া গেলেন।

অচল বসিতে দেখিলেন, তখনও কিছু সময় আছে। কলার  
পাথে বলিয়া পড়িলেন। অস্ত্রে অস্ত্রে পৌড়িতা কল্যা  
জিজ্ঞাসা করিলেন, হায়েব প্রস্থ, তোরা যা সেই গালিয়ার বই-টাই-  
কল্যা এখনও পড়েন বুঝি !

প্রিয়তমা ভদ্রিতে পাইল কি-না জানি না, কহা কহিল না।  
অচল কহিতে লাগিলেন, “মলিও চাইপায়চলো পড়েন না, ও  
হাই-তম আদ্যেব জন্মে মত, তা তনবে না ভা ! আরে  
বাপু”—কহা বক হইয়া গেল।

দুইটুকি একখানি বৈদিক লুভালপত্র চক্রে ধরে চকিতে  
চকিতে বলিতে লাগিলেন, ব্রহ্ম-ক্রাইসিস্, আনিত্রক্, “মালী  
মিকে কামজখানি অঙ্গদর কথিয়া বহিরা করিলেন, ক্রাইসিস্,  
ক্রাইসিস্, ক্রাইসিস্। ক্রুত ক্রাইসিস্, কোল ক্রাইসিস্, ব্রহ্ম  
ক্রাইসিস্, ক্রাইসিস্, ক্রাইসিস্—মামজাও এই ক্রাইসিস্ ছাড়া  
আর কথ বহিবে নে। লম্বা করে না লম্বা লম্বা বকুতা দিতে,  
লম্বা করে না বকু হাট লম্বা তিন হাত চক্রে উপায়শাস্ত  
ফিলোতে। লম্বা বকি জেগেট না মিলিতে ফিলো বীত বাব ক'রে  
বহাওক কহতে ! শেকি! দেশের বহবব কামজলোও হয়েছে,  
পোঁ-বরা, ক্যান-টাটা। কেউ ত বলে না যে বাপু, বকুতা অনবায়  
জন্মেই কি ভোমায়ের মদ্য-কিচাসন বলাই চক্রেই—খাও,  
তবতকে টাকা করি দিবে এসে, তাহ খাওয়া হয়ে গেছে।

এত অস্ত্রে অব্যাহতি পাওরা যাইবে অচল তাগা ভাঙিতেও  
পাছেন নাই। তাগাতাতি “এই যে বই” বলিয়া প্রাথমোক্ত  
হইলে দুইটুকি আবার বলিলেন, বেনী ক'রে কিছু ফিলো—  
ভোমায়ের বামবতো ব্রাহ্ম-মার্কটে ভিন্ন ওবু-টুকু পাবে কি !

যেহি—বলিয়া মশায়ে অচল প্রস্থান করিলেন।

( আগামী বারের লম্বা )

# শাস্তা রায়

[কথিতব্য]

ভেদে কৃন্দার নাগ

[টকি-হলে ভগ্নাশী, গুণ্য হুবি বৈশি, কিত যাবে যাবে বৈশিক জীবনে, সিনেমা-বিশেষের কাহিনে, গবে, ঐশে, জব বা আটবাসের চানা বানীতে চক্ষু মুগ্ধলে, যে চমকিত হনৈব পদ্যি তেলে ভেঙে, তাইই একটী নমুনা বিজ্ঞি এখনে।

যথাক্রমে-সোহে দুটি পান হুবে বিহে (একটি জবলা সবেত) বাতীরা সারনের অম, পদিসরগণা বাগানটী কোবে ভেঙে-চোষাটতে স্নিহে বসে হোলান দিলশ। হুবি হুবে হাতের আর পাতার পক্ষে এল জগা—তারই তেঁকে (জবলা ও সিগারেটের সোতাতেই effect) নিচলিখিত ছবিটি তেলে উঠল অস্ততসূর পাননে। এও সিনেমা ছাড়া আর কি?

—ডিসেম্বর ১৯৫৩]

## প্রথম পৃষ্ঠা

জান—তুবেনবাব (বৈখানে থেছি) কাল—পথের সফাল।

পাত্র—অমিতাভ চৌধুরী—

ডেড, ইন্—উতপানি হোড,—হেল-ইপন হোডেব তালভাটটার আলো বৈহিহে সিয়েল্ল পুহুদুহো একটা মালভুবি উপর বিহে। কতকগুলি চেতাবের বাতী পড়ল, সেগুলি পেলিয়ে বন্ধিহ বিহে। হানের কেত ও পতিত পাখের জনির উপর পতিতাক্র একটা কেটল (হাতালাইমখি)। বন্ধিহে কোন বৈব-বৈবীত নুতি নেই। পাত্রেরে কাককায়া অতি বন্ধ। উতপানি হোডে বিহে আলহে অমিতাভ ইকালো জাভ হুহে। বৈবদুয়ার ঘাকি লট ও নীলাত পট—পাত্রে শোটানু ত—ও মোকা—কাঁথে বন্ধুক, জান হাতেব জব, শিল্লেরে group থেকে বুল্লহে ছোট একটা জাভ, শাটের শিল্লেরে পকেট থেকে বাস হাতে ক্যামেরাটা আর কবে হালো পথ কেটে ঘনিহের দিকে এগিহে হেল। সেটলের পাত্রের একটা পাখের উপর বসল। বন্ধুটী মাগিহে আর একটা পাখ্যর উপর রেখে বন্ধিহ আলোয় উদ্ভাসিত বন্ধিহটী একটা ছবি নিল। আবার বসে ঘনিহের কাছ থেকে লাগল। জাভ থেকে চা রেলে হেল। চা পান করে অমিতাভ, একটা সিগারেট ধরালো।

প্রাক্তরের হাতে ব্যাককতের কিনাগার নিম্ন নিম্নর জনহীন এই ফেল্লের অপর্যাপ্ত হতে যেন কার অস্তিত্বের বুদ্ধ পথ কাগে এল। বন্ধুটী স্নিহে উঠে পড়ল অমিতাভ ঘনিহের চক্ষু-পার্বি ব্যাককায়া বৈব-বাব উৎক্রেত। সিগারেট তখনও পেনে হুজনি, ঐশে অমুহে একটা কুটিল সাগেব পান্যর এসে বসল একটা হাইপু—অমিতাভ সিগারেট হুহে পথে বন্ধুক তৈরী হৈ বিহে তাহ বিহে লক্ষ্য করতে করতে এগিহে এস—তার চেয়েব পড়ল অপর কোগে একটা ক্যান্ডাল পাত্র কবে ছবি অঁকিহে একঘর। ক্যান্ডালগে তলা বিহে বধ-বধে দাফা পাত্রের কবেহেরে ছাট

পাট বৈখা হাচ্ছে। পাছে পেন্ হাত কতক অমিতাভ সেবিহে আপাততঃ নম্র না বিহে পাতীটাকে হাল বন্ধুকের তলিতে।

অপর কোগে অমিতাভ চৌধুরী বন্ধুকের পক্ষে চক্ষু উঠলেন চিত্রকাহিনী শক্তা বাহ। তাহার উক্তিভা কৃতান্তি উল্লাসে নীত্যাবধা পত্রী উৎক্রেত হুটে হেলো পাত্রার বিশ্বালান্—এই নির্জন তেপান্তরের কোগে বৈবঘনিহে লহলা একটা বন্ধক এসে ছুত্ব কবে আভোজ করবে এবং হুটী তার বন্ধক যথো পত্রী আভুকা লাগবে—এও আপা কবে নি। তাবপর ব্যাপারেট বুলতে ক্যান্ডালের আভালের এ পাত্রে চোখ দুটি বহিহে বিকণ কহতে হুর্জন অমিতাভর সঙ্গে পাত্রার চোখাচোখি হৈ হেল। পাত্রা ভাবলে, হলে “বৈবত আপনি, অপর ছোট এসে ঘাট্টা ঘনিহানে অসহা পাতীটাকে দেহে কি বাহাট্টাই হৈখালেন? বাঘ ভাঙ্ক কি পেচাল হনিহ হত, বুদ্ধভাব। সাধারণ একটা বিহুদ্ব, কিং বহ না কিহু—অপর্যাপ্ত পুঙ্খের পক্ষে হুটী কবা বসতে ভব লক্ষা এল।—আগুন মনে যেন নিতান্ত অকমনদের ভাবে perashি চালাতে লাগল।

অমিতাভ হেললে ঘেরী হুদ্বী, দৌরাখী অম কৌকায় হুদ্বানিও যব নহ—যেন কোথায়—বাগকাগে, ক্যালোগে বা কোন নিম্নপ্রেরে বাতীতে অথবা কলকাতার ঐশে হালো এই বন্ধক আলোের হুবি বৈবহে। অমিত, সেবহলে সের্টেট এক ঘনে একটা নীমুতি ফেট, কবে হাচ্ছে—যাকে যে বন্ধুকের পক্ষে চক্ষু উঠেছিল তা বৈখা বাবে না। পান থেকে বাগ্যা পিও-নিহে বন্ধিহে হাওয়ায় প্রজী বুদ্ধভাবিহ কানো পাপে সোলান হুজলেব বন্ধক সোপার পত্রকাটা কানখালা চিন্ চিন্ কহে—বৌহ পড়ে। অদির ভাটী ভাল সেগে সেল মেয়েটিকে।

পাত্রা খেট, কবে হাচ্ছে—উক্তিভা কৃতান্তি অমিতাভ পাতীটাকে বিহে বাজ। পাত্রা একে হাচ্ছে হটে কিং জাব

ঘনটা ভিতরে পুরুষের সাঙাব উজ্জ্বল অশ্রুতব হচ্ছে—মনে কোন থেকে আর একটা মন কাছে ছেলেটি কিছ বেশ গায়ার (সাঁট) ত, বড়লোকের ছেলে, নীকারের সব আছে আবার—লুকিয়ে থাকতে লাগল—অবিত্র তখন মজা দিলে কিবে। ওর হাতেও ক্যামেরাটা শাফার চোরে পড়ল—‘হ্যাঁ! বেশ ছবি তোলায় সব আছে’ তা! (আর একটু ভাল লাগল) ‘আঃ কেন ‘যেহে ফেচ্’ করে যাবি—ছেলেটি ত এক নিমেষে কটো ফুলে নিয়ে যাবে।’ ‘নাঃ! ক্যামেরা দেখলে কি আর ফেচ্’ করতে মন চায়?’—কিছ কি অশ্রু নীলীভূতী—ভাবতে তারিক করতে হয়, ছবি একে নিয়ে গেলে ওবাবে আট-কলেক তাই’ প্রাইজ দিল।

শাফার আঁকতে আবার চিলে পড়ল—দিক্‌কথালে শাফারের মুস্তের দিকে তাকিয়ে আবার ভাবতে লাগল অশ্রুতব কথা—‘তাব হালা নীকার-হাটেই কটো ফুলে দিয়েছিল ও সেরা ফেড করে এনে দেবার প্রাইজই পেয়ে গেল—কিছ পুরুষবীরী খেলেন কোথায়? জুতার সব শাফি নাও? ... হাচ্ গে—অফল ইওর ওর বেশিন। কিছ বাসিন ভরলোক নিচ্ছ—নীকার ত পড়ে বেরে—পাহুয় আগলছে। কাব নীকার কে আগলায়—জাকি ওটকে—চলি, আর বেরী করে লাভ নেই—বচ্’ কথা হবে যাচ্ছে,’ ডাকল ‘পাহুয়। ওর পাহুয়, আর—বাতী চ. সে এটা যাতে নে।’ ‘হু হাইচি বিসিবি’—অস, কিছ পাহুয় আদবাব কোন উত্তর কল না—সেই যাবি বাওরা পাখীটাকে নিয়ে পড়ল।

একিছ অমিত বসিবে প্রেক্ষাগড়ে যে স্থানে চিত্রকালীনি শাফা ছবি আঁকছিল, সেখানে এল। শাফা যেন কিছুই টেনে পারনি—ওকে চমকে দিয়ে অমিত জিজ্ঞাসা করল ‘এচ্’ভিউক মি, আপনাব আঁকা বের হয়েছে? অমি তা হলে আপনাব পশিমপটা থেকে নীল একটা ছবি নিউ...ভাতী পুখর দৃষ্টিটা—আপনাব সিলেকশনের প্রসঙ্গে কবহি—এইটটি সব চেয়ে পারফেক্ট বাস্প্’চার অব মি অল্’ কিগাফস্। (উচ্ছ্বাসের মাধ্যমে অনেকগুলি কথা বলে গেল অমিতাভ। শাফা কিছ অবাব না করে একটু দূরে দাঁড়াল। উত্তর না পেয়ে অমিত লম্বা গেল—রাগ্’ করল—দুখটাও যেন কেমনভর হল; হুহ পর্বোলা নেই, কাবোহাতে দাবজেইটা কোকাস্’ করতে লাগল।

শাফা সেদিকে মন না দিতে আবার পাহুয়াকে ডাকতে লাগল। সে (পাহুয়) নীকারবৎ পলিককে নীকারী পাবে

কাছে রেখে ক্যানভাস যাতে ফুলে নিয়ে দাঁড়াল। কিছ পুখরী প্রকরী শাফার হান্না সবচে কোন তদপততা দেখা গেল না, বসিত সে চট্টাব অপরিচিত পুরুষের সঙ্গে কথা কইবে কেন? কিছ মনে চল নিচ্ছ তাবাবে—হাচ্’ আলাব সিলেকশনের একটা প্রসঙ্গে পাওরা বেশ—তা, ছবি কপি একখানা চাইলে ত হয়? না! তাবাবে বেহাটা। ‘তা হোক ছবি চাই’—অস মনে বলতে বলতে এগিয়ে এসে শাফা করে, ‘সেখন কিছু ছবি মনে না করেন—আপনাব ছবি উঠলে আমায় একটা প্রেক্ষি কপি যেকোন।’ অবিত উত্তর দিল না (পোষ মিলে); শাফার দুখানা লম্বায় হাল্লা হয়ে উঠল। অমিত সেই বাপজিত মেঘবীণ দুখানবৎ পানে তাকিয়ে গেল বসে, ‘ছবি অবাব না দিউ—বলবেন—লোকটা অভভ—একবারও তাবাবেন না’ সে, আবার প্রস্তাবও করার আগনি সেন নি।’

শাফা—বেখন, বুঝাবোন ভাবে বেলোখোর পিকা আমাবঃ বাতী পুখর করে না। চট্টাব অচেনা পুরুষের সঙ্গে কথা কওয়া আমাবের কাছে অনেক বাগেব মত।

অমিতাভ—তাই নাকি? আমাব ঠিক লজ্জতণ কিনা—তাই—হাচ্, আপনি বাগ করবেন না। আপনাকে ছবি নিচ্ছ হের—কিছ কি ভাবে .সব বলে গেছেন।

শাফা—কেন আমাব লাগিবে সেবর—আমাবের বাতীতে—ওই যে দেখতে পাচ্ছেন স্থান বাতীটা—বাস্তবিক টাইলের পোল্টিকো—লালে বাতীটার পিরনে—নান ‘মানসপুবা’ ওটখানে থাকি আমবা।

অমিত—ও। বুজতে পেরেছি—আচ্ছা, কলকাতার গিৎ ডেভালাপ করে দেখব, যদি ভাল ওঠে আপনাকে অতি অবত পাঠাব।

শাফা—‘আচ্ছা, তা হলে আমি এবার গিলি, নমকায়। কুশবন না যেন।’

শাফা চলে গেল—অমিত তার বিকে দূর দৃষ্টিতে তাকিয়ে হইল। (ফেড্, আউট)

## ২য় দৃশ্য—পরদিন সকাল

ফেড. ইন্—

‘ছুরাবের তীব্রের আর—একটি প্রসিদ্ধ কতকাণ্যময় প্রভব—নির্ধিত মন্থি মুক্তবৎ—তাব তোরগনী অতি তবৎ মৃদু শিল্প-কার্যে পূর্ণ, তারই সাথে ট্রেস্, দিবে বলে অমিতাভ পড়ছে যেটা একখানা বই। অমিত যেন অজ কোন মাহুৎ—ডাকার মত সাহিত্যিক পোন্—যেন বলে আছে কুৎসব বাপনাব একটা—



পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাঠ্যমালা আর আদিব পাঠ্যমালা—দিলে কত চিত্র  
হাতা।

স্বপ্নের পূর্বে কোণ থেকে সত্যসত্য অপরূপ-স্বপ্নীয় পোষে  
স্বপ্নী পাঠ্যমালা আবির্ভাব। সে আত্ম বোধ হয় খেলাস বসন্তঃ  
কোণসম্পত্তী কুণ্ডে স্থান কল্পে এসেছিল খুঁ সত্যসত্য সত্যসত্য,  
পাঠ্যমালা কৃতান্তিক সত্য কল্পে। স্থান সমাপন করে পাঠ্য  
মুক্তকল্পে বর্ণনে এসে ফেলল কালকের সেই পীতাম্বী অটোক্রোম  
একমনে হলে বই পড়ছেন। প্রথম মনে হল সে ভিক্টর প্যারে  
মি—কিও চিনবার সত্য সত্য অসত্যকে জানতে গিলে না তব  
উপস্থিতি। হাদি হাদি মুখে বেগেতে লাগল ওকে (আত্মসে)—  
মনে বোধ তব কলঙ্ক, 'বেশ সুন্দর লাগছে কিন্তু ফেলোকে—  
পাঠ্যমালা আর পাঠ্যমালা'। আত্মা কি নাম ও? বেগমহার  
এত হুঁত তে ফেলছি—বলে কি না কে জানে!

এদিকে পাঠ্যমালা একেবারে অসত্যের মাঝে উৎস হইয়া  
পড়িলেন এবং বলিষ্ঠাও ফেলিলেন, 'নিম্নমিদি সি বাবু বলিষ্ঠা'।

পাঠ্যমার বর্ণনে ও কথার অসত্য উঠে পড়ল এবং পাঠ্যমার দিকে  
অন্য অঙ্গের হুঁত কল্পে, 'নন্দকার—একবারে আত্মকেই হুঁত  
আলোয় আপনায় বেধা পায় তাহি নি'।

পাঠ্য—কিন্তু আপনি সি প্যেবকা পাঠ্যে বধে নিম্নমিদি  
বে আত্ম আদি—

অসি—বাঁক বাঁক দিকেতে অসত্য বুলবেন না। ভাস্কর  
অসিত জৌহীকে অসত্য কই বড় একটা কল্পে হয় না।

পাঠ্য—তাই নাকি? তা—আপনি ভাস্কর মাঝে—  
(পুনঃ) ভাস্কর, কিসে আপনি? হোবিওপ্যাথি নন  
ত? ব'লে সেসে প্রত্যাহার মত অসত্য—

... বাঁক পে, হুঁত পায় বস্তু কবে? কথন—  
অসি—কি কথন বস্তু—তবু ওই ত দেখে হলে মনে হচ্ছে—  
'পাঠ্য—হুঁত প্রত্যাহার—কাল হাতী গিয়ে শুশ্রূষা, বাবা বিন  
দশক হাতীই ভিগবেন বস্তুছেন।

অসিতাত—তাতে আর কি, আপনাবের বস্তুকাতার  
হাতীতেই, বস্তুকাতারই ত? (পাঠ্য হুঁত ব'লে হাত নাড়লে)  
পাঠ্যে বোধ।

পাঠ্য—ওঃ! মো কইও অসি ইট—আপনাকে অসত্য  
কথন বোধ, হুঁত আপনি এত কথায় খেতে, হাতীসত এই টিকানায়  
পাঠ্য করেন।

অসিতাত—সিও কথন নামে থাকে? আপনাব বাবায়  
নাম?

পাঠ্য—কেন আমার নামে? ওঃ হুঁত, আমার নাম হুঁত  
পাঠ্য হুঁত নামে—বাবার নামও হুঁতে পাবেন, 'কথন অসি'  
হুঁতের বহুত নাম হুঁত, এ্যাড্‌ভোকেট, হুঁতকোট।

অসিতাত—বেশ, পাঠ্য হুঁত—আদি বেগমাইক, ক'বে  
নিম্নি—পেশিল হুঁতিলে হুঁত নিম্নি—

পাঠ্য—আত্ম, আপি ভট্টব জৌহী—জোন্ট, হুঁতকোট?  
অসিতাত—হুঁত, নিম্নি, হুঁতকোট (হুঁতকোট)

হুঁতকোট, পশ্চিম পশ্চিমের দিকে চেয়ে হুঁতকোট হুঁতকোট  
পাঠ্য কল্পে। পাঠ্য হুঁতকোট থেকে লাগল—অসিত হুঁত হুঁতকোট  
তাহার পতি বেগমিল। তাপ হুঁতকোট হুঁতকোট হুঁতকোট  
হুঁত—অসিতকথনি পিঠি হুঁতকোট আত্ম—আত্মের হুঁতকোট  
পাঠ্যকোট। পাঠ্যের আত্মকোট হুঁতকোট পাঠ্য হুঁতকোট  
হুঁতকোট হুঁতকোট এল, পাঠ্যকোট হুঁতকোট কল্পে "বাবু, আপনকার  
হুঁতকোট হুঁতকোট হুঁতকোট হুঁতকোট"। অসিত তাহ পকেট  
থেকে ব্যাগ হুঁতকোট একটা কাঁচ ও হুঁতকোট হুঁতকোট। ওহ  
হুঁতকোট হুঁতকোট Crocin-এর মিটাডেল, বেশ, (ফেট, আউট)  
হুঁতকোট পায় পেল।

ফেট, ইট—  
পাঠ্য হুঁতকোট পাঠ্যকাট হুঁতকোট হুঁতকোট—  
Dr. Amitabha Choudhuri, B. Sc., M. B.  
Late House Physician, Medical College,  
3/3 A, Ritchie Road, Calcutta.

প'কে কি তাহতে ভাবতে জানার ভিতর হুঁতকোট হুঁতকোট  
কাট্টা ফেট, আউট।  
ওহ হুঁতকোট—কথন হুঁতকোট।

ফেট, ইট—জ্যোত্স্না হুঁতকোট কটক বেলকোট হুঁতকোট। হুঁত-  
প'হুঁত ভাস্কর অসিতাত, এক হুঁতকোট হুঁতকোট আত্মকোট হুঁতকোট, অপর  
হুঁতকোট হুঁতকোট হুঁতকোট, পূর্বা একজেনেবের মত অসত্য  
কথন। হুঁতকোট ক'বে হুঁতকোট পড়ল। প্রাটিকমেন্টে কথিত ক'বে  
ও হুঁতকোট ক'বে হুঁতকোট এল। হুঁতকোট হুঁতকোট আলোয় অসিত  
যেন বেগমিল পেল। ইটকোট কথনকোট পাঠ্যকোট হুঁতকোট  
হুঁতকোট।

হুঁতকোট হুঁতকোট ওহ হুঁতকোটকোট, হুঁতকোট, বেজি অসত্য হুঁতকোট  
হুঁতকোট হুঁতকোট হুঁতকোট। হুঁতকোট হুঁতকোট হুঁতকোট হুঁতকোট  
হুঁতকোট অসিত হুঁতকোটকোট পাঠ্যকোট ইটকোট কথনকোটকোট উঠ  
পড়ল এবং হুঁতকোট হুঁতকোট 'ইটকোট লই আপন' এই—ইটকোট  
হুঁতকোট না—কিও পাঠ্যকোট কথনকোটকোট অসত্য হুঁতকোটকোট  
উল্লেখকে কথনকোট হুঁতকোট—তাহা হুঁতকোট হুঁতকোট হুঁতকোট।

শান্তা গলাব স্বর শেরে চোখ তিরিয়ে দেখে বনজার ঝড়িয়ে  
অবিত্যত—হুইজন কুসী—তিড়ের বাকের হুড় ক'রে তার নিকে  
এগির আলোহে। কেউ আউট—

কেউ ইন্—

চোখের আলোর উজ্জ্বলিত পৃথিবীর নুকের উপর দিতে, শান্তা-  
পাশা, কন, শাকো, নলী, গিহিলাপা, তৎকাহিত বনজুদি, শত-  
ভাবনা উপত্যকা বা কন বালকুনি ভেন করে স্তম্ভবেগে বাহমান  
ঐশ্বর্যনি। যাবি বিগ্রহত, ইকায় চাপ কল্যাণিমটো বাতীপূর্ণ,  
অনেকেই বহুকায়ে সন্ত, শান্তা হুয়ার নি, ওয় বাবা-ক, জাই-  
বোন সকলেই নিগ্রিত বেক বখল করে—দুবাকদকোণে সেকের  
মাথাব নিকে উপস্থিত শান্তা, আন টিক সেই ভাবে উপস্থিত শব্দে  
বেকটোতে অবিত্যত। ঐশ্বর্যে পূর্ণনয়ন শব্দের আড়ালে হুপি  
হুপি কথা কইছে ওয়া।

শান্তা—আপনি হঠাৎ কটক খেতে উঠলেন ?

অনি—ভালচর ট্রেটে গেছলাম।

শান্তা—কলকাতার যান নি তা হলে ?

অনি—না, ভালচরের টিকাকো সায়েবের নিবরণ রাখতে  
গেছলাম শাকোয়ে।

শান্তা—তাই জুবনখের আর আপনাকে দেখতে পাইনি।

অনি—আপনার তা হলে সত্যিই কিরুলেন ?

শান্তা—হ্যাঁ, বাবার গুরুগাবিন্দপুরের স্কুলে ওয়ার করছিল।

অনি—ভালই হল, আপনাকে সবে আবার দেখা হল।

শান্তা—না হলেই বা কি ? তবে...যাক-গে, বলে হুড়ক  
হেলে অবিত্যতের নিকে তাকাল।

অনি—এমনি ত কতমানব সঙ্গে হুইনের আলোপ হও।

শান্তা—যেহা কি হও ?

অনি—সত্যি যেন কি হও ?

শান্তা—হও না, শাকোবতঃ টিক, তবে হওও।

অনি—যেদন আজ আমায়ের হল। না।

শান্তা—(অগ্র হস্তিৎ হয়ে) সে ত আপনি এই গাড়ীতে  
উঠলেন বলে।

অনি—আপনাকে কবিনই কি-বকম কেহতে ইচ্ছা করছিল—  
তাই; আজ এ অপহৃদীষ্টী মিস্ করতে পারিলাম না। আপনাব  
সঙ্গে সেই হুড়কয়ে যেনা হবার পরবিনই চলে আসি। সেদিন  
সকালে আপনায়ের যানলপুরীর সাধনে ঘিরে হুয়ার যতাব্যত  
কলশায়, কিত্ত

শান্তা—যাক, ওদর কথা হেঁড়ে বিন—কোথাকার কে আনি,

হুইনেরও পরিচয়, যেনা না হলেই বা কি। বলে শান্তা বাহিরে  
স্রুতিব সৌন্দর্য দেখতে লাগল। বাতাসে উত্তেজিত লাগল  
তার অলকণায়।

শান্তার বাবা কতদিন বাবু তজ্জার বোঁকে বললেন, “যুঁকি  
জুঁদাসে নি ? তোম গলা পাছি যেন—যুঁকির নে একটু।”  
বলে শাপ কিরুলেন।

শান্তা—“যুঁকি আগায়ে না, তুঁদি হুনাও, আনি টিক আছি।”  
নিজস্ব তেপান্তরী নাগের দাম্বধানে লাইন ক্রিয়ার না শেরে  
গাড়ীবানা ঝড়িয়ে পড়েছে। ওরা কথ্য বক্তৃতা করে জানুলা দিয়ে  
কখনও বাহিরেও হুড় উপত্যকা তরয়ে; কখনও বা কান্দার অঘো  
নিজস্বের সারিধা উপত্যকা করছে—কখনও বা চোখ তিরিয়ে এ  
ওকে দেখছে বা ওকে দেখছে—কখন চোখাচোখি হয়ে যাকে  
তখন হুড় বৃষ্টিতে পশপার পশপায়ের জোখের ভাবায় কথ্য করে  
হেলে হেলে আবার বৃষ্টি কেরাচ্ছে। সহযোগী যে বায় তালে,  
কেউ হুয়াছে, কেউ বকুয়ে, কেউ হুয়ত হুমান করছে।  
অনিত্যত ওয় পাইপটা বাব করে বিজ্ঞ হার হৈলে বসাতে লাগল।  
ঐশ্বর্য আবার পূর্ণনয়ন করতে করতে হুটে লাগল। তার ফাঁকে  
শান্তা ও অবিত্যত আবার কথা কইতে লাগল।

শান্তা—আপনার কার্ডে গিচি হোড address কেবলদায়,  
ওখানে আবার এক বন্ধু থাকে, কোন্ বাড়ীটা বলুন ত ?

অনি—কে আপনাব বন্ধু। কি নাম ?

শান্তা—অশোক। ওহ, এক কলেমে পড়তুম বা পড়ি এখনও।

অনি—ও। অশোকায়ের বাড়ীর উত্তরে বাড়ীবানাতেই  
অবধ থাকেন।

শান্তা—অশোককে চেনেন নাকি ?

অনি—ওহা আদিয়েছ address (টেনাট্)।

শান্তা—ও আদিয়ের আট কলেমে আঁকা দেখে।

অনি—আপনিও তা হলে কলেমে অব গৈতিং আটলে আঁকা  
দেখেন ?

শান্তা—হ্যাঁ। সেই লজই ত আপনাব কাছ থেকে করে  
ভিকা করছিল।

অনি—অশোকো বেশ ছবি আঁকে।

শান্তা—হ্যাঁ, আঁকে, তবে সব সময় আমাকে বিট্ কর্তে  
পারে না।

অনি—তা হলে, তবে ওয়েব যবে-যেবে ওয় আঁকা ছবি  
বেঙলি কোলে লেঙলি ত হব নয়—

শান্তা—ওদর—যাক-গে। কি আনলে তজ্জবাল বক-ছি—

কেন্দ্র, কেন্দ্র, টাঙ্গের আলোর পাহাড়টায় বেলে বাসিন্দা নবীজী  
কেন্দ্র ডিক্ কব্জ—

আমি—সেখোবিতা তবু আটটি নন, কবিও বোধহি।

শাস্তা নীহর (মনে মনে বোধ হয়) 'না সেমিওমা আমি  
নাবী দাস'

আমি বলে—'কিছু ডাক্তার লাহর আমি—কবিও আর আসে  
না'। গাভী এতটা বড় জলসে খাল, ওয়াও চূপ। অমিতাভ  
কুই পেয়েলা চা কিছুল—এক কাপ অকার কল পাঙ্কাক—  
শাস্তা চাভ-মুখ নেচে আপত্তি করা সবেও তুলে দিলে ওষ চাভে  
অমিতাভ। পুই চাভে চুপে চুপে খেলে চা। চাভে কাপ ও  
পদল নিয়ে সেল চা-ওলা। বহীন বাবু চাভে সফল চাভাভে  
অমিতাভ পিছন ফিরে বলল—পাইপটা আর একবার' ঘনির্  
চকু নিরীক্ষিত করে চান্দার দিলে হেলান। শাস্তাও এবিধ  
কিবে হেশান কিবে দুনাযা ভান করলে। ইজিন হুইস্ দিলে,  
গাভী আবার চাভে আলোর পৃথিবীর বুকের উপর ছুটতে  
লাগল।

কেড আটট

[ কিছুদিন পরে ]

পরে দূত (৩র্থ)—হান—কলিকাতার পেল অর শেকি:  
আটস। কাল—গোপুণি ও সফাও দিলন সময়। কলেভের প্রাটজ  
ডে—ডলে সফা বসবে—কোতলাই বাবুদলিত ছাত্রকারীসেব  
হাতে আঁকা ছবিও প্রদর্শনী—কলেভন ডব্রলোক ও বহিলা  
ছবিগুলি দেখিল। তাৎ যতো দেখা সেল—

কেডইন—ডাক্তার অমিতাভ চৌধুরী (হুটি শাস্তারী ও  
মাত্রাজী উজনি পঠিত) নিপালক পুটিতে পুটী ছবি খিলেব  
ভাবে লক্ষ্য করছে। সঙ্গে বঙ্গ (ওষ সন্যাসী, অশোকার ভাট)।  
চিত্র দুটিকে স্বর্গাঙ্কর শেষ আভার বেশ এক শতে অতি প্রথম  
বোঝাচ্ছে। তাৎবে নিজে সেবা স্বাক্ষর 'নটী নাচে আপন  
বোঝাচ্ছে' 'বর্জ্য কর্তৃত্বের' শিল্পী 'শাস্তা দাস'

অমিতাভ বুঝলে তার কোটো পাঠাৎ পর সেই মাত্রারাই  
বোঝল নটীভূমি ভারী লক্ষ্য করে এঁকেছে শাস্তা—কিছু পরে  
ছবিতে তার বুক দুই বীপনেব আভাল সেলে দুইভেঁবে জড়।  
মন হল বেন ও নিজেই ঝাঁপিয়ে অকোছে। আনটোমির জুল  
বাকুলেও কি প্রথম ইজিত। আকাশ বজ্রের খাট ও খাতি  
হাট-প্যাট পরা একটি বুকের, চার্টে বন্ধক, লক্ষ্য করছে একটা।  
গম্ভীর পানীকে—বাতাসে এলো বেলো চরয়ে তার অলক্ষিত  
কেন্দ্রায়—লগায় সিধে কথাল। পিছনে সুপে ছাখ—নাটে

পকেট ভাঁক নায়েব কামেমা—পায়ে চেবু কাটা বোঝা ও  
ট্রাপ হা। অমিতাভ দেখলে বেন ওই ছবি, মাজিত ভাবে  
রূপ বোধে প্রাণে পেয়েছে শাস্তা। ও বোধতে লাগল, হুয়ালতে  
লাগল, তার শব্দ সেল গভীর হয়ে।

বঙ্গ পরে ছবিগুলি দেখতে এগিয়ে গেছে—চাভে এবিধ  
ফিরে দেখলে—ডাক্তার এক মনে পাঙ্কাক আঁকা ছবি বোঝে  
এক ভাবে বাসিন্দা পিছন থেকে শাস্তা লক্ষ্য করছে ডাক্তারকে  
—মুখে অর হাসি। প্রথম শাস্তাকে বঙ্গের ভারী পছন্দ  
—বোন অশোকার বন্ধু—ওয়েববার এসেছিল ওয়েব বোঝতে।  
কিছু শাস্তা পারনি, দুই পুটিতে ও শাস্তাকে বোঝিল। শাস্তা  
হাসতে হাসতে অমিতাভের পাশে এসে ঝাঁপিয়ে মিচ্চালা কল  
—কি বোঝেন মিটার চৌধুরী—?

আমি—বোঝাচ্ছি আচ্ছা, না ছবি?

শাস্তা—ঠাট্য করছেন।

আমি—বোঝেই না—কিছু ছবি ত এটার পাঠাইনি' মিস  
হা—এটা এত প্রথম আঁকলেন কি করে—

শাস্তা—আবার স্ফাটায়ী করছেন! (ওষ পড়বে কিছু  
মজিতাভ। দুইটে উঠল—নবাক্ষণ বাগে সুখাদুখী যেমন লাজত  
হবে থাকে)

আমি—কেন্দ্র শাস্তা দেখী, এ হস্তভাগ্যে ছবি একে মিছেই  
বোঝি নট করছেন—

শাস্তা—ট্রিক বলছেন?

বঙ্গ এল ওয়েব কাছে—অপর বিক থেকে এল অশোকা—  
স্বাক্ষরভাটী উজল ভায়া। প্রথম মুখের আবকাষী দেখে, উত্তর  
হলেন মনন-ভিত্রপট, বঙ্গকে বললে—কোটা অমিতাকে তা  
হলে ট্রিক হবে এনেছ—আরে শাস্তা! কুই—কুই এখানে যে  
বড়—

শাস্তা—এখনই—না না যে ভট্টর-চৌধুরীকে ছবি  
দেখাচ্ছিলেন।

অশোকা—তাই না কি? আবার ছবিগুলি দেখেছেন  
অমিমা?

অমিতা—না! কোথায় তোমার গলো—যেখাও—

সবাই অশোকাকে অলমল করতে লাগল। সে তার ছবি  
দেখাতে ব্যস্ত, মাকথানে শাস্তা কেটে পড়ল। অমিতা বলে 'এবার  
ত কোঁর গাইড পেলেন, এবার আমি আমি, নমস্কার'।

(পট-পরিবর্তন) কেড, ইন্—সভা বসেছে পুষ্কায়

বিতরঙ্গী। সভা বদলার ঘণ্টা পড়ল। একদিকে লম্বাঘর বহিরা, তাবপূর সমস্তে ভক্তলোক সব বলে, আর এক দিকে প্রথমে ছাত্রীরা তার গর হাটখা বলে। দেউড়ারী বিশেষ পড়ছেন। পুরুষরা ঘেরোবের বেধছিল, তার মধ্যে বিশেষ করে সখাই লক্ষ্য করছেন পাড়কে, কারণ সে মার্কি বলের মধ্যে সব চেয়ে সুন্দরী। অমিতাভ, বরণ এবং কয়েকটা ছাত্র একে ঘেরে বসেই বসেছে। শান্তা দেখেছে অমিতাভকে আর মাকে মাকে লক্ষ্য করছে অপোকাকে। আর অপোকা লক্ষ্য করে যাচ্ছে, কতবার দেখেছে শান্তা অমিতাভকে।

পূজার বিতরণ শেষ হল। আমি শুধু শান্তা 'মহার্জি কাকিবেশ' ছদ্মি মাকার মত একটি বেডেল পুরস্কার পেল।

সভা শেষ হলে ভাস সভার (বোম্ব) অধ্যাপকদের মধ্যে থেকে অমিতাভ এসিয়ে গেল পাড়াকে অনুগ্রাহুলেট করতে—

"বিসু যার। পূজারের অর্ধেকটা কির আমায় পাওনা।"

শান্তা দ্বিত হাতে বলে "অর্ধেক কি? দেউ পাং দেউ। বেডেল আপনার বাড়ীতে পাঠিয়ে দেব অপোকাকে দিয়ে।

অমি—"সেখুন অপোকা। আমার এমন কেহ নয় যে বিয়ে লাগে করছেন।"

শান্তা—"আপনার হস্ত কেহ নয়, কিন্তু আপন হস্ত তার কেউ, এটা—

এসে পড়লেন পাড়ার বাবা, বতীন্দ্রসিং লক্ষ্য করলেন 'অমিতাভকে। শান্তা পরিচয় করে দিলে "বাবা! ইনি ডাক্তার অমিতাভ চৌধুরী—"অনি সেই নরীং ছদ্মি (ভুবনেশ্বর) পাঠিয়ে ছিলেন?"

অমিতাভ, নমস্কার করল, বতীন্দ্র বাবু প্রতিনন্দকার বলে বলেন, So kind of you, ডক্টর, হাসলেন, না, একদিন আবার বাড়ীতে, ভাল করে আলোণ করা যাবে—বিশেষের দিকে any day কোট থেকে দিবে, আপনাদের সঙ্গে বসে চা খাব। শনিবার হবিয়ার বাব লবস্ত্র।

অ—"চোটা করে আসতে, সন্ধ্যা বেলা আবার হুশিয়ারিয়াল ভিকিট দিতে ১৭। আজ ত ছাঁকি বিসুয়—আবার...

বতীন্দ্রবাবু—"ঐ! রকম একদিন ছাঁকি দিয়ে আসবেন—

আর যা শান্তা—এবার চলি—মারি হয়ে যাবে। ক্রান্ত

আউট দেয়ী করে লাভ নেই—

অমিতাভ "চায়েই আসো পাবেন, তবে সাইয়েন বাবাবার ভণ—  
লাজ্জা আর্পি" বলে নন্দনার করে চলে গেল। বতীন্দ্রবাবু কতাকে লইয়া ফেরেন।

কেউ আউট—এব পর কয়েকটা বৃদ্ধ সেধিলায় বাচাব বর্ণনার কোন সার্থকতা দেখি না, একেই কেবল ছুটী ঘুরে অমিতাভ শান্তার সাক্ষাৎ, কি ভাবে ঘটেছিল তার আচ দেখে।

প্রথমটা শান্তার বড়ীতে অমিতাভ প্রথম আগমন, চা পান, বতীন্দ্রবাবু সাকেই বিশেষ আলোণন, পাড়ার সঙ্গে বিশেষ কথা বলে আলোণ করবার অনুগ্রহীনি পেল না। দ্বিতীয়টা একটা অটোবাসে শান্তার সঙ্গে অপোকা ও আর একটা মেয়ে ছিল। তৃত্বনেই চোখেই কথা কইলে, অপোকা বহক কয়েকটা মৌখিক কথা কইলে।

এব পর কয়েকদিন পরেই একটা বৃদ্ধ সেধিলায়।

বেড, ইন্—ঈনটা অপোকা ও ও ঈদান অমিতাভ চৌধুরী দ্বি হাতে তারহলে বড়ীর সামনে মাদাক্স হোচায়েব বেকিতে বলে কথোপকথন করছে—মারি শুমন আউটা সস্তর—  
পূর্ণদিকে নিত পাঠটার অন্তর্গালে চাফ উঠে পড়েছে।

অপোকা—"তোমার মত পাড়া বেশ মনে মনে পালল হয়ে উঠছে বেকলাম অমি বা।

অমি—"কি করে বুকেল ছদ্মি?"

অপোকা—"বুকেল মেয়ে মাদুল হল—কিন্তু তুমি কাকে ভালবাস বলবে অমি বা।

অমিতাভ—"কউকে না। মেয়েদের কাকে যে ভালবাসা যায় জানি না—তবে তবের নিয়ে যে দেলা করা বোমাল করা যায়, ক্রাট করা যায়, Philandering করা যায়, সেটা জানি।

অপোকা—"আমি বা। তুমি তা চলে খেলাই কর? প্রেম কাকে বলে, জান না। অথচ আমাকেই কর মাল আগে বলে ফেলছিলে যে তাৎকালে ফেলবে। কোনটা সত্যি তুমিই জান। আর বুকেল—মন বলে তোমার কোন জিনিষ নেই।

অমি মিছে বাণ্ড করা অপোকা। তোমার ভালবাসি না কি বলেছি? তবে তোমার প্রেমে হাবুহু বাব সে প্রস্ততির ত নয়। অদ্যকো বিয়াসিউ, তুমি আমার পড়ই, আসাপিতা, বাড়বী যেমন বড়ুয়ের ভালবাসি, তেমনি তোমায় ও ভালবাসি।

অপোকা—বড়ুদের মত আমার সঙ্গে মিথতে পার, ক্রাট করতে পার, enjoy করতে পার—কিন্তু আমাকে প্রণয় করতে পার না—সে দিগালি তোমার নেই।

অপোকা আর বেরে কেলবার সোপাঙ্ক, তা হয়েও নিষ্ঠুর অমিতাভ বলে—"প্রণয় কর্মসেই 'ত' সব বোমালের অঙ্গান হবে অপোকা। বুকেলার বাত তরুণ-ভকসীসেই সঙ্গে ক্রাট করে আসছে কারণ ওটা বলদের বর্ষ Natural Selection কিন্তু সেটা পূর্ণদিক নয়।

অশোক—‘হাক্, ওসব বড় বড় কথা বলিয়ে আবার তোলাবার কৃপা চোঁরা কণো না! তোমার ঘন অন্তরিক দৃষ্টিতে...বেশ দৃষ্টে পাখি...তাই বিশেষ থেকে...’

কথা শুনে নিঃশব্দিত হয়ে ‘ধগ কহ মিছে অশ’!

অশোক—‘বিশেষ থেকে এসে অবধি, তোমার কথা-ছোঁয়া পাই না, এখন বুঝছি, তুমি সূতনের সন্ধান’ পেয়েছ—তাই আমার কুলতে পাখি! কিন্তু আমি তোমার সেভাবে ভালবাসি নি। ভালবেসেছিলুম তুমি আমার মেবে মলে...[ বসতে বসতে হেঁদে ফেললে ]

অশি—হ্রি: অশ! মিছে অনেক বকম ভেবে কাঁদছ—আমার কোন ঘোষ নেই, তুমি কেন যে...

অশোক—কেন মিথ্যে, গতিটাকে চাপা দিচ্ছ—তোমার বন দৃষ্টে আমার ব্যক্তি নেই। কিন্তু জেনো, আমি অভিসম্পাত তিনু—তুমি তোমার সেই কপালী শাস্তা, সেই শোকারমুখীকে কিছুতেই পাবে না জেনে রেখো। এই আমি বলে সেলুম... প্রস্থান।

অমিত্যভ নীচের বসিরা বহিল। —কেউ আউট।

শিমন-হলে বিলম্বের ব্যবস্থা আছে কিন্তু আমার মানসকে এই লেভিত্য আমার দুঃখের লজ্জা বিধান দিল না। দৃষ্টপটে আমি শাস্ত্যকে তাহারের বালীপঞ্জের কবীর বোডের স্রবণ ব্যতীতমিঃ প্রমিঃ ক্রমে। সময় বিকাল বলেই মনে হ’ল। অমিত্যভ এল, বতীজবানুও উপস্থিত। হিন মনেই তা পান করিতেছে—বতীজবানু অমিত্যভকে তাহার মেনের, গিতার এবং সাংসারিক অবস্থার কথা মিলাজা করছেন। তারপর এমনিই উঠে গেলেন। শাস্তা ফুলের ভাগ (১২০০) থেকে একটা ফুল নিয়ে অমিত্যভের বাটনে ফেলে লাগিয়ে দিল।

এই পর কতকগুলি সীন—অমিত্যভ ও শাস্তার মেলামেলা ও প্রণয়ের আলান-প্রধান—কখনও শাস্তারের ব্যতীতে, কখনও কান্টি ইয়ার্ডের বাস্তা দিয়ে মোটরে। ওদের প্রেমের পথে, শাস্তার বাব-বা বাবা দিলেন না, ‘কারণ অমিত্যভকে ভারী ভাবাতা ভগ্ন গ্রহণ করিতেছিলেন। বতীজবানু পরিচয়ে জেনেছিলেন—ভাস্কর অমিত্যভ সম্পন্ন—কমিলাব ঘোষ চৌহুরী-বাতীঃ ছেলে—তাঁদের ঘেরে সে ঘরে পড়া সৌভাগ্যের কথা।

বতীজবানু এদিকে অমিত্যভের দাব্যকে পত্র দিলেন এই লিখে যে তিনি তাঁর কতকগুলি গ্রন্থ করল, চিরকৃতজ্ঞ থাকিবেন—তাঁদের লক্ষণ এক কালে (দশমবার বঙ্গবাহা) অভিজাত

অমিত্যভ হিল, উপস্থিত অবস্থা পড়ে যেতে, এই ভিখা চাহিতেছেন। আর উপস্থিত ওদের মেলামেলা হয়েছে—ইত্যাদি ইত্যাদি।

অমিত্যভের গিতা উত্তরে বিশেষ আগ্রহী না করে ছেলেও টিউন্স কুটীর কপি পাঠালেন এবং মেয়ের কন্যাতমিঃ বা কুটী চের পাঠালেন—লিখলেন টিউন্সী বিললে, তাঁর মতামত জানাবেন—ইত্যদ্যে মেলামেলা যেন একবারে বন্ধ থাকে।

বতীজবানু কখনও তাঁর জানা গতিত পুণ্যহিষ্টকে দিয়ে বেঁধে জামলেন যে টিউন্সী বিললে—গণও বিললে—কোনরূপ গানিচের অভ্যাস নাই। তিনি মেলামেলাতে বাধ্য বিলেন না। অমিত্যভ ও শাস্তা যোমাল সহযোগে প্রেম করত লাগল। লোক উত্তরে পাশাপাশি টাংরে আলোর বেড়াতে থাকে—অবস্থার কথা ও অকারণ—হস্তকৌতুক—হ’লেন বেশ তাহ। তাহ দৃষ্টপটের বর্ণনা নাই কল্যাণ?

অপর থেকে অশোকের তত্ত্বাধীনা কোন চেষ্টা সাহায্যে একটা অনিষ্ট ঘটে গেল। যে ব্রাহ্মণকে অমিত্যভ বাধ্য টিউন্সী মিলাতে গিগেছিলেন, তাঁকে অসুস্থ-বিনয়-বড় বকমের খুঁ এবং ইত্যাদানে বণ করে ঘোষ-চৌহুরী তরক থেকে বাহ বেগদান হ’ল যে, কুটী দিলে নাই, অতএব এ বিবাহ হতে পাবে না।

যার মশাই (শাস্তার বাবা) অনেক খুঁকিয়ে পত্র লিখলেন এবং লিখলেন তাঁর খুঁ জানা জ্যোতিষশাস্ত্রী মিলিয়ে গিগেছেন কিন্তু মমিত্যভ ঘোষ-চৌহুরী মানলেন না। তাঁহার বহাধনের পূরাতন জ্যোতিষী—পুণ্যহিত বা বসুধন তা কি ক’রে তিনি অবিবাহ করেন। কোন ফল হ’ল না।

বতীজ বানু একটা সীনে অমিত্যভকে জামলেন। অমিত্যভ একবারে নিরাশ হয়ে গেল, তারপর ঊনসাহ ফিরে গেলে বসু, সে বাবার অমতে বিবাহ করবে—শাস্তা এসে পড়ল, সেও সব জনে কোষের কোষের জলের কপটা মুছে বসলে, ‘‘অমিত্যভ প্রমত্ত’’ দায়িত্বকে বস বসতে যে এতটুকু শিষ্টপাত মনে। কিন্তু যার কিছুতেই হাতী হলেন না।

কোন পক্ষই বিশেষ সাধন প্রবল না। বিবাহ ওদের হ’ল না। অশোকের অভিসম্পাতই ফল। একটা সীনে আমার অশোক-অমিত্য একসঙ্গে হ’ল। অশোক বিবেচনার দ্বারা ত জানন্দ-বিশ্রুপ নিয়ে অমিত্যকে চমুদ করলে। অমিত্য চ’লে গেল—অশোক বুকলে অমিত্যভকে সে আরও বুঝে দায়িত্ব কেন্দ্রে—চোখ কেটে ওর এল অজ্ঞাধা, ও হাউ হাউ ক’রে কাঁদতে লাগল।

এবার অমিতাভ ও শান্তা বিবাহের দীন কতকগুলি  
অমিতাভ নিম্নলিখিতভাবে হাসপাতালে যায়, শান্তাও প্রহর কলেজ  
যায়—সাঁতারে চলে। চলেই উঠে, নিরীক্ষা। যাবে  
মধ্যেই বাবে তাহলে দেখা হয়। একদিন অমিতাভকে ট্রাম থেকে  
নাথিয়ে একদিকে বেড়াতে বেড়াতে বললে, “আজই বেধে চর দেখে  
সেখা আনিয়ে! শান্তা—

শান্তা—“অমন কথা বলো না...”

কেন জানি?

অমি—না বলে ত উপায় নেই—আমি যে মাস্টার হ্যাঙ্কি  
Gymnology, পড়ত—ওগার হ্যাঙ্কল, বিলতে যাব—  
কলকাতার কিয়তক কত বছর ধরেই হয় ত?

শান্তা—হ্যাঁ ভাল যোক করবে—আমার কথা আন ভেব না?  
কেন যে accidentally তোমার সঙ্গে জাতাবাধী মনিরে দেখা  
হয়েছিল—এখন তাই ভাবি।

অমি—তবু সেই শান্তা, আমি চলে গেলে একদিন তুমিও  
আমার জুলে যাবে। আর অপর্যাপ্ত ধন আনিয়ে দিক থেকে  
কটেছে—তার ফল আমিই ভোগ করব। তুমি কেন তার ফল  
ভোগ করতে যাবে। তুমি কি ক’রে প্রবী হও—তোমার যত  
দেহের পাত্রের অভাব হবে না।

শান্তা—অপর্যাপ্ত আনিয়ে দিক থেকে ত হ’ল। তুমি ত  
আমার প্রাণ কল্পিত চেয়েছিলে।

মাস কয়েক পরেই ঘটনা, দুব্বেশের সুন্দর প্রতিভা বাহন  
বলি-পূর্ণি এনিয়ার। হাস্য-উপহাসে মোহে হুঁত বেবে ফেল,  
ভাপান ও ইয়েকবেব মকে। তারতর্ক্যে মৃত্যু ক’রে মাস লাভ  
হয় উঠল, বহু হলে ওগার-লাভিল নিতে লাগল। অমিতাভ  
ইজ্ঞান মেডিকেল সার্ভিস বিলে, মাস্টারে ব’সেই। মাস্টার  
যেহে অমিতাভ শান্তাকে একবার মাস পত্র লিখেছিল এক একটা  
ছবি তার চেয়েছিল। উজ্জ্বল শান্তা দীর্ঘ পত্র এবং অমিতাভ  
কোণেই একখানা ছবি (শান্তার নিম্নের) পাঠিয়ে দিয়েছিল।  
সুন্দর চাকরী নিয়ে অমি চলে গেল মসুর আশালায়—জানাল না  
শান্তাকে।

এদিকে শান্তার বিবাহ বিলেন মোহ ক’রে বতীত্র বাবু।  
ফেলিও ভাল নাম প্রবী, বেশ বড়ো অসহায়ানু সবেব ফেলে—  
ভীষণ ধনেশী—এক সময় কংগ্রেস-আন্দোলনে দুই ছেতেছিল  
এক বাব হুঁত ফেলেও ছুবে এসেছে। অজবের ক্রমব চলে  
দীর্ঘ নিম্নের ফেল শান্তা প্রবীকে পত্রিবে বহন করল। এই  
বিবাহের নিম্নের-পত্র (বতীত্র বাবু পাঠিয়েছিলেন মোহ ঘর)

মোহের বাড়ী দুই, মাস্টার মেডিকেল কলেজ দুই, অতি বিলবে  
আশালা ক্যান্টনমেন্টে অমিতাভের কাল্পে পৌঁছল। অমিতাভ  
তার নিম্নের (Safety) পরিচয় কর্তৃক। পত্র পড়ে—  
বললে আমন মনেই, আগে প্রবী মনে। মাস্টার ত আনিয়ে  
মনে পড়ত না? দুই Nationalist, মাস্টার বেশ গড়ে—  
ও ছেলে ভাল, মাস্টার...বলে দীর্ঘ নিম্নের ফেললে। কিছু  
চোখে কোণ ভিলে উঠল। শান্তার ছবিখানা পকেট থেকে বাব  
কলে, মোহে, একটা দুই খেবে ফেললে, তারপর মোহ বিলে—

আমিও কয়েক মাস পরে মোহ-অমিতাভ বহু জাপানগো সেলস  
পান করা চিঠি এল অমিতাভের হাতে, যখন সে কাবুল-কতিগারে,  
তেত ক্রপ কাল্পে—শান্তার লেখা—

প্রিয়তমসু—

মোহাখন বহুত মোহাখন বহুত ক’রে উঠে, অমিতা বহু দুগা  
হবে, এই মোহে যে, পত্রী এ বহুত মোহাখন বহুত পাঠলে কি  
ক’রে? বা ইতি, মোহ! কিছু তুমি আমাৰ প্রিয় হ’তেও প্রিয়তম,  
প্রিয়তম হ’তেও প্রিয়তম। মাস্টার আমাৰ ক্রপ—পত্র ক্রপ, তাঁর  
কাছে আমি প্রিয়তম হ’তে পারি কিছু Censored তাঁর কাছে  
প্রিয়তম। মোহাখন কথা তাঁর কাছে বহুত মসুর ত পাইনি?  
বিধে টিক চিঠি দিন পর তাঁকে এম। হ’বে নিম্নের মাস্টার ফেলে।  
আমিও তিনি অমিতাভ। এখন বলে মোহে অমি। কি নিম্নের  
আমি মাস্টার? অমিতাভ মাস্টার আটটি মাস? তারপর না হয়  
নিম্নের সত্যান মাস্টার কল্পিত সত্যান মোহাখন মোহে মোহে দাব।

তবেই মোহে দ্বিতীয়বারও ভালবাসে, তৃতীয়বারও, কিছু  
তাতে মসুর লাগে, মাস্টার লাগে—বা থেকে আমাৰ ভগ্নবান  
বলিত ক’রেছে। Censored প্রেতিব মাস্টারকে আমি মোহ  
পূজা কনি, কিছু মনেটাকে ত তুমি। মাস্টার পাত্রি না। ছবি  
খাঁকা ছাফতে হ’য়েছে—মোহের বাড়ীতে বাড়বীয়া আসত, তবু  
অজবহক হওয়া যেত। এখানে তাও নেই।

মোহাখন কথা মনে এলে জানি, মোহাখন আমাৰ কিছুই নেওয়া  
হ’ল না—জানি আমাৰ “মাস্টার ক্যাঙ্কিও” ছবিটাও মোহাখন  
মোহের বাড়ীতে পাঠিয়ে গিলে হ’ত।

আম বহু একা, তুমিও সেই ক’রে মোহ, আম, মাস্টার বহিও  
মোহাখন, তাও তিনি মাস্টার—আমি তি। মোহাখন। তুমি আমাৰ  
প্রাণব নিও। ইতি—

মোহাখন—শান্তা।

চিঠি পেতে মনে হল অমিতাভ মোহাখন মোহাখন মোহাখন মোহাখন  
মোহে মনে হল মোহ অমিতাভ, মোহাখন পত্র মোহ, মোহাখন মোহাখন

দে দেশের বাড়ীতে এসে শ্রীর সন্ধ্যা। বাপ বিবাহের কথা  
পাঠালে—বিশেষ হুঁহুঃ তল না। আত্মা কংকট কি কবে,  
ওদের পুণ্যতন কোঁতিলি পুণ্যবিত্ত—(বিনি পাছার টিকুতি খেয়ে-  
ছিলে) তাঁর জীব বোকাহিত্তে অপোকার কাহলাকি এবং তাড়াত  
চড়ায়ে বস্ত্র উল্কাটন হওয়ারে একবারে জেপে উঠল অমিত।  
কলকাতার রুল, সেই তারেই অপোকারে ডেকে নিয়ে গেল পাঠে  
এই বিশিষ্টারী হেম (সেই বস্ত্র), দেহাভ্যন্তর একবারে মিষ্টারী,  
অপোকার সঙ্গে জুড়ুল কলর, তাড়াত কলে অসুস্থ অমিতাভ  
গুলি করলে অপোকারে, অপোকারে পড়ে গেল অসুস্থকারে। অমিত  
অসুস্থ। (বলু ভদ্রমি সান)

এইখানে একটা সীমে দেখলাম শাফা তার শ্রীর বাড়ীতে এক  
কবে অমিতাভ চঠাৎ কাতর হয়ে যেন এক বুড়ো ফোলে টানান  
(দর্শনকার্যকর) চকিতা দেখছে। জীল আলো জলছে অর,  
আলুখানু বেশ নিতে চেয়ে শাফা। চঠাৎ হুঁহুঃ বস্ত্র থেকে যেন  
বেঁধা বেঁধেছিলো আর লজ্জা তল কলি নিজের—ও তল শেরে শেরে  
গেল, চললে মুখখানা ওর ঘোঁষের জলে ভরে গেল।

অমিতাভ পাঠালে—কিছু অপোকারে দেখলাম অমিত, হস্তনয়।  
কুশিটালে কবে অমিতাভ নিশ্চয় মনে কবেই অপোকারে যাবে।  
(আর না মংলও আটনের চাটে ওর বকা নাট।)

অমিতাভ পাঠালে এংলো কুবেরবধে—এমন ক'দিন যুবলু  
তাড়াত কি চেয়ে একদিন গুল শ্রুতিগিরি উল্কাগিরি এল না  
সিঁরে বাগার। হুঁহুঃ কথছে চায়েই আলো, লাহরী অমিতাভ  
পাঠাডের উপর উঠল, তাৎপর্য যুগে যুগে পাথরে কাটা একটা  
আগনে বলে দেখি ইনডেক্সের সিঁহিৎ বাব কবে ডাঃ চৌধুরী  
নিজেই কবে কি (শেরে কুবলাম বিদ) Injere করলে। তাৎপর্য  
চার আবার জির নাহক, যুগে যুগে লজ্জা কথার অভিযুক্তি  
প্রকাশ কবে কবে নেতিয়ে শ্রীল—যেবে বলে। দ্বিতী কবে  
কবে বলে হইলেন অমিতাভ বস্ত্রের বেহটা—চক্রের পাথর  
কিতে লাগলেন।

যেবে চয়ে গেল আবার চোখ কবে গিনেমা দেখা, চোখ য়েবে  
বহি আবারও হুঁহুঃ দিল। ইহকালির চো-এই ডাক-পড়ল,  
উঠে পড়লার; সামনেই বহি—ওই যুগে খণ্ডগিরি পাঠাতের লাহা  
দাঁকড়া।

## অক্ষয়

ঐনুপেক্ষকুমার ঘোষ

পৌচক করিল বস্ত্রোৎসাহ,  
“হর্যের কবে বোর  
বিশেষ বারের কুনো বঁলে হার  
অপবন রটে বোর।”  
বস্ত্রোৎসাহ বলে, “বস্ত্র পৌচক,  
একথা বলেই জোর;  
সাতাটা দিল আনিও শুণিত  
আলোর বাপটে ওয়।”

সৌর কলর করিবে বাহির  
হুঁহুঃ হইল শেষে  
এমন শ্রীর পূর্ণগগনে  
হুঁহুঃ উলিল বঁলে।  
বোহে বলে শেষে কোপের আড়ালে  
নিজেদের দিয়ে ঢাকা,  
“আরও খন কোপে চল তাই, আপন,  
হুঁহুঃটা করি শাকা।”

# সাম্প্রদায়িকতা

কান্দীর-সমস্যা

বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে কান্দীর-সমস্যা অত্যন্ত চরম পূর্ণ। বিগত এই নব্বইয়ের কান্দীরের রাষ্ট্রদায়ক শেষ আবদুলা এক বিচিত্রপ্রসঙ্গে বলেন যে, বর্তমান অবস্থায় কলে যদি ভারতীয় দুর্ভাগ্য ও পাকিস্তানের মধ্যে দূর থাকে, তাহা হইলে কান্দীর উপসত্যায়ই পাকিস্তানের সমাধি রচিত হইবে।

কিন্তু দূর থাকিতে বাস্তবিকই বিলম্ব হইল না। কান্দীর সমস্যার প্রাথমিক পাকিস্তান গভর্নমেন্ট প্রথম আক্রমণ করিতে উদ্বৃত্ত হইল। ভারতীয় ইউনিয়ন গভর্নমেন্ট কান্দীরের সাহায্যে ইন্টারিয়া শের আক্রমণের প্রত্যুত্তর দিতে বাধ্য হইল। শের-ই-কান্দীর শেষ আবদুলা বলিলেন, “এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই যে, আক্রমণ-কারীদিগকে হটাঁইয়া দিবার জন্য কান্দীরের অধিবাসিনসমূহ তাহাদের শেষ প্রকল্প বিচার দ্বারা করিবেন। যদি আধাবাসিকেরা হইতেই হয়, তাহা হইলে দূর করিয়াই মৃত্যু বরণ করিব।”

কান্দীর সম্পর্কে যি: কিত্রা যে কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন, পাল’মেন্টের দৃষ্টান্তেই বল তাহা সমর্থন করিতেছেন বলিয়া জানা যায়। বঙ্গদেশের ইজ্জত, কান্দীরকে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে ভাগাভাগি করা দেওয়া হউক। পণ্ডিত নেহেরু শান্তিপূর্ণভাবে যে-সমস্যার কথা উল্লেখ করিয়া কান্দীর-সমস্যার বীমানসার পৌঁছাতে নির্দেশ দেন, তাহার নিকা: করিয়া বৃষ্টি পূর্ণিষ্ঠার সাধারণ দৃষ্টান্ত ‘ইকনমিষ্ট’ বলেন যে, এইরূপ বিপরীত ও পারস্পরিকভাবে সমস্যার প্রথম করিতে হইলে বিবেচনাইতে বহু দূর পথায়নক অবস্থান করিতে হইবে।

কান্দীরের বক্তব্যের প্রাথমিক দৃষ্টান্ত: দূর, চন্দ্র ও কান্দীরকে বিভিন্ন করিয়া দিলে সমস্যার সমস্যার একটা সমাধান হইতে পারে। দায়িত্ব অকলংক কর্তৃক সহিত ও গিলগিটকে কান্দীরের সহিত যুক্ত রাখিতে হইবে। চন্দ্র-শীল দেশের কোনো কোনো ‘ভারত-বিশেষজ্ঞের’ অভিমত

এই যে, লাবণ ও অম্লকে ভারতের সহিত এবং কান্দীর ও গিলগিটকে পাকিস্তানের সহিত যুক্ত রাখিতে হইবে। কিন্তু এটোই বহিঃপ্রাথমিক প্রস্তাবসম্পর্কে কোনো অভিমতই ব্যক্ত করেন নাই।

দিল্লীর একটি জনসভায় এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে ভারতীয় বক্তৃত্যেই প্রাথমিক পণ্ডিত অজয়নগর নেহেরু বলেন: “কিন্তু কান্দীর পূর্বে ভারতকে ছুঁনাগড়, মঙ্গ্রাল ও বাব্রী-বাদের সমস্যার আয়-নিয়োগ করিতে হয়। ঐ সমস্যা সমাধানকর গভর্নমেন্ট এখন উদ্বৃত্ত নিয়োগ করেন, এখন কান্দীরের সমস্যা অধিকন্তর গুরুতর আকারে দেখা দেয়। স্টাইল দৃষ্টান্ত দায় যে, ভারত গভর্নমেন্টের দৃষ্টি দ্বারা নিবৃত্ত দায় এবং কান্দীর-ভোগ্যভোগ্য গোপন দায়ের উদ্দেশ্যেই ছুঁনাগড় সমস্যা উপস্থাপন করা হয়। গত বছরকাল যাবৎ কান্দীর আক্রমণের জন্য শান্ত সমাধান করা হয় বলিয়া গভর্নমেন্টের পক্ষে বিশ্বাস করিবার সম্ভব কারণ আছে। উপসত্যার অঞ্চল ও পাকিস্তানের অন্তর্গত দেশের লোক-জন কান্দীর আক্রমণ করে। আক্রমণকারী সৈন্যবল আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত এবং পাকিস্তান-সেনাবাহিনীর অধিনায়ক তাহাদের পরিচালনা করিতেছে। অবশ্য ইহা সত্ত্বেও আমরা কান্দীর দৃষ্টান্তে বিনামূল্যে সৈন্য পাঠাই এবং এইরূপে গ্রীনগরের পতন নিরোধে সমর্থ হই।”

গ্রীনগরে ১২ই নভেম্বরের এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে পণ্ডিত নেহেরু কান্দীর-সমস্যার উদ্দেশ্যে বলেন, “এখন ক্রমশঃ সমস্যা হয়। এখনও আধাবাসিকের অনেক কাজ করিতে হইবে। হানাদারদিগকে বিতাড়িত করিতেই হইবে।... আপনারা যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাহার জুলা হয় না। পাকিস্তান দ্বিগুণে কি, বৃদ্ধা, আপনারা তাহার দায় পাইয়াছেন। কলং ও দায় কি, তাহার আপনারা জানিয়াছেন। শক্তির বিচ্ছেদ-সংক্রামে এখনকার অধিবাসিনের দ্বন্দ্ব-মূল্যবান দোষ। সমস্যা দেশের নিকট একটি উচ্চ দৃষ্টান্ত হইয়া রহিল।” পণ্ডিত নেহেরু



পারে ইটিং সঙ্কেতের বিলাস অঙ্গসজ্জা পরিদর্শন করেন। তিনি একটি হিন্দুগ্রন্থের অঙ্গের তিন মন্তব্যিক গুরু সম্পূর্ণ ভদ্রীভূত অবস্থার এবং বোকাশলি ও বাজারগুলি সুউত অবস্থার দেখেন।

মিঃ জিয়ার পার্সেলিওস সেক্রেটারী মিঃ কে. এইচ. গুহেশ্বরক কান্দীর বন্ধা বিধান অধ্যয়নী প্রোগ্রাম করা হয়। এতে। ইতিপূর্বেও তিনি দ্বারা আইন ভাষার অভিযোগে একবার অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। প্রকাশ, মিঃ গুহেশ্বর রাণের ব্যবস্থারবাহী কার্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

১৪ই নভেম্বর এক শক্তিশালী ভারতীয় বাহিনী শ্রীনগর হইতে ৬০ মাইল দূরে অবস্থিত উড়ি সঙ্কেত অধিকার করিয়াছে। বেশকিছু সপ্তাহের এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, ভারতীয় সেনাবল বঙ্গলা-তোমেন গ্রামের সঙ্কেতের উপরে অবস্থিত উড়ি বঙ্গল করিয়াছে। শ্রীনগর উপত্যকা হইতে অবশিষ্ট হানাদার-দিগকে বিতাড়নের কার্য চলিতেছে। উড়ি অধিকৃত হওয়ার কান্দীর উপত্যকা এখন আর সম্পূর্ণ নিরাপন্ন হইল। কান্দীর নৌগোলিক পরিবেশ : উত্তরে ও পূর্বে রুশিয়া, চীন ও তিব্বতের সীমারেখা। উত্তরে মালভূমি—যাকে 'বাম-ই-ছিন্দি', 'গুবিয়ার ছাব' বা Roof of the world বল' হয়। এই উত্তর সীমানায়ই কারাকোরাম পর্বতশ্রেণীর অপর পার্শ্বে গোবি মরুভূমি অবস্থিত। কান্দীরের দক্ষিণে পূর্বে ও পশ্চিমে পাকিস্তান, পশ্চিমে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ বা পাঠানীস্থান এবং পূর্বে তিব্বত। ভৌগোলিক হিসাবে এই পার্শ্বতা ভূখণ্ডটিকে তিন ভাগে ভাগ করা হইতে পারে, যথা: (১) উত্তরভাগে তিব্বতীয় ও অর্ধতিব্বতীয় পার্শ্বতা ভূখণ্ড, যার মধ্যে জিহ্ম; ইয়াসিন, গুনিয়াস, গিলগিট উপত্যকা, হুন্ডা, নাগর ও বলতিস্থান অবস্থিত। এই স্থানগুলি একত্রে বিজ্ঞান-সম্ভভাবে না হইলেও, সাধারণতঃ বহিঃস্থান নামে পরিচিত। (২) মধ্যভাগে হিমাচল উপত্যকা। এখানে কান্দীরের বিখ্যিত বনোয় 'হাংপালা' অবস্থিত।

(৩) দক্ষিণভাগে বহুভূপূর্ণ অর্ধপার্বত্যভূখণ্ড; এখানে বহুভূত কান্দীরের মহাদাক্ষার দীপকালীন বাসভবন

অবস্থিত। ১৪, ১৭২ বর্ষ মাইল পরিমাণের বিশিষ্ট এই রাজ্যটিতে ১৯৪২ সালের লোকগণনা অনুসারে ৪০, ২১, ৬২৬ জন লোকের বাস। লোকসংখ্যার শতকরা ৭৪ জন মুসলমান এবং অবশিষ্ট ২৬ জন হিন্দু।

শৈলমালা-সমাকীর্ণ পুণ্যশোভিত কান্দীরের প্রাকৃতিক উদ্ভাব্য প্রচুর। সাধারণ রুবি, ফলচাষ, যেমন ও পশু-শিল্পও বিশেষ উন্নত। রুবি, বন, শিল্প, আবগারী, অস্ত্র-সজ্জা হইতেও আরও বহুবিধ। লবণ, কল্যা, স্তামা প্রভৃতি বহিঃ-সম্পদও কান্দীরে বর্তমান। বহুভিহানে স্বর্ণনিও আবিস্কৃত হইয়াছে। কিন্তু কান্দীরের জনসাধারণের অধিকাংশই দরিদ্র, পোষিত, যথেষ্টমুদ্রক আহার ও পরিষ্কৃত অনেকে তাগোই ভোটে না। প্রচাপের অধিকাংশই মুসলমান। রাজ্য ভোগ্য: রাজপুতবংশীয়, হিন্দু। শেখ আবদুল্লাহ প্রভৃতি বিলিমা প্রথমতঃ এখানে একটি বিরোধী বল স্থাপিত করেন—যাহা 'মুসলিম সম্মেলন' নামে পরে বিরাট আকার ধারণ করে। পূর্বে রাজপুতবংশের অধীনে সাধারণতঃ বিশেষ কোনো মুসলমানকে নিযুক্ত করা হইত না। মুসলিম সম্মেলনের আন্দোলনের পরে কিছু কিছু নেতারা বহু বটে, তবে আন্দোলনের উদ্যোক্তা হিসাবে শেখ আবদুল্লাহকে প্রচার করা হয়। মুক্তিলাভের পর যে কারগেই হউক, শেখ আবদুল্লাহ মুসলিম সম্মেলন ত্যাগ করেন এবং সর্ব-সম্মেলনের লোক হইয়া 'জাতীয় সম্মেলন' নামে একটি প্রগতিশীল বল গঠন করেন। এত কাল সাম্রাজ্যিক ভিত্তিতে যে সংগ্রাম চলিতেছিল, অসাম্রাজ্যিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তিতে এখন এই সংগ্রাম পরিচালিত হওয়ার কান্দীরে বিপুল গণজাগরণের সূচনা হয়। প্রাণ-বলবল্লভের ভোটাধিকার, জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিগণের দ্বারা বহিঃগত গঠন, মুক্ত-নির্বাচনে প্রচার প্রবর্তন, সাংগঠনগতের অস্ত্র আশ্রয় সঙ্কল্প ইত্যাদি ব্যাপার লইয়া জাতীয় সম্মেলন আন্দোলন শুরু করে। পরে অবশ্য শেখ আবদুল্লাহ কংগ্রেসের অধ্যক্ষ হইয়া পড়েন। ১৯৪২ সালে কংগ্রেসের 'ভারত ছাড়' আন্দোলন-লক্ষ্য করিয়া শেখ আবদুল্লাহ ও 'কান্দীর ছাড়ো' আন্দোলন আরম্ভ করেন বাহ্যিক কালে ১৯৪৬ সালের ২২শে মে তাঁহাকে প্রচার করা হয়। তাহার পরের ইতিহাসের সঙ্গে আর

বিশ্ববাক্যেই পরিচিত। শেখ আবদুল্লাহ পঞ্চ সমর্থন করিতে গিয়াই পণ্ডিত জগদরূপাল পণ্ডিত কান্দীর সহকারে কু-বৃত্তিতে পড়েন এবং প্রেরণার হন। পরে তাঁহাকে চাকরি দেওয়া হয়। তাঁহাকে মহাশয় এই প্রতিশ্রুতি দেন যে, শেখ আবদুল্লাহকে পণ্ডিত করা হইবে না। কিন্তু এই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা হয়। কান্দীরের প্রধান মহী শ্রীযুক্ত হামজা কাদের বড়ই ছিল ইহার বিরুদ্ধে। এবং তাঁহার চেষ্টাতে রাজা অভিভূত হইয়া পণ্ডিত হামজা বসিরাই ক্রমে প্রবাসের পাবানল জিয়া উঠে। কিন্তু প্রকৃতির এই নিয়ম যে, সেদিনের হামজা শেখ আবদুল্লাহ হাতেই আজ কান্দীরের সম্পূর্ণ ক্ষমতা নির্ভর করিতেছে এবং সেদিনের প্রধান মহী শ্রীযুক্ত কাক আজ কারাগারে বন্দী।

ভারতীয় মুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যোগ দিয়া কান্দীর আজ তাহার ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার পথ বাছিয়া লইয়াছে।

### হায়দরাবাদ সমস্যা

রাষ্ট্রক্ষেত্রে হায়দরাবাদের অবস্থা আজ ত্রিশদূর মতো। একদিকে ভারতীয় মুক্তরাষ্ট্র, অন্যদিকে পাকিস্তান। আত্মনিরাপত্তার ব্যাপারে তাহাকে এই দুই জোখিনিয়নের যে কোনো একটিতে অন্তর্ভুক্ত হইতে হইবে। আত্ম-স্বাভাৱ বজায় রাখিয়া চলিবার মতো সংসার তাহার বর্তমান, তাহা বিচার্য বিষয়।

নিজামের উত্তরাধিকারী বেরারের সুব্রাহ্মণ্য আজান জাহ্ প্রকৃতপক্ষে হায়দরাবাদে বগুহে নজরবন্দী আছেন বলিয়া প্রকাশ। মুজিব জাহ্ দীর্ঘদিন ধাবং লগনে অভিযান্ত্রিক করিতেছেন। কারণ তিনি আশঙ্কা করেন, হস্ত তাহার ভাগ্যেও ঐরূপ অবস্থা ঘটতে পারে। সমস্ত মুসলমানের হত্যাকাণ্ডের ফলে যোগকভাবে হিন্দু বাজারে চলিয়া আসিতেছে—সাম্প্রতিক এই সংবাদে এইজন্য হায়দরাবাদের বর্তমান হইয়াছে যে, ভারতীয় সৈন্যগণ হায়দরাবাদ রাজ্য হস্ত আক্রমণ করিতে পারে।

গোঁড়া সম্পর্কে এখনও অন্তর্ভুক্ত্যের আশা পণ্ডিতা যায়। গোঁড়া পণ্ডিতা সেলে হায়দরাবাদ বিশেষ হইতে অসম্পূর্ণ আনিবার একটি বন্দন পাইবে। প্রকৃতপক্ষে

হায়দরাবাদের শাসনকার্য এখন দুইটি পরাম্পরবিপরীত বনের দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ বনের দ্বারা হইতেছেন নিজামের উত্তরাধিকারী, ইহারা ভারতীয় মুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করিয়া নতুন বজায় রাখিতে চান; সংখ্যাগরিষ্ঠ বনের নিজামের প্রিয়, নিজাম দাবী রাখিতে চাহেন এবং তিনি শেখ পণ্ডিত দাবী রাখিতে না পারিলে অগত্যা পাকিস্তানে যোগদান করিতেও চাহেন। লগনে হায়দরাবাদের অবিস্মৃত্য আশঙ্কা করেন, নিজামের মীমাংসারিহোদী মনোভাব নিজামের অভিযন্ত্রণ পক্ষে সাম্প্রতিক হঠা উঠিবে। কারণ, কান্দীরের সমস্ত সমাধান হইলেই ভারতীয় মুক্তরাষ্ট্রে এ সম্পর্কে চূড়ান্ত স্থাপনা করিতে অগ্রসর হইবে।

এদিকে নেতৃগণের প্রাণ হায়দরাবাদ প্রেটকেন্স মহলের একটি সাবধানে প্রকাশ, নিজাম রাজ্যের অন্তর্গত ক্রমাঙ্কিত তিরুতুর বিভাগের ৮টি গ্রাম দাবীমতো যোগদান করিয়াছে এবং এই গ্রামগুলি ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদানের অন্ত প্রস্তাব হইয়া রহিয়াছে।

অতএব নিজামের মনোমত ইচ্ছা শেখ পণ্ডিত কর্তৃক সফল হইবে—তৎসঙ্গে বগুহে রহিয়া গিয়াছে। ঘটনা-পরাম্পর প্রাপ্তি লক্ষ্য রাখা তির বর্তমানে আশাযের উপায় কি।

### জুনাগড়ের বিপত্তি

জুনাগড়ের সমস্ত প্রাপ্তি আজ দেশবাসী প্রত্যেকেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। যাহা মহাত্মা গান্ধী পণ্ডিত এ সম্পর্কে দীর্ঘ রাখিতে পারেন না। বিভিন্ন প্রারম্ভ-সত্য এবং বক্তব্য তিনি এ সংকে আলোচনা করিয়াছেন। সেই আলোচনার প্রতি দৃষ্টি রাখিলেই জুনাগড়ের সাম্প্রতিক ঘটনা সংকে দেশবাসী সচেতন হইতে পারিবেন। মহাত্মা গান্ধী বলেন যে, জুনাগড়ের প্রধান মহী ও সহকারী প্রধানমন্ত্রীর অধুনাগড়ের অধুনাগড়ের জুনাগড় প্রবেশের সম্ভাব্য পাওয়া গিয়াছে। জুনাগড়ের কর্তৃপক্ষের এই সিদ্ধান্তে দি কারো আশঙ্কা অধুনাগড়ের না থাকে, তবে আশঙ্কা প্রকাশ করা দি হইবে না।

স্বাধীনতার পক্ষ হইতে অস্থায়ী গণপরিষদে জনগণ দল  
কমার, পাকিস্তান-কর্তৃপক্ষ বিরুদ্ধে প্রকাশ করার এবং রাজ্য  
হইতে ভারতীয় সৈন্য অপসারণ ও পূর্বের গণপরিষদের  
হাতে শাসনকার্য হস্তান্তর দিবার এবং ভারতীয় ইউ-  
নিয়ন হইতে রাজ্য আভিমান বন্ধ করার যে দাবী  
জানাইয়াছেন, তাহাতে বিশ্রুত হইতে হয়। পাকিস্তান  
গণপরিষদ আরও বলিয়াছেন যে, রাজ্যের শাসক অবস্থা  
দেওয়ান ভারত-গণপরিষদের সহিত স্থায়ী অথবা সাময়িক  
কোনো প্রকার আলোচনা চালাইবার অধিকারী নহেন  
এবং ভারত গণপরিষদে আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গ  
করিয়াছেন।

অথচ প্রকৃতপক্ষে আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গ করা হয়  
নাই এবং এমন কি ভারত গণপরিষদে কোনো অকল  
অধিকার করেন নাই। মহাশয়াজীর মতে জনগণের  
অনুমোদনের পক্ষ হইতে অস্থায়ী গণপরিষদে রাজ্য  
করিয়াছেন, তাহা যে-আইনী নহে। সমগ্র কাবিরাসফের  
নিয়ন্ত্রণাধীন কাবিরাসফের নৃপতিদের অল্পমোটে ইউ-  
নিয়ন গণপরিষদে তাহা দিগন্তে সৈন্য দিয়াছেন। অতএব  
ইহাতে আইন-বহির্ভূত কোনো ব্যাপারই ঘটে নাই।  
এই দৃষ্টান্তই লইয়া বিচারটিকে দেখিতে হয় যে, জন-  
সাধারণের সম্মতি না লইয়া জনগণের ন্যায় সাধারণ  
পাকিস্তানে যোগদান করিতে পারেন না। জনগণের  
অধিবাসীদের মধ্যে লক্ষ্য করা ১৪ জন ছিল। পবিত্র  
গির্গার পুরুষ ও পুরুষোপরি বহিঃসমূহ জনগণ হাজার  
দশভুক্ত। এখানকার ব্যক্তিগত কোনো জিনিষই  
মুশতদের নহে। জনসাধারণের অধি হিসাবেই উদাহরণ  
উদাহরণের (জনসাধারণের) দাবী প্রতিষ্ঠিত করিতে  
পারেন এবং প্রত্যেক কার্যে উদাহরণের জনসাধারণের  
অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে। কোন দেশের রাজ্য  
কোন ভৌমনিয়নে যোগ দান করিবে, তাহা সেই  
দেশের রাজ্যের স্বাধীনগণই বিচার করিবে। জনগণের  
অস্থায়ী গণপরিষদে রূপিত স্বাধীনতার প্রতিনিধি না হয়,  
তবে উদাহরণের কার্য কাহারও দ্বারা অসম্মোদিত হইবে  
না।

পাকিস্তান গণপরিষদের মনোভাব এবং জনগণের

প্রধানমন্ত্রী বর্তমানে যে মনোভাব অবলম্বন করিয়াছেন,  
তাহাতে অবস্থা ক্রমে সঠিক হইয়া উঠিয়াছে।

ভারতের সহকারী প্রধান মন্ত্রী সর্দার বল্লভ ভাই  
প্যাটেল রাজকোট হইয়া জনগণে আসেন। বাহাই-  
দীন কলেজ-প্রাচীরে এক সভার সমবেত সম্মেলনকে  
উদ্বোধন করিয়া সর্দারজী প্রশংসা করেন যে, ভারতীয় ভারতীয়  
ইউনিয়নে যোগদান করিবে, না পাকিস্তানে যোগদান  
করিবে। উক্ত সভার সমগ্র লোক হাত তুলিয়া উক্তভাবে  
জানাই "ভারতবর্ষে।" সর্দারজী পুনরায় প্রশংসা করেন যে,  
এ বিষয়ে কোনো ভ্রান্তিবিদ্যে আছে কিনা। উক্তের অন্ত্য  
সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ থাকে।

ইহার পরে সের্গেন্টের দপ্তর মত বা পাকিস্তানের  
দাবী বলিয়া কিছু থাকিতে পারে বলিয়া জানরা বিশ্বাস  
করিতে পারি না।

### ত্রিপুরারাজ্যে সঙ্কট

ত্রিপুরারাজ্য ভারতীয় দৃষ্টান্তে যোগদান করার  
দৃষ্টান্ত হইতেই পাকিস্তানের বিধানভাবে পরিচালিত। এবং  
অনেক অকলে পাকিস্তানী চক্রা ক্রমাগত চুক্তি  
পড়িয়া দল-প্রাচীরে বীরে বীরে পাকিস্তানী হইয়া উঠিবার  
অন্ত চেষ্টা করিতে থাকে। ইহাই পরে তাহাদের  
অক্রমণমুখী চমকিতে পর্যাবসিত হয়। ত্রিপুরা-রাজ্যকে  
পাকিস্তানী অধিকারে পাইবার অস্ত্র তিনটিকে হইতে  
ত্রিপুরাকে অক্রমণ করিতে উদ্যোগী হইয়া ওঠে মুসলিম  
লীগ ও বা পাকিস্তান। বিশ্বাসযোগ্য মতলব সংবাদ  
প্রকাশ, চাকলা বোদনাবাদে বহু-সংখ্যক বহিঃগত  
মুসলমান সমাবেশ করা হইয়াছে। এত স্থানটি বাস  
ত্রিপুরা-রাজ্যের বাহিরে, কিন্তু পাকিস্তান এলাকার ত্রিপুরা  
রাজ্যের ভূমিদারী অবস্থিত। প্রকাশ, বহিঃগত  
পাকিস্তান ত্রিপুরা-রাজ্যে অকস্মাৎ অক্রমণ পরিচালনার  
সম্মত করিয়াছে। তাহাদের দাবী এই যে, পূর্ব  
পাকিস্তানের সন্নিহিত ত্রিপুরা-রাজ্যকে পাকিস্তান  
ভৌমনিয়নে যোগদান করিতে হইবে। ত্রিপুরা রাজ্যের  
কর্তৃপক্ষ ও প্রধানমন্ত্রীর চক্রা অসম্মোদিত ভারতীয়  
দৃষ্টান্ত-গণপরিষদে রাজ্য ভারতীয় সৈন্য প্রেরণ  
করিয়াছেন। প্রকাশ-সাধারণের উদ্দেশ্যে ত্রিপুরার

বহাগিণী বলেন, "রাজ্য হকার ভর আমরা সর্গতোভাবে প্রস্তুত থাকিব। আনার মন আপনাদের সঙ্গেই রহিয়াছে। আপনাদের বাস্তবতা ও আপনাদের জন্মভূমি সাহায্যে নিরাপদে থাকিতে পারে, তজ্জন্ম আত্মরক্ষা-ব্যবস্থাকে শিক্ষাগণী করিয়া তুলিতে হইবে। প্রভাবের মধ্যে যদি কেহ অক্রিয়শীল উপায় অবলম্বনের চেষ্টা করে, তবে কঠোর হস্তে তাহা বমন করা হইবে।"

রাজ্যের দিক হইতে এক সাবধানতা সত্ত্বেও কিয়ৎ একটি সম্মতি ব্যাপার লক্ষ্য করিতেছি। গত ২৪শে কার্তিক ( ১২ই নভেম্বর ) পূর্ববঙ্গের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন এলোসিয়েটেড প্রেসের প্রতিনিমিত্তে বলেন, জিপুরা-রাজ্যে কোনো বহিরাগত প্রবেশ করে নাই অথবা পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের পক্ষ হইতে এরূপ কোনো আন্দোলনও করা হয় নাই। "পূর্ববঙ্গের অর্থ ও বাণিজ্য সচিব মিঃ হামিদুল হক চৌধুরী বলেন, "জিপুরা রাজ্যে ভারতীয় ইউনিয়নের সৈন্য প্রেরণের সংবাদ পড়িয়া আমি বিস্মিত হইয়াছি। গত কয়েকমাস ধাবৎ পূর্ববঙ্গের অথবা আর স্বাভাবিক, কিন্তু ইহার ফলে অতিক্রিয়া বোনা।

দিতে পারে। প্রকৃতপক্ষে ইহা জিপুরার মহারাজার জমিদারীর প্রভাবের কতকগুলি অভাব-অতিযোগ দূরীকরণের আন্দোলন। কিন্তু ইহাকে এইরূপ অতিরিক্ত করিয়া বলা সম্ভব হয় নাই।" তিনি এই বলিয়া অসুযোগ তুলিয়াছেন যে, পরিস্থিতি সম্পর্কে যদি মহারাজী শঙ্কিত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহা পূর্ববঙ্গ সরকারের গোচরীভূত করিতে পারিতেন। জিপুরা ও পূর্ববঙ্গের মধ্যে সম্পর্ক ক্ষুদ্র হইতে পারে, এমন কোনো আন্দোলন পূর্ববঙ্গ সরকার তাহাদের এলাকার কখনই চলিতে দিতে পারেন না।

শেখজ কবাগুলি দেশ ও জাতির পক্ষে অত্যন্ত আশাশ্রয়। কিন্তু বৈ-আপকার ইচ্ছানিত হইয়া উঠিতে হইয়াছিল জিপুরাকে, তাহা কি নিতান্তই নিরর্থক, না ভারতীয় সৈন্যের সমসংখ্যার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই উক্তিগুলি প্রকাশ পাইয়াছে মন্ত্রিবদের মধ্যে ? ভবিষ্যৎ ঘটনাবলীর মধ্যে আশা অথবা ইহার উত্তর খুঁজিয়া পাইব বলিয়া আশা করি।



# পথ যেখানে পথিকের পদচিহ্ন নিয়ে চলেছে

শিলং-এর গিরিগাত্রে, নদীতটকতে এনে মিশেছে

পাহাড়িরা স্বর্ণা, তার রঙিন শ্রমায়

কমলার মঞ্জরী যেখানে

প্রজাপতিকে ডাক দিয়েছে সিলেটের

ঘন ছায়াশুশীতল বনে,

মনের মমুর যে সেইখানেই ডানা মেলে

উড়ে যায় মূর্তির আনন্দে।

সেই আনন্দ-পথের

সাক্ষাৎ

## দি ইউনাইটেড্ মোটর ট্রান্সপোর্ট

কোম্পানী লিমিটেড্

দি মেট্রোপলিটান্ ইন্সিওরেন্স হাউস্-১১, ক্লাইভ রো, কলিকাতা

শিলং-সিলেট্ লাইনের টিকিটসমূহ আমাদের শিলং অফিস  
এবং সিলেট্ অফিসে পাওয়া যায়। সিলেট্ লাইনে শিলং  
বাইবার ৫ টিকিট এ. বি. জোনের টেশনসমূহ হইতে পাওয়া  
যায়। শিলং হইতে সিলেট্ লাইনে এ. বি. জোনের টেশন-  
সমূহের ৫ টিকিট শিলং অফিসে পাওয়া যায়।